অভীক দত্ত

উপন্যাস সমগ্র

২

উপন্যাস সমগ্র
২

অভীক দত্ত

বুক ফার্ম

Uponash Samagra Vol-2
by
Abhik Dutta

উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই ।

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০

প্রচ্ছদ : সপ্তদীপ দে সরকার

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

ভূমিকা

উপন্যাস সমগ্র ১-এ ছিল নীল কাগজের ফুল, অসময়ের বৃত্তান্ত, অন্তবিহীন এবং শেষের পরে। উপন্যাস সমগ্র ২-এ থাকল আমার আরও তিনটি উপন্যাস।

রাস্তা পার হবে সাবধানে, আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে এবং বিজন ঘরে।

আমি যখন ফেসবুকে 'কথা ও কাহিনী' পেজে প্রথম আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে লিখতে শুরু করি, তখন এই উপন্যাস প্রবল জনপ্রিয় হয়। বই হিসেবেও 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে'র বিক্রি বেশ ভালো। কিন্তু আমার বারে বারেই মনে হয়েছিল, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এই উপন্যাসটি পৌঁছনোর দরকার। একজন অপরাধী সমাজের বাইরে থেকে আসে না। সে সমাজেই থেকে প্রবল ক্ষতি করে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।

'রাস্তা পার হবে সাবধানে' লাইনটি নেওয়া আমার প্রিয় গান চন্দ্রবিন্দুর 'ভিনদেশী তারা'র থেকে। সম্পর্কের জটিলতা থেকে অন্য এক জার্নির গল্প বলেছি এই উপন্যাসে। বিজন ঘরে কিংবা রোদচশমা উপন্যাসদুটিও আমার অনেক সময় নিয়ে লেখা।

এক কালে তো গল্প লিখেছি, তাহলে হঠাৎ উপন্যাসের দিকে ঝুঁকলাম কেন?

মূলত আমার পাঠকদের চাপেই। ধারাবাহিকভাবে আমার পেজগুলোতে এবং পরে সিক্রেট গ্রুপে লিখতে লিখতে একের পর এক উপন্যাস লেখা হতে শুরু করল। পাঠকের দাবী মেনেই বড় লেখায় মনোনিবেশ করলাম।

এবার আসি বুক ফার্ম-এর কথায়।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে শুধু বইটি প্রকাশ করেই কোন কোন প্রকাশক ভাবেন তার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বুক ফার্ম এইখানেই আলাদা। বইয়ের মান এবং ডিস্ট্রিবিউশনকে বুক ফার্ম এক আলাদা উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আমার বরাবরই মনে হয়েছে বাংলা বই তার বিপণনের জায়গায় অনেক পিছিয়ে আছে। অনেকেই ক্রমাগত প্রচার করে চলেন 'বাংলা বই এখন আর কেউ পড়ে না' বা 'বাংলা ভাষা মৃতপ্রায়'।

তা সত্যি হলে এই অতিমারীর সময় শুধু বাংলা ভাষায় লিখে এত টাকা মানুষের জন্য আমি তুলে দিতে পারতাম না। বুক ফার্ম-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তারা আমার কাজকে সম্মান জানিয়ে আমার উপন্যাসগুলি সমগ্র আকারে প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন।

আশা করি উপন্যাস সমগ্র ১ এর মত দ্বিতীয় খণ্ডটিও পাঠক আপন করে নেবেন।

আলো আসুক এই দীর্ঘ অন্ধকার সরণি শেষে, এই আশা করি।

অভীক দত্ত
৭.১১.২০২০

সূচিপত্র

রাস্তা পার হবে সাবধানে

১
জীমূতবাহন

না। আমার নাম নিয়ে একদম হাসাহাসি করবেন না। নাম নিয়ে হাসাহাসি করা মোটেও সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। তবে আপনারা সুস্থ মানুষ এটাই বা কে বলেছে? বাসে, ট্রেনে, মেট্রোতে নিজেদের মধ্যে ক্যালাকেলি করতে ব্যস্ত লোকজন আপনারা।

হে প্রিয় অসুস্থ মানুষেরা, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। মানায় না আপনাদের। হ্যাঁ, হাসাহাসি করতে পারেন আমার বিয়েটা নিয়ে। আপনারা জানেন কি না জানি না, এই বিয়েতে আমার বাবা মায়ের মত ছিল না, আমার বউয়ের বাবা মায়ের মত ছিল না, এমনকি আমাদের নিজেদেরও মত ছিল না। কী করে যে বিয়েটা হয়ে গেল, তা উপরওয়ালাই জানেন। অবশ্য কী করে হয়ে গেল, সেটা এখনই বলে দিলে তো আপনারা পিঠটান দেবেন। রয়ে সয়ে এসব কেচ্ছা শুনতেই তো মঙ্গল, কী বলেন? ভাতের সঙ্গে রোজ একটু কেচ্ছা মিশিয়ে না খেলে পরের দিন সকালে আপনাদের পেট পরিষ্কার হয় না সেটা খুব ভালো করেই জানি। সব এখনই বলব না। শুধু জেনে রাখুন, এখন আমার ফুলশয্যা চলছে। একটা গম্ভীর বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে বয়স্ক বয়স্ক কতগুলো পিসি এসে আমাদের ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে বলে গেলেন দরজা বন্ধ করে শুতে। সিনেমার মতো কোনও রোম্যান্টিক ব্যাপার নেই, হাসি মজা নেই, গান নেই, খাটের তলায় শুয়ে থাকা ঢ্যামনা জামাইবাবু নেই, কিচ্ছু নেই। রোম্যান্টিকতাহীন একটা ঘেমো ফুলশয্যা। বিয়ের ডেটে শয়ে শয়ে বিয়ে হয়েছে, আজকে এতক্ষণে ফুলশয্যায় কন্ডোমের প্যাকেটও নিশ্চয়ই খোলা হয়ে গেছে সবার, আর আমি দরজা বন্ধ করে ফ্যানের রেগুলেটর জোরে দিতে ব্যস্ত।

একবার গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, “ফ্যান জোরে দিলে প্রবলেম নেই তো?”

মেয়েটা, মানে যাকে আজ থেকে আমার বউ বলা হবে, জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “না নেই।” ফ্যানটা চারের বেশি গেলেই কুত্তার বাচ্চার মতো ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দ করে। আমি চারে রেখে একটা চেয়ার নিয়ে মেয়েটার সামনে বসে বললাম, “ইয়ে, তুমি মানে চেঞ্জ করবে না?” মেয়ে বা আমার বউ আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, “নিচে বাথরুম, এখন নামলে আবার সমস্যা।” আমার মনে হল, তাই তো। হাসিমুখে বললাম, “ঠিকই, এখানেই গামছা-টামছা দিয়ে চেঞ্জ করে নিতে পারো, আজ থেকে তো আমরা বর বউ।” মেয়েটা উত্তর দিল না। শুধু নড়ল একটু। বুঝলাম অফসাইডে গোল হয়ে গেছে। এসব না বলাই ভালো। বললাম, “চোখ বন্ধ করবে হ্যাঁ তিরিশ সেকেন্ডের জন্য, আমি পাতলা গেঞ্জিটা পরে নি।” মেয়েটা বলল, “চেঞ্জ করুন না, আজ থেকে তো আমরা বর বউ।” আমি হাঁ। এ মেয়ে ডেঞ্জার তো! এ কথাটা বলে দিল? এত বড়ো কথাটা? যাক গে, বললই যখন, তখন এত লজ্জা পাবার কিছু নেই। পাঞ্জাবিটা খুলে আমার গেঞ্জিটা গলিয়ে, বারমুডা পরে খাটের ওপাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বউ বলল, “আমি ও বাড়ি যাব কবে?”

আমি বললাম, “যবে খুশি। কেন, মন খারাপ করছে এখনই?”

বউ মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, “দিয়ে আসব কালকে।”

বউ বলল, “কাল কী করে হবে? যেদিন যাবার, সেদিনই যাব।”

আমি বললাম, “তাহলে মনখারাপ বললে কেন?”

বউ বলল, “মনখারাপ হলেই যে তার সলিউশন পাওয়া যাবে কে বলল? মেয়েদের মনখারাপ করতে নেই। আমি জানি।” আমি বললাম, “উরিব্বাস। তুমি তো ভালো ডায়লগ মারতে পারো! বাংলা সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লেখো নাকি?”

বউ বলল, “ঠাট্টা করার মতো কিছু বলেছি কি? নাকি আমাকে মানুষ বলেই মনে করছেন না?”

আমি জিভ কাটলাম, “সেসব না। আচ্ছা শোনো না, এই জবরজং পরে থেকো না। চেঞ্জ করে নাও। আমি ওপাশ ফিরে শুচ্ছি। দেখব না। মাইরি বলছি।” বউ অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ঠিক তো দেখবেন না?”

আমি বললাম, “মা শীতলার দিব্যি। সিরিয়াসলি। যাও।”

বউ উঠল। আমি ওপাশ ফিরে তাকালাম। একটা ছোটো আয়না সেট আছে। চাইলেই দেখা যেত, কিন্তু দেখলাম না। নিজে থেকে কিছু চাইব না। যেদিন দেবে, সেদিন নেব। নইলে মাঝরাতে যদি কান্না জুড়ে দেয়, সামলানো শিবের অসাধ্য হয়ে যাবে।

মিনিট পাঁচেক পরে বউ বলল, “আপনি কি কিছু করতে চান?”

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, “কী মানে?”

বউ বলল, “বিয়ে করলে যা করে?”

আমি বললাম, “না না, তুমি ঘুমাও। ভয় নেই। আমি ভালো লোক।”

বউ খাটের ওপর বসে বলল, “সে সবাই বলে আমি ভালো, হ্যান ত্যান। তারপরই আসল চেহারা বেরোয়।”

আমি বললাম,“তুমি কত লোক দেখেছ?”

বউ বলল, “অনেক। শুয়ে পড়াই তো কাজ আমার। আপনাকে ঠকিয়েছে। আমি এক্কেবারে বেশ্যা মেয়ে। আমার মতো মেয়েকে কেউ বিয়ে করে না। এসব বলেনি আপনাকে?”

আমি হাঁ করে বউয়ের দিকে তাকালাম। বউ বলল, “এইচ আই ভি টেস্ট করতে দিয়েছি। রেজাল্ট এলে তবেই শোবেন। যান, ঘুমিয়ে পড়ুন এখন।”

আমি কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে তড়িঘড়ি পাশ ফিরে শুলাম। এই দিনটাও দেখতে হল আমায়!

২

“মুত। এই মুত।” রাস্তার মধ্যে দিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে ঈশান দাঁড়াল। লোকজন সব বিচ্ছিরি দাঁতক্যালানো মুখে তাকাচ্ছে। আমি ঈশানের দিকে একটা ভস্ম করা দৃষ্টি দিলাম। অন্য দিন হলে ব অক্ষর দিতাম, আজ মুড ছিল না। ঈশান কাঁধে জোরে চাপড় মেরে বলল, “কী রে ভাই? সিল খুললি?”

আমি অবাক হয়ে বললাম, “মানে?”

ঈশান বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটা গোল বানিয়ে ডান হাতের তর্জনীটা ওটায় ঢুকিয়ে বার করতে করতে চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল, “হল ভাই, হল? গাব ছাড়িয়েছিস?”

আমি ঈশানের কথা না শুনে জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম। ঈশান দৌড়োতে দৌড়োতে আমার পাশে এসে বলল, “পারিসনি? ও ঠিক আছে। সবাই প্রথম দিনে পারে না। ইনফ্যাক্ট আমাদের দাদাও অস্ট্রেলিয়ায় ফার্স্ট ইনিংসে ধেড়িয়ে চার বছর পরে লর্ডসে সেঞ্চুরি করেছিল। তুইও হয়তো পারবি, চার বছর পর।”

আমি ফুটপাথের দোকানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট নিলাম। দড়ির আগুন থেকে সেটায় আগুন দিয়ে বললাম, “নিজে তো এই দামড়া বয়সেও একটা জোটাতে পারলি না। অন্যদের কথা শুনে অরগ্যাজম হয় কেন বে তোর? ফোট তো!”

ঈশান আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, “কী হল ভাই? ব্যাপার সিরিয়াস লাগছে? বউদি গম্ভীর? নাকি ফেসবুক কবি? তুই ছুঁলেই তিরিশ পাতা বিদ্রোহী কবিতা নামিয়ে ফেলবে?”

আমি ফুটপাথের দিকে তাকালাম। কাল রাতে ভালো বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা ভেজা ভাব আছে একটা। এদিকের ফুটপাথে দুজন শুত। নিশ্চয়ই বৃষ্টি বলে অন্য কোথাও ঠাঁই নিয়েছে। খুব সম্ভবত পঞ্চাননতলার পেতে রাখা পাইপগুলোতে। একটা আস্ত মানুষ দিব্যি সেঁধিয়ে যেতে পারে। আমারই কতবার ইচ্ছে হয়েছে পাইপে সেঁধিয়ে যাই, ইন ফ্যাক্ট এখনও হচ্ছে। এমন বিয়ে করলি মদন, হাড়মাস সুদ্ধ খেল...? ধুস! কী সব ভাবছি। এত কিছু ভেবে তো লাভ নেই। যা হবে হবে। বিয়েটা এরকম করে হয়ে যাবে তাই বা কে জানত! আর কে বলে আমরা এখন এগিয়েছি? এখনও লগ্নভ্রষ্টা মেয়ের বিয়ে হয়। দিব্যি গেছিলাম বিয়ে খেতে। ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিল। বাবা মা তো এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। আর বউয়ের দিকে তাকাব কী, কিছুই তো বলে না। যেন বিয়ে হয়েছে, চেপে যাও বস। বেটির বয়ফ্রেন্ড বিয়ের রাতে পালিয়েছে দেখে কে বলবে! সিগারেটটাও বিড়ালের হিসির মতো লাগছিল। ফেলে জুতো দিয়ে পিষে দিলাম। ঈশান বলল, “যাই বল ভাই, লো বাজেট বিয়েতেও খেয়ে সুখ আছে। তোর বিয়েটা হঠাৎ করে হল বটে, খাসি করতে পারিসনি বটে, কিন্তু মুরগির মাংসটাও জব্বর বানিয়েছিল। আচ্ছা ভাই, মদ পার্টিটা কবে দিবি?”

আমি বললাম, “আমার শ্রাদ্ধের দিন খাস।”

ঈশান মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, “শ্রাদ্ধের দিন তো মাংস খাওয়া যাবে না, নিরিমিষ চাট আমার পোষায় না, নিয়মভঙ্গের দিন খাব। আমার অ্যাকাউন্টে বেশি করে টাকা পেটিএম করে দিস তো বাপ। গ্লেনফিডিচ খাব। বড়ো লোকের মদ। ওরা নাকি ওটা খেয়ে বিডিএসএম করে। বিডিএসএম জানিস তো কী? চোখ বেঁধে লাগায়। হেবি জিনিস। দেখলেই কেমন লাগে। আরে ফিফটি শেডস অফ গ্রে দেখিসনি? হেবি জিনিস রে ভাই। তুইও ট্রাই নে।”

আমি এবার খিস্তির বন্যা বইয়ে দেবার জন্য রেডি হচ্ছিলাম, এমন সময় অফিসের বাস এসে গেল। খরুস হারামি বসটা সামনেই বসে আছে। আমার দিকে রসসিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন আমি কীভাবে করেছি তার সব রিপোর্ট এখনই ওকে দিতে হবে, ও হেড অফিসে মেল করবে।

আমি উঠতেই বলল, “তারপর, বোসো, সব ঠিক আছে তো? ফুলশয্যার পরের দিনই অফিস করছ, ছুটি নিতে পারতে তো!” আমি হে হে করে একদম পেছনের সিটে গিয়ে বসলাম। ঈশান ফেবিকুইক। আমার পাশে এসেই বসল। বিড়বিড় করে বললাম, “সব শালাকে বুলডোজারের তলায় ফেলব। তোকেও।”

ঈশান আমার পেটে চিমটি দিয়ে বলল, “এরকম করিস কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু হাস না ভাই।” আমি দাঁত বের করতে যাব, আমার ফোন বেজে উঠল। দেখি আননোন নাম্বার।

ধরলাম, “হ্যালো।”

“আমার প্যাড আনা হয়নি। ডেট সামনেই।”

অবাক হয়ে বললাম, “কে? কে আপনি? কী প্যাড? রাইটিং প্যাড?”

“আমি আপনার বিয়ে করা বউ। প্যাড মানে এখনও না বুঝলে বিয়ে করলেন কেন?”

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, “আমি কোথায় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম?”

“চাননি, করেছেন তো! সব ভেঙেচুরে পালান তো নি! সাইজ মেসেজ করছি, নিয়ে আসবেন। আরও অনেক কিছু লাগবে। আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিচ্ছি। টাকা পাঠান। কিনতে যাব। চিন্তা করবেন না, হিসাব রাখছি, চাকরির অ্যাপ্লাই করা আছে, পেয়ে গেলে সব টাকা দিয়ে দেব। আপনার টাকা আমার লাগবে না।” ফোন কেটে গেল। আমি হাঁ করে ফোনটার দিকে তাকিয়ে ফোনটা পকেটে রাখলাম।

কাজের চাপে পাথর চাপা অবস্থা। মাঝে মাঝে কফি খেয়ে জল থেকে মাথা তুলতে পারছি কোনও রকমে, আবার কিউবিকলে পৌঁছে জলে ডুবে যাচ্ছি। ব্ল্যাক হোল না কার হোলের ছবি তুলছে বিজ্ঞানীরা আর আমরা এদিকে কোডিং করে যাচ্ছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। আমাদের দেওয়ালেই বস আবার একটা হাসিমুখো বুড়োর পোস্টার চিপকে দিয়েছে। তাতে আবার লেখা "গেট এ লাইফ ম্যান।" কী যে লাইফ পাচ্ছি আমিই জানি। লাঞ্চের একটু আগে পঞ্চা বেয়ারা এসে আমার দিকে ঝুঁকে কানে কানে এসে বলল, "আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে।" পঞ্চা এভাবেই কথা বলে। কথা বলার সময় পঞ্চার পান খাওয়া মুখ থেকে পানের পিক আপনার কানে লাগতেও পারে কপাল ভালো থাকলে।

আমি ছিটকে চিড়বিড়িয়ে উঠে বললাম, "এভাবে বলার কী আছে?"

পঞ্চা কোনও উত্তর না দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন কোনও সিক্রেট মিশনে রয়েছে। আমি রেগেমেগে বেরোলাম। অফিসের লবিতে গিয়ে দেখি একজন লম্বা একহারা চেহারার লোক, আমারই বয়সি হবে, উদাস মুখে অফিসের ফ্যান দেখছে। আমি গিয়ে বললাম, "আমায় ডাকছেন?" লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বলল, "নমস্কার, আমি অমলকান্তি।" আমি হাঁ করে বললাম, "ও! তো আপনি কি রোদ্দুর হতে চান?"

অমলকান্তি বলল, "সে তো বিক্রম হয়েই রয়েছে ফাগুন বউতে। আমি আর রোদ্দুর হতে চাই না। আমি আমার প্রেমিকাকে চাই, যাকে আপনি বিয়ে করেছেন।" আমি অমলকান্তির দিকে তাকালাম। কথায় বিনয় ঝরে পড়ছে। ইনিই তাহলে তিনি? মাথা চুলকে বললাম, "খামোখা পালাতে গেলেন কেন? দিব্যি তো বিয়েবাড়িটা খেতে গেছিলাম। মাংস আসার আগেই তুলে নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। আপনার জ্বালায় মাংসটাও তো খেতে পারলাম না।"

অমলকান্তি সোফায় ধপ করে বসে পড়ে বলল, "ভয়ে। তিতি অতি দজ্জাল একজন মেয়ে। প্রতিটা ঝগড়া হ্যাশট্যাগ ফেমিনিজম দিয়ে ফেসবুকে দেয়। আমি ভয়ে পালিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বিয়ের পর এ মেয়ে নির্ঘাত আমায় জেলে ঢোকাবে। রেডি হচ্ছিলাম, বুঝলেন তো। হঠাৎ করে কে এক আত্মীয় এসে ফোর নাইন্টি এইট এ নিয়ে দীর্ঘ একখান লেকচার দিয়ে বলল, বউকে পায়ের তলায় না, মাথার উপরে রাখতে হবে। বউ মাথায় হাগবে মুতবে সব করবে। দরকার হলে বউকে তুমি হাগিস পরিয়ে দেবে। কিন্তু বউয়ের পাছায় চিমটি কাটলেই বউ বাঙালকে হাইকোর্ট দেখিয়ে দেবে। সেটা শোনার পর থেকে আমার টেবিল টেনিস বল জোড়া আউট হয়ে গেল বুঝলেন? আমি জাস্ট পালিয়ে গেলাম। প্রথমে দেওঘর। সেখানে নিরিমিষ সহ্য করতে না পেরে পাটনা চলে গেলাম। কী জ্বালা বলব মশাই, সেখানে আবার নীতিশ কুমার মদ ব্যান করে দিয়েছে। অগত্যা গুটখা খেতে হল। গুটখা আগে কোনও দিন খাইনি। হোটেলের দেওয়াল নোংরা-ফোংরা করে খুব কষ্ট হল। মনে পড়ল এই মেয়েটাকে নিয়েই তো কতবার পার্কে বসে মশার কামড় খেয়েছি। গালে চুমু খেতে গিয়ে গালে চড় খেয়েছি। তিতিকে আমি ছেড়ে দিলাম কী করে? সটান পাটনা থেকে চলে এলাম জেনারেল কামরায় করে। একটা বিহারি বাচ্চা কোলে বসিয়ে দিয়েছিল, সেটা আবার হিসি করে দিয়েছে গায়ে। দেখুন দেখুন।" অমলকান্তি জামাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি ছিটকে গেলাম, "এই না না। এসব দরকার নেই। আপনি কী করতে চান সেটা বলুন।" অমলকান্তি করুণ মুখে বলল, "এই বিয়েটা আপনি অস্বীকার করুন। ডিভোর্স দিন। আমার প্রেমিকাকে আমাকে বউ হিসেবে পেতে দিন।" আমি বললাম, "সে তো করাই যায়, কিন্তু আমি যে বউভাতে এতগুলো টাকা খরচ করলাম?" অমলকান্তি আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা এটিএম কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "পিন কোড ওয়ান থ্রি ফাইভ নাইন। ইউজ করুন। যেদিন ইচ্ছা হবে আমাকে দেবেন। এবার হবে?" আমি দাঁড়িয়ে মাথা চুলকে কিছুক্ষণ পরে বললাম, "আপাতত আমাকে একটা প্যাকেট হুইস্পার এনে দিতে পারবেন?"

৪

শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি আমি এখন অমলকান্তির ফ্ল্যাটে এসেছি। অমলকান্তি কবি। আমার বউ কবি অমলকান্তির প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু অমলকান্তি রোদ্দুর হবার আগেই ভোর থাকতে পালিয়ে যাওয়ায় বিয়েটা আমাকে করতে হয়েছে। মেঝেতে বসে ওল্ড মংকের বোতল থেকে পবিত্র সন্ন্যাসী ঢালতে ঢালতে আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে অমলকান্তি বলল, "তিতিকে ছাড়া আমি বাঁচব না বিশ্বাস করুন। ওকে ফিরিয়ে দিন আমায়।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "আমার যতদূর মনে হচ্ছে তিতি থাকলে আমিও বাঁচব না। একদিনেই আমার লাইফটা কেমন মিনি পাকিস্তান করে দিয়েছে। ঘুম থেকে মনে হচ্ছে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললেই এমন করছে যেন ওনাকে কাছে পিঠে কেউ জয়শ্রীর আম বলেছে। আপনি নিয়ে যান না। আমি বাধা দেব না। বরং একদিন ভালো মদ খাওয়াব। চাইলে শুকনো ডাঙায় ওড়াতেও পারি।"

দাঁত বের করে বললাম আমি।

অমলকান্তি জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আপনি তিতিকে চেনেন না। এখনই যদি আমি যাই, তাহলে অজন্তা ফুটওয়ারের সব হাওয়াই চটি আমার পিঠে ভাঙবে। উঁহুঁ, ওইভাবে হবে না।"

আমি বললাম, "তাহলে কীভাবে হবে?"

অমলকান্তি বলল, "আপনি খুব বাজে ব্যবহার করুন। মারধরও করতে পারেন। তাহলে জেলে যাবেন। আপনাকে বাজে ভাববে। ও কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে চলে আসবে।"

আমি চোখ ছানাবড়া করে অমলকান্তির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার কপালে ভোট ফর লেফট লেখা আছে যে সারাবছর ফেসবুকে লেফট ফ্রন্টের ক্যাম্পেন করে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসব?"

অমলকান্তি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা ঠিক। আপনি বুদ্ধিমান লোক। অত সহজে আপনাকে টুপি পরানো যাবে না।"

আমি ভ্যাবলার মতো খানিকক্ষণ বসে থাকলাম। দেখি আবার ফোন আসছে। অমলকান্তি হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, "তিতি না?" আমি দেখলাম হ্যাঁ। ফোনটা অমলকান্তির দিকে দিয়ে বললাম, "নিন কথা বলুন।" অমলকান্তি আমার দিকে তাকাল। তারপর তড়াক করে উঠে ঘরের ভিতরে দৌড়োতে দৌড়োতে বলল, "ওরে বাবা পাগল নাকি!"

আমি হাঁ করে অমলকান্তির দৌড়ে যাওয়াটা দেখে ফোন ধরলাম। ওপাশ থেকে বউ বলল, "এখন কটা বাজে?"

আমি ঘড়ি দেখে বললাম, "আটটা।"

"এখন অফিস করেন? এতক্ষণ কোন ড্রেনে পড়ে আছেন? যেটা আনতে বলেছিলাম কিনেছেন?"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিনেছি তো।"

"আধঘণ্টার মধ্যে আসুন। একটা কাজ দিয়েছি, ধেড়িয়ে লাট করে দিচ্ছেন।"

ফোনটা কেটে গেল। আমি কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এটা বিয়ের পরের দিন বউয়ের কথা! লাইফটা সত্যিই মুত হয়ে গেল তো!

৫

কপালকুণ্ডলা

হ্যাঁ। এই ভ্যাকচ্যাক নামটা আমার। বাবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন, লোকে যেরকম দিদির ভক্ত হয়, মোদির ভক্ত হয়, আমার বাবা তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। একমাত্র মেয়ের নাম দিলেন তাঁর প্রিয় চরিত্র কপালকুণ্ডলার নামে। কপালগুণে ডাকনাম হল কপাল। কিছু হলেই "কপাল কপাল" করে ডেকে পাড়া বাড়ি মাথায় করাটা বাবার প্রিয় কাজ। এলাকার সবথেকে বড়ো মিষ্টির দোকান আমার বাবার। যদিও

কলকাতা থেকে মাড়োয়ারি মিষ্টি এসে দাঁত বসাতে চেষ্টা করছে, কিন্তু আমাদের দোকানের ছানার জিলিপি আর শিঙাড়া ওইসব ঢপের মেশিনে বানাতে চাপ আছে কাকা! দোকানের নাম বাবা "বিষবৃক্ষ" রাখবে ভেবেছিল, কিন্তু ঠাকুরদার তাড়া খেয়ে অবশেষে সেটা "তালুকদার মিষ্টান্ন ভাণ্ডার"-এই সেটল হয়েছে। কাউকে "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ" বলব বলে আজন্মকাল বসে আছি, কিন্তু গুগল ম্যাপের কল্যাণে এরকম পথিক কাউকে পাব না পাব না করে একজনকে পেয়েছি। পাওয়া মানে একেবারে পাওয়া না। এ পাওয়া সে পাওয়াও না। এই তো সেদিনের কথা।

গরমের দিনের দুপুরবেলা। কলেজ থেকে ফিরতে দেখি বাবা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাকে বলল, "কপাল, ক্যাশ সামলা, কাল রাতের খাসির সাথে আম দুধ খেয়ে আমার গ্যাস হয়ে গেছে বোধহয়। যাচ্ছি আর আসছি। আমি আর পারছি না মা, তুই দেখ, আমি যাই।" বলেই স্কুটি নিয়ে বাবা ধাঁ। আমি আর কী করব, ক্যাশে বসে দুখান রসগোল্লা আর দুটো কালোজাম নিয়ে মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছি, এমন সময় এক ক্যাবলাচরণ নবকুমার এসে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "আচ্ছা, হাবলু মিত্রর বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?" হাবলু মিত্রর বাড়ি কাক চিল তিষ্ঠোতে পারে না আর ভাড়াটে!

এক মাস পর পর নতুন ভাড়াটে আসে। বুঝলাম এ নয়া চিড়িয়া। আমি বলতে যাচ্ছিলাম, "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ", কিন্তু বললাম না।

উলটে বললাম, "আপনি কোত্থেকে আসছেন?" ছেলেটা বলল, "মুর্শিদাবাদে বাড়ি। এখানে ভাড়া পেলাম। বাড়িটা বলবেন? লাগেজ রেখে বেরোতে হবে আবার খেতে।"

আমি দোকানের একটা পুচকেকে ঠিক করে দিলাম। পুচকেটা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিল হাবলু মিত্র নতুন চিড়িয়াকে সাদরে আমন্ত্রণ করেছে। মিটিমিটি হাসলাম। কদিন টেকে, দেখার সেটাই। ছেলে সিরিয়াস। ঝাড়ি-টারি দূরের কথা, মুখের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দ্যাখে না। হনহন করে বেরিয়ে যাবে, আর সন্ধের সময় এসে দোকান থেকে দুখানা শিঙাড়া নিয়ে চলে যাবে। আমি যে কতবার গলা খাঁকড়ানি দি, দেখবেই না। বাগে পেলে কানের টেস্ট করতাম। শিওর কালা আছে। আর সব থেকে অবাক কথা হল আমাদের চমকে দিয়ে এ ছেলে টিকেও গেল। হাবলু মিত্রর বাড়ি টিকে যাওয়া যে সে কম্মো না। তবে কানে শুনতে পায় না বলেই হয়তো টিকে গেল। নইলে হাবলু মিত্রের বউয়ের যা শুচিবাই, বাবা রে! সেদিন সন্ধেবেলা। দোকানে গিয়ে ঘুরঘুর করছি, কারণ তখন বাবুর আসার টাইম হয়ে গেছে। বাবাও নেই। কোথায় জানি গেছে। দেখি ছেলেটা ঠিক এসেছে। একটা টেবিলে বসে ইতিউতি তাকাচ্ছে। ভুঁড়িবাবু যাব যাব করছিল, আমি ওকে সরিয়ে ছেলেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "কী দেব?" ছেলেটা আমাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "মানে আপনি অর্ডার নেবেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ নেব। কী দেব বলুন।"

ছেলেটা বলল, "দুটো লেডিকিনি।"

আমি ছেলেটার সামনে থেকে গিয়ে একটা প্লেটে দুটো লেডিকিনি নিয়ে ছেলেটার সামনে রাখলাম, কিন্তু সরলাম না। ছেলেটা আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকাল। বোঝা যাচ্ছিল ভালো মতন ঘাবড়েছে। আমি বললাম, "কী হল? খাবেন না?" ঠিক এই সময়, যখন ইম্প্রেশন জমানোর কঠিন টাইম, মঞ্চে আমার বাবার প্রবেশ ঘটল। চিরকাল তো ফলস সময়েই এন্ট্রি নিতে হয়। স্কুটি থেকে নেমেই জোরে জোরে চ্যাঁচাতে শুরু করল, "কপাল, ওরে ও কপাল, শুনেছিস?"

আমি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললাম, "কী হয়েছে, কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে?"

বাবা গলা নামিয়ে বলল, "আরে, পাল বাড়ির মেয়ের বিয়ে অন্য বাড়িতে হয়ে গেছে। হেবি ব্যাপার। যা না মা, আমি গেলে খারাপ দেখায়। তুই গিয়ে খবর নিয়ে আয়।" আমি একবার ছেলেটার দিকে, আর একবার বাবার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে দুম দুম করে পাল বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

নবকুমারের নাম জানা গেছে। আমার মতো উদ্ভট নাম না। সুস্থ স্বাভাবিক নাম।

অনির্বাণ রায়। দেখেছেন? কত সিম্পল নাম। এই নামে কত কত বাঙালি আছে। এই যুগে কোন বাপ তার মেয়ের নাম কপালকুণ্ডলা রাখে? আর ঠাকুরদাকেও বলিহারি যাই। দোকানের নাম বিষবৃক্ষ রাখতে আটকালেন আর আমার নামটা চেঞ্জ করতে পারলেন না? শুনেছি, বাবা নাকি ঠাকুরদাকে বুঝিয়েছিলেন কপালকুণ্ডলা নাম দিলেই নাকি সংসারে সুখের সুনামি আসবে।

কী সুনামি এসেছে জানি না, তবে স্কুল কলেজে আমার নাম নিয়ে খ্যাপানোর যা সুনামি হয়, তা আর কী বলব! আমি আজকাল হাল ছেড়ে দিয়েছি। কেউ খ্যাপালে কোনও প্রতিক্রিয়া দিই না। তাতে দেখা যায়, যে খ্যাপাতে এল, সে-ই খেপে যায়। মনে মনে ভাবে এ কী রে ভাই? খ্যাপে না কেন?

তবে আমি অনির্বাণ বলে ডাকি না। নবকুমার বলেই ডাকি। কপালকুণ্ডলার চাপের মানুষ তো নবকুমারই হবে, নাকি? সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস আছে কাছের মানুষ। আমি যদি কোনও দিন উপন্যাস লিখি, তাহলে সে উপন্যাসের নাম দেব চাপের মানুষ। চাপের মানুষ বড়োই ভোলাভালা টাইপ।

কখনও সে দাড়ি রাখে, কখনও রাখে না। আবার কখনও কখনও এমনভাবে দাড়ি কাটে যে গলার কাছে একটু দাড়ি থেকে যায়। আমি ভাবি বলব, কিন্তু বলি না। ঠাকুমা বলেছে মেয়েদের একটু ঘ্যামে থাকতে হয়। সমস্যা হল, আমার নবকুমারকে ঘ্যাম দেখিয়ে থাকলে সারাজীবন আমাকে কুমারীই থাকতে হবে। নবকুমারের মতো আলাভোলা ঝাড়িহীন পুরুষ আমি কম দেখেছি।

আমার দিকে তাকাতে যে কী হয় তার কে জানে! এমনভাবে দোকানে আসবে যেন সাড়ে চুয়াত্তরের উত্তমকুমার। কিছুই বোঝে না। পুরো অবাক পৃথিবী মোড।

আসবে, এসে বসবে। খেয়েদেয়েই চলে যাবে। ওরে, তোর জন্য যে একটা মেয়ে আজকে একটু কষ্ট করে ভালো করে স্নান করেছে, কাজল দিয়েছে, আমেরিকা থেকে মেসোর আনা লিপস্টিক দিয়েছে, দেখ রে বাবা নবকুমার!

গোদের ওপর বিষফোঁড়া তো তখন হয়, যখন নবকুমার যেতে না যেতেই পাশের পাড়ার দুষ্টু বুড়োটা দোকানে এসে আমার দিকে জুলজুল করে তাকায়। দুষ্টু বুড়োটা হেব্বি বদ। মেয়ে বা বউ দেখলেই পিঠে হাত দেবে। আমার দিকে তাকালে আমি আগুনে চোখে তাকাই। বুড়ো বসে শিঙাড়া নেয়। একবাটি দুধ নেয়। তারপর দুধে শিঙাড়া চুবিয়ে চুবিয়ে খায়। পাড়ার বদ ছেলেরা দাদুকে দুধে শিঙাড়াও বলে। দাদুর তাতে যায় আসে না। দাদু জিনিস।

দাদুর দুই ছেলেই ভালো চাকরি করে। বিরাট ব্যাপার। দুই ছেলেই বড়ো গাড়ি নিয়ে ঘোরে। কিন্তু দাদুকে দেখলে কে বুঝবে? দাদু আসবে, জুলজুল চোখে তাকাবে। আমার বন্ধু পিউ বলেছে, কিছু কিছু বুড়ো আছে, তাদের শেষ দিন অবধি ইয়ে শুলায়।

আমার দাদুর চোখ ঠিক লাগে না। কেমন বুকের দিকে তাকায়। আমি একদম সহ্য করতে পারি না এরকম ধরনের লোক। আর কিছু লোক আছে বাসে ট্রেনে উঠলেই ঠিক পাছা ঘষবে। যেন ঘষার জিনিসের অভাব আছে পৃথিবীতে। আমি যেই বলি, “দাদা, খুব ঘষতে ইচ্ছা করলে বলবেন, গরম তাওয়া ধরব, সেঁকে নেবেন।” বাস সুদ্ধ লোক হাসে। লোকগুলো দূরে যায় বটে, কিন্তু এদের লাইন শেষ হবার নয়। দাদার বয়সি, বাবার বয়সি, এমনকি দাদুর বয়সি লোকেরাও কিছুদিনের মধ্যেই সবাইকে অবিশ্বাস করতে শিখিয়ে দেবে। সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখিয়ে দেবে।

আর এইজন্যই এদের মধ্যে আমার নবকুমারকে ভালো লাগে। কোনও ভান নেই, ঝাড়ি নেই। ক্যাবলাকান্ত আসবে। বসে বসে মাথা নিচু করে খাবে। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে বাড়ির দিকে রওনা

দেবে। আমার খুব ইচ্ছা করে নবকুমারের বাড়ির ভিতর উঁকি দিয়ে দেখি। নবকুমার কী করে? রান্না করে খায় সেটা টের পেয়েছি, আমার ওর রান্নার স্বাদ পেতেও ইচ্ছা করে।

ঠিক করেছি খুব বৃষ্টি হলে, নবকুমারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াব। পোড়ামুখী বৃষ্টিও তেমন, এ বছর নামার নামই করে না। কোনও কোর্টে এর নামে মামলা করা গেলে সবার আগে গিয়ে মামলা করে আসতাম।

যাক গে, যা বলছিলাম, নবকুমারকে আমার পছন্দ। আমি খাতায় রোজ নবকুমারের সঙ্গে কথা বলার ১০১ উপায় লিখি আর কাটি।

যেদিন কথা বলবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, সেদিন যে কী হবে ভাবতে এখনই আমার বুক দুরুদুরু করে ওঠে।

কিন্তু একটু যে ঠান্ডা মাথায় শান্তিমতো বসে নবকুমারের কথা ভাবব, তার কি উপায় আছে? ওই বাবা দোকানের বাইরে থেকে "কপাল", "কপাল" করে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বড়ো কোনও অর্ডার এল! জীবনে কি সুখ আছে কোনও?

যাই, দেখি গে!

৭

আমার বাবাটা না কোনও দিন মানুষ হবে না। এই যে এত চুল আঁচড়ে দি, ছাদে বসে কী সুন্দর করে কলপ করে দি, মাঝে মাঝে ভাত খাইয়েও দি, তাতেও আমার বাবা আমাকে বুঝতে পারে না।

নইলে একটু খোঁজখবর নেবে না, যে, মেয়ের একজনের ওপর চাপ আছে, একটু দেখে খেলো এখন?

রবিবার দিন, দিব্যি ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং তুলে লুচি আলুভাজা খাচ্ছি, মা এসে গম্ভীর মুখে বলল, "আজ কোথাও যাবি না।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেন?"

মা হাসিমুখে বলল, "সাঁপুই মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কথা বলছিলাম না, ওরা তোকে দেখতে আসবে আজ। আরে সেই যে, ওদের ল্যাংচা বিখ্যাত।"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম ল্যাংচা তোমার পেছনে গুঁজে রাখো, অনেক কষ্টে উড়ন্ত চপ্পল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বললাম, "আমাকে আগে বলোনি কেন?"

মা অবাক হয়ে বলল, "সে কী! পরশু রাতেই তো বাবা বলছিল। তুই খেতে খেতে মোবাইল দেখছিলি আর হুঁ হুঁ করছিলি!"

আমি বললাম, "উফ! আমার কানে হেডফোন ছিল তো! আমি কি অত শুনেছি নাকি?"

মা বলল, "শুনিসনি তো কী হয়েছে? এত ভালো সম্বন্ধ পাবি নাকি কোথাও? সাঁপুইদের মিষ্টি জগৎপুরের বিখ্যাত। কত লোক এসে সাঁপুইদের ল্যাংচা নিয়ে যায়। ওখানকার কোনও নেতা তো কোনও অনুষ্ঠানে সাঁপুইদের ল্যাংচা ছাড়া কিছু মুখেই নেবে না।"

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললাম, "মানে? সাঁপুইদের ল্যাংচায় কী আছে? কত বড়ো? জনি সিন্সের থেকেও বড়ো?"

মা অবাক হয়ে বলল, "জনি কী? সে আবার কী?"

আমি লুচি মুখে দিয়ে বললাম, "ও বুঝবে না তুমি। বুঝে কাজও নেই। আমি আজ থাকতে পারব না।"

মা রেগে গিয়ে বলল, "না থাকার কী আছে? তোর বাবার সম্মান আছে না? আচ্ছা শোন না মা, তোর বাবার প্রেস্টিজের ব্যাপার। আচ্ছা শোন, আজ একটু ভালো করে বস, আমি দুহাজার টাকা দেব তোকে কথা দিলাম।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "দুহাজার? আচ্ছা, দাও তাহলে। এখনই দাও। নইলে কথা রাখতে পারছি না।"

মা গজগজ করে কোমর থেকে একটা গোলাপি পাত্তি বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, "এরপরে যদি না থেকেছিস না কুন্তি, তাহলে তোর একদিন কি আমার একদিন হবে এই বলে দিলুম।"

আমি এঁটো হাতে মার কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, "কেন থাকব না মা জননী? দুহাজার ফেলেছ, এটুকু তো কত্তেই পারি। তবে শুধু গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু বলে দিলাম!"

মা দুহাত তুলে নমস্কার করে বলল, "তাই করিস মা। জয় জগত্তারিণী, একটু দেখো মা আমার এই পাগলি মেয়েটাকে।"

***

যথাসময়ে তেনারা এলেন। আমার জ্যাঠা কাকারাও এসেছে। বড়ো মামা এসেছে। বাড়ি ভর্তি লোক, যেন মেলা বসেছে। আমি অত বুঝিনি, দুহাজার নিয়ে ভেবেছিলাম অত ঝাম হবে না। এ যে এত ক্যাচালের যজ্ঞ, ভাবতে পারিনি। মাসি এসে গলায় একটা বড়ো হার পরিয়ে দিল। মা শাড়ি পরিয়ে দিল। আমি বললাম, "এ কী করছ? এসব তো কথা ছিল না বন্ধু!"

মা রাগি মুখে বলল, "দুহাজার নিয়েছিস, যা যা বলছি তাই করবি।"

আমি কিছু বললাম না। দাঁড়াও, করছি ব্যবস্থা।

হাতে একটা শিঙাড়ার ট্রে ধরিয়ে দিল মাসি। আমাদের দোকানের বিখ্যাত শিঙাড়া। সেটা নিয়ে বসার ঘরে ঢুকে দেখি আমাদের বাড়ি, তাদের বাড়ি মিলিয়ে একগাদা লোক।

মা শিখিয়ে দিয়েছিল সবাইকে প্রণাম করতে হবে। আমি প্রণাম না করেই বসে পড়লাম। বাবা ইশারা করল, "ওরে কপাল, প্রণাম কর মা।"

আমি শুনলাম না। ছেলের বাড়ি থেকে এক বয়স্কমতো মহিলা এসেছিল। আমায় দেখে বলল, "তোমার নাম কী মা?"

আমি বললাম, "কপালকুণ্ডলা তালুকদার।"

মহিলা বললেন, "একটু হেঁটে দেখাও মা।"

আমি হাসিমুখে বললাম, "হাঁটলাম তো, দেখেননি? শিঙাড়ার ট্রে তো হেঁটেই নিয়ে এলাম।"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কপাল!'

মহিলা অপ্রতিভ হয়ে বললেন, "তা ঠিক। তুমিই তো এনেছ। আচ্ছা, দাঁত দেখি।"

আমি বললাম, "দেখানো যাবে না, গুড়াকু মেজে এসেছি এখন।"

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আমার বাবাকে ধরে রাখা যাবে না বুঝছি, হেবি খচে গেছে। মহিলা একটা ছেলের দিকে দেখিয়ে বলল, "তোমাদের কিছু বলার থাকলে নিজেরা কথা বলো।"

ছেলেটাকে দেখলাম। কোথায় চাঁদ আর কোথায় ...। কোথায় আমার নবকুমার আর কোথায় এই বাচ্চু কুমার!

ছেলেটা বলল, "একটা গান করো।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম, "সাইকেলের দুদিক চাকা মধ্যে ফাঁকা, আয় আয় চড়বি কে কলির সাইকেলে।"

ছেলের বাড়ির লোকজন বুঝদারের মতো মাথা নাড়তে লাগল। আমি হাফ গান গেয়ে বুঝলাম এতেও এদের কিছু হচ্ছে না, আমাকে পছন্দ করেই ছাড়বে।

আমি "আমার হাগু পেয়েছে, এলাম, পরে কথা হবে", বলে ঘর ছেড়ে দৌড় মারলাম।

বাড়ির সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল, আমি বাথরুমে ঢুকে বসে রইলাম।

সব জিনিসের খারাপ ভালো থাকে। কোনও কিছুরই সব খারাপ হতে পারে না।

আমাদের বাড়ির যেমন।

বাড়ি পৌঁছতে রাত সাড়ে নটা বেজে গেল।

রোজ এই সময় আমার বাবা আর মা গম্ভীর মুখে সিঁদুরের দিব্যি বলে কী একটা ঢপের সিরিয়াল দ্যাখে। বাড়ি যখন ঢুকি তখন কেউ দেখতেও পায় না। জুতো খুলে গা হাত পা ধুয়ে নিজের ঘরে গেলেও কেউ টের পায় না আমি এসেছি।

দশটায় "ফুলকো লুচি", সাড়ে দশটায় "বিধবার কলঙ্ক" দেখে এক্কেবারে রাত এগারোটার সময় সবার খেয়াল হবে যে এবার খেতে হবে। তখন গিয়ে সবাই খেতে বসবে।

এদিন বাড়ি ঢুকে দেখি টোটাল বিলা চলছে।

বাবা গম্ভীর মুখে পায়চারি করছে। মা কাঁদো কাঁদো মুখে বসে আছে। আর বউ এইচবিও-তে কী একটা ইংরেজি সিনেমা দেখছে, তাতে যে-কোনো মুহূর্তে নায়ক নায়িক বিপজ্জনক দৃশ্যে অভিনয় করতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমি ঢুকতে মা আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেভাবে সিনেমায় অভিমানী উকিল জজের দিকে তাকিয়ে বলে, "জজ সাহেব, আইনের চোখ তো অন্ধ, আপনিই এই অবিচারের বিচার করুন।"

আমার হাতে কালো প্যাকেট। আমি একবার বাবার দিকে, আর-একবার মায়ের দিকে তাকালাম। বউ কড়া গলায় বলল, "এনেছ?"

আমি মাথা নেড়ে প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম।

বউ ওদের সামনেই প্যাকেটটা বের করে দেখল। মা বড়ো বড়ো চোখ করে বউয়ের দিকে তাকাল। বাবা ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

বউ ভালো করে দেখে খুশি হয়ে বলল, "একদম ঠিক জিনিস এনেছ। বাহ। ভালো তো।"

আমি একবার মার দিকে তাকিয়েই উপরের ঘরে দৌড় দিলাম। এরকম বিপজ্জনক ফোর ফরটি ভোল্ট বউ হবে, আমি চারদিন আগেও জানতাম না মাইরি। কোথাকার কোন এক গ্রামের ঘোমটাপরা বলে আমার কতদিনের শখ, ফুলশয্যার সময় মাথায় ঘোমটা দিয়ে দুধ নিয়ে আসবে। তার জায়গায় কী চলে এল। ভাবতেই দেড়তলার ছাদ থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছে করছে।

বউ সোজা উপরে চলে এসে আমাকে বলল "তোমার ফিরতে এত দেরী হল কেন?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "অমলকান্তির ফ্ল্যাটে গেছিলাম।"

বউ আমার আগাপাশতলা দেখে বলল, "তুমি কি পুরুষত্বহীনতায় ভোগো, স্বপ্নদোষ আছে, লিঙ্গ ছোটো? তাহলে ডিকে লোধের কাছে যাও।"

আমি গোবেচারার মতো বললাম, "কেন?"

বউ বলল, "যে ছেলে নিজের বিয়ের দিন পালায়, যার বিয়ে করার ধক নেই, সেই দুর্বল চরিত্রের ছেলের বাড়ি কী করতে গেছিলে? ঘর বন্ধ করে দেখতে যে তোমারটাও ওর মতো কি না?"

আমি ঘামতে শুরু করলাম। এ কী ডেঞ্জার চিজ রে ভাই! বলেও ভুল হয়েছে।

বউ ফ্যান চালিয়ে আমার সামনে চেয়ার নিয়ে বসে বলল, "তা কী বলল সে?"

আমি বললাম, "তোমাকে ফেরত চায়।"

বউ আমার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে বলল, "ফেরত তো তখন চায় যখন জিনিস কারও পার্মানেন্টলি হয়। আমি ওর কোনও দিন পার্মানেন্টলি হইনি। হবার প্রশ্নই নেই। তুমি বিয়ে করতে গেলে কেন আমাকে? পালাওনি কেন?"

আমি বললাম, "আমি বুঝিনি। সবাই কী সব বলল, তুমি নাকি লগ্নজিতা হয়ে যাবে।"

বউ বলল, "লগ্নভ্রষ্টা। যাক গে, উদ্ধার করেছ। এবার ডিভোর্স দিতে হবে। সে ব্যাপারে কী করতে হবে দেখো।"

আমি আশার আলো দেখে বললাম, "রেজিস্ট্রিই হয়নি তো। ডিভোর্সের দরকার কী?"

বউ অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "তাই তো! এটা তো ভেবে দেখিনি। তাহলে আবার কী! ডিল ফাইনাল। সকালে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসবে। ওকে?"

আমি আশায় বাঁচে চাষার মতো মুখ করে বললাম, "একদম। যা বলবে।"

৯
অমৃত

পৃথিবীতে অনেক গন্ধ আছে। গোলাপের গন্ধ, রজনীগন্ধার গন্ধ, মুরগির গুয়ের গন্ধ, পেট্রোলের গন্ধ... কিন্তু আমার সবথেকে প্রিয় গন্ধ হল অমলেটের গন্ধ। কোনও জায়গা থেকে অমলেটের গন্ধ পেলেই আমার মনটা কেমন কেমন করে ওঠে। একটা ডিমের ক্ষমতা তুম ক্যা জানো রমেশবাবু!

অবশ্য রমেশবাবু ডিমের ব্যবসায়ী হলে জানতেই পারেন। সব না জানার দায় ভদ্রলোক নেবেনই বা কেন!

যাক গে, কথাটা কিন্তু আমি ডিম নিয়ে বলব বলে শুরু করিনি।

ইন ফ্যাক্ট, ডিম নিয়ে কিছু বলারই নেই।

ডিম্ভাত, ডিম্ভাজা ভালো, এই পর্যন্তই।

কথাটা অন্য।

কথাটা হল আমি প্রেমে পড়েছি।

এবং মারাত্মক প্রেমে পড়েছি।

মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার পাশে বসেছিল। আমরা আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলেছিলাম। মেয়েটির সঙ্গে শুধু দেখা হবার কথাই ছিল।

মাঝখান দিয়ে চুমু যে কখন চলে আসবে বুঝতে পারিনি।

আমি পাগলের মতো চুমু খেয়েছি তাকে। এবং সে আমাকে। প্রেমে পড়লে মানুষ ভুলে যায় চারপাশে কে আছে। আমারও তাই হয়েছিল। মেয়েটিরও।

চুমু খাওয়াখাওয়ির পর সে বেশ কিছুক্ষণ আমায় জড়িয়ে ধরে বসে রইল। আমি তাকে। বললাম, "ছাড়বে না?"

সে বলল, "ছাড়ব না।"

আমি বললাম, "এত ভালোবাসলে কবে?"

মেয়েটি আরও আঁকড়ে ধরে বলল, "জানি না।"

আমার বিভিন্ন অনুভূতি হচ্ছিল। সবথেকে বেশি ইচ্ছা করছিল লাফ মারতে। প্রেম জিনিসটা এত ভালো জানতাম না তো! এত ভালো একটা জিনিস আমি এতদিন করিনি কেন? কী ভালো লাগছে! মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাব। মনে হচ্ছে শহিদ মিনারের মাথায় উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে জানান দি, "আমি ভালোবাসি। আমি তাকে পাগলের মতো ভালোবাসি।"

ভালোবাসায় শরীর এলেই সে ভালোবাসা খারাপ হয়ে যায় না। শরীর তো আসে স্বাভাবিক নিয়মে। আমি কাউকে ভালোবাসলে সে কাছে এলে আমি তাকে দূরে সরিয়ে দেব কেন? আর এই অনুভূতি কি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব?

সে বাসে করে চলে গেলে আমি রাস্তার পাশের দোকানে চুপ করে বসে থাকলাম। আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে। গালে লিপস্টিকের দাগ। আশেপাশের লোক বেশ কৌতুক সহকারে দেখছে আমাকে। আমি তাদের পাত্তা না দিয়ে মন দিয়ে ডিমভাজার গন্ধ নিতে নিতে তার কথা ভাবতে লাগলাম।

ভালোবাসা এত ভালো কেন?

দোকানি ডিম ফ্যাটাচ্ছে। চামচ দিয়ে কী অবলীলায় সে ডিম ফেটিয়ে যাচ্ছে।

আমার ভেতর থেকেই বেরিয়ে এল, “আমার জন্য একটা অমলেট দিয়ো তো।”

দোকানি অভ্যস্ত হাতে গ্লাসটা কড়াইতে খালি করে আর-একটা ডিম নিল। চামচ দিয়ে সেটা ফাটিয়ে গ্লাসে ঢেলে নুন লংকা দিল। আবার ফ্যাটানো শুরু। আমার পাশের জন মন দিয়ে অমলেট খাচ্ছেন। চামচ দিয়ে টেনে টেনে।

আমার মনে আছে আমাকে ক্লাস ফোরে শনিবার দুপুরবেলা যিনি অঙ্ক করাতে আসতেন, তাঁকে মা চায়ের সঙ্গে অমলেট দিতেন। স্যারের যেদিন মন ভালো থাকত, আমাকে তাঁর অমলেট থেকে কিছুটা দিতেন। যেদিন দিতেন, স্যারকে ভগবান মনে হত। যেদিন দিতেন না, ভারী কষ্ট পেতাম। মন খারাপ হত। সেদিন বিকেলে ভালো ব্যাট করতে পারতাম না।

ডিমের ভূমিকা আমার জীবনের অপরিসীম।

মেয়েটির পারফিউমের গন্ধ আমার হাতে লেগে রয়েছে। মাঝে মাঝেই আমি সে গন্ধ নিচ্ছিলাম। লিপস্টিকের গন্ধটাও যে কী ভালো লাগছিল! অমলেটের গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে সে গন্ধ এক অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল।

আমার অমলেট এল।

আমি মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। একজন ডিমের পোচের অর্ডার দিল।

দোকানিকে আমার দ্য ভিঞ্চি মনে হচ্ছিল।

কী সুন্দর কুসুমটাকে এক রেখে পোচ বানিয়ে দিল।

এসব প্রতিভা। সবার দ্বারা সম্ভব না। আমার অমলেট চামচ দিয়ে খেতে খেতেই আমি আমার জন্য পোচের অর্ডার দিয়ে দিলাম।

চুমুর সঙ্গে অমলেট না মিশলে সেটা ভালোবাসা হয় নাকি?

ধুস!

১০
অমৃত

দাদার বউ বা বউদিরা সাধারণত দু ধরনের হয়।

১) ভালো

২) খারাপ

এই ভালো খারাপের রিলেটিভ ব্যাপারও আছে। কেউ কেউ আছে, যতদিন ঠাকুরপো চাকরি পায়নি, ঠারেঠোরে কথা শোনাতে ছাড়বে না। আর যখনই সে ঠাকুরপো চাকরি পেয়ে যাবে, তখন সেই নয়নের মণি।

হাতের কাছে শাঁসালো ছেলে, নিজের আত্মীয়মহলে তখন ঘ্যাম বাড়াবার জন্য এই ঠাকুরপোই তখন কত ভালো। এটা সেটা রান্না আসছে। আর শুধু নিজের বউদি কেন, এই সময়টা যে কত মা-মাটি-মানুষের আবির্ভাব হয় সে লিস্টি শেষ হবার নয়।

সমস্যা হল চুমু এবং অমলেট খেয়ে আমি যখন বাড়ি পৌঁছোলাম তখন চুমুর দাগটা মোছা হয়নি।

বউদির পিসতুতো বোন অনন্যা আগে আমাকে বিশেষ পাত্তা-ফাত্তা দিত না। আমি সেভাবে লাইন মারতেও যাইনি, কিন্তু তেনার ধারণা ছিল আমার তার ওপর হেব্বি চাপ আছে। যদ্দিন চাকরি পাইনি পাত্তা না দেওয়াটা বজায় ছিল।

চাকরিটা পাবার পর থেকে অনন্যা প্রায়ই আসে। বউদির সঙ্গে কথা বলে, বউদি আকারে ইঙ্গিতে আমাকে আর অনন্যাকে জড়িয়ে কল্পনা চাওলা বানায়। আমি দাঁত-ফাত কেলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ি বা পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে যাই। বউদিদের বাড়ি থেকে ফর্মাল প্রোপোজালও যে-কোনো সময় আসবে আসবে করছে, সকালেই শুনেছিলাম খাওয়ার টেবিলে বাবাকে বউদি ইনিয়েবিনিয়ে এ ব্যাপারে কিছু বলার চেষ্টা করছিল।

আমি অত কিছু বুঝিনি, হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ঢুকে অনন্যার সামনে পড়ে গেলাম।

বত্রিশ পাটি বের করে অনন্যাকে বলতে যাব "ভালো আছ?" দেখি অনন্যা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে মুখে ওড়না দিয়ে বউদির ঘরে দৌড়ল।

আমি লিপস্টিকের দাগের কথা ভুলে গেছিলাম। অনন্যার দৌড় দেখে বুঝতে পারলাম সেটা দেখেই বিবিসি নিউজ নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে পড়েছে।

আমি সেটা আর না মুছেই ঘরে ঢুকে পড়লাম।

খানিকক্ষণ পরেই দরজায় ঠক ঠক। দরজা খুলে দেখি বউদি দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে দেখে বলল, "অমু, কিছু খাবে?"

বুঝতে পারছি বউদি এসব বলে আমার গাল দেখার তালে আছে।

আমি বললাম, "না বউদি, অমলেট খেয়ে এসেছি তো।"

বউদির চোখে পাওয়ার আছে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে লিপস্টিকের দাগ আইডেন্টিফাই করার ইচ্ছা বউদির ভয়াবহ। একটু দূরে অনন্যা কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে রাহুল গান্ধিকে ভোটের রেজাল্ট শোনানো হচ্ছে।

আমি মোবাইলের টর্চটা জ্বেলে গালে আলো ফেলে বউদিকে বললাম, "দ্যাখো বউদি, আজকাল কী সব লিপস্টিক বেরিয়েছে শুনেছি, চুমু খেলেও গালে দাগ পড়ে না। তবু এ শেখেনি। ভালো দেখে একটা লিপস্টিক কিনে দিতে হবে বলো?"

বউদি চমকে গেল। আমাকে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "কে? কাকে কিনে দিতে হবে লিপস্টিক?"

আমি বললাম, "সে আছে একজন। খুব ভালো মেয়ে। নিয়ে আসব। অনন্যারই বয়সি হবে। ভালোই হল। এ বাড়িতে একজন বন্ধু পাবে অনন্যা।"

বউদি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে "অ" বলে ঘরের দিকে রওনা দিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম অনন্যাও ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ-টুখ মুছে বসার ঘরে গিয়ে দেখি বাবা আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আমি বললাম, "কিছু বলবে?"

বাবা বলল, "বউমার কাছে শুনলাম তুই কোথায় কী করে এসেছিস নাকি?"

আমি বললাম, "সেরকম কিছু না।"

বাবা চারপাশ তাকিয়ে আমার দিকে তাকাল, গলা নামিয়ে বলল, "ভালো করেছিস। এই অনন্যা মেয়েটা মোটেও সুবিধের ছিল না। যারা মাংসে দু কেজি চিনি দেয় তারা মোটেও সুবিধার হয় না। বাঁচিয়েছিস। তা মেয়েটা কে রে?"

আমি বললাম, "ফেসবুকে আছে, অ্যাড করে নাও। বেশি প্রশ্ন করবে না। আমার প্রেস্টিজ আছে।"

বাবা মুখ বাঁকিয়ে বলল, "হুহ, আমার বয়ে গেছে অ্যাড করতে। তোর গোরু, তুই সামলা। আমি হলাম এখন শান্তি রক্ষা কমিটির মেম্বারের মতো। বাড়িতে ক্যাচাল দেখলে অর্ডার অর্ডার বলব।"

আমি ফিক ফিক করে হাসতে লাগলাম।

১১

জীমূতবাহন

ঘুম একটা শান্তির জিনিস। কিন্তু বউ ঠিক না থাকলে সে ঘুম শান্তির ছেলে হয়ে যায়।

ভোর চারটেয় আমার বউ আমাকে ঠেলতে শুরু করল।

আমি ঘুমচোখে ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, "কী হল?"

বউ বলল, "বাড়ি নিয়ে চলো। আমার গোছগাছ হয়ে গেছে।"

আমি হাঁ করে একবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। আর-একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখন রাস্তায় বেরোলে কুকুরে তাড়া করবে তো। অন্তত দিনের আলো ফুটুক!"

বউ বলল, "না। তোমার বাইক আছে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

বউ বলল, "বাইক বের করো। আমাকে দিয়ে এসো। পরে লোক পাঠিয়ে সব বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে যাব।"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "আচ্ছা তাহলে বড়ো বাইরে সেরে নি।"

বউ বলল, "যা করবে তাড়াতাড়ি করো। আমার এখানে ঘুম হচ্ছে না।"

আমি উঠে বাথরুম গেলাম। অসময়ে বেগ আসে না। তবু চেষ্টাচরিত্তির করতে লাগলাম। সকালে ক্লিয়ার না হয়ে বেরোলে অস্বস্তি হয়।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে আউটপুট বেরোবে বেরোবে করছে, এমন সময় বউ দরজা ধাক্কাতে শুরু করল, "হল?"

আমার আবার ভেতরে ঢুকে গেল। অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটলে আমার ঢুকে যায়।

কিছুক্ষণ আরও বসে থেকে বিফলমনোরথ হয়ে বেরোলাম।

বউ গম্ভীর মুখে বলল, "ভেতরেই কি গোটা দিনটা কাটানোর প্ল্যান ছিল?"

আমি ব্যাজার মুখে তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোলাম। নিচে নেমে বাবা মাকে জাগালাম। সবাই অবাক হয়ে বসে আছে। মা ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "এত ভোরে অষ্টমঙ্গলা করতে যাচ্ছিস নাকি তুই?"

আমি বললাম, "না ওকে বাড়ি দিয়ে আসি। বাড়ি যেতে চাইছে।"

মা আর কোনও কথা না বলে শুয়ে পড়ল। যেন জানত এরকমই কিছু একটা হবে।

আমি বাইক বের করলাম।

বাড়ির সামনে পাড়ার কুকুরগুলো শুয়ে ছিল। ঘেউ ঘেউ শুরু করল। আমি বকাঝকা দিয়ে থামালাম।

গাড়ি স্টার্ট দিতে বউ এসে পেছনে বসল। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শ্বশুরবাড়ি পৌঁছোলাম। সেখানেও এক অবস্থা। সবাই ঘুমাচ্ছিল। বাইরের পাঁচিলের গেটে তালা দেওয়া। বউ বলল, "যাও, পাঁচিল চড়ে ভেতরে গিয়ে কলিং বেল বাজাও।"

আমি কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মনে হল এই জিনিসের থেকে যত তাড়াতাড়ি বাঁচা যায়, ততই ভালো। পাঁচিল টপকে কলিং বেল বাজালাম। শ্বশুরমশাই দরজা খুলে আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, "কী হল?"

বউ বাইরে থেকে চ্যাঁচ্যাল, "দরজা খোলো এত কথা না বলে।"

হতভম্ব মুখে শ্বশুরমশাই দরজা খুললেন।

বউ শ্বশুরমশাইকে বলল, "খুব ভেবেছিলে না? মেয়ে পার করে দিয়েছি? নাও চলে এসেছি। এবার কী করবে করো।"

শ্বশুরমশাই একবার মেয়ের দিকে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানে?"

বউ বলল, "মানে পরিষ্কার। আমি চলে এলাম। রাতে ঘুমাইনি। এবার যাই, ঘরে গিয়ে ঘুমাই। ডিস্টার্ব করবে না দুটোর আগে।"

বলে গটগট করতে করতে বউ ঘরে চলে গেল।

শ্বশুরমশাই আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "তুমি কিছু বলবে না?"

আমি বললাম, "আমি কী বলব? মানে আমার তো কিছু বলার নেই। আপনারা যে নাটকীয় পরিস্থিতিতে বিয়েটা দিলেন, তাতে এরকম হওয়াটা তো আশ্চর্যের কিছু নয়। হতেই পারে।"

শ্বশুরমশাই বললেন, "ওর মা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাচ্ছে। উঠে এসব দেখলে তো অক্কা পাবে। অষ্টমঙ্গলা হল না, এখনই মেয়ে বাড়ি ফিরে এল!"

আমি হাতের আংটি খুললাম, গলার চেন খুলে ওঁর সামনের টেবিলে রেখে বললাম, "এগুলো থাক। আর দরকার পড়বে না বোধহয়। আইনি ব্যাপার কিছু থাকলে আমরা আলোচনা করে পরে সেটল করে নেব। আপনার মেয়ে যদি না থাকতে চায়, তাহলে তো কিছু করার নেই।"

শ্বশুরমশাই ধরা গলায় বললেন, "আমি এই মেয়েকে নিয়ে কী করব? নিজেই বিয়ে ঠিক করল। সে বিয়ে ভেঙে গেল। ছেলে এলই না। তোমাকে কোনও মতে রাজি করিয়ে বিয়েতে বসালাম। তুই তখন বল বিয়ে করবি না! ছি ছি ছি, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপড়শির কাছে মুখ দেখাব কেমন করে!"

আমি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে চুপচাপ সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইকে এসে বসলাম।

সকাল সকাল এত চাপ আর নিতে পারা যাচ্ছে না।

কোথাও গিয়ে ভালো চা খেতে হবে।

১২
অমৃত

প্রেম ভালো জিনিস।

চুমু খাবার পরে প্রেম ভালোতর জিনিস।

গরমের মধ্যেও মনে হয় চাদ্দিকে কেমন একটা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, পাখি-টাখি গাইছে। খিঁচ ধরে থাকা লোকজনের মুখও মিষ্টি মনে হয়।

এই যে আমি খাবার টেবিলে বসে আছি দাদা আর বাবার সঙ্গে, আর বউদি ভাতের হাঁড়ি, মাছের বাটি সব দুম দুম করে টেবিলে দিচ্ছে, তবু সব কত মধুর লাগছে।

বাবা পরমহংসের মতো উদাসীন চোখে বসে আছে। দাদা ভয়ে ভয়ে বউদিকে দেখছে। অনন্যা খাবে বলে বউদি মাংস রেঁধেছিল, সে মাংসের বাটি কেমন অবহেলায়, করুণ ভাবে টেবিলের ওপর বসে আমাকে দেখছে।

এক ফাঁকে বউদি রান্নাঘরে যেতেই দাদা ফিসফিস করে বলল, "তোর কোনও দিন বুদ্ধি হবে না। অনন্যাকে কাটানো যেত, তা বলে লিপস্টিক মাখার কী দরকার ছিল?"

আমি দাদাকে বললাম, "আমি মাখিনি। চুমু খেয়েছে, আমি কী করব?"

দাদা হাঁ করে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "মাইরি? সিরিয়াসলি? তুই প্রেম করছিস?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

বাবা রান্নাঘরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দাদাকে বলল, "সবাই তোর মতো মুখ গুঁজে পড়াশুনা করবে ভাবিস কী করে? তুই তোর মার মতো হয়েছিস। চিরকালের আনরোমান্টিক। অমুর মধ্যে আমি আমার ছায়া পাই।"

বাবা কথাটা এমনভাবে বলল যেভাবে ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন সচিন অনেকটা আমার মতো খেলে।

দাদা পানসে মুখে বলল, "তোমাদের কী? তোমাদের তো আর বউ সামলাতে হবে না! আমাকে সামলাতে হবে। রাতে কী কপালে নাচছে কে জানে!"

বাবা বলল, "হেসে ফেলবি না। তাহলেই হবে। হেসে ফেললেই কেলো। তোর মার সামনে একবার কী একটা সিরিয়াস কেস খেয়ে হেসে ফেলেছিলাম। বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল আমার। মনে রাখবি একটাই টিপস, চুপচাপ ঝাড় খেয়ে যাবি। হেসে ফেলবি না।"

দাদা গজগজ করে যেতে লাগল।

বউদি গম্ভীর মুখে এসে ভাত বাড়তে শুরু করল।

বাবা বলল, "বউমা তুমিও বসে যাও। আবার পরে খাবে কেন?"

বউদি বলল, "আমার খিদে নেই বাবা।"

বাবা বলল, "খিদে না থাকা মোটেও ভালো জিনিস না মা। গ্যাস হয়নি তো? কারবোভেজ খেতে পারো।"

বাবা কদিন হল কোমর বেঁধে হোমিওপ্যাথি চর্চা করছে। বই কিনে এনেছে মোটা একটা। সেটা সারাদিন মুখস্থ করে যাচ্ছে।

বউদি কিছু একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

দাদা ভালো মানুষের মতো বলল, "বাবা যখন বলছে তখন বসে গেলেই পারো।"

বউদি শব্দ করে চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, "কোথাকার না কোথাকার মেয়ে! কী করে কে জানে! ঘরে নিয়ে এসে তুলবে।"

দাদা পা দিয়ে আমার পা ঠেলে ইশারা করে বলল, "কী রে অমু, কোথাকার মেয়ে? কী করে?"

আমি বললাম, "অঙ্কের টিচার। খুব ভালো মেয়ে।"

বাবা গম্ভীর গলায় বলল, "অঙ্ক? ওরে বাবা! অমু, তোর ডিফারেন্সিয়ালটা তো এখনও কাঁচা আছে, শিখে নিস ভালো করে।"

বউদি আমার দিকে কটমট করে তাকাল। আমি ভাতে নজর দিলাম।

দাদা বলল, "অঙ্কের টিচার তো ভালো। ভালো মানে খুবই ভালো। বাড়ির হিসেব-টিসেব মেলাবে! কী বলো বাবা?"

বউদি জোরে জোরে ভাত মাখছে। কোনও কথা বলল না। দাদা অনন্যার মাংসের বাটি থেকে খানিকটা মাংস আমার পাতে আর খানিকটা নিজের পাতে নিয়ে বলল, "মাংসের কালারটা হেবি হয়েছে তো! তোমার রান্নার হাত দিন দিন স্বর্গীয় লেভেলে চলে যাচ্ছে। চিনিও দাওনি দেখছি। অনন্যা এ মাংস খেলে তো দু লিটার জল খেয়ে নিত, ওর কাছে এ তো মাংস না, লংকার দোকান!"

বউদি দাদার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "রাস্তায় রাস্তায় দেখা না করে মেয়েটার বাড়ির সঙ্গে কথা বললে ভালো হয়। মা নেই, আমাকেই তো সব করতে হবে এখন।"

দাদা বলল, "আমাদের অফিসের শম্ভুদার ভাই আইটি ইঞ্জিনিয়ার। অনন্যার জন্য দেখব নাকি?"

বাবা আর আমি একসঙ্গে বিষম খেলাম।

কী করে হল কে জানে!

১৩

জীমূতবাহন

একটা ভিডিও দেখেছিলাম কোন একটা মলের। মানুষ গিজগিজ করছে। মানুষের চাপ সহ্য করতে না পেরে লোক সুদ্ধ সে মল ভেঙে পড়েছিল।

এ শহরের সেই অবস্থা হবে নির্ঘাত যে-কোনো দিন।

মানুষের চাপ আসতে আসতে ভয়াবহ অবস্থা হয়ে গেছে।

আমার অবশ্য বউ বাপের বাড়ি চলে গেছে। এসব দার্শনিক কথা না ভাবলেও চলবে। কিন্তু ভোর সাড়ে ছটাতেই চায়ের দোকানে গিজগিজে লোক দেখে এ কথা ছাড়া আর কী মনে আসবে?

বেঞ্চিগুলোতে বয়স্ক লোকেরা বসে আছেন। মর্নিং ওয়াকে গেছিলেন, এখন ফেরার পথে চা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন। রাজনীতির কচকচিই চলছে। আমি সাইড দেখে বসতে এক কাপ দুধ চা এল। সঙ্গে একটা বিস্কুট। বিস্কুটটা নিশ্চয়ই ফ্রি না, টাকা নিয়ে ছাড়বে। তা নিক।

আমার কী? আইনি ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে আমায় এবার। কী বাঁচা বেঁচে গেছি সেটাই ভাবছি। এ মেয়ে গলায় জুড়লে অবস্থা খারাপ হয়ে যেত। এরকম পচা ঘচা বাংলা সিরিয়ালের মতো বিয়ে হবে সেটাও তো কোনও দিন ভাবিনি।

পাশের দুটো বুড়ো বিরাট আলোচনা শুরু করেছে। হনোলুলু থেকে নিউ জার্সি, ট্রাম্প থেকে তারিণী ঘোষ, কাউকে বাদ দিচ্ছে না। চায়ের মধ্যে তর্ক করার যে তীব্র জীবনীশক্তি থাকে, তা মনে হয় আর কোনও কিছুতে থাকে না। বাংলা মদেও না।

চা-টা ভালো। বিস্কুটটা চায়ে চুবিয়ে খেতে ভালো লাগছে। বিস্কুটের মধ্যে বাদাম আছে। এরকম বিস্কুট খেতে বড্ড ভালো। এগুলো লোকাল বেকারির বিস্কুট। বড়োলোকের "বিস্কিট" না।

বিস্কুটটা খেয়ে আর-একটা চাইতে হল। চাও আর-এক কাপ খেতে হবে। সকালে উঠিয়ে দিয়েছে। এখন মাথা কাজ করছে না। আমার এই এক সমস্যা। ভোরে উঠলে মাথা কাজ করে না। এই লোকগুলো ভোরে উঠে হেঁটে এসেছে।

হাঁটলে হার্ট ভালো থাকে। সুগার প্রেশারের সমস্যা কমে যায়।

এত বেঁচে থাকার চাহিদা হবে কেন মানুষের? কী হবে বেঁচে থেকে? তাও এই বুড়োদের? সারাজীবন তো কেটেছে। চাকরি করেছে, ছেলেপুলে মানুষ করেছে। এখন মরে গেলেই তো হয়। বাঁচার কী তীব্র ইচ্ছা!

আমার তো বিয়ের পর থেকেই মরে যেতে হচ্ছে করছে।

লজ্জার ব্যাপার হবে। অফিসে সবাই জেনেও গেছে। এখন আবার বলব কাকা কেঁচে গণ্ডূষ হয়েছে? থুথুক্কি, সব ভুলে যাও? কী করে বলব? বললেও তো চাপ হয়ে যাবে!

অবশ্য মা বেঁচে গেল। পছন্দের সিরিয়ালে হাত পড়লে নিরীহ মহিলারাও ঝাঁসি কি রানি হয়ে যায়, এরকম কেস আমি স্বচক্ষে দেখেছি। বাবা রিমোট হাতে বিশ্বকাপ দেখব বলে মিনমিন করায় আমার আপাত নিরীহ মা এমন দৃষ্টি দিয়েছিল একবার, যে, ত্রেতা যুগ হলে বাবার ভস্ম পেতাম খালি। বাকি শরীরটা স্রেফ হাওয়ায় ভেসে যেত।

কিছু বললে মা একটাই কথা বলে, "সারাদিন এত কাজ করি, সন্ধেটা টিভি দেখব তাতেও তোদের আপত্তি? কদিন আর বাঁচব?"

এই কদিন আর বাঁচবর মতো সেন্টুপূর্ণ কথা পৃথিবীতে আর আছে? তাও যদি নিজের মা বলে। এই কথা শুনলে চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ে। নিজের বেঁচে থাকার প্রতি অনীহা জন্মায়। নিজের প্রতি তীব্র ঘেন্না জন্মায়। ছিহ, মাকে এত কষ্ট দিতে পারলাম আমি?

দুটো বিস্কুট, দুটো চা শেষ করে বাইকে চড়লাম। অফিস যেতে হবে। পেটের ভাত জোটাতে হবে। বসে থেকে রাজনীতির প্যাঁচাল শোনার বিলাসিতা আমাকে দেখালে চলবে না।

খানিকটা যেতেই ফোনটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শুরু করল। ভাইব্রেশনে থাকলে আমার ফোন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। আপনাদের ফোন কী করে তা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন।

ফোন বের করে দেখলাম বউ ফোন করছে।

ধরা কি ঠিক হবে?

একটু ভেবে দেখলাম না ধরলে আবার প্রচুর টেনশন কাজ করবে। কী বলতে চেয়েছিল, কেন বলতে চেয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। তার থেকে ধরে নেওয়াই ভালো।

ধরলাম। বললাম, "হ্যালো।"

''নেট ব্যাংকিং আইডি পাসওয়ার্ডটা পাঠান তো। আমার অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা লাগবে। ওটিপি গেলে সেটাও দেবেন।"

আমি হাঁ করে খাবি খেয়ে বললাম, "এটা তো কাউকে দেওয়া যায় না।"

"আমি বউ তো! আমাকে দেওয়া যাবে।"

"আপনাকে বাড়ি দিয়ে এসেছি। এখন কী করে বউ হবেন?"

"আপনি দেবেন, না ফোর নাইন্টি এইট ঠুকব?"

আমার হাত থেকে ফোন পড়ে গেল।

খেয়েছে! এ কার পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!

১৪
আত্রেয়ী

"তুই যে লোককে সবথেকে বেশি অপছন্দ করিস, তোর ছেলে যদি তার মতো স্বভাব চরিত্র পায়, তখন কেমন লাগে বল তো?"

রুটি তরকারি খেতে খেতে কথাগুলো বলল আদৃতা। আমি হাঁ করে আদৃতার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার ছেলে কোত্থেকে পেলি?"

আদৃতা রুটি চিবোতে চিবোতে বলল, "আরে তোর ছেলে মানে তো কথার কথা বলেছি। আমার ছেলের কথা বলছি। সবটা আমার শাশুড়ির মতো পেয়েছে জানিস! এমনকি, উনি যেরকম থমকে থমকে হাঁটেন, আমার ছেলেও সেরকম একেবারে! জিন পেলি পেলি, আমার মার মতো পেতে পারতি না! ওর মার মতোই পেতে হল? শাশুড়ি না থাকলেও আমার ছেলেকে দেখলে মনে হবে যেন উনিই সামনে দিয়ে ঘুরঘুর করছেন! মরণ আর কাকে বলে!"

আমি চাউ খাচ্ছিলাম। হাসির চোটে সব বেরিয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে জিভ-টিভ কামড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "এইটুকু ছেলে, এখনই এত সব কিছু কল্পনা করে নিচ্ছিস কেন? তুই পারিসও বটে। পাগল কোথাকার একটা!"

আদৃতা হাত-টাত নেড়ে বলল, "তুই জানিস না বলে বলছিস। সংসার তো করতে হয় না। দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিস। দুদিন পর যখন বিয়ে হবে তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল!"

আমি ঠোঁট কামড়ালাম। আগে এসব লজ্জা-টজ্জা পেতাম না। আজকাল পাচ্ছি। সে আসার পর থেকে পাচ্ছি। কোত্থেকে যে কী হয়ে গেল বুঝতে পারি না। কটা দিন যেন স্বপ্নের মতো কেটে যাচ্ছে। জীবনটা এত ভালো হবে? সত্যি? ভাবতেই কেমন যেন লাগে।

আদৃতা বলল, "পেরেন্টস টিচার মিটিং আছে এই শনিবার, জানিস তো? হেডু আজ স্কুলে আসতেই বলে দিয়েছে।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। আমাকেও বলেছেন। হোক না, অসুবিধা কী?"

আদৃতা বলল, "অসুবিধার কিছু নেই। তবে আমাদের সময় তো এসব ছিল না রে। স্কুলে দিদিরা কী পেটান পেটাত। আমরা কি মানুষ হইনি? আজকাল কারও কান ধরলেও শহরসুদ্ধ লোক চলে আসে। টিভিতে ব্রেকিং নিউজ হয়ে যায়। ভয় লাগে। ক্লাস করাই, না বর্ডারে পাহারা দি বুঝতে পারি না। ক্লাস এইটের সঞ্চিতার কথা শুনেছিস তো?"

আমি বললাম, "না, আমি দুদিন আসিনি তো। কী হয়েছে?"

আদৃতা চারদিকে তাকিয়ে বলল, "একটা ছেলের সঙ্গে সিনেমা গেছিল স্কুল পালিয়ে। পড়বি তো পড় বাবার সামনে। মেয়েকে নিয়ে স্কুলে চলে এসেছিল। কী হম্বিতম্বি! তারপর হেডু বোঝাল, দেড় হাজার মেয়ের মধ্যে কোন মেয়ে স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেছে সেটা দেখা আমাদের কাজ না। তাতেও মানে না।"

আমার চোখ মোবাইলের দিকে চলে যাচ্ছিল। মেসেজ করছে না সে অনেকক্ষণ। মিটিংয়ে ঢুকেছে। নতুন চাকরি বলে কথা। বেশি বিরক্ত করাও ঠিক না। কিন্তু আমার এরকম হয় কেন? সারাক্ষণ মোবাইল দেখে চলেছি! চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে আমার একদিন। আমি জানি। আমার দ্বারা সব একসঙ্গে হবে না।

বীণাদি এই গরমেও উল বুনছেন। দূরে বসেছেন। বীণাদিকে সবাই সমীহ করে চলে। বাড়তি কথা বলেন না। তবে মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে বসেন যে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যায়। ভদ্রমহিলার রসবোধ প্রচুর। তবে ভীষণ উইটি। মোটা দাগের কোনও রসিকতা করেন না।

আমার অবশ্য ভালো লাগে বীণাদির শাড়ির কালেকশন। এত ভালো ভালো শাড়ি পরেন যে দু চোখ ভরে দেখতে হয়। সামনের অক্টোবরে রিটায়ার করবেন। তবু কোনও কামাই নেই। ছাত্রীদের প্রাণভরে ভালোবাসেন। এরকম একজন শিক্ষিকা অনেক তপস্যা করলে পাওয়া যায়।

আদৃতার খাওয়া হয়ে গেছিল। বেসিনে গেল। টিচারস রুম ফাঁকা। বাকিরা ক্লাসে চলে গেছেন।

বীণাদি হঠাৎ উল বোনা থামিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই মেয়ে, প্রেম করছিস?"

আমার কান মাথা লাল হয়ে গেল।

কী ভীষণ লজ্জা পেলাম!

১৫
আত্রেয়ী

শহরে অফিস টাইমে চারদিকে এত হাত সব সময় উদ্যত হয়ে থাকে যে ভয় লাগে। মানুষ এরকম কেন হবে? বাবার বয়সি, কাকুর বয়সি, জেঠুর বয়সি, দাদুর বয়সি লোকেরা পিষে দিচ্ছে বাসে, মেট্রোতে সর্বত্র। স্কুল থেকে বেরিয়ে আমি বেশ কিছুক্ষণ দম আটকে দাঁড়িয়ে থাকি।

ট্যাক্সি নিই কোনও কোনও দিন। তাতে অনেক টাকা চলে যায়। ওভাবে হবে না বুঝে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেই উঠব ঠিক করেছি শেষমেশ। বাসে উঠেই লেডিস সিটের দিকে চলে যাই। খানিকটা আক্রমণাত্মকও হয়েছি।

আগে কেউ গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চাইলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। আজকাল চেঁচিয়ে উঠি। কোনও কোনও সময় বিপরীত দিক থেকেও তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে, "অফিস টাইমে অত ভদ্রতা রাখলে ট্যাক্সিতে যেয়ো মামণি" টাইপ কমেন্ট আসে। এই প্রতিক্রিয়াগুলো একা কেউ করে না। অনেকে মিলেই করে। যেন এর অন্যথা হতেই পারে না। লোকটার কোনও খারাপ অভিপ্রায় থাকতেই পারে না।

অবশ্য অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের সমর্থনও পেয়ে যাই। সব পুরুষ খারাপ নয়। বুঝতে পারি সময় এগোলে। এও বুঝি খুব সুন্দর মুখের পুরুষের ভেতরটা কুৎসিত হতে পারে, উলটোটাও হতে পারে। পুরুষের চোখের থেকে বড়ো সত্যি আর কিছু হয় না। ক্রমাগত বুকের দিকে তাকিয়ে কথা বলা একজন অতীব ভদ্রলোক যেমন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি। মাঝে মাঝে মনে হয় চড় মারি। অথচ তাঁর কথা শুনলে কে বলবে তিনি এরকম। চোখটাই আসল।

সাত পাঁচ ভেবে স্কুল থেকে বেরিয়ে চোখ বন্ধ করেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দেব মনস্থির করে চোখ খুলে দেখি সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বাইক নিয়ে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "অফিস?"

অমৃত বলল, "তোমার কথা খুব মনে পড়ছিল। পেট খারাপ বলে পালিয়ে এলাম।"

আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, "ধরা পড়ে যাও যদি?"

অমৃত হাসল, "ধরা পড়ব কেন? সবাই কেজো লোক। কাজ করুক। আমি বরং একটু প্রেম করি। প্রেমের দ্বিতীয় দিন অত হিসেবি হলে হয়?"

আমার কেমন লজ্জা লাগছিল। স্কুলের সব ম্যাডামরা বেরিয়ে যাননি এখনও। দেখলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। ওকে বললাম, "তুমি রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে দাঁড়াও। আমি আসছি।"

অমৃত বলল, "ধুস। পিছনে বসো। এখনই হুশ করে বেরিয়ে যাই।"

খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ওর বাইকের পিছনে উঠলাম। শুরুতেই এত স্পিড দিল যে জাপটে ধরতে হল।

বললাম, "কী করছ? আস্তে চালাও।"

অমৃত বলল, “তোমার স্কুলের সবাই দেখবে, না? দাঁড়াও, এলাকাটা পেরোই।”

বেশ জোরে চালিয়ে অনেকটা রাস্তা পেরোল। বড়ো রাস্তায় গাড়ির গতি কমল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আছি। প্রথমে ভয় লাগছিল। এখন অনেকখানি ভালোলাগা সেটাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। খানিকটা গিয়ে বাইক দাঁড় করিয়ে অমৃত বলল, “আমার এখন ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ গাইতে ইচ্ছা করছে।”

আমি বললাম, “গাও না। কে বারণ করেছে?”

অমৃত বলল, “আমার না খুব আনন্দ হচ্ছে। খুব। তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।”

আমার হাসি পেল। ছেলেটা কেমন বাচ্চাদের মতো করে! অথচ প্রথম প্রথম কী ডাঁটই না দেখাত, বাবাহ! আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, “হয়েছে হয়েছে। আমি বাড়ি যাই।”

অমৃত অপ্রস্তুত মুখ করে বলল, “চলে যাবে? এখনই? ধুস। তাহলে কী করে হবে?”

আমি বললাম, “তাহলে কী করবে? তুমিই বলো।”

অমৃত বলল, “ঘুরি। উদ্দেশ্যহীনভাবেই ঘুরি। জড়িয়ে ধরে বসে থাকো না। আর শোনো, মেট্রোদাদু দেখলে বাইকের স্পিড বাড়িয়ে দেব।”

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, “এ কথাগুলো ভেবে বলো, না বানিয়ে নাও?”

অমৃত বলল, “বানিয়ে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে। আমি খুব ট্যালেন্টেড তো।” বলেই হেসে ফেলল। তারপর বলল, “তোমায় বাড়িতে নিয়ে যেতে বলছে সবাই। যাবে আমাদের বাড়ি?”

আমি ওর দিকে তাকালাম।

খুশিতে চোখ দুটো চিকচিক করছে।

আমার হঠাৎ খুব কষ্ট হল।

ভালো লাগছে না কেন কিছু?

১৬
জীমূতবাহন

ঈশান আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন অ্যালিয়েন দেখছে। আমি বললাম, “কী হল?”

ঈশান বলল, “ভাই মুত, তোর বউ চলে গেল? বিয়ের পরের দিন?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ। চলে গেল। কী করব? আমার কী করার আছে?”

ঈশান মুখের হাঁ বন্ধ না করেই বলল, “এবার কী হবে?”

আমার ইচ্ছে করছিল মল্লিকের লেডিকেনিটা ঈশানের মুখে ঢুকিয়ে দি। প্রবল ইচ্ছা দমন করে বললাম, “তোর এত চাপ হচ্ছে কেন? আমার বিয়ে আমি বুঝব।”

ঈশান গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, “তুই বুঝছিস না। এরকম কোথাও হয় না। লোকে কী বলবে?”

আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে মনোযোগ দিয়ে বললাম, “লোকে যা ইচ্ছা বলুক। আমার তাতে কিছু করার নেই।”

ঈশান বলল, “এইজন্য বিয়ে করতে নেই। বিয়ে জিনিসটাই গোলমেলে হয়ে গেছে।”

আমি বললাম, “আমি তো শখ করে বিয়ে করিনি। সবাই বলল মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হতে চলেছে। আমিও ব্রাইডাল মেকআপ দেখে বার খেয়ে বিয়ে করে ফেললাম। দেখতে তো ভালোই লাগছিল। ভেতরে যে বিছুটিপাতা আছে আমি কী করে বুঝব? আমি অপরাজিত দেখা পাবলিক। কিন্তু যুগটা যে বিভূতিভূষণের নেই, কিউর যুগ হয়ে গেছে, সেটা তো বুঝিনি।”

ঈশান ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বলল, “কিউ?”

আমি বললাম, “গান্ডু।”

ঈশান বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাচাল, “ওহ। বুঝেছি। কী আর করা। স্যাড লাইফ। আচ্ছা তুই আবার বিয়ে করতে পারবি তো?”

আমি দু হাত জোড় করে প্রণাম করার ভঙ্গি করে বললাম, “আর বিয়ে? নমস্কার। আর দরকার নেই। এখনই আমার নেট ব্যাংকিং পাসওয়ার্ড চেয়ে নিয়েছে।”

ঈশান বলল, “সে কী! কেন?”

আমি বললাম, “টাকা চাই।”

ঈশান বলল, “যাহ শালা। এ কেমন মেয়ে?”

আমি বললাম, “বললাম তো! পুরো বিছুটিপাতা।”

কথা শেষ হল না, আমার ফোন বাজতে শুরু করল। দেখলাম বউ। ঈশানকে বললাম, “এই দেখ, শয়তানের নাম নিলাম না, শয়তান হাজির।”

ঈশান বলল, “ধর ধর, কী বলে দেখ।”

আমি ফোন তুললাম, “হ্যালো।”

ওপাশ থেকে বউয়ের রাগি গলা ভেসে এল, “এই, তুমি ডরম্যান্ট অ্যাকাউন্টের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়েছ কেন?”

আমি বললাম, “মানে?”

বউ বলল, “তোমার অ্যাকাউন্টে পঁচাশি টাকা পড়ে আছে। ক্যা করেঙ্গে হাম ইতনে ধনরাশি সে? যে অ্যাকাউন্টে টাকা আছে, সে অ্যাকাউন্টের ইউজার নেম, পাসওয়ার্ড দাও।”

আমি বললাম, “আমার এই একটাই অ্যাকাউন্ট। আমার টাকা নেই তো! এরকমই টাকা থাকে। নেহাতই গরিব আদমি আমি।”

বউ বলল, “তোমার সাহস তো কম না! পঁচাশি টাকা অ্যাকাউন্টে নিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে?”

আমি বললাম, “আমি কোথায় তোমাকে বিয়ে করতে গেছিলাম! আমি তো খাসি খেতে গেছিলাম। অমলকান্তি রোদ্দুর না হয়ে রোদ্দুর রায় হয়ে গেল বলেই তো আমাকে বিয়ে করতে হল।”

বউ বলল, “তোমার সঙ্গে বিয়ে করা আমার ভুল হয়ে গেছে।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ, আর আমি তো ঐতিহাসিক ঠিক করেছি তোমাকে বিয়ে করে। এত ভালো সিদ্ধান্ত আর কিছু হতেই পারে না।”

বউ বলল, “শাট আপ। তুমি জানো আমার জন্য কত ছেলে পাগল?”

আমি বললাম, “স্বাভাবিক। তোমার এক কিলোমিটার রেডিয়াসে কোনও সুস্থ মানুষ থাকাই সম্ভব না।”

বউ রেগে গেল, “এই তুমি এরকম টিজ করে করে কথা বলছ কেন? খুব সাহস দেখছি তোমার!”

আমি বললাম, “আমার সাহসের কিছু নেই। বিয়ে করেছ, বাড়ি চলে গেছ। আমার কী? আমার তো কিছু করার নেই।”

বউ বলল, “আমি সিদ্ধান্ত চেঞ্জ করেছি। বিয়ে করেছি যখন সংসার করব। হানিমুনে যাব। আজ রাতেই নিয়ে যাবে আমাকে।”

আমি খাবি খেলাম, “মানে? হানিমুনে যাবে আবার কী? তুমি তো বাড়ি চলে গেছ!”

বউ বলল, “বললাম তো ডিসিশন চেঞ্জ করেছি। দার্জিলিং যাব। টিকিট কাটো। রাতে যাব।”

আমি বললাম, “ওভাবে হয় নাকি? ছুটি নেই, টাকা নেই। কোত্থেকে পাব সব?”

বউ বলল, “আমি কী জানি? জোগাড় করো। আমি হানিমুনে যাব আজ। আমার বাড়িতে ভাল্লাগছে না। মা সারাক্ষণ ইনিয়েবিনিয়ে কেঁদে কানের মা-মাটি-মানুষ করে দিচ্ছে। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। দার্জিলিং নিয়ে চলো। রেডি হয়ে থাকব। নিয়ে যাবে। রাখলাম।”

বউ ফোনটা কেটে দিল।

ঈশান পাশে আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। ফোন রাখতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল, "কী রে, কী হল?"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বললাম, "পাগল করে দে মা, লুটেপুটে খাই। হাজার তিরিশেক টাকা ধার দে ভাই। আমি শ্যাষ!"

১৭

অমৃত

আমাকে যদি প্রেম নিয়ে এসে লিখতে দেওয়া হয়, আমি এখন চৌরাস্তায় একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে প্রেম নিয়ে এসে লিখতে পারব।

প্রেম নিয়ে একটা টলিউডি গান আছে "প্রেম কী বুঝিনি আগে তো খুঁজিনি, আজ কী হল রে আমার।"

বিষয়টা টালিগঞ্জের গান বলেই একবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। সিরিয়াসলিই প্রেম যে কী আগেভাগে বোঝা সম্ভব নয়। যখন আসে, তখন এক্কেবারে মাইক টাইসনের মতো বুকে মুখে পিঠে ঘুসি মেরে নিজের অস্তিত্ব বোঝাতে শুরু করে দেয়।

আত্রেয়ীর কথাই ধরি। যখন আসেনি, আসেনি। কিন্তু যখন এল, তখন সারাক্ষণ মনে হতে শুরু করল কেন ও আমার সামনে বসে নেই? কেন আমাকে সারাক্ষণ রিপ্লাই করবে না? কেনই বা অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলবে?

প্রেম নিয়ে একটা পাই চার্ট বানাতে গেলে দেখা যাবে প্রেমের তিনভাগ ভালোবাসা, একভাগ অধিকারবোধ। টিনএজ প্রেমে অধিকারবোধ বেশি থাকে। আমি টিনএজ নই। চাকরি পেয়েছি, বাড়ি থেকে বিয়ের কথা হচ্ছে আর এই সময় আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তবু আমার টিনএজ পাবলিকের মতো ভীষণ প্রেম পায়। প্রেম পেলে কথা ছিল, আমার চুমুও পায়।

একটা কথা আছে, এ শহরে রাস্তাঘাটে হিসিতে কেস নেই, কিসিতে কেস আছে। তবু আমরা চুমু খেয়েছি। বৃষ্টি পড়ছিল, চুমু খাওয়ার পর লক্ষ করেছি ট্রাফিক পুলিশ আমাদের দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে আছে। আত্রেয়ী ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "দেখেছ, এবার যদি জেলে নিয়ে যায়?"

আমি ওর হাত শক্ত করে ধরে বলেছি, "কেউ কোথাও যাবে না।"

পুলিশ আমাদের দিকে তাকিয়েছে। তারপর রাস্তা পরিচালনার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে। সম্ভবত নিজেও প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। প্রেম করে বিয়ে করা লোকজন কি বাকিদের প্রতি খানিকটা সফট হয়? কে জানে! হলে তো ভালোই। তাহলে একটা লিস্ট করা যেতে পারে শহরের কোন কোন ট্রাফিক পুলিশ প্রেম করে বিয়ে করেছিল। সেক্ষেত্রে তাদের সামনে চুমু খাওয়া যেতে পারে। অবশ্য শহরে তো শুধু পুলিশ থাকে না, মরাল পুলিশও থাকে। পৃথিবীর সব ফ্রাস্ট্রেশন বুকে নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে। কেন চুমু খেলে, কী কারণে চুমু খেলে, এদের এত প্রশ্ন জীবনে!

অবশ্য আত্রেয়ী আমাকে অনুযোগের সুরে বলেছে, "তুমি ভারী ইয়ে। যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চুমু খাও কেন?"

আমি মাথা চুলকে বলেছি, "আচ্ছা, তাহলে কয়েকটা পয়েন্ট ঠিক করো। সেখানে সেখানেই খাব। ব্যাপারটা তাহলে আর যেখানে সেখানে হবে না।"

আত্রেয়ী হেসে ফেলেছে। আমার পিঠে ঘুসি মেরে বলেছে, "বদমাইশ।"

আত্রেয়ী যখন এই শব্দটা বলে, মনে হয় গোটা পৃথিবীটা ওর সামনে নামিয়ে রাখি। একটা শব্দ একজনের মুখে শুনতে এত ভালো লাগে?

মাথায় সারাক্ষণ একটা কথাই পাক খায় আজকাল। বিয়েটা কবে হবে?

আত্রেয়ী বলল অবশ্য বাড়িতে বলবে। সমস্যা তো এটাই। দুজন মানুষ ভালোবাসবে, তারপর পরিবার চলে এসে সব কিছু জটিল করে দেবে। অবশ্য আমার মনে হয় না আমাদের দুই পরিবার থেকেই

কোনওরকম সমস্যা হতে পারে। দু পক্ষই যথেষ্ট লিবারাল। তবু ভয় লাগে।

ভালোবাসার মানুষকে হারানোর ভয়ের থেকে বড়ো ভয় বোধহয় আর কিছু হয় না। আত্রেয়ী আমার ঘাড়ে আলতো করে আদর করে, আমি চুপ করে বসে থাকি। আদর করার পরে আত্রেয়ী বলে ঠিক এমন করে ও ওর কুকুরকেও আদর করে। বলেই ফিক ফিক করে হেসে ফেলে।

শুনে আমি বুঝতে পারি আমার হেবি রেগে যাওয়া দরকার, কিন্তু আমি রাগতে পারি না। আত্রেয়ীর কানে কামড়ে দিয়ে বলি, দ্যাখো তো, এভাবেই তোমার কুকুরও কামড়ায় নাকি? দুজনে মিলে খুনসুটি শুরু হয়।

আত্রেয়ীর বাড়ির সামনে যখন ওকে নিয়ে নামালাম, দেখলাম একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আত্রেয়ী আগে দেখেনি। যখন দেখল তখন দেরি হয়ে গেছে। আমার কোমর খামচে ধরে বলল, "জেঠুমণি। তুমি বাইকটা দাঁড় না করিয়ে সোজা বেরিয়ে যাও।"

আমার মাথা কাজ করছিল না। আমি উলটোটা করলাম। সোজা আত্রেয়ীর জেঠুমণির সামনে বাইকটা দাঁড় করিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক একবার আমার দিকে, আর-একবার আত্রেয়ীর দিকে বিস্মিত চোখে তাকালেন।

আমি আর-একটু ছড়ালাম, ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বত্রিশ পাটি বের করে বললাম, "জেঠুমণি ভালো আছ?"

আপনি-টাপনি না, সরাসরি তুমি।

আমি কেস খাব না তো কে খাবে?

১৮

জীমূতবাহন

কথায় আছে কপালে থাকলে কী যে হতে পারে ভগাদাও জানেন না।

আমার হয়েছে সেই অবস্থা। দার্জিলিং মেইলে বউসুদ্ধ এসি টু টিয়ারের টিকিট ম্যানেজ হয়ে গেল। আমাকে অবশ্য কিছুই করতে হয়নি। সবই তিনি করেছেন।

আমাকে অফিস থেকে স্টেশনে যেতে বলেছিল। গিয়ে দেখি পায়চারি করছে। আমাকে দেখে কড়া গলায় বলল, "টাকা জোগাড় হয়েছে?"

আমি ব্যাজার গলায় বললাম, "ধার করেছি।"

বউ খুশি খুশি গলায় বলল, "বেশ তো। ধারে ঘোরার মজাই আলাদা।"

আমি বললাম, "ট্রেনের টিকিট কী হবে? মেঝেতে বসে যাবে?"

বউ বলল, "আমার টিটি মামা আছে কি মুখ দেখতে? চলো দেখি।"

তারপর আমার হাত ধরে টেনে টেনে নিয়ে গেল এক কালো কোটওয়ালা ভদ্রলোকের কাছে। দেখেই চিনেছি, এ চিজ ছিল বিয়েতে। আমাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে এর অবদানও কম না।

এরপর পুরোটাই মোহন সিরিজের গল্প, "কী হইতে কী হইয়া গেল কেহ বলিতে পারে না।"

প্রথমেই এসিতে তুলে দিল আমাদের। তারপর ঠিক দেখা গেল সাইড আপার লোয়ারে দুজন অ্যাবসেন্ট। বোলপুর স্টেশনে পেরোনোর পর অবাক চোখে দেখলাম ম্যানেজ হয়ে গেল।

আমার সালোয়ারধারী বউ চোখ নাচাতে নাচাতে বলল, "দেখলে তোমার বউয়ের ক্ষমতা?"

আমি খাবি খেয়ে বললাম, "সে তো বিয়ের দিন থেকেই দেখছি, এ আর নতুন কী?"

বউ বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা ঠিক। বাড়িতে বলেছ তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। বলেছি।"

বউ বলল, "আমিও বলেছি।"

আমি বললাম, "অমলকান্তি যাবে নাকি দার্জিলিং?"

বউ আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, "ওই শুয়োরটা কেন যাবে? মানে কেন? কী কারণে?"

আমি বললাম, "না মানে ওর সঙ্গে তো তোমার বিয়ে হবার কথা ছিল। তাই ভাবলাম।"

বউ বলল, "বিয়ে হয়েছে?"

আমি বললাম, "না তা হয়নি।"

বউ কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে দেয় কে? সিরিয়াসলি, কে দেয় তোমায়?"

আমি বললাম, "ইয়ে মানে কেউ দেয় না বলেই তো তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।"

বউ বলল, "তাও ঠিক। যাক গে, এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। ডিভোর্স করার ইচ্ছে নেই আমার। ইচ্ছে করছেও না।"

আমি দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম, "কেন? মানে আমি কি খুব ইম্প্রেসিভ কিছু কাজ করেছি?"

বউ মাথা দুদিকে নাড়িয়ে বলল, "না। আমার মুড নেই। দাঁড়াও, একটু ফুঁকে আসি বাইরে থেকে।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "ফুঁকবে মানে? ট্রেনে স্মোকিং ব্যান না?"

বউ বলল, "না না, মাঝের প্যাসেজটায় ফুঁকব। কেন, তোমার একা থাকতে ভয় লাগবে?"

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে না পেরে বললাম, "না ঠিক আছে, যাও।"

বউ ফুঁকতে গেল।

আমি কয়েক মিনিট আলুসেদ্ধর মতো বসে থেকে দরজা ঠেলে মাঝের প্যাসেজে গিয়ে দেখলাম বউ মন দিয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আমাকে দেখে বলল, "কী ব্যাপার? কাউন্টার নেবে?"

আমি ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ালাম, "না লাগবে না।"

বউ বলল, "মদ খেতে ইচ্ছা করছে।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "থাক। দার্জিলিং গিয়ে খেয়ো নাহয়।"

বউ বলল, "হ্যাঁ, তাই করতে হবে। তুমি স্মোক করো তো, নাও না কাউন্টার।"

আমি বললাম, "আচ্ছা দাও।"

বউ সিগারেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "বহুদিন পাহাড় দেখি না। ঝাঁটের লাইফ হয়ে গেছে। বালছাল কবিদের সাথে এইজন্য প্রেম করতে নেই। শুধু বাতেলা। এইসব অমলকান্তি-ফান্তি কোত্থেকে যে জোটালাম কে জানে! তুমি কোনও দিন কবিতা লিখেছ?"

আমি বললাম, "আমার মেলে না। মানে ছন্দ। আর বুঝিও না ঠিক ওসব।"

বউ আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে মন দিয়ে টান দিতে দিতে বলল, "মেয়েরা কবিতা হেবি খায়। জনি সিন্সের ইয়ের থেকেও বেশি খায় দুই লাইনের কবিতা। আমিও খেয়েছিলাম। মাল যে ডরপোক বেরোবে বুঝিনি।"

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ট্রেন ছুটে চলেছে দ্রুত গতিতে।

আমি আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "তুমি কি আমার সঙ্গে সংসার করতে চাও? না মজা করে ঘুরতে এলে এই অবধিই?"

বউ আমার দিকে চোখ ছোটো ছোটো করে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি চাও? তোমার আমাকে পছন্দ?"

আমি বললাম, "আমি অত ভেবে দেখিনি। সব কিছু এত ঝড়ের গতিতে হয়ে গেল, তুমি বাড়িও চলে গেলে, আবার এখানেও নিয়ে চলে এলে, আমি ঠিক করে কিছু বুঝতেই পারছি না, আমার সঙ্গে কী হচ্ছে বা হতে চলেছে।"

বউ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "ষোলো বছর বয়স ছিল। এক মেধাবী দাদা প্রেগন্যান্ট করে দিয়েছিল। অনেক কষ্টে সে যাত্রা বেঁচেছিলাম। এই ফ্যাক্টটা জানলে তুমি আমাকে বিয়ে করতে?"

আমি ওর দিকে তাকালাম। হাসি হাসি মুখটা কখন যেন সিরিয়াস হয়ে গেছে।

ট্রেনের স্পিড বাড়ছে।
আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

১৯
আত্রেয়ী

মানে এ ছেলেটা এরকম কেন? কেন? আর আমার কপালেই এরকম জুটবে কেন?

বাইকটা দাঁড় করালি করালি, তাও জেঠুমণির সামনেই? আর আমার জেঠুকেই জিজ্ঞেস করে বসলি, "জেঠুমণি ভালো আছ?"

আমার মনে হচ্ছিল হৃৎপিণ্ড বেরিয়ে যাবে এত জোরে হার্টবিটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

জেঠুমণিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। একবার ওর দিকে, আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ ভালো আছি, কিন্তু তুমি কে বাবা?"

অমৃত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "নামো তো।"

আমি খানিকটা ঘোরের মাথাতেই বাইক থেকে নামলাম।

অমৃত নিজে নামল, হেলমেট খুলল, তারপর বাইক স্ট্যান্ড করে জেঠুমণিকে ঢিপ করে প্রণাম করে বলল, "আমার নাম অমৃত। আমি আত্রেয়ীকে বিয়ে করব।"

জেঠুমণি কাশতে শুরু করল।

আমি রেগেমেগে ওর হাত ধরে বললাম, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?"

অমৃত এবার বুঝল কেস করেছে। একবার আমার দিকে আর একবার জেঠুর দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব ভুল করে ফেললাম মনে হচ্ছে?"

জেঠুমণি কাশতে কাশতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে জল-টল দে। মনে হয় বেশি উত্তেজনায় কী বলতে হবে বুঝতে পারেনি।"

অমৃত মাথা চুলকে বলল, "তাই হবে। আমি ঠিক নরমাল নই, বুঝলেন?"

আমি দাঁতে দাঁত চিপে রাগি গলায় বললাম, "বাইকটা বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে এসো। অনেক করেছ।"

অমৃত বাইক স্ট্যান্ড থেকে নামাতে গিয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল। আমিই ধরলাম। তারপর দুজনে মিলে বাইকটা বাড়ির ভেতর নিয়ে এলাম।

বাবা বাইরে শব্দ শুনে বাইরে এসেছিল। জেঠুমণি বাবাকে দেখে বলল, "বাপ্পা দেখ রে তোর জামাই এসেছে।"

বাবা হতভম্ব গলায় বলল, "মানে?"

আমার মনে হচ্ছিল শাবল দিয়ে গর্ত করে মাটির ভিতর ঢুকে যাই। অমৃতকে দেখিয়ে বাবাকে বললাম, "ওর নাম অমৃত।"

বাবা কয়েক সেকেন্ড অমৃতর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওহ। আচ্ছা। বেশ তো।"

বাবাও বাক্যহারা হয়ে গেছে। আমি অমৃতর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললাম, "আমার বাবা! প্রণাম করো।"

অমৃত বাবার পায়ে ডাইভ দিল। বাবা চমকে উঠে "থাক বাবা, থাক থাক", বলে সরে গেল।

অমৃতকে বললাম, "ঘরের ভিতর চলো।"

অমৃত ঘোরের মধ্যেই কোনও দিকে না তাকিয়ে বসার ঘরে গিয়ে সোফায় বসে পড়ল।

জেঠুমণি জোরে হেসে উঠল। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রে? কী ব্যাপার?"

জেঠুমণি বলল, "বুঝলি না? আমাদের মেয়ে তার মতো একটা পাগল জোগাড় করেছে। ভারী মজার ছেলে। চ আলাপ করি।"

আমি কী করব বুঝতে না পেরে রান্নাঘরে দৌড়োলাম। সেখান থেকেই দেখলাম অমৃতর সামনে বাবা আর জেঠুমণি বসেছে।

আমি জিভ কাটলাম। এ কী সমস্যায় পড়লাম রে বাবা! এরকম করে কিছু হয় নাকি? এ কেমন পাগল ছেলে!

ডিম দেখতে পাচ্ছিলাম। কড়াইতে তেল গরম করে ডিম ছাড়লাম। অমলেটটা হতেই প্লেটে নিয়ে শিগগিরি বসার ঘরে দৌড়লাম। ওকে একা ছাড়া যাবে না। আবার ছড়িয়ে লাট করে যদি!

অমৃত অবশ্য ডিমের প্লেট দেখেই আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, "বাহ, তুমি তো আমার পালস পড়তে পারো দেখছি। তুমি কী করে বুঝলে আমার এখন অমলেট খেতে ইচ্ছা করছিল?"

বাবা মুগ্ধ গলায় অমৃতর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার অমলেট ভালো লাগে বুঝি?"

অমৃত চামচ দিয়ে অমলেট কাটতে কাটতে বলল, "আমার বেসিকালি সব কিছু ভালো লাগে। কিন্তু সন্ধে হলে অমলেটের যে মারকাটারি একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই।"

জেঠুমণি হাসতে হাসতে বলল, "কীরকম?"

অমৃত বলল, "দেখুন পৃথিবীতে মাছ, মাংস অনেক কিছুই আছে খাবার মতো। কিন্তু ওই যে তাওয়ায় ডিমটা দেওয়া হয়, তারপর যে জিনিসটা প্লেটে আসে, আর তার সঙ্গে চারদিক জুড়ানো যে গন্ধ, এর তুল্য বোধহয় আর কিছু হতে পারে না। অ্যাটলিস্ট আমার কাছে। হ্যাঁ, এক-একজন মানুষ এক-এক রকম। আপনার হয়তো ফিশফ্রাই ভালো লাগে। লাগতেই পারে। গণতান্ত্রিক দেশ, সবার পছন্দ সমান হবে, এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে?"

বাবা বলল, "তোমাদের আলাপ কোথায়?"

অমৃত মন দিয়ে ডিম খাচ্ছিল। এতক্ষণ পরে বোধহয় বুঝতে পারল ও আমার বাবার সামনে বসে আছে। অমলেট সহ প্লেটটা সামনের টেবিলে রেখে আমার দিকে অসহায় চোখে তাকাল।

আমার কেন জানি না, ঠিক এই সময়টাই ছেলেটাকে ভীষণ জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছিল।

একজন মানুষ এতটা পাগল, এত ভালো হয় কী করে?

২০

কপালকুণ্ডলা

মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই আমার মা বাবার দ্বিতীয় পক্ষের বউ। সদুদা মনে করিয়ে দেয়।

সদুদা বাবার থেকেও বড়ো। আমাদের দোকানের কর্মচারী থেকে এখন প্রায় সবটাই সামলায়।

আমাদের দোকানের ডিডি গেঞ্জি বলা যেতে পারে। চোখ বন্ধ করে ভরসা করা যায়।

আমার যখন ছেলেপক্ষ তাড়িয়ে বাড়িতে মার ঝাঁটাপেটা খাবার উপক্রম হয়, তখন আমি সদুদার ঘরে গিয়ে লুকাই। আমাদের দোকানের পিছনেই সদুদার ছোট্ট একখানা ঘর। একখানা ছোটো টেবিলফ্যান চালিয়ে গেঞ্জিটা মিশমিশে কালো ভুঁড়ির উপর তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। এরকম গায়ের রংওয়ালা লোকেদেরই আবলুশ কাঠ গায়ের রং বলে বোধ হয়।

সদুজেঠু বলা উচিত, কিন্তু কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, ছোটোবেলা থেকে দাদা চলতে চলতে এখনও সেটাই বলি। আবার সদুজ্যাঠাও বলি কখনও কখনও। পাগল তো আমি। ডাকের ঠিক ঠিকানা নেই কোনও।

সাঁপুইদের তাড়িয়ে যথারীতি আমি সদুদার ঘরে সেঁধিয়েছি।

সদুদা এক ধামা মুড়ি নিয়ে বসেছিল। মাখা সন্দেশ দিয়ে মুড়ি মেখে খায়। হেবি লাগে। আমিও খাই। তবে এখন ভালো লাগছিল না। চুপ করে গিয়ে বসলাম।

সদুদা মুড়ি খেতে খেতে বলল, "তোর বাপ তোর বিয়ে দিয়েই ছাড়বে কপাল। পালিয়ে যেতে পারবি না।"

আমি রেগে ছিলাম। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে বললাম, "জানি তো। মেয়েরা তো বাবা মার বোঝা। যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামানো যায় তত মঙ্গল। কই, আমার মতো দোকান বাবাও কি চালাতে পারে? একবারও কেন ভাববে না, মেয়ে যদি বিয়ে করতে না চায় তবে থাক?"

সদুদা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "যদি মেয়ের বাবারা সেটা ভাবত, তবে পৃথিবীটাই অন্যরকম হয়ে যেত। মেয়েজন্ম তো পাপ। তাও তো ভালো রে, এ দেশেরই কোনও কোনও রাজ্য আছে, যেখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে নেয় পেটে মেয়ে আছে, তারপর গর্ভাবস্থাতেই সে মেয়েকে মেরে ফেলা হয়। তোর বাপের মোটা মাথায় আর কী ঢুকবে? মেয়ের বিয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারবে না। যে দেশে মেয়ে জন্মালে বাবারা মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা জমাতে শুরু করে, যেখানে মেয়ের বিয়ে মানেই একগাদা জিনিস দিতে হয়, সে দেশে মেয়েকে বিদায় করাটা অস্বাভাবিক কেন হবে?"

আমার কান্না পাচ্ছিল। কাঁদলাম বেশ খানিকক্ষণ হুহু করে। একমাত্র সদুদার কাছেই আমি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারি। সদুদা কান্না থামাল না। আমাকে চুপ করে কেঁদে যেতে দিল। কান্নার বেগ কমলে সদুদা বলল, "মানুষ একটা মেয়ের বাইরেটা দ্যাখে। তার সাজগোজ দ্যাখে, চোখ দ্যাখে ট্যারা নাকি, দাঁত দ্যাখে ফোকলা নাকি, পা দ্যাখে খোঁড়া নাকি। যেমন করে গোরু কেনে লোকে হাট থেকে, সেভাবে দ্যাখে। অথচ মেয়েটার কী ইচ্ছা, কটা মানুষ দ্যাখে?"

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, "তুমি থামো। খালি বড়ো বড়ো কথা। নিজে বিয়ে না করে ভুঁড়িওয়ালা ময়রা সেজে জীবন কাটিয়ে দিলে আর আমাকে বাতেলা মারছ। বিয়ে করতে পারতে না? তোমার যদি মেয়ে হত, কত সুখে থাকত বলো তো?"

সদুদা হাসল, "আমিও আসলে তোর বাবার মতোই। বাতেলায় অন্ধকার করে দেবে, আর আসল জায়গায় গিয়ে দেখা যাবে আমিও ওদের মতোই করছি। আমার ইচ্ছায় হত না, আমার বউয়ের ইচ্ছায় হত হয়তো। তোর বাবা কি তোকে কম ভালোবাসে? মা কি কম ভালোবাসে? তা তো না। কিন্তু তোকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা এত উতলা কেন? কারণ এটাই সিস্টেম। সিস্টেম ভাঙার কথা সবাই ভাবতে পারে না। তবে যারা ভাঙে তারাই টিকে যায়, বাকিরা গতানুগতিক হয়ে থেকে যায়। তুই বল না, নেতাজির আমলে কত লোক তো থাকত, একজনের নামও কেউ জানে? তুই তোর প্রপিতামহের নাম জানিস? কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোসের নাম সবাই জানে। কেন জানে? কারণ লোকটা ওই নিস্তরঙ্গ সুখী, মেরুদণ্ডহীন বাঙালি জীবনটাকে ভাঙতে পেরেছিল। মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে, দ্যাখো, চেষ্টা করলে পারব না হয়তো, কিন্তু পারতেও তো পারি। তুই সৌরভ গাঙ্গুলির কথা ভাব না। লোকটার তো সব ঠিক ছিল না। লাফিয়ে ওঠা বল খেলতে পারত না, হুক পুল তো ছেড়েই দিলাম। টিম থেকে বাদ দিয়ে দিল। চ্যাপেল জানে, এ ছোঁড়া ঘাসের পিচে পায়খানা করে দেবে। ভেবেছিল যাবে সাউথ আফ্রিকান পিচে, বুকে-টুকে বল খেয়ে পালিয়ে আসবে। কিন্তু আদতে কী হল? সেই ছেলেটাই অবলীলায় ঘুরে দাঁড়াল। গড়পড়তা বাঙালি চিন্তাধারা নিয়ে চললে পারত? অনেক তো পেয়েছিল জীবনে, অত বড়ো বাড়ি, অতগুলো বাড়ি, দেশের ক্যাপ্টেনও ছিল, কী দরকার ছিল খেলার? রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিলেই তো পারত। নাহ, নেয়নি। এখানেই লোকটা সবার থেকে আলাদা। সবাই পারে না। কেউ কেউ পারে। যারা পারে, তারা থাকে। তোর বাবা পারবে না, থাকবেও না।"

আমি মুগ্ধ হয়ে সদুদার কথা শুনছিলাম। কত সুন্দর করে কথা বলে লোকটা, কত জ্ঞান, অথচ মিষ্টির দোকানেই কাটিয়ে দিল গোটা জীবন। মানুষের জীবন বড়ো জটিল। কে যে কোথায় কেন আছে, কেউ বলতে পারে না।

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললাম, "ও সদুদা, বাবার আগের বউয়ের কথা বলো না গো। কেমন ছিল দেখতে?"

সদুদা উত্তর না দিয়ে মন দিয়ে মুড়ি খেতে লাগল। এই কথা জিজ্ঞেস করলেই সদুদা চুপ মেরে যায়। কখনও মুড হলে একটু বলে। বেশিরভাগটাই বলে না।

আমি উঠলাম না আর। চুপ করে বসে রইলাম। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছিল না।

২১।

জীমূতবাহন

কথায় আছে, "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

আমার হয়েছে সেই অবস্থা। এমন জ্যাম লাগল সেবক থেকে, আর দার্জিলিং যাওয়া হল না। তিস্তা বাজারের থেকে যে রাস্তা কালিম্পং-এর দিকে বেঁকে গেছে, সে রাস্তায় খানিকটা গিয়ে নাম না জানা জায়গায় একটা নির্জন হোম স্টে-তে যখন পৌঁছোলাম তখন রাত সাড়ে আটটা।

বউয়ের চাপ ছিল না। খানিকক্ষণ পর পর ঘুমিয়েছে। আমার গাড়িতে ঘুম এসেছিল বটে, কিন্তু এত খিদে পেয়েছিল যে ঘুম ভেঙে গেছিল। গোটা রাস্তা গাড়ি শামুকের গতিতে এগিয়েছে। হোম স্টে-তে পৌঁছে চেঞ্জ না করেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

বউ একটা জানলা খুলে দিল। শীত নেই তেমন। জানলার কাছে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে বলল, "তুমি জীবনে কটা প্রেম করেছ?"

আমার মাথা ধরে গেছিল। তবু বউয়ের প্রশ্নটা কানে এল। একটা হালকা হাওয়া আসছে বাইরে থেকে। বললাম, "হাফখানা। তাও একটা বিয়েবাড়িতে। ক্লাস ইলেভেনে। মেয়েটা বিয়েবাড়ির পরে আর ফোনও ধরল না।"

বউ খ্যাক খ্যাক করে কয়েক মিনিট হেসে বলল, "তা বোঝাই যায়। তোমার দ্বারা প্রেম হবে না।"

আমি বললাম, "ইয়ে মানে সিগারেটটা না খেলে হয়? আমার কেমন মাথা ধরছে।"

বউ বলল, "তুমিও ধরাও একটা। নাকি কাউন্টার নেবে?"

আমি বললাম, "আমার ইচ্ছে করছে না।"

বউ বলল, "গুড। আচ্ছা, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। তোমার সম্মান রক্ষার্থে এই সিগারেটটা আমি ফেলে দিলাম।"

আমাকে অবাক করে বউ সিগারেটটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল।

আমি খানিকক্ষণ সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম। বাপরে। কত সম্মান। বলতে ইচ্ছা করছিল, আমাকে এত সম্মান দিলেন মা, আমি কি এত সম্মানের যোগ্য? বললাম না। যা জিনিস, এখানে কোনও সিন ক্রিয়েট করে দিলে কেলো হয়ে যাবে।

বউ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুশি?"

আমি মাথা নাড়লাম, "হ্যাঁ, খুশি।"

বউ খাটের ওপর বসে মাথার চুল খুলে দিল। কত চুল রে বাপ! আমার চুলে শ্যাম্পু করতে দু টাকার সানসিল্কে হয়ে যায়। এর যা চুল দেখছি, তাতে শিওর গোটা বোতল লাগে। ধুস, কী সব মাথায় আসছে।

বউ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "অমলকান্তি হলে এখন কবিতা আউড়াত। শুনে শুনে কান পচে গেছে। চুল নিয়ে লোকের কী এত কবিত্ব আসে কে জানে! হিন্দির চুল নিয়ে তো আসতে পারে।"

আমি হেসে ফেললাম। বউ বলল, "তোমার প্রেম হয়নি তাহলে সেভাবে?"

দরজায় কেউ নক করল। বউ দরজা খুলল। গরম কফি দিয়ে গেল দু কাপ। বউ আমার দিকে আমার কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এ নাও। ভালো লাগবে।"

আমি ভাবছিলাম আমার কী ভাগ্যি। অবশ্য যেরকম ওয়েদার, যখন তখন যা তা হতেই পারে। আমার বউয়ের যা রূপ দেখেছি, ঠিক কিছুই বিশ্বাস হয় না। উঠে বসে কফিতে চুমুক দিলাম। বেশ ভালো লাগল।

বউ আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রেম হয়নি তাহলে সেভাবে?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না। হয়নি। তোমার?"

বউ বলল, "আমারও হয়েছে। ফিজিকাল রিলেশনও।"

আমি চমকালাম না। এ মেয়ের থেকে কিছুই অপ্রত্যাশিত না। বললাম, "অমলকান্তির সঙ্গে?"

বউ মুখ কুঁচকে বলল, "ধুস! ওই দু লাইনের ফেসবুক কবির দু ইঞ্চিও আছে নাকি সন্দেহ আছে আমার। ও তো আমার বডিগার্ড ছিল।"

আমি খাবি খেয়ে বললাম, "মানে? ওকে তুমি ভালোবাসতে না? ওর সঙ্গে বিয়ে করতে গেছিলে যে?"

বউ চুপ করে কফি খেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল, "অ্যাকচুয়ালি ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পুরোটাই লোক দেখানো। ওকে আমার দরকার ছিল কিছু মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। আমি যাকে ভালোবাসি সে একজন বিবাহিত মানুষ। কয়েক মাস হল বিয়ে হয়েছে।"

আমি চমকালাম।

বউ হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর কিন্তু বিয়েতে বিন্দুমাত্র মত ছিল না। বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দুজন দুজনকে পাগলের মতো ভালোবাসি।"

কফিটা কেমন বিস্বাদ লাগছিল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে তুমি এখানে এলে কেন?"

বউ বলল, "ওকে জ্বালাতে। প্রেমে একটু জ্বালানো পোড়ানোরও দরকার আছে, তাই না?"

আমি ক্যাবলার মতো মাথা নাড়লাম।

বউ বলল, "প্রথম যখন প্রোপোজ করেছিল, আমি শুরুতেই না করে দিয়েছিলাম ওকে। ও কিন্তু হাল ছাড়েনি। ক্রমাগত আমায় বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে গেছে আমার ওপর ওর সফট কর্নার আছে। বাইরে চাকরি করে ও। বিয়ের কার্ড দিতে কলকাতা এসে বলল দেখা করবে। আমার বাড়িতেই এল। কেউ ছিল না সেদিন। কার্ড দেওয়া হল, কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা হল, আমি আবিষ্কার করে বসলাম আমি ওকে ভালোবাসি। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করলাম। ও আমাকে কথা দিয়েছিল বিয়েটা করবে না। কিন্তু বাড়িতে জানানো মাত্র এত সমস্যা বেড়ে গেল যে বিয়েটা ওকে করতেই হল। যদিও আমাদের মধ্যে যোগাযোগটা ঠিকই আছে এখনও। আমরা মিটও করি।"

আমি অবাক গলায় বললাম, "আর ওর বউ?"

বউ হেসে বলল, "বিন্দুবিসর্গ জানে না। ও বলেইনি ওকে কিছু।"

আমি বললাম, "কিন্তু সেটা কি ঠিক হয়?"

বউ বলল, "এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। চলো ডিনার করে আসি।"

বউ উঠল।

আমার আর উঠতে ইচ্ছা করছিল না।

খিদেটা কোথায় যেন ঢুকে গেল।

২২

মাংসের গন্ধ ভালোই বেরিয়েছিল। চিকেন রুটি করেছিল। বউ অনেকটা খেল। খিদে পেয়েছিল। আমি একটা রুটির বেশি খেতে পারলাম না। অস্বস্তি লাগছিল।

ঘরে এসে বউ বলল, "তোমার আমার স্টোরিটা শুনতে ইচ্ছে করছে?"

আমি বললাম, "তোমার ঘুম পায়নি?"

বউ বলল, "গাড়িতে ঘুমালাম তো। তুমি ঘুমালে ঘুমাও। আমি একটু টেক্সট করব ওকে।"

বউ ব্যাগ থেকে ফোন বের করে মেসেজ করতে শুরু করল।

আমি কেমন ক্যাবলার মতো কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে বললাম, "ভদ্রলোকের বউ? পাশে নেই?"

বউ হাসল, “বউ সাথে থাকে না তো। উইকএন্ডে দেখা হয় শুধু। বাকি পাঁচ দিন আমার সঙ্গে টেক্সট চলে। ও কটা দিন আমিই বউ আর কি।”

আমি বললাম, “ওহ। ঠিক আছে।”

বউ বলল, “তোমার আনএথিকাল লাগছে না ব্যাপারটা? স্বাভাবিক। শোনো, তোমাকে বেশি কিছু করতে হবে না। কয়েক দিন আমার সঙ্গে থেকো। তারপর ডিভোর্স দিয়ে দিয়ো। আমি তো বাড়ি চলেই গেছিলাম। পরক্ষণে মনে পড়ল আমি যদি তোমার সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্যে না থাকি তবে ওর বউয়ের সন্দেহ হতে পারে।”

আমি চুপ করে বসে থেকে বললাম, “অমলকান্তি পালিয়ে গেছিল কেন? ও কি কিছু বুঝেছিল?”

বউ জোরে হেসে উঠে বলল, “নাহ। অত বুদ্ধি ওর নেই। আমার একটা ভলান্টিয়ার দরকার ছিল। অমলকান্তি ছিল না, তুমি এলে। একই হল।”

আমি বললাম, “ভলান্টিয়ার? মানে মুরগি?”

বউ বলল, “তুমি রেগে যেয়ো না। কটা দিন কষ্ট করো। তারপর ডিভোর্স হয়ে যাবে।”

আমি বললাম, “ডিভোর্স করে তুমি কী করবে? ওই ভদ্রলোক তো বিবাহিত।”

বউ কাঁধ ঝাঁকাল, “ও এইসব বিয়ে-টিয়ে নামের ইন্সটিটিউশন মানে না। বউকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবে যে-কোনো দিন।”

আমার সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। বউ টেক্সট করতে করতে ফোন করল এবার। ফোনটা নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

আমি খাটে চুপ করে বসে রইলাম। নিজেকে চার অক্ষরের বোকা মনে হল। অদ্ভুত একটা রাগ হচ্ছিল।

সমস্যা হল, এক-একটা মানুষের এক-একটা জিনিস থাকে না। আমার যেমন বেশ কিছু অনুভূতি ভোঁতা। যেভাবে বিয়ে হল তা মনে হয় এই দু হাজার উনিশ সালে এসে কারও হওয়া সম্ভব না। বিয়ে আদৌ করব কি না সেটাও কোনও দিন ঠিক ছিল না। বাড়ি থেকে তাড়া দিচ্ছিল বটে, কিন্তু আমি ঠিক কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। বিয়ের নামে আমার বরাবর একটা ভীতি কাজ করত। যেভাবে বিয়েটা হয়েছিল সেটাও একটা ঘোরের মধ্যে।

বিভূতিভূষণের আমলে এসব বিয়ে হত বটে। কিন্তু ঘোর কলকাতা শহরে এভাবে জোর করে বিয়ে দেওয়ার কারণটা একটু একটু করে খোলসা হচ্ছিল। হিসেবমতো আমার রেগে যাওয়া উচিত। চেঁচামেচিও করা উচিত। আমার কিছুই আসছিল না। আমি কেমন একটা জড়ভরতের মতো কয়েক মিনিট বসে রইলাম। দলা পাকিয়ে একটা কান্না যে আসছিল না তা অস্বীকার করব না, তবে সেটা গিলে ফেলছিলাম। এভাবে একটা মানুষের সঙ্গে কী করে পরপর অঘটন ঘটতে পারে? জোর করে বিয়ে, হানিমুনের নাম করে বন্ধুর কাছে হাত পেতে টাকা নিয়ে আসা, আর তারপরে এরকম একটা গল্প শোনা, আমার নিজেরই সব কিছু কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল। জ্ঞানত কারও কোনও ক্ষতি করিনি, পাড়ার কারও জন্য হাসপাতালে রাত জাগতে হলে সবার আগে আমিই দৌড়োই। যখন যা দরকার আমি চলে যাই সবার আগে। সেই আমার সঙ্গে এরকম একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হতে পারল? ডিভোর্স হয়েই বা কী হবে? এ ক্ষত তো চিরকালীন হয়ে থাকবে। রাগ হচ্ছিল। একটু একটু করে।

খাটে শুয়ে পড়লাম। বালিশে মাথা দিয়ে চাদর টেনে নিলাম। ঘুম আসছিল না তবে চোখ বুজে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে বউ এসে পাশে শুল ফোনে কথা বলতে বলতেই। ন্যাকা ন্যাকা গলায় কথা বলছিল, “তুমি কিন্তু নিজের খেয়াল রাখবে। এরপরে এসো, আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ো, আবার আমি তোমার চুলে বিলি কেটে দেব।”

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে উঠে বসলাম। বউয়ের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে দেওয়ালে ছুড়ে মারলাম।

বউ আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে উঠে বসে বলল, “এটা কী করলে তুমি?”

আমি নিজেও বুঝতে পারিনি এটা আমি করতে পারি। একটু ভেবে নিয়ে বললাম, “আমি করিনি। ঘুমের ঘোরে আমার এরকম একটা রোগ আছে। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমার ফোন দিয়ে ফোন করো। আমি তোমাকে ফোন কিনে দেব একটা।”

বউ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আইন-টাইন জানা আছে? বধূনির্যাতন হলে কী হতে পারে জানো? চাকরি তো যাবেই, জেলের ঘানি টেনে জীবন কেটে যাবে।”

আমি বললাম, “পাহাড়ে অনেকের বউ খাদে পড়ে মরে যায় জানো তো? পা স্লিপ করে যায়। বেশি চাপের কিছু না। একটু ঠ্যালা দিলেও হয়। কিংবা ধরো তোমার গলাটা টিপে দিলাম। তারপর খাদে ফেলে দিলাম। কে বুঝবে?”

বউ আতঙ্কিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, “তোমাকে নিরীহ ভেবেছিলাম।”

আমি শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে বললাম, “ঘুমিয়ে পড়ো। কাল সকালে দার্জিলিং যাবে। আর ওই কে আছে না, তার সঙ্গে আর-একবার কথা বললে তাকে ধাপার মাঠে পুঁতে দিয়ে আসব। আমাকে চেনো না তুমি।”

বউ অবিশ্বাসী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

২৩

ছোটোবেলায় পড়েছিলাম জীব আর জড়। প্রকৃতিটা প্রাণী বাদে যেসব গাছপালা আর জড় পদার্থ নিয়ে তৈরী, তাদের কি আমাদের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, সুখ ইত্যাদিতে কিচ্ছু যায় আসে? মনে তো হয় না। সকাল থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিং যাবার সিদ্ধান্ত ক্যান্সেল করতে হয়েছে এই বৃষ্টিতে বেরোতে পারা যাবে না বলে। একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে কেমন গুটিশুটি মেরে বউ ঘুমাচ্ছে। আমি জানলা খুলে খাদ দেখছি আর মাঝে মাঝে বউয়ের দিকে তাকাচ্ছি। এই মেয়েটা আমাকে ভালোবাসে না। সব কিছুই হঠাৎ করে হয়ে গেছে। তবু এই বাইরের বৃষ্টি আর এই কুঁকড়ে থাকা শোয়াটা সব কেমন অবিশ্বাস করতে বলছে!

ওর ফোনটা এখনও মেঝেতে পড়ে আছে। নিজে আর তুলতে যায়নি। আমার ওপর তেমন রাগারাগিও আর করেনি। যেন ঠিক আছে, এরকম তো হতেই পারে। কিছুক্ষণ পরে কম্বল টেনে নিয়ে ঘুমিয়েও পড়ল। আমি চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে শুয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে দেখি আমার গায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছে। গলার ওপর হাত। হাতটা কোনও মতে সরালাম। পা-টাও। বৃষ্টি নেমেছিল মাঝরাতেও। ও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকল। একবারও উঠল না। আর আমার ঘুম এল না। পায়চারি করলাম। হোম স্টের বাইরের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। পাহাড়ের নিস্তব্ধতা চিরে ঝিঁঝির ডাক আসছিল। শীতও লাগছিল। এখানে রাতের দিকে শীত পড়ে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্ধকারেই অনেকটা হেঁটে আবার ঘরে এসে বসলাম। কান, মাথা, নাক ঠান্ডা হয়ে গেছে।

ছেলেদের কাঁদতে নেই নাকি। আমার ভীষণ কান্না পেল। নিজের বর/বউয়ের আর-একটা সম্পর্ক জানার পরে মানুষ কি এভাবেই কাঁদে? আদৌ কাঁদে? আমার তো সব কিছুই দুম করে হয়ে গিয়েছিল, তাহলে আমার কেন কান্না পাবে? একটা সম্পর্ক, যাকে সবাই জোর করে নাম দিয়ে দিতে চেয়েছে, সে সম্পর্কে আমি কেনই বা দুম করে অধিকারবোধ দেখাতে যাব? কান্নাই বা আসবে কেন? এগুলো কেন হবে? মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ বসে সোফাতেই ঢুলে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল সেই বৃষ্টির শব্দেই। ও তখনও ঘুমাচ্ছে।

হোম স্টের মালকিন নিজে এসে চা দিয়ে গেলেন। দরজা খোলার শব্দে ও উঠে পড়ল। খাটে বসে বেশ কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “গুড মর্নিং।”

আমার মনে হল ও কি কালকের রাতের কথা ভুলে গেছে? সেটা আর জিজ্ঞেস না করেই বললাম, "গুড মর্নিং। চা দিয়ে গেছে। চিনি খাও তো?"

ও আঁতকে উঠে বলল, "একবারেই না। চিনি খেলে খুব ফ্যাট হয় জানো না?"

আমি বললাম, "হতে পারে।"

ও বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঈশ, কী রোম্যান্টিক ওয়েদার।"

আমি কিছু বললাম না। চুপ করে বসে চা খেতে লাগলাম।

চায়ের কাপ হাতে নেবার পর ওর ফোনের দিকে চোখ পড়ল। বলল, "এই, তুমি আমার ফোনটা ভেঙে দিয়েছ না?"

আমি ওর দিকে তাকালাম। কেমন বাচ্চাদের মতো প্রশ্নটা করল। আমি বললাম, "ভুলে গেছ?"

ও খাটে বসে পড়ে বলল, "ভুলব কেন? ভোলার কিছু নেই। ফোন ছুড়ে ফেলতে পারো, মন থেকে কি কাউকে ছুড়ে ফেলতে পারবে?"

আমি বললাম, "একেবারেই না। সম্ভবও না সেটা। তোমায় আমি ফোন কিনে দেব। কাল আমার কাজটা উচিত হয়নি একেবারেই।"

ও বলল, "একদম। ভালোই হল, নতুন ফোন পাব। কাল আমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাইনি। স্বাভাবিক। তোমরা জায়গায় যে-কোনো ছেলে থাকলেও তাই করত। ইন ফ্যাক্ট তুমি যে বললে না খাদে ঠেলে ফেলে দেবে, সেটাও করতে পারত। তুমি তো কিছুই করলে না।"

আমি বললাম, "আমার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমি নিজের কাজের জন্য যথেষ্ট দুঃখিতও বটে। তুমি আমার ফোন থেকে তোমার প্রয়োজনীয় ফোনগুলো সেরে নিতে পারো।"

ও হাত নেড়ে বলল, "দরকার নেই। বেড়াতে এসেছি, বেড়াই। পরে দেখা যাবে। অ্যাকচুয়ালি তোমাকেও দোষ দেওয়া যায় না। দুম করে কাউকে এভাবে বিয়ে করে মুরগি করা হলে তার রাগ হতেই পারে। আমি কিছু মনে করিনি। তুমি চাপ নিয়ো না।"

আমি বললাম, "নিচ্ছি না চাপ। তুমি ডিভোর্সের জন্য যা যা করার দরকার করে নিয়ো কলকাতা গিয়ে। আমি ভাবছি আর পাহাড়ে না গিয়ে বৃষ্টি কমলে এখান থেকেই কলকাতা ফিরে যাই। অকারণ ঘোরার তো কোনও মানে দেখতে পাচ্ছি না।"

ও বলল, "না না। আমি এখন কলকাতা যাচ্ছি না। ঈশ, জঘন্য। আর শোনো, তোমার চিন্তা করতে হবে না। ডিভোর্স হয়ে যাবে। মিউচুয়ালি করা কোনও ব্যাপারই না। আর আমরা তো রেজিস্ট্রিই করিনি এখনও। অত জটিল কিছু হবে না। খামোখা তোমার কটা দিন নষ্ট করলাম, এটা ঠিক। চিন্তা কোরো না, আমার একটা ফিক্সড ডিপোজিট আছে, তোমায় সব ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব। তুমি আমায় পাহাড় ঘোরাও বুঝলে? চাপ নিয়ো না। টাকা দিয়ে দেব। আমি ধার রাখব না।"

কেমন হাত পা নেড়ে নেড়ে ও কথাগুলো বলল। সব নিশ্চিন্ত যেন। কোথাও কোনও চিন্তা নেই, সব কত সহজ সরল। কেউ কেউ নিজের পৃথিবীটাকে এরকম বানিয়ে নিতে পারে। তাকে সামনে পিছনে কিছু ভাবতে হয় না। অন্যের জীবনে কী প্রভাব পড়ছে ভাবতে হয় না। সে সব কিছুই ভেবে নেয় তার মনমতো চলবে।

আমার চা খাওয়া হয়ে গেছিল। কাপটা সামনের টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম, "বেশ। কোথায় কোথায় যাবে বলো। ঘুরব।"

ও লাফ দিয়ে বলল, "ইয়েস।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই মেয়েটা আদৌ সুস্থ তো?

পেরেন্টস টিচার মিটিং-এর মতো ভয়াবহ ব্যাপার আমার জীবনে আর কিছু নেই। এক-একজন বাচ্চার বাবা এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন গিলে খাবে। অথচ ব্যাপারটাকে বাইপাস করার জায়গা নেই। করতেই হবে। অত্যন্ত ক্লান্তিকরভাবে প্রথম পর্বটা শেষ হল। এই সময়টা মেসেজও দেখা যায় না। নিজের ডেস্কে এসে বসে সবার আগে মোবাইল দেখলাম। অমৃতর মেসেজ জমে আছে। একটা কবিতা লিখেছে কাঁচা হাতে। হাসি পেলেও হাসলাম না। বাণীদি কেমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকান, ভীষণ লজ্জা লাগে। রিপ্লাইতে লাভ সাইন দিলাম বেশ কয়েকটা। অমৃত অনলাইনই ছিল। লিখল, "আমার এই পচা কবিতাও ভালো লাগল?"

আমি লিখলাম, "হ্যাঁ, হোক না পচা, তবুও তো আমার।"

অমৃত হাসির ইমোজি পাঠাল। লিখলাম, "খেয়েছ?"

অমৃত লিখল, "জাস্ট। তোমার পিটিএম কেমন যাচ্ছে?"

লিখলাম, "জঘন্য। তোমাকে নিয়ে এসে বসাতে পারলে ভালো হত, বুঝলে?"

অমৃত লিখল, "আমার তো তাই ইচ্ছা। সারাদিন তোমার কাছে এসেই বসে থাকি।"

আমার হাসি পেলেও হাসলাম না।

আদৃতা পাশে এসে বসে মোবাইলে ঝুঁকে পড়ল। আমি মোবাইলটা সরিয়ে নিয়ে বললাম, "কী হল? এসব কী?"

আদৃতা বলল, "তোর ইয়ে কী লিখেছে দেখাবি না ভাই? দেখা না, কী হয়েছে। আরে শেষে তো সেই বর যাবে দূরে আর শাশুড়ির সাথেই লড়ে মরতে হবে।"

আমি বললাম, "আমার শাশুড়ি নেই। শ্বশুর আছে।"

আদৃতা বলল, "তাও ভালো। বেঁচে গেছিস। আর কে কে আছে?"

আমি বললাম, "বলব না। সব বললে হয় নাকি?"

আদৃতা জোরে আমার গাল টিপে দিয়ে বলল, "ওলে বাবা লে, আমার সোনা মেয়ে রে। সবই তো দুদিন পরে জানতে পারব। এখন বলতে কী হয়?"

আমি হাসলাম, "গুরুদেবের বারণ আছে তো। কাউকে বলা যাবে না।"

আদৃতা চোখ টিপে বলল, "গুরুদেব? তা কে সে গুরুদেব? বাবা রামরহিম?"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। বাণীদি তাকালেন, কিছু বললেন না।

আদৃতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "লুকো লুকো ভাই। এই সময়টাই জীবনের সেরা সময়, বুঝলি? তারপর সব কিছু সামলাতে হবে। লাইফ পুরো হ্যাজ হয়ে যাবে। মেয়েদের জীবন তিনটে জিনিসে চলে বুঝলি?"

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, "কী তিনটে জিনিস?"

আদৃতা ডার্টি পিকচারের বিদ্যা বালানের মতো মুখ করে বলল, "স্যাক্রিফাইস, স্যাক্রিফাইস, স্যাক্রিফাইস।"

আমি আবার হাসলাম।

আদৃতা বলল, "হাসছিস না? হেসে নে। কিন্তু এই স্যাক্রিফাইসের মতো জিনিস হয় না। বিয়ের আগে লেগ পিস পছন্দ করিস? বিয়ের পরে বর খাবে সেটা। তুই তো ব্রেস্ট খাবি। শক্ত শক্ত পিস। দাঁতে ছিবড়ে লাগে। কিন্তু তোকেই সেটা খেতে হবে। মাছের পেটি পছন্দ করতিস? ছেলে খাবে তো, কাঁটা পিস খেতে পারবে না সে। তোকে ল্যাজা খেতে হবে, যেটা তুই সবথেকে বেশি অপছন্দ করিস। বরের শরীর খারাপ হতেই পারে, কিন্তু তোর? নৈব নৈব চ। ওই নিয়েই কাজ করতে হবে। কাজের মেয়ে না এলে তো আরও ভালো। ঘর মোছ, বাসন মাজ, সব তোকেই করতে হবে। এর অন্যথা হবে না। সর্বোপরি আছে শাশুড়ি মাতার জ্ঞান। বউমা, রাতে এটা খায় না, বউমা, ভাদ্র মাসে ওটা খেতে নেই, বউমা, শরীর খারাপ হলে ঠাকুরঘরে যায় না... মেরে ফেল কেউ আমায়।"

আমি বললাম, "এত রাগ?"

আদৃতা বলল, “রাগই রাগ। মেয়েদের বিয়ে মানেই তো সব শেষ। বুঝবি বুঝবি। এখন অনেক কিছু মনে হবে। কত কত প্রতিশ্রুতি দেবে সে। রাজরানি করে রাখব, সব কাজ করে দেব, তোমাকে কোনও কিছুতে হাত দিতে দেব না... শেষমেশ...”

আদৃতার গলা জোরে হয়ে গেছিল। বাণীদি শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন, “এইটুকু বয়সেই তোর এই অবস্থা আদৃতা। আমার বয়সে এলে কী করবি তুই?”

আদৃতা বলল, “সত্যিই জানি না দিদি। মরে যাব আমি শিওর। তুমি একশো বছর বাঁচো। কিন্তু আমার তোমার মতো এতদিন বাঁচার কোনও দরকার নেই।”

অনিন্দিতা টিচার্স রুমে ঢুকল। ওকেও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল। আমাদের দেখে হাসল। আদৃতা বলল, “এই দ্যাখো, আর-এক নতুন বিয়ে ভদ্রমহিলা। তা দিদিভাই, কেমন লাগছে বরকে?”

অনিন্দিতা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুল ঠিক করতে করতে বলল, “অনিরুদ্ধ? ঠিকই আছে। সপ্তাহান্তে কলকাতা আসে। বাকি সময়টা চাতক পাখির মতো বসে থাকা।”

আদৃতা বলল, “ভুবনেশ্বরে চলে যা না। কী হবে চাকরি করে?”

অনিন্দিতা হেসে বলল, “চাকরিটা দরকার। নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা সব মেয়ের দরকার। বুঝিস না সেটা?”

আদৃতা বলল, “তা আর বুঝি না? এটাই তো অক্সিজেন এখন।”

ওদের কথা শুনছিলাম। হঠাৎ দেখি অমৃত মেসেজ করেছে, “আজকেও দেখা করব কিন্তু। এসো।”

২৫
অমৃত

হিমুর একটা নদী ছিল।

ময়ূরাক্ষী।

আমারও আছে।

আত্রেয়ী।

আমার সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকার নদী।

সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছিলেন প্রেমে না পড়লে বোঝা যায় না আপনি বুদ্ধিমান না বোকা। প্রেমে পড়লে মানুষ উলটো হয়ে যায়। চালাকরা বোকা হয়ে যায়, আর বোকারা চালাক।

প্রেমে পড়ার পর আবিষ্কার করলাম আমি আসলে হেবি চালাক ছিলাম। হ্যাঁ, মানে সিরিয়াসলি, এখন বোকা হয়ে গেছি।

নইলে আত্রেয়ীদের বাড়িতে গিয়ে ওরকম কম্মোটা করি? অনেকটা সময় অবধি আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে আমি ওদের বাড়ি আছি। হঠাৎ করে খেয়াল পড়ল। আর তারপরেই আমি ট্রিপ করে গেলাম।

দুই ভদ্রলোকের একজন যে আত্রেয়ীর বাবা, আর একজন যে জেঠু, সেটা বোঝার পর আমি কিঞ্চিৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলাম। অমন প্রিয় অমলেটও তখন অচেনা লাগছিল। সেটাও প্লেট থেকে যেন আমার দিকে তাকিয়ে গাইছিল, “সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে”।

সে সময়টা আত্রেয়ী পরিত্রাতা হয়ে না এলে আমার যাবতীয় কারিকুরি ওখানেই শেষ হয়ে যেত। “এই তুমি বেরোবে না, তোমার না অফিসের কাজগুলো বাড়িতে গিয়ে করতে হবে”, বলে আত্রেয়ী এমন তাড়া দিল, আমি হুড়মুড় করে অমলেটটা খেয়েই দৌড় দিলাম। দুই ভদ্রলোক আমার যাওয়ার পথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। পরে আত্রেয়ী বলেছে ওর বাবা আর জেঠু দুজনে মিলে ওকে ব্যাপক নাকি লেগপুল করেছে।

আমার বাবাও কম করছে না অবশ্য। ঘোষণা করেই দিয়েছে আমি নাকি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বউপাগলা ছেলে হব। বউ উঠতে বললে উঠব আর বসতে বললে বসব। সেটা শুনে দাদা বলেছে তার মানে এ গুণটা অমু তোমার থেকেই পাবে বাবা।

বাবা সেটা শুনে কিঞ্চিৎ খচেছে, তবে তারপরে নিজেকে ডিফেন্ড করতে বলেছে বউকে ভালোবাসা পুণ্যের কাজ। অমু যদি বউকে ভালোবাসে তাহলে তো সেটা ভালোই হবে।

দাদা খুক খুক করে হেসেছে।

বউদি প্রথম প্রথম খুব রাগ দেখিয়েছিল। এখন আত্রেয়ীর ছবি দেখেছে। আত্রেয়ীর সঙ্গে একদিন ফোনে কথাও বলেছে।

বাবা আত্রেয়ীর বাবার সঙ্গে ফোনে কথাও বলে ফেলেছে। ঠিক হয়েছে এ হপ্তার শেষে ওদের বাড়ি যাব সবাই মিলে।

সবাই মিলে বাড়ি ভর্তি আচ্ছে দিনের পরিবেশ।

আমার অবশ্য সমস্যা কমেনি।

বরং বেড়েছে। যে আমি কোনও দিন অফিস পালানোর কথা স্বপ্নেও ভাবতাম না, সে আমিই সেকেন্ড হাফ হলেই আত্রেয়ীকে দেখার জন্য পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছি। ইনোভেটিভ সব আইডিয়া বের করতে হচ্ছে অফিস থেকে বের হবার জন্য। একদিন আমার পাইলসের ব্যথা বেড়েছে বললাম।

আর-একদিন বললাম, মেজো দাদু অসুস্থ।

নিজের দাদুই নেই তায় আবার মেজো দাদু! কতজনকে যে ভালোবাসার স্বার্থে পৃথিবীতে ইমপোর্ট করতে হচ্ছে তার হিসেব নেই।

সব কিছুর শেষে যখন আত্রেয়ীকে স্কুল থেকে বেরোতে দেখি, আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে ওর ভুবনজয়ী হাসিটা হাসতে দেখি, তখন মনে হয়, এ মেয়েটার জন্য হাসতে হাসতে জীবন দিয়ে দেওয়া যায়।

বাইকের পেছনে বসে যখন মেয়েটা আমার কোমরে হাত দেয়, খুনসুটি করে চিবুকটা কাঁধে ছোঁয়ায়, তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। এই পৃথিবীতে, এত মানুষের মধ্যে এই মেয়েটা আমার। আর আমি ওর। এর থেকে ভালো অনুভূতি বোধহয় আর কিছু হয় না।

অফিস থেকে বেরিয়ে বাইকটা স্ট্যান্ড করে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর ওদের স্কুল ছুটি হল। আমাকে দেখে চারদিকে তাকিয়ে রাস্তা পার হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি রোজ রোজ এভাবে অফিস পালাচ্ছ, চাকরিটা না থাকলে কী হবে?"

আমি বললাম, "তোমার চাকরি আছে তো, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে খাব।"

আত্রেয়ী আমার পেটে একটা ঘুসি মেরে বলল, "ছাতা খাওয়াব। বউয়ের টাকায় খাবে, লজ্জা লাগবে না?"

আমি বললাম, "অন্যের বউয়ের টাকায় তো খাব না। নিজের বউয়ের টাকায় খাব।"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব ইয়ে হয়েছে না? আর বাবার সামনে তো কাপড়েচোপড়ে করে ফেলেছিলে, হুহ।"

আমি বললাম, "চলো, এখনই চলো। তোমাদের বাড়ি যাই। এবার দেখো কত স্মার্টলি কথা বলব।"

আত্রেয়ী বলল, "থাক। হয়েছে। ওই দ্যাখো, বাণীদি কেমন দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। কত সিনিয়র উনি। তুমি এবার থেকে দূরে দাঁড়াবে বাইক নিয়ে। লজ্জা লাগে না বুঝি আমার?"

আমি বললাম, "এত লজ্জা রাখো কোথায় তুমি? ব্যাংকে?"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল। বলল, "চলো। খিদে পেয়েছে।"

আমি বললাম, "আমারও। বিরিয়ানি খিদে পেয়েছে। খাবে বিরিয়ানি?"

আত্রেয়ী বলল, "বিয়ের পিঁড়িতে দুজনে ভুঁড়ি নিয়ে বসলে ভালো লাগবে দেখতে?"

আমি বললাম, "লাগবে। আমাদের বিরিয়ানি। আমরা বুঝব। চলো।"

আত্রেয়ীকে হেলমেট দিলাম। ওর জন্য নতুন হেলমেট কিনেছি। আত্রেয়ী পিছনে উঠে আমাকে ধরে বসলে বাইক স্টার্ট দিলাম।

আত্রেয়ী টুক করে ওর চিবুকটা আমার কাঁধে রেখেই হেসে ফেলল।

আমি বললাম, "অ্যাক্সিডেন্ট হবে কিন্তু। বাইক চলার সময় চুপ করে বসবে। এটা তো আর সিনেমা না যে গান গাইতে গাইতে পিছনে ফিরে চুমু খাব। অত ক্ষমতা নেই আমার।"

আত্রেয়ী বলল, "আমার কিন্তু খুব আদর পাচ্ছে।"

আমি বললাম, "তাই? আমার তো সকাল থেকে। তাইলে বিরিয়ানি আগে না চুমু?"

আত্রেয়ী আমার কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বলল, "তুমি যেটা চাইবে।"

আকাশ মেঘলাই ছিল। বৃষ্টি নামল যেন আমাদের কথা শুনেই।

খানিকটা গিয়ে বাইকটা রাস্তার বাঁদিকে দাঁড় করালাম।

চুমৌষধি হইতে বড়ো ঔষধি নাই।

কোনও এক মহাপুরুষ বলেছেন।

কে বলেছেন জিজ্ঞেস করিয়া লজ্জা দিবেন না।

২৬
জীমূতবাহন

ক্লাস টুয়েলভ অবধি বয়েজ স্কুল। কলেজ কো-এড হলেও ছেলেদের সঙ্গে থাকতাম, মেয়েদের থেকে বরাবর দূরে।

সেই ছেলে যখন একটা পাহাড়ি গ্রামে বসে বৃষ্টির মধ্যে একটা সুন্দরী মেয়ে, যে কিনা আমার বউ বলে সবাই জানে, তাকে মনোযোগী হয়ে কাজল পরতে দ্যাখে, তার কী হতে পারে?

আমি তাকাতে চাই না, যতবারই মনে পড়ে, এ মেয়ে আমার নয়, অন্য কেউ আছে এই মেয়ের জন্য, তবু না চাইতেও চোখ পড়ে যায় আয়নায়। কেমন শিল্পীর মতো চোখের পাশ দিয়ে কাজল পরছে! একটু টেনে দিল কাজলটা। তাতে আমার একটা হার্টবিট মিস হল। বৃষ্টির জল হোম স্টের সামনের রাস্তা দিয়ে বয়ে চলেছে নদীর মতো, রান্নাঘর থেকে একটা মন কেমন করা মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে, আর আমি ক্যাবলার মতো একটা মেয়ের কাজল পরা দেখছি।

যাতে ওদিকে চোখ না যায়, তার চেষ্টা করলাম। মোবাইল বের করে খুটখুট শুরু করলাম। লাভ হল না। আড়চোখটা বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করল। ঠিক চোখ চলে যায়।

কাজল পরা হলে নিপুণ হাতে এবার লিপস্টিক দিতে শুরু করল। লাল রঙের লিপস্টিক, লাল, কিন্তু লাল নয়। কী অদ্ভুত রং! বউ ঠোঁটদুটো এক করে মন দিয়ে লিপস্টিক দিল।

আমি এবার খানিকটা অধৈর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "এত সাজছ কেন? এই বৃষ্টিতে আজ তো আর কোথাও যাওয়া হবে না!"

বউ এবার নেলপালিশ ধরেছে। ঠান্ডা মেঝেতেই পা পেতে বসে পড়েছে। আমায় বলল, "সাজার জন্য কোনও এক্সকিউজ লাগে নাকি? আমি তো এমনি এমনি সাজি! তুমি নেলপালিশ পরবে নাকি? এসো।"

আমি বললাম, "ধুস! তোমার কি মাথা খারাপ?"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধকে পরিয়ে দিয়েছিলাম তো আমি। মজা করে। আবার রিমুভার দিয়ে রংটা মুছেও দিয়েছিলাম। এসো না, ভালো লাগবে দেখো।"

আমার যেটুকু ইচ্ছা হয়েছিল, অনিরুদ্ধর নামটা শুনে সব ইচ্ছা মেঘ হয়ে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি খাটে পাশ ফিরে শুয়ে বললাম, "ওসবে আমার কোনও রুচি নেই। তুমি যা ইচ্ছা করো।"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধর নাম শুনে ফাটল? কী কী করেছি শুনলে তো আরও ফাটবে তোমার।"

আমি বললাম, "আমি শুনে কী করব তুমি কী কী করেছিলে? দুদিন পরে আমাকে ডিভোর্স দেবে, তুমি তোমার মতো যার সঙ্গে খুশি থাকবে, আমি আমার মতো যার সঙ্গে খুশি থাকব। এর বাইরে আমার কিছু জানার প্রয়োজন নেই।"

বউ বলল, "বললে বুঝি ফোনটার মতো আমাকেও দেওয়ালে ছুড়ে মারবে? হেবি রাগ তোমার কিন্তু। আচ্ছা, এত রাগ কী করে হয়? কোনও স্পেশাল প্র্যাকটিস করতে হয়? আমার জানো তো, সেভাবে রাগ হয় না। কেউ কিছু বললে আমি শুনতে ভালোবাসি। অনিরুদ্ধ যেদিন বিয়ে করল, সেদিন একটু রাগ হয়েছিল বটে কিন্তু আমি ওকে বুঝতে দিইনি। আসলে তো ও আমাকেই ভালোবাসে, কেন খামোখা রাগ করব বলো?"

আমি বললাম, "তুমি আবার আমাকে ফালতু কথাগুলো বলে যাচ্ছ। তোমাকে আমি বলেছি এসব বাজে উটকো প্যাচাল আমার শোনার কোনও ইচ্ছা নেই। তুমি তোমার মতো করে একটা জীবন ভেবে নিয়েছ, তাতে আমার কোনও জায়গা নেই সেটা তুমিও জানো, আমিও জানি। আমাকে কেন তুমি এসব শোনাতে যাচ্ছ? তোমার পাঁঠা, তুমি যেদিক দিয়ে খুশি কাটবে।"

বউ বলল, "তা তো কাটবই। আমি স্বাধীনচেতা মেয়ে। আমার যেটা ইচ্ছা আমি সেটা করব।"

আমি বললাম, "সেটা কোরো। তবে কী জানো তো, অনেকে স্বাধীনচেতা হতে গিয়ে ভালো মন্দের তফাতটা ভুলে যায়। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, সেটার পার্থক্য করতেও ভুলে যায়। সমস্যা শুরু হবার আগে তারা বুঝতেও পারে না, আসলে সে এতদিন ধরে একটা সমস্যাকেই ডেকে আনছিল।"

বউ নেলপালিশটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি প্রচুর জানো, না? খুব জ্ঞানী মনে করো নিজেকে?"

আমি চুপ করলাম। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তবু জানলাটা বন্ধ করতে ইচ্ছা করল না।

বউ বলল, "দুটো মানুষের মধ্যে সম্পর্ককে ওভাবে বোঝানো যায় না। অনিরুদ্ধ আর আমার ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করে। আমাদের চিন্তা ভাবনা সব মিলে যায়। আমরা কথা বলতে পছন্দ করি। তুমি এগুলো বুঝবে না। কটা প্রেম করেছ তুমি? কিছুই তো করোনি। কী করে বুঝবে? সব সময় ভেবে নাও ওয়ান ইজ টু ওয়ান প্রেমই হয়। ভুল ভাবো। প্রেম হতেই পারে দুজনের মধ্যে। তাতে তৃতীয় ব্যক্তি এলেও কোনও ক্ষতি নেই।"

আমি উঠে বসলাম। বললাম, "ঠিক আছে। বেশ করেছ যা করেছ। তুমি আমাকে একটা কথা বলো শুধু, অনিরুদ্ধর বউ পুরো ব্যাপারটা জানে তোমাদের?"

বউ একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে বলল, "না।"

আমি বললাম, "তাহলে?"

বউ বলল, "এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ..."

বউ কথা শেষ করতে পারল না, আমি বললাম, "নিজেকে ওর বউয়ের জায়গায় বসিয়ে দ্যাখো তো! কেমন লাগছে?"

বউ একটু চুপ করে বলল, "ঠিক লাগছে। আমার বর আমার প্রতি সব কর্তব্য করে তো!"

আমি বললাম, "তবু লুকিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কেন তোমাকে বলে না?"

বউ রেগে গেল, "বেশ করেছে বলে না। তোমার কী তাতে?"

আমি হেসে বললাম, "আমার কিছু না। আমাকে মুক্তি দিয়ো তাড়াতাড়ি। তারপর যা ইচ্ছে করো আমার কিছু যায় আসে না।"

বউ বলল, "দেব তো! শহরে ফিরেই দেব। আমার যেন খেয়েদেয়ে কাজ নেই ওনার সঙ্গে সংসার করতে হবে!"

আমি বললাম, "খেয়েদেয়ে কাজ আমারও নেই। নইলে কি আর তোমার মতো একটা মেয়ে জোটে?"

বউ বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, "কী, কী বললে? আমার মতো? কেন, আমি কী করেছি?"

আমি বললাম, "কী করেছ আয়নার সামনে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে নিজেকেই জিজ্ঞেস করো। আমি কেন তোমাকে সিদ্ধান্ত বলতে যাব? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো, নিজেই নিজেকে উত্তর দাও। সহজ ব্যাপার তো!"

বউয়ের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমার আবার ওর চোখে চোখ পড়ে গেল। কাজলটা কেমন টেনে পরেছে!

চোখ সরাতে পারলাম না। হৃৎস্পন্দন বেড়ে চলল।

এই হৃদযন্ত্রটার কি কোনও কাজ নেই? যেখানে বেশি পারফরমেন্সের দরকার নেই, সেখানেও আমাকে জ্বালাতন করতেই হবে?

২৭

অমৃত

মানুষ এমন একটা প্রাণী যার জীবন সরলরেখায় চলে না। অবশ্য বেশিরভাগ প্রাণীরই তাই। যে ইঁদুরটা সকালে গর্ত থেকে বেরোয়, রাতে সে নিজেও জানে না গর্তে ফিরবে কি না।

জীবন জিনিসটাই আসলে অনিশ্চিত।

আমার যেমন।

যে আত্রেয়ীর সঙ্গে সব কিছু এত মসৃণ চলছিল, যাকে কিনা আমি এত ভালোবাসছিলাম, তার সঙ্গে হঠাৎ করে পশুর মতো আচরণ করতে গেলাম কেন? তাও এমন একটা সামান্য বিষয় নিয়ে, যার কোনও মাথামুন্ডু নেই।

ঘটনাটা শুরুও হয়েছিল হঠাৎ করেই। প্রবল ভালোবাসাবাসির পর আত্রেয়ীকে ওদের বাড়ির গলিতে নামিয়ে দিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত আটটা।

বাবা বাইরের ঘরে টিভি দেখছে। বউদি রান্না বসিয়েছে। দাদা ব্যায়াম করছে।

বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে ফিরে আমি মোবাইলে ফোন করতে গেলাম আত্রেয়ীকে। ফোন রিং হয়ে কেটে গেল।

কী মনে হতে আমি ওর ফেসবুক প্রোফাইল খুললাম মোবাইল থেকে। দেখলাম সকালে একটা প্রোফাইল পিকচার দিয়েছিল। তাতে একটা ছেলে ভীষণ ফ্লার্ট করেছে। অবাক করার মতো ব্যাপার, আত্রেয়ী সে কথার উত্তরও দিয়েছে। কী মনে হতে ছেলেটার প্রোফাইল খুললাম। মাঝে মাঝেই ডুয়াল মিনিং স্ট্যাটাস আছে। আর তার প্রত্যেকটাতেই আত্রেয়ী কমেন্ট করেছে। ছেলেটা সে কমেন্টের রিপ্লাই করেছে ফ্লার্ট করে। ওকে মিন করেই যে কথাগুলো লেখা সেগুলো বুঝতে পেরেও আত্রেয়ী প্রতিটা কথার উত্তর দিয়ে গেছে।

মাথায় কোত্থেকে একটা অসহ্য রাগ এসে চেপে বসল।

বউদি চা এনে দিয়ে বসে বলল, "কই গো, তাহলে যাবে তো ওদের বাড়িতে?"

আমি অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "হুঁ।"

বউদি বলল, "কী হুঁ? যাবে না?"

আমি বললাম, "যাব।"

বউদি কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে ঠাকুরপো? মেজাজ খারাপ?"

আমি এড়ানোর চেষ্টা করলাম, "না, এই অফিসে একটু চাপ যাচ্ছে আর কি! আমি একটু পরে কথা বলি বউদি?"

বউদি চুপ করে আরও কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার এই মুখটা অফিসের কাজের ব্যাপারে কিছু না। যাই হোক, আমাকে বলতে চাইলে বলতে পারতে। আমি এলাম।"

বউদি উঠে বেরোল।

আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর মোবাইলটা বের করে প্রতিটা কমেন্টের স্ক্রিনশট নিয়ে আত্রেয়ীকে হোয়াটসঅ্যাপ করলাম।

ফোন করলাম আবার।

ফোন রিং হয়ে গেল।

বিরক্ত হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করলাম।

মিনিট কুড়ি পরে আত্রেয়ী ফোন করল আমায়। আমি তৈরি হয়েই ছিলাম, ধরলাম, "হ্যালো।"

"হ্যাঁ বলো। স্নান করছিলাম। কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "হোয়াটসঅ্যাপ চেক করো। তারপর ফোন করো।"

আত্রেয়ী হেসে বলল, "আরে বলো না।"

আমি থমথমে গলায় বললাম, "না, আগে চেক করো। তারপর ফোন করো।"

ফোনটা কেটে দিলাম।

কয়েক মিনিট পরে আত্রেয়ী আমাকে ফোন করে বলল, "দেখলাম।"

আমি বললাম, "কে ছেলেটা?"

আত্রেয়ী বলল, "বন্ধু।"

আমি বললাম, "কেমন বন্ধু?"

আত্রেয়ী বলল, "এমনি, স্পেশাল কিছু না। ফেসবুকেই এক বান্ধবীর মাধ্যমে আলাপ। ওর কথাগুলোই এরকম।"

আমি বললাম, "এরকম মানে? শুয়োরটার এত সাহস হয় কী করে এভাবে কথা বলার?"

আত্রেয়ী একটু থমকে বলল, "আচ্ছা, আমি বলে দেব এরকমভাবে কথা না বলতে।"

আমি বললাম, "তুমিই বা রাস্তার মেয়ের মতো ওর কথার উত্তর দিচ্ছিলে কেন ওভাবে? কে হয় তোমার ও?"

আত্রেয়ী এবার রাগল, "এসব কী বলছ তুমি? রাস্তার মেয়ে মানে?"

আমার সুর চড়ল, "রাস্তার মেয়ে ছাড়া কী? ওই জানোয়ারটার এত সাহস হবে কীভাবে তোমাকে এভাবে কথা বলবে? আমার সামনে থাকলে তো ওকে আমি খুন করে পুঁতে দিতাম জাস্ট।"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল, "আচ্ছা তাই দিয়ো।"

আমার রাগ কমল না, বরং বাড়ল, "শোনো।"

আত্রেয়ী বলল, "বলো।"

আমি বললাম, "ওকে ব্লক করো। এখনই।"

আত্রেয়ী অবাক গলায় বলল, "মানে?"

আমি বললাম, "যা বলছি তাই করো। এখনই শুয়োরটাকে ব্লক করো।"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "না করলে?"

আমি বললাম, "না করলে সম্পর্কটা এখানেই শেষ করো।"

আত্রেয়ী আবার চুপ করে থেকে বলল, "একটা বাইরের ছেলের জন্য এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে?"

আমি রাগি গলায় বললাম, "নিলাম। তুমি ওকে ব্লক করবে না করবে না?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?"

আমি বললাম, "বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসছে না তো এখানে। যে তোমার সঙ্গে এভাবে ওপেন ফ্লার্ট করে, সে তোমার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকবে না, ব্যস।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি বুঝতে পারছ তুমি এবার অকারণ জোর খাটাচ্ছ?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ বুঝতে পারছি। দশ মিনিট সময় দিলাম। হয় ছেলেটা থাকবে, নয় আমি থাকব।"

ফোনটা কেটে দিলাম। আমার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছিল।

কয়েক মিনিট পরে ফেসবুক খুলে দেখলাম আত্রেয়ী অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে।

২৮

জীমূতবাহন

আমার এক বন্ধু ছিল পিন্টু। পিন্টু চিরকাল চেষ্টা করে গেল একটা ভালো মেয়ে তোলার। পিন্টু আমার থেকে দু বছরের বড়ো।

আমি যখন নাইনে পড়ি, পিন্টু দেখি একটা লেডিস সাইকেল কিনল।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "ছেলে হয়ে লেডিস সাইকেল কিনলি কেন?"

পিন্টু ভারী চালিয়াতের মতো বলেছিল, "যে মেয়েটা আমাকে পছন্দ করবে, তাকে আমি এই সাইকেলটা চালাতে দেব।"

ক্লাস টুয়েলভ নাগাদ পিন্টু আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে দারুণ সুন্দরী একজন প্রেমিকা জোগাড় করল। সত্যিই সে মেয়েটা সাইকেলটা চালাত।

পিন্টু জীবন লাগিয়ে দিয়েছিল প্রেমের পিছনে। এইচ এস কোনও মতে টপকে পাস কোর্সে বিএ করল।

পিন্টু যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, মেয়েটা তখন এইচ এস। মেয়েটার বাপ সম্বন্ধ নিয়ে এল।

পিন্টুকে কিছু না জানিয়েই মেয়েটা বিয়েতে রাজি হয়ে গেল।

পিন্টু আমাদের কাছে এসে খুব কাঁদল। তারপর ওর মা ওর বউয়ের জন্য যা যা গয়না রেখেছিল, আলমারির চাবি জোগাড় করে সব গয়না একটা প্যাকেটে জড়ো করে মেয়েটাকে বিয়েতে দিয়ে একটা লরির তলায় বডি দিয়ে দিল।

পিন্টুর মা এখনও কাঁদেন, কেন গয়নাগুলো লকারে না রেখে আলমারিতে রেখেছিলেন। আমরা বুঝি না, দুঃখটা ছেলের জন্য বেশি, না গয়নার জন্য।

তবে মরাল অফ দ্য স্টোরি হল, এই ঘটনার পর আমাদের পাড়ার ছেলেদের মধ্যে প্রেমের প্রতি একটা ভাটা এসে গেল। সবথেকে বেশি বোধহয় আমার উপরেই এসেছিল। এই কারণটার জন্যই কোথাও গেলে মেয়ে-টেয়ে দেখতাম না বেশি। গুটিয়ে যেতাম।

এভাবে বিয়ে হয়ে হানিমুনে এসে বউয়ের মুখে এসব কথা আমার প্রেম জিনিসটা থেকেই অনেকটা ভক্তি তুলে দিয়েছিল।

রাতে সুন্দর রান্না হয়েছিল। পেট ভরে খাওয়া হয়ে গেছিল। বাইরে বৃষ্টি কমেনি। বৃষ্টির শব্দে একটা চমৎকার ঘুম হয়। এসব ঘুমকে ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেন কোনও ওস্তাদের আলাপ।

বউ হোম স্টের মহিলার ঘরে গিয়ে বকবক করছিল। আমি ওর জন্য অপেক্ষা করলাম না। কম্বলে সেঁধিয়ে চোখ বন্ধ করতেই ঘুম চলে এল। আকাশ পাতাল কাঁপানো ঘুম। পাহাড়ে যে এত ভালো ঘুম আসে জানতাম না। মনে হয় নাকও ডাকতে শুরু করেছিলাম।

ঘুমটা ভাঙল মাঝরাত নাগাদ। মনে হচ্ছিল কোনও আর্তনাদ শুনছি। ঘুম ভাঙলেও চোখ খুললাম না। তবে বুঝলাম বউ কাতরাচ্ছে, বলছে, "পাবলোদা, শোন না, আমায় ছেড়ে যাস না প্লিজ। শোন না পাবলোদা, আমায় সবাই খারাপ মেয়ে বলবে। তুই পারবি আমায় ছেড়ে থাকতে? আমায় বাঁচা পাবলোদা, শোন না, প্লিজ যাস না, এই পাবলোদা।" চোখ খুললাম। আলো জ্বাললাম।

বউ ছটফট করছে। আমি ডাকলাম, "এই, এই।"

শুনল না।

নিরুপায় হয়ে ওর হাত ধরে নাড়া দিলাম। বউ ধড়মড় করে উঠে বসল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী হল?"
বউ অবাক গলায় বলল, "কী হল? কী হয়েছে?"
আমি বললাম, "পাবলোদা কে? সেই দাদা?"
বউয়ের ঠোঁট দিয়ে কেমন লালা টাইপের পড়ছিল। ও হাতের চেটো দিয়ে সে লালাটা মুছে বলল, "হ্যাঁ। সেই দাদা। মাঝে মাঝে এই দুঃস্বপ্ন দেখি। সব ফিরে আসে।"
আমি বললাম, "ঘুমাও। একবার ঘুম ভেঙে গেছে তো। আর সেসব আসবে না।"
বউ ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুল।
আমি বললাম, "আলো জ্বালানো থাকবে?"
বউ বলল, "থাকুক।"
আমি বললাম, "এসব দুঃস্বপ্ন দ্যাখো যে, কোনও মনোবিদকে দেখিয়েছ কোনও দিন?"
বউ বলল, "না।"
কেমন কুঁকড়ে শুল। আমি বললাম, "কী হল?"
বউ বলল, "ঠান্ডা লাগছে।"
আমি বিয়ের প্রথম রাতের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেয়েটার সঙ্গে এই মেয়েটাকে মেলাতে পারছিলাম না। বললাম, "আর-একটা কম্বল দেব?"
বউ বলল, "দাও।"
আমি আর-একটা কম্বল ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। বউ বলল, "তুমি ঘুমাও। আমার মনে হয় আর ঘুম আসবে না।"
আমি বললাম, "ঠিক আছে। জেগে আছি আমি। তুমি শোও।"
ওইরকম কুঁকড়ে শুয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে দেওয়ালের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করল। কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়ল।
ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝেই শিউরে উঠছিল।
আমি চুপ করে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।
সারারাত।

২৯
অমৃত

ঝড় আসার আগে কিছুই বোঝা যায় না কখন ঝড় আসে, কীভাবে আসে। কিন্তু যখন আসে, তখন সব কিছু ওলটপালট করে দিয়ে চলে যায়।
কারও সঙ্গে অনেকটা মেলামেশা, প্রচুর ভালোবাসার পরেও সে মানুষটাকে চেনা অত সহজ না।
আত্রেয়ীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে হঠাৎ করে এরকম একটা জায়গায় চলে আসতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অথচ সবই তো ঠিক ছিল। ওদের বাড়ি গেলাম, ক্যাবলামি করে চলে এলাম। আমার বাড়ির লোকজনও জেনে গেল, তারপরে হঠাৎ করে এভাবে আমাকে সব জায়গা থেকে ও ব্লক করে দেবে? কী এমন ভুল কথা বলেছিলাম আমি?
আমার রাগটা ঝড়ের মতো আসে, ঝড়ের মতো যায়। যখন ছিল, আমি আত্রেয়ীকে একবারও ফোন করার চেষ্টা করিনি। নিজে বসে বসে গোঁ গোঁ করেছি।
একটু রাতের দিকে যখন রাগ কমল, আত্রেয়ীকে ফোন করলাম। ফোন সুইচড অফ। আমি ওকে একটা মেইল করে লিখলাম, "একটা ফালতু ছেলের জন্য তুমি আমার উপর রাগ করছ?"
মেইল করে পায়চারি করছি। রাত আড়াইটা বাজে প্রায়।

কোনও উত্তর না আসায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতে দেখলাম আত্রেয়ী মেইলের রিপ্লাই করেছে।

"তোমাকে আমি পর ভাবিনি। পর ভাবিনি বলেই হয়তো আমি তোমাকে এভাবে গ্রহণ করেছিলাম, যেভাবে আর কাউকেও কোনও দিন গ্রহণ করার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। সোশ্যাল মিডিয়া আর মানুষের জীবনে তো আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকে অমৃত। আমার উপর কোনও ছেলের দুর্বলতা থাকতেই পারে, কথা হল, আমার কি আছে? আর মজা করতে পারব না? এরপর কি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও তোমার অনুমতি নিতে হবে বলো তো? মেয়ে মাত্রই ক্রীতদাসী ভাবলে কেন তুমি আমাকে? কেন ভেবে নিলে সার্কাসের বাঘের মতো বেত দেখানো মাত্রই তুমি যেভাবে বলবে সেভাবে আমাকে হাঁটাচলা করতে হবে? কেন আমাকে একটা আলাদা মানুষ ভাবতে পারবে না? আমার একটা পৃথক সত্তা থাকতে পারবে না? কাউকে ভালোবাসলে তাকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করতে নেই? পজেসিভনেস আর সন্দেহের মধ্যে মনে হয় কিছু হলেও তফাত থাকে। সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আশা করি তোমার আছে। তুমি ভেবে দেখো, আমি কিন্তু এরকমই। এগোতে চাইলে ভেবে এগিয়ো। আমাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা যদি ভেবে থাকো, তাহলে এখানেই থেমে যেয়ো। তোমার আদরগুলো আমার মনে থাকবে। কিন্তু আমার নিজের স্বাধীনতা যদি কোথাও গিয়ে আটকায়, তাহলে সে সব কিছুকেই স্মৃতিতে রূপান্তরিত করতে আমি দ্বিতীয়বারও ভাবব না। আমার বাবা আমাকে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফ ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে ভাবার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। আমি সেভাবেই চলব। ভালো থেকো। আত্রেয়ী।"

মেইলটা বেশ কয়েকবার পড়লাম। কী করব, বুঝতে পারলাম না।

ফেসবুকের পোস্টটার স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছিলাম। ছেলেটার কমেন্টে আত্রেয়ীর উত্তরগুলো দেখছিলাম। একে স্বাধীনতা বলতে হবে? বেশ কিছুক্ষণ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ফোনটা অফ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বউদি ঘুম ভাঙাল সকাল নটা নাগাদ। দরজা ধাক্কাচ্ছিল।

ঘুমচোখে উঠে দরজা খুললাম। বউদি বলল, "এই তুমি অফিস যাবে না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। যাচ্ছি, রেডি হচ্ছি।"

বউদি বলল, "কী ব্যাপার? তোমার মুখ চোখ বসে আছে কেন? কী হয়েছে?"

আমি গামছা নিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বললাম, "কিছু হয়নি। চিন্তা কোরো না।"

স্নান সেরে জামাকাপড় পরে খাবার টেবিলে গিয়ে দেখলাম বাবা বসে আছে।

আমাকে দেখে বলল, "কী রে, ওদের বাড়িতে কী পরে যাবি কিছু ঠিক করলি?"

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, "একটু প্ল্যান চেঞ্জ হয়েছে বাবা। এই মুহূর্তে দেখা করাটা পিছোবে কদিন।"

বাবা অবাক গলায় বলল, "মানে?"

আমি বললাম, "মানে কিছু না। ওরা থাকবে না। কে একজন মারা যাবে, দিল্লি যাবে বলছিল।"

মিথ্যা করেই বললাম কথাটা।

বাবা বলল, "কী আশ্চর্য! আগে বলবি তো! দে ফোনটা দে, ওর বাবাকে ফোন করি।"

আমি বললাম, "ধুস, ওরা এখন খুব ব্যস্ত। তুমি এসব নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

বাবা আমার চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে? ঝামেলা?"

আমি ভাতে ডাল মেখে ব্যস্ত হয়ে খাওয়া শুরু করে বললাম, "কী যে বলো!"

বাবা চুপ করে বসে থেকে বলল, "ঠিক আছে। তবে আমি তোকে যতদূর চিনি, তুই তুমুল ঝগড়া চালাচ্ছিস এখন। ভুল বললাম?"

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "না। তুমি সবই ঠিক বলো। আমাকে খেতে দাও প্লিজ।"

বাবা আর কিছু বলল না। চুপ করে খেতে লাগল।

হোম স্টে ছেড়ে আমরা রওনা দিলাম যখন তখন সকাল সাড়ে দশটা বাজে। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করেছিল কোন দিকে যাব।

বউ বলে দিল রাবংলার দিকে কোনও হোম স্টেতে নিয়ে যেতে।

ড্রাইভার আর কোনও প্রশ্ন করল না। গাড়ি স্টার্ট দিল।

আগের দিন যে এত বৃষ্টি হয়েছে এখন কিছুই বোঝা সম্ভব না। একদম ঝকঝকে আকাশ। হালকা মেঘ থাকলেও তার থেকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অবশ্য পাহাড়ের আবহাওয়া বোঝা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। আবার কখন মেঘ জড়ো হয়ে বৃষ্টি নামবে কেউ জানে না।

বউ জানলার বাইরে মুখ করে বসে ছিল। বলল, “আমার কোনও জায়গা ছেড়ে আসতে মায়া লাগে। এই যে এই হোম স্টেতে ছিলাম, দু রাত। তাতেও মন খারাপ হয়ে গেল।”

আমি বললাম, “ভালো তো। মায়া থাকা ভালো। আমায় মায়া না করে ডিভোর্সটা দিয়ে দিয়ো, তাহলেই হবে।”

বউ বলল, “দেব। চিন্তা করছ কেন? তোমার কপালে আমার মতো বউ জোটা ডিজাস্টার। ভাবাই যায় না। তোমার জন্য কেমন মেয়ে চাই বলো তো?”

আমি বললাম, “কী রকম?”

বউ বলল, “একদম চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইট। টুকটুকে ফরসা। মাথা ভর্তি ঘোমটা থাকবে। চোখ সব সময় পায়ের দিকে থাকবে। সম্মান ছাড়া কথাই বলবে না। বাংলা সিরিয়ালের আদর্শ গৃহবধূ টাইপ আর কি।”

আমি বললাম, “আমার বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা নেই আর।”

বউ বলল, “তাই নাকি? ওরম মনে হয়। ডিভোর্স পেলেই তুমি ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করতে ছুটবে।”

আমি বললাম, “কেন? এ কথা তোমার মনে হল কেন?”

বউ বলল, “কারণ সব মানুষই বিয়ে করতে চায়। একটা সম্পর্কে জড়াতে চায়। একা থাকতে চাওয়া মানুষেরাও শেষমেশ বিয়ে করেই ফেলে। ব্যতিক্রমী মানুষ যে নেই তা নয়, কিন্তু তার পারসেন্টেজ কম। আর তুমি তো পিওর ম্যারেজ মেটিরিয়াল টাইপ। ভালো হাজব্যান্ড হবে তুমি।”

আমি বললাম, “ও। জেনে খুশি হলাম।”

বউ বলল, “আমি নর্থ পোল হলে তুমি মঙ্গল গ্রহের সাউথ পোল। তোমার সঙ্গে আমার কোনও মিলই নেই।”

আমি বললাম, “তা ঠিক। তুমি মডার্ন মানুষ। বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকে তোমার খারাপ বলে মনে হয় না। ভালো কিন্তু।”

বউ বলল, “খারাপ কেন? মানে সব সম্পর্কই যে সমাজের ডিফাইন করা পথ মেনে হতে হবে এটা কোথায় লেখা আছে? কিছু কিছু সম্পর্ক তো সিলেবাসের বাইরেও হতে পারে।”

আমি বললাম, “একশো বার হতে পারে। আমার তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। কিন্তু সেই সম্পর্ককে লালন পালন করতে গিয়ে যখন অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব পড়ে, তখন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তোমার প্রেমিকের বউ কোনও দোষ করেনি। আমিও কোনও দোষ করিনি। আমাদের দুজনের জীবন জড়ানোর কি কোনও প্রয়োজন ছিল? মেয়েটি জানলে মারাত্মক কষ্ট পাবে।”

বউ জানলার বাইরে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কি আমার গিলটি ফিলিংস জাগানোর কোনও চেষ্টা করছ?”

আমি বললাম, “তা কেন? কথাই আছে পরের ছেলে পরমানন্দ, যত গোল্লায় যাবে তত আনন্দ। তুমি গোল্লায় যাও না, আমার কী দরকার তোমার মধ্যে গিলটি ফিলিংস জাগিয়ে? সমস্যা হল, আমি যে বিয়ে করেছি আমার বাড়ির লোক থেকে শুরু করে পাড়ার লোক সবাই জানে। ডিভোর্সের পরে বিভিন্ন জায়গায়

কথা হবে। সেটা আমার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না করলেও আমার বাবা মার সমস্যা হতেই পারে, তাই না?”

বউ বলল, “তাহলে ডিভোর্স কোরো না। নিজের মতো করে একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করে ফেলো। মিটে গেল।”

আমি হেসে ফেললাম, “সব কিছু খুব সোজা ভাবো তুমি, তাই না? পৃথিবীটা এতই সোজা?”

বউ বলল, “আমরাই তো কঠিন করে ফেলি। ভেবে নিতে চাইলে বানিয়েও নিতে পারবে। কী হয়? তুমি থাকবে তোমার মতো, আমি আমার মতো। রাতে এক ঘরে থাকব। সম্পর্ক দুজনের আলাদা হবে। সবাই জানবে আমরা হ্যাপিলি ম্যারেড কাপল। সিম্পল।”

আমি বললাম, “সিম্পলের দরকার নেই। তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়ো।”

বউ জানলার দিকে মুখ ফেরাল, “তাহলে এত প্যাচাল পাড়ছিলে কেন?”

আমি বললাম, “তুমি ঝগড়া করতে চাইছ নাকি? ঝগড়া কোরো না দয়া করে। ঘুরতে এসেছ, ঘোরো। কিন্তু তোমার বানিয়ে দেওয়া ফরমুলা অনুযায়ী আমি চলব, এটা ভুলেও ভেবো না।”

বউ আর কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

আমি এবার সত্যি অবাক হলাম। এত তাড়াতাড়ি কেউ ঘুমাতে পারে কী করে?

তিস্তার কাছে এসে পড়েছিলাম। এত সুন্দর প্রকৃতি সত্ত্বেও মনটা খিঁচড়ে গেল সকাল সকাল।

কিছু কিছু মানুষের জীবন তারা না চাইতেও এত জটিল হয়ে যায় কী করে?

৩১

কপালকুণ্ডলা

বাবা মা দুজনেই আমার ওপর বেজায় খচে আছে। সাঁপুইরাও বলে গেছে এরকম মেয়ের জীবনেও বিয়ে হবে না। আমি তাতে খুশি হয়েছি বটে কিন্তু রেগেও যে যাইনি এমন না।

বাইরের লোক এসে আমার সম্পর্কে জ্ঞান দেবে এত সাহস পাবে কেন? বাবা কেন তাদের কিছু বলবে না? কই আমাকে যদি কোনও বাইরের লোক আমার বাবা মার সম্পর্কে কিছু বলে আমি তো তাকে ছেড়ে কথা বলব না। কপালে দুঃখ হয়ে যাবে তার। পাগলের মতো দৌড় করাব।

অবশ্য সদুজ্যাঠার কথা আলাদা। তবে সদুজ্যাঠা তো আর বাইরের লোক না। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও কোনও কোনও সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের থেকেও বেশি কিছু হয়। সদুজ্যাঠার সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক।

আমার নবকুমারের সম্পর্কে তো কিছুই জানতে পারতাম না সদুজ্যাঠা না থাকলে।

সদুজ্যাঠাই একদিন বিকেলে নবকুমারের টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। নবকুমার তখন শিঙাড়ায় কামড় দিয়েছে। সদুজ্যাঠা একটা স্যান্ডো আর নীল চেক কালারের লুঙ্গি পরা অবস্থায় ছিল। ভুঁড়িটা এত বড়ো যে স্যান্ডো সেটাকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে না। চকচকে মোটা কালো ভুঁড়ি বেরিয়ে থাকে। সদু জ্যাঠাকে বসতে দেখে নবকুমার শিঙাড়াটা কামড়ানো অবস্থাতেই অবাক হয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে সদুজ্যাঠার দিকে তাকাল।

মাইরি বলছি, সেই সময়টায় নবকুমারকে এত মিষ্টি লাগছিল না, যে, আমার মনে হচ্ছিল ব্যাটার দুই গালে চকাস চকাস করে চুমু খেয়ে নি।

সদুজ্যাঠা বলল, “আপনি এ পাড়ায় নতুন। দেখছি কদিন ধরেই। তা কেমন লাগছে?”

নবকুমার শিঙাড়াটা নামিয়ে রেখে বলল, “ভালো লাগছে। শান্ত পাড়া। ভালো তো।”

সদুজ্যাঠা বলল, “বাড়ি কোথায়?”

নবকুমার আমার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি ক্যাশে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

সে বলল, “মুর্শিদাবাদে।”

সদুজ্যাঠা বলল, “বাহ, নবাবদের জায়গা। তা কী করা হয়?”

আমার হাসি পাচ্ছিল। সদুজ্যাঠা কীরকম সিবিআইয়ের মতো জেরা শুরু করেছে।

নবকুমার অবশ্য বেশ ভদ্রলোক। সদুজ্যাঠার প্রশ্ন শুনে জবাব দিল, “এই তো, এই লোকাল কলেজে ক্লার্কের কাজ পেয়েছি।”

সদুজ্যাঠা বলল, “বেশ। বাড়িতে কে কে আছে?”

নবকুমার বলল, “বাবা মা।”

সদুজ্যাঠা বলল, “ও। এক ছেলে? তা প্রেম করো?”

নবকুমার সদুজ্যাঠার কথায় ঘাবড়ে গিয়ে বিষম খেয়ে বলল, “না না, সে কী! ওসব করার সময় কোথায়?”

সদুজ্যাঠা আমার দিকে তাকিয়ে একবার হেসেই গম্ভীর হয়ে নবকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল, “ভালো ভালো। রসমালাই খাবে? আমি বানিয়েছি আজ। স্পেশাল।”

নবকুমার আবার ক্যাবলা চোখে তাকাল।

সদুজ্যাঠা বলল, “খাও খাও। টাকা দিতে হবে না। আমি বানিয়েছি। এই কেতো, এখানে একটা ভাঁড় দিয়ে যা তো। খেয়ে দ্যাখো, এসব জিনিস সবাই পারে না।”

কার্ত্তিক একটা রসমালাইয়ের ভাঁড় দিয়ে গেল। নবকুমার ভালো মানুষের মতো সে ভাঁড়টা শেষ করে হেসে বলল, “খুব ভালো হয়েছে। সত্যিই আপনার রান্নার হাত ভীষণ ভালো।”

সদুজ্যাঠা বলল, “রান্নার হাত না। মিষ্টির হাত। রান্নার হাত ওর ভালো।”

সদুজ্যাঠা আঙুল তুলে আমার দিকে দেখাল।

নবকুমার আমার দিকে তাকিয়েই জোরে জোরে কাশতে শুরু করল।

সদুজ্যাঠা জলের গ্লাস নবকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “যা চিংড়ি মাছের মালাইকারি করবে না, ভাবতে পারবে না। অসাধারণ হাত। অবশ্য চিংড়ি মাছের মালাইকারি করলেই যে মোচার ঘণ্ট করতে পারবে না, এমন তো নয়। সেও আমাদের মেয়ে অসাধারণ রান্না করে। আর খাসির মাংসের তো তুলনাই হয় না। ওরে ও কপাল, কী যেন হাঁড়িতে করিস অল্প আঁচে একটু একটু করে, কী নাম যেন?”

আমার সদুজ্যাঠার ওপর এমন রাগ হল না! ঈশ, এভাবে কেউ বলে? যদি বুঝে ফেলে? আমি রাগি গলায় বললাম, “আমি জানি না। আর আমি রাঁধতেও পারি না। কেন অকারণ বাড়িয়ে বলো?”

নবকুমার কেমন ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি চলি, হ্যাঁ?”

বলে ক্যাশে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে চেঞ্জ না নিয়েই দৌড় মারল। সদুজ্যাঠা হাসতে লাগল।

আমি রাগি গলায় বললাম, “এটা কী হল?”

সদুজ্যাঠা বলল, “তোর লাইন ক্লিয়ার করলাম। এবার তো তোকে নিয়ে ভাববে রে পাগলি।”

আমি বললাম, “তোমায় মিথ্যে করে বলতে কে বলেছিল? আমি ভালো রাঁধি?”

সদুজ্যাঠা বলল, “আমি শিখিয়ে দেব তো। রাঁধা তো আর্ট রে! যত শিখবি, যত মনের মানুষকে রেঁধে খাওয়াবি, দেখবি তত ভালো লাগছে।”

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বললাম, “তুমি হেবি খারাপ। আমাকে চমকে দিলে।”

সদুজ্যাঠা দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

৩২

অমৃত

সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

ভোর হতেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শহরটার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ থাকে। রাত হলে একরকম।

ভোর হলে আর-একরকম।

কর্পোরেশনের গাড়ি বেরিয়েছে। পুলিশ টহলদারি গাড়ি ক্লান্ত হয়ে ফিরছে। ফাঁকা বাসগুলো রাস্তায় বেরিয়েছে কমসংখ্যক যাত্রী নিয়ে। অবশ্য পেপারওয়ালারা ভীষণ ব্যস্ত। তারা হুড়মুড়িয়ে সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছে।

আমার এত সব কিছু দেখার সময় ছিল না। আমি বাইক চালিয়েছি মনের সুখে। আত্রেয়ীদের বাড়ির সামনে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম তখন সাড়ে পাঁচটা।

বাইরের গেট বন্ধ।

আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে কলিং বেল বাজালাম।

বেশ খানিকক্ষণ পরে আত্রেয়ীর বাবা ঘুমচোখে দরজা খুলে আমাকে দেখে বললেন, "এত সকালে? কী ব্যাপার?"

আমি বললাম, "ইয়ে, কাকু, না জেঠু, মানে বুঝতে পারছি না কী বলব, আত্রেয়ী আছে?"

আত্রেয়ীর বাবা দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ আছে তো। এসো ভিতরে এসে বসো। কী হয়েছে? এত সকালে?"

আমি মাথা চুলকে বললাম, "তুমুল ঝগড়া। মার মার কাট কাট যাকে বলে।"

আত্রেয়ীর বাবা ঘুমচোখেই হো হো করে হেসে ফেলে বললেন, "মার মার কাট কাট? আচ্ছা, দাঁড়াও। আমি চা বসাই। দুজনে একটু গল্প করি, তারপর নাহয় মুনাইকে ডেকে দিচ্ছি। তোমার মার মার কাট কাট ঝগড়াটা আমার ভালো লেগেছে। একটু বলবে নাকি আমাকে?"

আমি সোফার উপর বসে পড়ে বললাম, "কিছুই না, মানে আমার মাথাটা হঠাৎ করে গরম হয়ে যায় তো। শনি খুব নিচে।"

আত্রেয়ীর বাবা কৌতুকপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরে বাবা, এসব জ্যোতিষ চর্চাও করা হয় নাকি?"

আমি বললাম, "না না, শনি নিচে সেটা দেখা তো খুব সোজা। এই দেখুন না আমার কেনো আঙুলটার যেখান থেকে উৎপত্তি, তার পাশের আঙুলটার উৎপত্তিস্থল থেকে কত নিচুতে। আমার এক বন্ধু জ্যোতিষচর্চা করে। ওর থেকেই শিখেছিলাম। ও আমাকে বলেছিল আমার শনি খুব নিচে। কী সব রত্ন দিতে চেয়েছিল, আমিই নিইনি।"

আত্রেয়ীর বাবা বললেন, "ভালো করেছ নাওনি। মানুষের ভাগ্য মানুষের নিজের হাতেই থাকে। তোমার শনি তোমাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাগটাও। মুনাইয়েরও রাগ মারাত্মক। তোমারও। তা এত রাগ থাকা কি ভালো?"

আমি বললাম, "জানি তো ভালো না। চেষ্টা করি সামলাতে।"

আত্রেয়ীর বাবা বললেন, "মানুষের সবথেকে খারাপ রিপু রাগ। বাকিগুলোও বেকায়দায় ফেলে বটে, কিন্তু রাগ এমন একটা বস্তু যা সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষকে অমানুষ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। চেষ্টা কোরো এ রিপু দমন করতে। আমি মুনাইকে ডাকছি, অপেক্ষা করো।"

ভদ্রলোক উঠে ভিতরের ঘরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে আত্রেয়ী এল। আমাকে দেখে কঠিন গলায় বলল, "তুমি এত ভোরে?"

আমি উঠে আত্রেয়ীর হাত ধরে বললাম, "আমায় ক্ষমা করো প্লিজ। বিরাট ভুল হয়ে গেছে। তুমি যার খুশি প্রোফাইলে লাভ রিয়্যাক্ট দাও, যে তোমার প্রোফাইলে যা খুশি কমেন্ট করুক, আমি তোমাকে কিছু বলব না। প্লিজ। ক্ষমা করে দাও।"

আত্রেয়ী সরে গিয়ে বলল, “বাবা আছে, কী করছ? আমি ছেলেটাকে ব্লক করে দেব। খুশি?”

আমি বললাম, “করতে হবে না। আমারই ভুল। আমি সারারাত ধরে ভেবেছি। জ্যোতি বসুর পরে আমার এই রাগটাই দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ভুল। মাইরি বলছি, আর হবে না।”

আত্রেয়ী হেসে ফেলে বলল, “ঠিক আছে। অসভ্য ছেলে। তোমার জন্য সারারাত ঘুম হল না আমার।”

আমি বললাম, “আমারও তো হয়নি। চলো তোমার ঘরে গিয়ে ঘুমাই।”

আত্রেয়ী চোখ বড়ো করে বলল, “কী শুরু করেছ? বাবা আছে দেখোনি?”

আমি জিভ কেটে বললাম, “ঠিক ঠিক। আসলে আবেগ কন্ট্রোল করতে পারছি না আর কী।”

আত্রেয়ী বলল, “সোফায় বসো। আমি চা করছি।”

আত্রেয়ীর বাবা এসে বললেন, “লুচি ভাজতে বলে দিস মা। ছেলেটা এত সকালে এসেছে, আমাদের বাড়ির স্পেশাল লুচি ছোলার ডাল খেয়ে যাক।”

আমি ক্যাবলার মতো হাসলাম।

৩৩

অনিরুদ্ধ

ঋতুজা কোনও মেসেজ করছে না চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল।

আমার মাথা কাজ করছে না। ঋতুজা মেসেজ না করলে আমার মাথা কাজ করে না।

মেসেজ করি রোজই। কিন্তু এবারে প্রথমে দেখলাম হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজগুলো সিন হচ্ছে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফোনটা কেটে গেছিল। প্রতি রাতেই ও বলে, তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমার মাথার ঘন চুল ওর নাকি ভীষণ পছন্দ। যেদিন ওর বাড়ি গেছিলাম, আমার মাথায় অনেকক্ষণ বিলি কেটে দিয়েছিল। এরপর থেকে রাতে ফোন করলে বলবে, তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।

এবারে ফোন কেটে যাবার পর আর কিছুতেই কানেক্ট করতে পারছি না। পাহাড়ে গেছে, নেটওয়ার্ক ট্রাবল হতে পারে ভেবে প্রথমে চেষ্টা করিনি, পরে অধৈর্য হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে কথা না বলে এতক্ষণ থাকার মেয়ে তো ঋতুজা নয়।

ওর বাড়ির ল্যান্ডলাইন নাম্বার আমার কাছে ছিল। সকাল হতেই সেখানে ফোন করলাম। ওর বাবা ধরলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, “হ্যালো।”

আমাকে চেনেন ওর বাবা। আমি বললাম, “কাকাবাবু, আমি অনিরুদ্ধ বলছি, ঋতুজা আছে?”

ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় জবাব এল, “না, ও দার্জিলিং গেছে তো। তা ছাড়া ও এখানে থাকেও না এখন।”

আমি বললাম, “জানি তো। আচ্ছা, ওর হাজব্যান্ডের নাম্বারটা দেওয়া যাবে, একটু আর্জেন্ট ছিল আর কি।”

ওর বাবা বললেন, “আমার কাছে নেই। বিকেলের দিকে ফোন কোরো। যদি পাওয়া যায়, আমি তোমায় দিয়ে দেব।”

আমি “আচ্ছা” বলে ফোন রাখলাম। হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল।

ঠিক করে স্নান না করে অফিস গেলাম।

প্রতাপ দেখেই বলল, “কী রে ভাই, আজ এরকম ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থা কেন?”

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে বললাম, “সমস্যা হয়ে গেছে। ঋতুজাকে পাচ্ছি না।”

প্রতাপ বলল, “সে তো বিয়ে করেছে। এখন না পেলেই বা কী করবি? বরের সঙ্গে ফুর্তি মারছে দেখ গে।”

আমি কড়া চোখে প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বললাম, “ফালতু বকিস না। বরের সঙ্গে ফুর্তি মারবে কী, ওই বানচোদকে ও ছুঁতে পর্যন্ত দেবে না এটা আমি লিখে দিতে পারি।”

প্রতাপ বলল, “বেশ তো। তোর তো বউ আছে। ওর সঙ্গে থাক গিয়ে।”

আমি কয়েক সেকেন্ড প্রতাপের দিকে তাকিয়ে বললাম, “দে সে, প্রেমটা ড্রিবলিং, বিয়েটা গোল। বল জালে শেষ অবধি না জড়ালেও, কিছু ড্রিবলিং চিরকাল মনে থেকে যায়*।” (*লেখা ঋণ— বাউন্ডুলে)

প্রতাপ হেসে ফেলল, “ঋতুজার বর গোল দিয়ে দিল তো। এবার?”

আমি প্রতাপের দিকে স্থির চোখে তাকালাম। পেপারওয়েটটা হাতে ছিল। ইচ্ছা করছিল প্রবল জোরে প্রতাপের দিকে ছুড়ে মারি। অতি কষ্টে আটকে বললাম, “তোকে আমি একবার বলেছি, ও আমাকে ছাড়া কাউকে ছুঁতে দেবে না।”

প্রতাপ জলের গ্লাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ওকে, কুল, কুল। মাথা ঠান্ডা কর প্লিজ। আমি কথা দিচ্ছি, এটা নিয়ে তোকে আমি রাগাব না। শোন, বল, আমাকে বল আমি কী করব।”

আমি বললাম, “ওকে কনভিন্স করা। সব কিছু ছেড়ে আমরা দুজন কোথাও পালিয়ে যাব। সম্ভব হলে স্টেটসে। কোথাও একটা হলেই হল। আমার বউ দরকার নেই, বউকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ওকে কনভিন্স কর, ও বরকে ছেড়ে চলে আসুক।”

প্রতাপ মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “ভাই আমার জেল হবে। তুই খেপেছিস?”

আমি বললাম, “তুই না বললে তোকে খুনের দায়ে আমার জেল হবে এটা মনে রাখিস। আমার জন্য তোকে এটা করতে হবে।”

প্রতাপ বলল, “ওকে, কুল। মাথা ঠান্ডা কর। আমি বলব। কথা দিলাম। দে ওর নাম্বার দে।”

আমি বললাম, “তোকে তো বললাম, ওকে ফোনে পাচ্ছি না। বিকেলে ওর বরের নাম্বার পেতে পারি, ওকে ফোন করে নিস।”

প্রতাপ হতভম্ব গলায় বলল, “ওর বরকে ফোন করে আমি ওকে চেয়ে এসব বলব? তুই পাগল হয়ে গেছিস? কী সব বলছিস, এ কী রে?”

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, আমার ফোনটা বেজে উঠল। ভাবলাম ঋতুজা ফোন করছে, লাফিয়ে উঠে ধরতে গিয়ে দেখি অনিন্দিতা ফোন করছে।

আমি ব্যাজার মুখে প্রতাপের দিকে একবার তাকিয়ে ফোনটা রিসিভ করলাম, “হ্যালো।”

অনিন্দিতা বলল, “কী ব্যাপার বলো তো, কাল প্রায় রাত তিনটে অবধি হোয়াটসঅ্যাপে তোমাকে লাস্ট সিন দেখাচ্ছিল। কী করছিলে?”

আমি বললাম, “কিছু না। হবে কোনও সমস্যা। কেন, কী হয়েছে?”

অনিন্দিতা খুশি খুশি গলায় বলল, “একটা সারপ্রাইজ আছে।”

আমি বললাম, “কী?”

অনিন্দিতা বলল, “প্রেগনেন্সি কিট পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে।”

আমি হতভম্ব মুখে ফোনটা হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

৩৪

জীমূতবাহন

পাহাড়ের সমস্যা হল কখন যে বৃষ্টি নামবে, আর কখন যে রোদ উঠবে কেউ বলতে পারে না।

হোম স্টেতে যেরকম ভালো আবহাওয়া পেয়ে বেরিয়েছিলাম, সিকিমে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা উবে গেল। পরিবর্তে শুরু হল আবার গতকালের মতো বৃষ্টি। গাড়িটা যাও বা চলছিল ধীরে সুস্থে, খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল রাস্তায় আবার ধ্বস নেমে গেছে। গাড়ির লাইন লেগে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

বউ ঘুমাচ্ছিল। উঠে পড়ে বলল, “বাহ, ধ্বস নেমেছে? সুন্দর।”

আমি রাগি গলায় বললাম, “সুন্দরের কী আছে? পাহাড়ে ধ্বস নামবে এটা সুন্দর? রাস্তা আটকে গেল, সেটা ভাল্লাগছে?”

বউ বলল, “তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? পাহাড় মানেই তো আনসার্টেনিটি। এরকম তো হবারই ছিল। এত ভাবার কী আছে?”

আমি বললাম, “ভাবার আছে, কারণ আমার এত তাড়াতাড়ি মরে যাবার কোনও ইচ্ছা নেই। কোনও ভাবে যদি আমাদের গাড়ির ওপরেই ধ্বস নেমে যায়, তাহলে কী হবে?”

বউ বলল, “মরে যাবে! আবার কী হবে? বেঁচে থেকে কী এমন লাভ আছে?”

আমি বললাম, “সে জেনে তুমি কী করবে? তোমার মতো উদ্দেশ্যহীন লাইফ লিড করি না তো।”

বউ বলল, “তাই বুঝি? তা কী এমন উদ্দেশ্য আছে তোমার জীবনে? কী হবে তুমি? মুকেশ আম্বানি না শাহরুখ খান?”

আমার মাথায় রক্ত চড়ছিল। এরকম করে কেউ তর্ক করলে আমার খুব রাগ হয়ে যায়। আমি বললাম, “যাই হই, তোমাকে বলতে যাব কেন? তুমি যে চুলোয় যাও, বাঁচো, মরো, মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসে থাকো, সেটা তোমার সমস্যা, তুমি বুঝবে। আমি আমার মতো করে থাকব। সেটাই ভালো।”

বউ বলল, “আচ্ছা। তাই হবে। তুমি তোমার মতো করেই থেকো। এবার একটা কাজ করতে পারো। ঘুমিয়ে পড়ো বরং।”

আমি বললাম, “ঘুমিয়ে পড়ব? এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি ঘুমিয়ে পড়ব? আমি কি তোমার মতো কুম্ভকর্ণ?”

বউ হেসে ফেলল। বলল, “তোমার হেড অফিস হেবি গরম। এত রাগ ভালো না। প্রেশার আছে তোমার?”

আমি বললাম, “জানি না। থাকলে থাকবে। তোমার জেনে কী কাজ?”

বউ বলল, “তা ঠিক। আচ্ছা। আমি আবার ঘুমাই তবে।”

বলে আমাকে অবাক করে চোখ বন্ধ করল, আর ঘুমিয়ে তলিয়ে গেল।

আমি কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে যখন বুঝলাম ও সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি গাড়ি থেকে নামলাম। বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। রাস্তার অবস্থা সঙ্গিন। একটা মেশিন এসেছে, রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে। গাড়িতে এসে বসলাম। আধঘণ্টা পরে রাস্তা ছাড়ল।

রাবংলায় কোন এক গ্রামে থাকার কথা ছিল, কিন্তু আসল জায়গায় দেখা গেল ড্রাইভার কোনও হোম স্টে না জোগাড় করে সরাসরি একটা হোটেলে নিয়ে তুলল।

বউ রাগারাগি করছিল বটে, কিন্তু সে ছোকরা নেপালি ভাষায় কী সব কিচকিচ করে বলে কেটে পড়ল।

বউ বলল, “ডিসগাস্টিং। আমার একদম এরকম লোকালিটির মধ্যে থাকতে ভাল্লাগে না। অফবিট জায়গা খুঁজতে বেরোলাম, কোনও কাজ হল না। হুস।”

আমি পাড়াগেঁয়ে গরিব আদমি। এই সব “অফবিট” শব্দ-টব্দ ফেসবুকেই শুনেছি, থুড়ি দেখেছি। চিরকাল ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস। বউয়ের কথা শুনে বললাম, “তাহলে কি বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ব?”

বউ রাগি গলায় বলল, “নাহ। আমার ঘুম পেয়েছে। খিদেও পেয়েছে। কিন্তু ড্রাইভারটাকে আমি ছাড়ব না। ওর কপালে দুঃখ আছে।”

আমি চুপচাপ ভালো মানুষের মতো হোটেলের রুমে ঢুকে পড়লাম। সুন্দর গিজার আছে। গরম জলে স্নান সেরে খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম যখন, তখন বেলা গড়িয়েছে। সাড়ে চারটে বাজে। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আবার হালকা রোদ উঠেছে।

বউ বলল, “তুমি শুয়ে থাকবে? বিকেলে বেরোবে না?”

আমি বললাম, “তুমি বেরোবে? তাহলে বেরোব।”

বউ বলল, “আমার একটু লোকাল বাজারে যেতে হবে। কেনার আছে কিছু।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে, তৈরি হয়ে নাও।”

বউ বলল, “মদ খাব আজ। হুইস্কি কিনো। তুমি হুইস্কি খাও?”

আমি বললাম, “খাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে খাব না। তুমি খেয়ো।”

বউ রাগি গলায় বলল, “কেন, খাবে না কেন? কী হয়েছে?”

আমি বললাম, “এমনি, ইচ্ছা নেই খাবার তাই খাব না। তোমায় কিনে দেব, খেয়ো যত খুশি।”

বউ জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, “যা ইচ্ছে করো। তৈরি হও। বেরোব।”

বেরোলাম কিছুক্ষণ পরেই।

ফোনটা যখন এল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। বউ একটা দোকানে ঢুকে কীসব কিনছিল। আমার ফোনটা বেজে উঠল। দেখি আননোন নাম্বার। ধরলাম, “হ্যালো।”

“হ্যালো, ঋতুজা আছে? অ্যাকচুয়ালি ওর ফোনটা পাচ্ছি না।”

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বললাম, “আপনি?”

“আমি অনিরুদ্ধ। ঋতু মনে হয় আপনাকে আমার কথা বলেছে, তাই না ভাই?”

আমি আবার একটু চুপ করে থেকে বললাম, “ও, আপনিই সেই মাতৃসম্ভোগকারী বঞ্চিত শুয়োর?”

ওপাশ এবার একটু চুপ থেকে বলল, “মানে? কী বলতে চাইছেন?”

আমি চোখ বন্ধ করে যত খিস্তি জানি সব মনে করলাম। তারপর বলতে শুরু করলাম। কয়েক সেকেন্ড পরে ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল।

বউ দোকান থেকে বেরিয়ে দেখল আমি থরথর করে কাঁপছি।

অবাক গলায় বলল, “কী হয়েছে তোমার? মৃগী আছে নাকি?”

আমি ধাতস্থ হয়ে বললাম, “না, এমনি। চলো। যাওয়া যাক।”

৩৫

সন্ধ্যা নেমেছে। তার সঙ্গে নেমেছে তুমুল বৃষ্টি।

হোটেলের বয় জানাল রাবংলার বৃষ্টি এমনই। যখন হবে সারাক্ষণ ধরে হতেই থাকবে।

বৃষ্টির শব্দটা দারুণ লাগছিল। গরম গরম চিকেন পকোড়া আর কফি দিয়ে গেছে। আমি কফি খাচ্ছি। বউ কম্বলের তলায় শুয়ে টিভি দেখছে।

ফোনে মেসেজে ভরে যাচ্ছে। অনিরুদ্ধ অজস্র থ্রেট দিয়ে চলেছে। আমি দেখছি।

ফোনটার ব্যাপারে বউকে কিছুই বলিনি। চুপচাপ শপিং সেরে চলে এসেছি।

কীসব কিনল।

আমার মনটা একটু মদ মদ করছিল বটে এই ওয়েদারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাব না বলেই ঠিক করলাম।

এরকম নিঃস্পৃহ বেড়ানো আমার জীবনেও হয়নি। কোথাও গেলে বাড়ির সবাই মিলে বেড়াতে যেতাম ছোটোবেলায়। কাকার ছেলেরা, জেঠুর ছেলেরা মিলে লাফঝাঁপ দিয়ে সবাইকে অস্থির করে তুলতাম।

একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকার কথা কোনও দিন ভাবিওনি।

নিজেকে কেমন সাইকো মনে হচ্ছে। পরিস্থিতি সুস্থ মানুষকে সাইকো বানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমার নিজেকে তেমন মনে হচ্ছে।

অনিরুদ্ধ ফোন করা শুরু করল।

বউ বলল, “কে ফোন করছে?”

আমি বললাম, “অফিস থেকে ফোন আসছে। ধরব না ধুস।”

বউ বলল, "তুমি এরকম কাজ থেকে পালিয়ে থাকো নাকি?"
আমি বললাম, "কাজের মধ্যেই তো থাকি সারাদিন। এখন একটু পালিয়ে থাকি নাহয়।"
বউ বলল, "ও। আর-একটা কফি বলো। খুব ভালো বানিয়েছে।"
আমি রুম সার্ভিসে ফোন করলাম।
চুপ করে বসে টিভি দেখতে দেখতে মাথায় একটা বুদ্ধি এল।
বউকে বললাম, "তুমি ফেসবুকে আছ?"
বউ বলল, "আছি তো। কেন? অ্যাড করবে?"
আমি বললাম, "না না, এমনি। কোনও কারণ নেই।"
বউ বলল, "অ্যাড করলে করো, কিছু লিখো না। লোকজনকে জানাবার প্রয়োজন নেই। আমি কাউকে কিছু জানাইনি।"
আমি বললাম, "তুমি রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট না করলে লিখবই বা কী করে? তা ছাড়া অ্যাড করছি না। এমনিই মনে হল হঠাৎ করে আর কি।"
বউ বলল, "ওহ। তাহলে ঠিক আছে।"
সেট ম্যাক্সে পঞ্চান্ন কোটি বারের মতো সূর্যবংশম দিয়েছে। বউ সেটা দেখতে লাগল।
আমি আর কোনও কথা না বলে ফোন ঘেঁটে বউয়ের প্রোফাইল বের করলাম।
হুঁ, এই তো, অনিরুদ্ধ আছে!
কমেন্ট করেছে একটা ছবিতে।
অনিরুদ্ধর প্রোফাইল খুললাম।
বউয়ের সঙ্গে ফটো দিয়েছে, এবং কী সর্বনাশ! এ তো অনিন্দিতা! আমাদের সঙ্গে পড়ত একই কলেজে, একই ক্লাসে!
হাসি পেয়ে গেল।
পৃথিবী গোল।
অনিন্দিতা প্রি-ওয়েডিং থেকে শুরু করে গাদাগুচ্ছের ফটো দিয়েছে। সব বসে বসে দেখতে লাগলাম।
কী মনে হতে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টও পাঠিয়ে দিলাম।
মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেল। অনিন্দিতা অনলাইনই ছিল।
অ্যাকসেপ্ট করেই পিং করল, "কী রে, অ্যাদ্দিন পরে মনে পড়ল?"
আমি বললাম, "একদম। কেমন আছিস রে? বিয়ে করেছিস দেখলাম!"
ফোনে অনিরুদ্ধর মেসেজ এল একটা, "আমার ঋতুজাকে যদি কিছু করেছিস তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে।"
অনিন্দিতা আমার মেসেজের রিপ্লাই করল, "এই তো। কদিন হল। তুই বিয়ে করলি?"
ঘরের কলিং বেল বাজল। কফি দিতে এসেছে।
বউ কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, "উফ, এসব জায়গায় কফি খেতে হেবি লাগে। একটা সিগারেট ধরাই?"
আমি বললাম, "ঘর ধোঁয়ায় ভরে যাবে। কী দরকার?"
বউ বলল, "তাও ঠিক। ঘুমটা নষ্ট হবে। থাক।"
আমি ফোনের দিকে তাকালাম।
অনিন্দিতা আমার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে একটা জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়েছে।
আমি লিখলাম, "বিয়ে করেছি রে। তবে যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছি, সে লোকটা একটা সদ্যবিবাহিত লোকের প্রেমিকা। খুব জটিল।"

অনিন্দিতা চোখ বড়ো বড়ো করা স্মাইলি পাঠিয়ে লিখল, "ওরে বাবা। সে কী রে! তুই মানছিস কেন? লোকটাকে ধরে ক্যালা।"

আমি হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখলাম, "ধুস। সে তো ভুবনেশ্বরে বসে আছে। তাকে পাব কী করে?"

অনিন্দিতা লিখল, "ভুবনেশ্বরে? কী নাম রে? আমার বরও আছে। নামটা বল তো। দেখি বরকে বলে। চেনে নাকি!"

আমি চুপ করে বউয়ের দিকে তাকালাম। ফোনটা টেবিলের ওপর রেখে সোফায় পা তুলে বসলাম। অমিতাভ বচ্চন বিষ ভরা পায়েস খাচ্ছেন। ভীষণ ইমোশনাল সিন।

ফোনে মেসেঞ্জার টোন বাজল। হাতে নিয়ে দেখলাম অনিন্দিতা লিখেছে, "কী রে মড়া, কোথায় গেলি?"

আমি অনিরুদ্ধর ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ওর ডিপিটা অনিন্দিতাকে পাঠিয়ে বললাম, "এই লোকটা।"

ওপাশে মেসেজটা সিন হল। আর কোনও রিপ্লাই এল না।

৩৬

আত্রেয়ী

কোনও কোনও দিন আসে, যে দিনগুলো টিভি সিরিজের সময় নষ্ট করার মতো সময় নিয়ে আসে। আমরা ঘুম থেকে উঠি, খাই দাই, স্কুল কলেজ অফিস যাই, আবার ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আর কোনও কোনও দিন আসে, যে দিনগুলো ঘটনাবহুল হয়। ওই একদিনেই এমন সব কাণ্ড ঘটে, যা আমাদের গোটা জীবন, চিন্তাভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়।

এরকম সুন্দর সকালও তো আমার জীবনে খুব একটা আসেনি।

অমৃত যখন অপরাধী অপরাধী মুখ করে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, বারবার ক্ষমা চাইছিল, আমার মনে হচ্ছিল ওর মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দি। বাবা না থাকলে সারা মুখে চুমু খেতাম। এমন পাগলামি প্রেম তো কোনও দিন করিনি। প্রেম শব্দটা সম্পর্কেই একটা ভীতি কাজ করে এসেছিল চিরকাল। ভেবেছিলাম কোনও দিন বিয়ে করব না। বিয়ে সম্পর্কেও আমার ভীতি আছে।

অমৃত যখন অমন করে আমার ওপর হম্বিতম্বি করছিল, খুব রাগ হয়েছিল। শুতে পারছিলাম না। ছটফট করছিলাম। গোটা দিনটা তেতো হয়ে গেছিল। ক্লাস নিতে নিতে কখন যে দু চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জলের ধারা নেমে যাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম না। ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু কেউই কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিল না।

সম্পর্ক তো এভাবে হয় না। একজন মালিক হবে, আর একজন কুকুর। পায়ের তলায় রেখে দেবে তাকে। সে কুকুর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। মালিক যেভাবে বলবে, যেমনভাবে চলতে বলবে, তেমনভাবে চলবে।

এরকম সম্পর্ক থেকেই তো আমি বরাবর ভয় পেয়ে এসেছি। তবে অমৃতও সেরকম হয়ে গেল। যতবার ভেবেছি, কান্না পেয়েছে। চোখ মুখ শব্দ করে টিচার্স রুমে বসে ছিলাম।

আদৃতার প্রগলভ কথা ভালো লাগেনি।

বরং অনিন্দিতাদি খানিকটা বুঝেছিল আমার মুড ঠিক নেই। কখন যেন পাশে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, "কী রে পাগলি, কী হয়েছে?"

কেউ এভাবে বললে ঠিক থাকা যায় না। আমি হঠাৎ করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

অনিন্দিতাদিও আর জানতে চায়নি কী হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বলেছে, "মন খারাপ করিস না।"

আজ সকালে অমৃত স্কুলে নামিয়ে দিয়ে গেল। ওকে জড়িয়ে ধরে পিঠে মুখ গুঁজে বসে ছিলাম। অমৃত অপরাধীর মতো মুখ করে ছিল। তবু খুব কষ্ট হচ্ছিল।

ভালোবাসলে বুঝি এমনই হয়। এত নির্ভরতা কোত্থেকে আসে কে জানে!

স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় অমৃত বলল, "রাস্তা পার হবে সাবধানে।"

তখনও আমার কান্না পাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সেসব সামলে বলেছি, "তুমি বাইক চালিয়ো সাবধানে। আর রাগটা কমাও। এই বয়সে হাই প্রেশার হলে ভালো লাগবে?"

অমৃত ফিক করে হেসে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যতক্ষণ না আমি রাস্তা পার হলাম তারপর। স্কুলের গেট দিয়ে ঢোকার আগে আমি দাঁড়িয়ে ইশারা করলাম, "যাও।"

অমৃত বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ ওর বাইকটা দেখা যায়, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝগড়া হবার পর মিল হলে বুঝি এমন ভাবেই ভালোবাসা বাড়ে?

ঘোরের মধ্যে ছিলাম। সেটা ভাঙল টিচার্স রুমে এসে। লাফাতে লাফাতে এসে অনিন্দিতাদিকে জড়িয়ে ধরতে যাব, দেখলাম অনিন্দিতাদি কেমন পাথরের মতো বসে আছে। রোজ কী সুন্দর করে চুল বেঁধে আসে, আজ আসেনি। চোখে মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। কাল পর্যন্ত কত সুন্দর করে সিঁদুর পরে এসেছিল, আজ সিঁদুরটাও পরেনি। বাণীদি খাতা দেখছিলেন। আদৃতা আসেনি তখনও। অন্য কোনও দিদিও আসেননি।

আমি অনিন্দিতাদিকে বললাম, "এই, কী হয়েছে? কোনও ব্যাড নিউজ?"

অনিন্দিতাদি ম্লান মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "না তো। কিছু হয়নি। তুই কেমন আছিস বল? ঠিক আছিস?"

আমি হেসে বললাম, "হ্যাঁ ঠিক আছি। তুমি বলো না আমায় কী হয়েছে। কেমন লাগছে। আচ্ছা এসো।"

অনিন্দিতাদিকে নিয়ে টিচার্স রুম থেকে বেরোলাম।

ক্লাস টেনের পরীক্ষা চলছিল বলে ছুটি ছিল। টেন এ-তে ফাঁকা ক্লাস রুমে নিয়ে গিয়ে বসালাম।

অনিন্দিতাদি বসেই কেঁদে ফেলল। জোরে জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আমি অনিন্দিতাদির হাত ধরে বসে রইলাম।

কান্না থামতে বলল, "আত্রেয়ী, আমার সব শেষ হয়ে গেল রে।"

আমি বললাম, "কেন গো? কী হয়েছে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি কনসিভ করেছি কালকে জানতে পারলাম।"

আমি খুশি হয়ে বললাম, "সে তো ভারী খুশির কথা।"

অনিন্দিতাদি বলল, "আর কালকেই জানতে পারলাম আমার বর আমাকে চিট করছে দিনের পর দিন।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "মানে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "বিয়ের আগে থেকে ওর একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। মেয়েটা ওকে রিজেক্ট করায় আমাকে বিয়ে করে। বিয়ের পরে মেয়েটার মনে হয়েছিল ও ভুল করেছে। অনিরুদ্ধ ওর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে যোগাযোগ করে চলেছে। ওদের মধ্যে ফিজিক্যাল রিলেশনও আছে সম্ভবত।"

আমি বললাম, "ধুস। এগুলো মিথ্যেও তো হতে পারে। লোকমুখে শুনেছ? অন্যের কথা শুনে এসব বলতে নেই।"

অনিন্দিতাদি বলল, "না রে। প্রমাণ আছে। আমি কী করি বল তো? বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলব?"

অনিন্দিতাদি কেমন অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি কী বলব বুঝেই উঠতে পারলাম না।

৩৭

মানুষ সম্পর্কে বাঁচে। সম্পর্ক যতদিন না কারও সঙ্গে তৈরি হয়, মানুষ একরকমভাবে থাকে। সম্পর্কের পর সে মানুষের বাঁচা মরার রকমভেদ হয়।

বাঙালির যেমন দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোর আগে মানুষের জীবন একরকম থাকে। পরে আর-একরকম।

সম্পর্কটাও তাই। যারা বলে একটা ব্রেক আপে তাদের কিছু যায় আসে না, ভুল বলে। ব্রেক আপ মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যায়। সব কিছুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে যায়।

অনিন্দিতাদিকে দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। এই অনিন্দিতাদিই আমাকে একদিন বলেছিল, "কেন চাকরি করি জানিস? কোওন পরের বাড়ির ছেলে যেন একদিন দুম করে বলে না বসতে পারে, আমার টাকায় খাও পরো, লজ্জা লাগে না?"

খুব কাঁদছিল অনিন্দিতাদি।

আদৃতা এসে গেছিল রুমটায়। আমি ইশারায় ওকে চলে যেতে বললাম।

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি কী করি বল তো আত্রেয়ী?"

আমি বললাম, "দাদাকে জিজ্ঞেস করো সরাসরি। কী আবার করবে? এটা তো আর প্রেম না যে ব্রেক আপ হয়ে গেলেই সব মিটে যাবে। রীতিমত সই সাবুদ করে বিয়ে করেছ। একজন স্ত্রী হিসেবে সমস্ত আইনগত সুবিধা পাবে তুমি। এসব মানুষকে সহজে ছাড়তে নেই। এ তো রীতিমত ফ্রড কেস দিদি।"

অনিন্দিতাদি কান্না থামিয়ে ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ওকে জেলে দি, ফাঁসি দি, যাই করি, ও তো আমায় ভালোবাসে না। তাহলে এসব করেই বা কী হবে?"

আমার চোয়াল শক্ত হচ্ছিল। বললাম, "হবে। অনেক কিছুই হবে। তুমি হয়তো একরকম ভেবেছ, কিন্তু যারা মানুষকে এভাবে ঠকায়, তাদের ছেড়ে দিলে তুমি অপরাধ করবে। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, দুজনেই অপরাধী দিদি। অনিরুদ্ধদা যেমন অন্যায় করে দোষী, তুমি যদি ওকে সহজে ছেড়ে দাও, তবে তুমি অন্যায় সহ্য করে দোষী হবে। তুমি নাহয় ওকে ডিভোর্স দিয়ে দিলে, কিন্তু ও যে আর-একটা বিয়ে করে সে মেয়েটার জীবনও তোমার জীবনের মতোই অসহনীয় করে দেবে না তার কোনও গ্যারান্টি আছে?"

অনিন্দিতাদি আমার হাতদুটো ধরল হঠাৎ। বলল, "আচ্ছা, অ্যাবরশন কোথায় করা হয়, জানিস?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "মানে? তুমি বাচ্চাটা নেবে না?"

অনিন্দিতাদি বলল, "না, নেব না। অনাদরের বাচ্চা রাখব না। তাতে আমি মরে গেলে যাব। কিন্তু এই বাচ্চা আমি কিছুতেই নিতে পারব না।"

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। স্কুলের ঘণ্টা পড়েছে। ভাগ্য ভালো আমার এখন কোনও ক্লাস নেই। টিচার ইন-চার্জ যদি না অন্য কোনও স্টপ গ্যাপে পাঠান তাহলে কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

বললাম, "তুমি যাই করো অনিন্দিতাদি, একটা দিন বা দুটো দিন পরে করো। রাগের মাথায় বা কোনও কিছুর ঝোঁকে পড়ে কিছু করতে গেলে মানুষ আরও বেশি করে ভুল করে ফেলে।"

অনিন্দিতাদি ধরা গলায় বলল, "একটা মেয়ের তো সব কিছু ঘিরে ওই একজনই থাকে রে আত্রেয়ী। সে-ই তার সব হয়, ওই যে পৃথিবী না কী বলছিস সে সব। আমার তো পায়ের তলার মাটিটাই সরে গেছে। ঈশ, কী লজ্জা বল তো, লোকে যখন জানতে পারবে আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিনের পর দিন ঠকিয়েছে, ঈশ।"

অনিন্দিতাদির গলা বুজে এল।

আমি আমার ব্যাগ থেকে বের করে জলের বোতল বের করে অনিন্দিতাদির হাতে দিয়ে বললাম, "জলটা খাও আগে। নাও।"

অনিন্দিতাদি অনেকটা জল খেল।

বললাম, "শোনো, আমাকে ফোনটা দাও। অনিরুদ্ধদার সঙ্গে আমি কথা বলি।"

অনিন্দিতাদি বলল, "তুই বলবি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। ফোন ধরে দাও তো। সকালে কথা হয়েছিল?"

অনিন্দিতা বলল, "হ্যাঁ। আমি স্বাভাবিক কথা বলেছি। বুঝতে দিইনি কিছু।"

আমি বললাম, "কেন বুঝতে দাওনি?"

অনিন্দিতাদি বলল, “বুঝিয়ে কী হবে?”

আমি বললাম, “নাম্বারটা দাও। আমি অন্য একটা জিনিস করি। লয়ালটি টেস্ট। একটা চ্যানেলে হত, খুব দেখতাম।”

অনিন্দিতাদি ফোনটা বের করে নাম্বারটা দিলাম।

আমি মিসড কল মারলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন এল। “হ্যালো, কে বলছেন?”

আমি বললাম, “রং নাম্বার।”

ওপাশ থেকে ভেসে এল, “রং নাম্বারই তো? হ্যান্ডসাম ছেলেদের নাম্বারে মেয়েদের মিসড কল মারা স্বভাব আছে কিন্তু।”

আমি মিষ্টি গলায় বললাম, “আচ্ছা? আপনার নাম্বার কী করে পেলাম বলুন তো?”

অনিরুদ্ধদা বলল, “পেয়ে যায়। আপনিও নিশ্চয়ই কোথাও থেকে পেয়েছেন। মে বি টিন্ডার? আমরা দেখা করেছি কি কোনও দিন?”

আমি বললাম, “কই না তো। তবে ইচ্ছা আছে।”

অনিরুদ্ধদা বলল, “করলেই হয়। সিঙ্গল মানুষ, সুন্দরীরা দেখা করতে চাইলে কেন করা যাবে না? এই উইকএন্ড ফ্রি আছেন?”

ফোন স্পিকারে চলছিল। আমি দেখতে পেলাম অনিন্দিতাদির দু চোখ দিয়ে জলের ধারা পড়েই চলেছে।

৩৮

জীমূতবাহন

আগের রাতে ঘুম হয়নি বলে এ রাতে বিছানায় পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাতে টের পেয়েছিলাম বউ আমার গায়ে পা তুলে দিয়েছে, বাধা দিইনি আর। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম গলা জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। ওকে হালকা ঠেলে উঠলাম।

বউ ঘুম ভেঙে আমাকে ঘুমজড়ানো গলায় বলল, “ওহ, আমার ঘুমটা খুব খারাপ। তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম?”

আমি বললাম, “কাকে জড়িয়ে ধরলে খুশি হতে? অনিরুদ্ধকে?”

বউ বলল, “ঘুম থেকে উঠেই তুমি ছয় হাঁকাতে শুরু করে দিলে যে। একটু অপেক্ষা করতে পারতে তো!”

আমি বললাম, “এমনিই ইচ্ছা হল। রেডি হয়ে নাও, সাইট সিয়িং করে আসি।”

বউ বলল, “কোথায় নিয়ে যাবে? ঘুমালে হত না?”

আমি বললাম, “কত ঘুমাবে? একটু ঘুরে নাও। খিদে পাবে ভালো।”

বউ বলল, “স্নান করে নি। তুমি আগে বাথরুমে গেলে যাও। আমার স্নানে টাইম লাগে।”

আমি বললাম, “পেট পরিষ্কার করে বেরিয়ো। মাঝরাস্তায় হাগা পেয়েছে বলবে না।”

বউ রেগে গেল, “আমি কি একবারও হাগা পেয়েছে বলে গাড়ি দাঁড় করিয়েছি? এরকম কথা মনে হল কেন হঠাৎ? আর আমার পেট ক্লিয়ারই হয়। তোমাকে দেখে যেরকম কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগি বলে মনে হয়, আমি সেরকম নই। আমার স্কিন দেখেছ, একটা পিম্পল পর্যন্ত নেই।”

আমি বললাম, “আমারও ক্লিয়ার হয়। আগে থেকে বয়ফ্রেন্ড থাকা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে সব পুরুষের কোষ্ঠকাঠিন্য কেন, পাইলস, ফিশার সব হতে পারে।”

বউ চ্যাঁচাল, “সবাই কি তোমার মতো নাকি? ফ্রাস্ট্রু পাবলিক। জীবনেও গার্লফ্রেন্ড জোটাতে না পারা লোকগুলো আজীবন ফ্রাস্ট্রেশনেই মরে যায়।”

আমি বললাম, "তাও ভালো করে, তোমার মতো কাউকে ঠকিয়ে যেতে হয় না।"

বউ রাগি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কাউকে ঠকাইনি।"

আমি বললাম, "তুমি নিশ্চিত?"

বউ বলল, "হ্যাঁ।"

আমি সোফায় বসে পড়ে ঠান্ডা গলায় বললাম, "তোমার অনিরুদ্ধের বউ আমার ক্লাসমেট ছিল। ওকে সব বলে দিয়েছি।"

বউ আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "তারপর?"

আমি কাঁধ ঝাঁকালাম, "তারপর তোমার অনিরুদ্ধর এখন পাপড় সেঁকা হচ্ছে মে বি, আমার কী?"

বউ বলল, "তোমার কী? তুমি কেন বলতে গেলে?"

আমি বললাম, "তোমারই বা কী? তুমি ওর বউকে কেন ঠকাবে? আমার বলার ইচ্ছা হয়েছে, আমি বলে দিয়েছি। তুমি অনিরুদ্ধকে ফোন করবে? সান্ত্বনা দেবে? ওদের ডিভোর্স হয়ে যাবে নিশ্চয়ই এবারে, তখন তোমরা নিশ্চিন্তে সংসার করতে পারবে।"

বউ আমার দিকে ছোটো ছোটো চোখ করে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে সহজে?"

আমি হাসলাম, "না। সহজে দেব না। তোমার ওই অনিরুদ্ধকে বলবে একদিন একটা একলা জায়গায় আমার সামনে একা আসতে। ওর স্পেশাল জায়গায় কিছু স্পেশাল লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা আছে আমার।"

বউ রেগে গিয়ে বলল, "যে তোমার কোনও ক্ষতি করেনি, তার সম্পর্কে এরকম মানসিকতা রাখার মানে কী?"

আমি বললাম, "ক্ষতি করেনি কে? অনিরুদ্ধ? মানে তুমি সিরিয়াসলি বলছ? একটা স্বাভাবিক ছেলে, যে কিনা খুব ভালো ছিল, তাকে একটা ডিসপুটেড ম্যারেজের মধ্যে জড়িয়েছ তোমরা, তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করছি, এমন হাল করব তোমাদের, দুটোকেই জেলের ঘানি টানাব।"

আমি রেগে গেছিলাম।

বউ সেটা দেখে হাই তুলে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে বলল, "জেলে পাঠালে পাঠাবে। মানুষের সব এক্সপেরিয়েন্স হওয়া দরকার চিতায় ওঠার আগে। সঞ্জু দেখে আমার জেল লাইফের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট এসেছে। জেল তো ভালো জায়গা।"

আমি বললাম, "জেল ভালো জায়গা? মোটাসোটা চেহারার মহিলারা যখন জায়গামতো বেগুন ঢুকিয়ে দেবে তখন বুঝতে পারবে।"

বউ বলল, "ধ্যাত। ফালতু কথা যত।"

আমি বললাম, "ফালতু কথা হলে ফালতু কথা। আমি শুনেছি বলেই বললাম।"

বউ বলল, "যাহ্, কী বলো তুমি? সত্যি নাকি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আরও অনেক কিছু হয়। আমি গুগল সার্চ করে দেখে বলব তোমায়।"

বউ সিরিয়াস মুখে বলল, "তাহলে জেলে যাব না। তুমি ডিভোর্স চেয়ো, দিয়ে দেব। খামোখা কেস খাইয়ো না। শোনো না, সকালে আলুপরোটা বলে দাও না। ডিভোর্সের কথায় খিদে পেয়ে গেল।"

আমার প্রবল সন্দেহ হল এই মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে।

৩৯

আত্রেয়ী

টিচার ইন-চার্জকে জানিয়ে স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অনিন্দিতাদিকে ওর বাড়ি নিয়ে গেলাম।

বাড়ি বলতে ওর শ্বশুরবাড়ি। অনিন্দিতাদি গোটা রাস্তা চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকল। আমাকে বাড়ি ঢোকার সময় বলল, "আমার ব্যাগ গোছাতে বেশিক্ষণ লাগবে না, তুই আমাকে হেল্প করিস শুধু।"

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, "তোমার তো নর্থ বেঙ্গলে বাড়ি। কোথায় যাবে তুমি এখন?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আপাতত কোনও একটা হোস্টেলে থাকি। তারপর দেখা যাবে।"

আমি কিছু বললাম না। যেরকম চোখ মুখ শক্ত করে রেখেছে, কিছু বলা সম্ভব বলে মনে হল না।

কলিং বেল বাজাতে অনিন্দিতাদির শাশুড়ি দরজা খুললেন। অবাক গলায় বললেন, "কী ব্যাপার বউমা? তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "একটু কাজ ছিল মা। বেরোতে হবে আমাকে। ওর সঙ্গে পরিচয় করুন, আত্রেয়ী, আমার কলিগ।"

অনিন্দিতাদির শাশুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেই অনিন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোথায় যাবে তুমি? অনিকে বলেছ?"

অনিন্দিতাদি ব্যস্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ বলে দেব। বাড়ি থেকে জরুরি ফোন এসেছে তো আসলে। আয় আত্রেয়ী, আমার ঘরে আয়।"

অনিন্দিতাদির শাশুড়ির হতভম্ব মুখ পিছনে ফেলে গুটিগুটি অনিন্দিতাদির পিছন পিছন ওর ঘরে গেলাম।

পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা ঘর। অবশ্য অনিন্দিতাদিকে দেখলেই সেটা বোঝা যায়, সব সময় এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অনিন্দিতাদি খাটে বসল একটু। খাটের পাশের টেবিলে অনিরুদ্ধদা আর অনিন্দিতাদির বিয়ের ছবি। অনিরুদ্ধদা হাসি হাসি মুখে বসে বিয়ে করছে। ছবিটা দেখে কেমন একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হল।

এই লোকটা এভাবে বসে বিয়ে করছে, এতটা অভিনয় কেউ করতে পারে? এতটা?

ভাবতে পারছিলাম না ঠিক। বিশ্বাসও হচ্ছিল না।

অনিন্দিতাদি বলল, "তোকে আর মেসেজ করেছে?"

আমাকে বেশ কয়েকটা মেসেজ করেছিল অনিরুদ্ধদা, কিন্তু আমি অনিন্দিতাদিকে আর চাপ দিতে চাইলাম না। বললাম, "না করেনি আর। কেন বলো তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি ঠিক বুঝতে চাইছি আত্রেয়ী, ও কত দূর এগিয়েছে। এরকম একটা মানুষের সঙ্গে বিয়ে হল আমি তো ভাবতেই পারছি না। এরকম কেন হল বল তো আমার সঙ্গে?"

আমি বললাম, "কিচ্ছু হয়নি অনিন্দিতাদি। কিছুই হয়নি এখনও। তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? হয়তো এটাই অনিরুদ্ধদার কোনও অসুখ। মানুষ তো রোগের ঘোরেও এরকম কাজ করতে পারে। কথা বলতে হবে। দেখো, কথা বলে যদি সারানো যেতে পারে!"

অনিন্দিতাদি বলল, "কী সারাব আত্রেয়ী? তুই আমাকে বল দেখি, তোর সঙ্গে এরকম হলে কী করতিস তুই?"

আমার হঠাৎ করে মাথাটা ঘুরে উঠল। সত্যিই তো! এরকম হলে আমি কী করতাম? অমৃত যদি আমাকে লুকিয়ে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে অনিরুদ্ধদার মতোই কিছু করে? বরাবরই ভীষণ শারীরিক ও, আমাদের প্রেমে শরীর আসে। ও এরকমই অন্য কারও সঙ্গে করতে পারে তো! চোখ বন্ধ করে ওর মুখটা মনে করলাম কয়েক সেকেন্ড ধরে। ফোনটা বের করে আমাদের একসঙ্গে তোলা ছবিগুলো দেখলাম। একটা ছবি আছে, যাতে ও আমাকে জাপটে ধরে আছে। কী সুন্দর ছবিটা! সময় পেলেই আমি এই ছবিটা দেখি। কয়েক সেকেন্ড ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনের তেতো ভাবটা কাটালাম।

অনিন্দিতাদি আলমারি খুলল। লকার খুলে নিজের গয়নাগুলো খাটে ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, "এ বাড়ি থেকে যা দিয়েছিল, ও আমাকে যা কিনে দিয়েছে, সব রেখে যাব। শুধু আমার বাবা মা যা দিয়েছে তাই নিয়ে যাব।"

আমি বললাম, "মাথা ঠান্ডা করো প্লিজ। এভাবে খাটের ওপর ছুড়ে ফেলছ কেন?"

অনিন্দিতাদি আমার কথা শুনল না। কাঁদতে কাঁদতে যা করছিল করে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর একটা ব্যাগ গোছানো সম্পূর্ণ হলে বলল, "আত্রেয়ী ক্যাব ডাক তো। আমি দেখি কোথায় যাওয়া যায়!"

আমি বললাম, "তুমি আজকের দিনটা আমার বাড়ি চলো অনিন্দিতাদি। তারপর দেখা যাবে। হুইমজিক্যাল ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে না তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "না যাচ্ছে না। এক মিনিট দাঁড়া।"

অনিন্দিতাদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পর শাশুড়িকে নিয়ে এসে বলল, "মা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনারা বিয়েতে যা দিয়েছিলেন, খাটের ওপর থাকল। নিয়ে নেবেন।"

অনিন্দিতাদির শাশুড়ি অবাক হয়ে অনিন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানে?"

অনিন্দিতাদি আমাকে বলল, "আয় আত্রেয়ী।"

প্রৌঢ়াকে পিছনে রেখে যেভাবে এসেছিলাম সেভাবেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এলাম।

দুপুর গড়াচ্ছে। খিদেও পেয়েছে। ক্যাব এল। অনিন্দিতাদি গোটা রাস্তা একটা কথাও বলল না।

আমার ফোন বাজছিল। আমি দেখলাম অমৃত ফোন করছে।

ধরলাম, "হ্যালো।"

অমৃত বলল, "অন আসছ না দেখলাম, আজ খুব প্রেশার যাচ্ছে?"

আমি বললাম, "অন্য ব্যাপার আছে, আমি পরে তোমাকে বলি?"

অমৃত "আচ্ছা" বলে ফোনটা রেখে দিল।

ফোনটা রেখে দেখলাম অনিরুদ্ধদা হোয়াটসঅ্যাপ করেছে আবার, "কবে দেখা হচ্ছে?"

৪০

অমৃত

প্রেমের সমস্যা হল, ঝগড়ার প্রথমে মনে হয় দিই সব শেষ করে। তারপর যত সময় যায়, তত মনে হয়, ও কি আদৌ আমার কথাই ভাবছে?

আর তারপর যখন সব মিটে যায়, তখন প্রেম দশ গুণ বেড়ে যায়। এটা সমস্যা বললাম, এই কারণেই যে, আত্রেয়ীর সঙ্গে যেদিন সব মিটল, সেদিনই আত্রেয়ী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওর স্কুলে কোন কলিগের কী সমস্যা হয়েছে, সেসব একটা মেসেজে বলে বলল, রাতে জানাচ্ছে সব। বাবা ক্লাবে গেছে, দাদা আর বউদি বেরিয়েছে।

বাড়িতে বসে বসে নেই কাজ তো খই ভাঁজ আত্রেয়ীর প্রোফাইলটা খুললাম আবার। আত্রেয়ী জানিয়েছে, যেই ছেলেটা ওকে দিদিমণি দিদিমণি বলে বাজে ভাবে ফ্লার্ট করত, সেটাকে ব্লক করে দিয়েছে। আমার কথায় নাকি করেনি, ওর নিজেরই মনে হয়েছে ছেলেটা একটা জায়গায় সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি অনেক কষ্টে কিছু বলিনি। আমার বারবার মনে হয়েছিল ছেলেটাকে গিয়ে রাম খিস্তি মেরে আসি। কোথাকার কোন বেবুনের উল, আমার বউকে উলটোপালটা বলে ফ্লার্ট করার এত সাহস পায় কী করে? সামনে পেলে শরীরের বলগুলো ডিসম্যান্টেল করে টেবিল টেনিস খেলতাম! আত্রেয়ী জানিয়েছে ছেলেটার একটু ইয়ে ছিল বইকি, ও-ই ওকে কাটিয়ে দিয়েছে। আমি তখন বলেছি, ছেলেটার ইয়ে আছে জেনেও তুমি প্রশ্রয় দিয়েছিলে কেন?

আত্রেয়ী বলেছে ও বন্ধুই ভেবেছিল।

আমি রেগেছি। আবার নিজেই নিজেকে বুঝিয়েছি। আমার এরকম করা ঠিক না। ও তো ব্লক করে দিয়েছে। অফিসের সৌরভদা বলে প্রেমের শুরুতে অনেক রকম ইনসিকিউরিটি থাকে। এই ফেসবুকের জমানায় এই সব ইনসিকিউরিটি ডানা মেলার সুযোগও বেশি পায়।

এসব ছেলে তো সামনে ওভাবে কথা বলার সাহস পাবে না। ফেসবুকের আড়ালটা ব্যবহার করতে পারছে বলেই যা নয় তাই বলে দিতে পারছে।

কথা হল কেউ যদি যা নয় তাই বলেও, একটা মেয়ের জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সেটাকে প্রশ্রয় দেব কেন? সবাই কি বন্ধু হয়? বন্ধু শব্দদুটো কি এতটাই সোজা যে যার তার সঙ্গে যা খুশি বলা যায়?

আত্রেয়ী আমার পিঠে মুখ গুঁজে যখন আসছিল, আমার এই সব প্রশ্নগুলো কোথায় যেন ডানা মেলে চলে গেছিল।

ঘরে বসে এই কথাগুলো আবার মাথায় ঘুরতে শুরু করল। আমি ফেসবুক বন্ধ করে গান শুনতে চেষ্টা করলাম। লাভ হল না।

অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার কেন এরকম হয়? বসও বললেন কাজের প্রতি মন না দিলে সমস্যা বাড়ে। বিয়ের পর কি এরকম হবে? এতটা ইনসিকিউরিটি আসতে পারে?

আমি ফোন রেখে শুয়ে পড়লাম। খানিকক্ষণ ছটফট করার পর দেখলাম আত্রেয়ী ফোন করেছে। ধরলাম, "হ্যালো।"

আত্রেয়ী গলা নামিয়ে বলল, "একটা বাজে জিনিস হয়ে গেছে বুঝলে। এইজন্যই বিজি ছিলাম।"

আমি বললাম, "সেসব তো বলেছ বটে, কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। কী ঘটেছে একজ্যাক্টলি?"

আত্রেয়ী বলে গেল। আমি সব শুনলাম। আত্রেয়ী বলল, "আমি রুটি করে আসছি দাঁড়াও।"

আমি গুম হয়ে বসে রইলাম। বাবা ফিরেছে। দাদা বউদিও। বউদি একবার ঘর নক করে গেছে। আমি ঘুমজড়ানো গলায় বলেছি, ঘুমাচ্ছি।

খানিকক্ষণ পরে আত্রেয়ী ফোন করল আবার। আমি ফোন ধরেই বললাম, "তুমি ওই লোকটাকে ফোন করতে গেলে কেন নিজের ফোন থেকে? মেসেজই বা করলে কেন?"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "ওই সময়টা আমি কী করতাম? আমি ব্লক করে দিয়েছি অলরেডি।"

আমি গোঁ গোঁ করতে লাগলাম।

আত্রেয়ী বলল, "দ্যাখো অমৃত, মানুষের জীবন তো এরকম না যে, আমি তোমার প্রেমিকা বলে আর কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারব না কোনও ভাবেই। এরকম মানসিকতা মধ্যযুগে ছিল। তুমি বুঝতে পারছ তোমার কোনও একটা সমস্যা হচ্ছে? আমার কাছে একজন ভালো মনোবিদের নাম্বার আছে, তোমাকে দেব?"

আমি রেগে গিয়ে বললাম, "মনোবিদ মানে? আমি পাগল?"

আত্রেয়ী বলল, "পাগল তো বলিনি। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার ট্রিটমেন্ট দরকার। সাধারণ ঘটনাগুলো নিয়ে তুমি যেভাবে ইস্যু বানিয়ে ফেলছ, তাতে দুদিন পরে দেখা যাবে তুমি কাউকেই সহ্য করতে পারছ না। আমি কাউকে লয়ালটি চেক করতে ফোন করেছি মানে এই না যে আমি তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছি। টিনএজারদের মতো করছ কেন?"

আমি বললাম, "আমি তো কোনও দিন প্রেম করিনি, আমি জানি না কার মতো করছি। তুমি করেছ, তুমি বলতে পারবে।"

আত্রেয়ী ঠান্ডা গলায় বলল, "তুমি ঝগড়া শুরু করতে চাইছ, তাই তো?"

আমি বললাম, "আমি কিছু শুরু করতে চাইছি না, এই ধরনের ভুলভাল লোককে তুমি ফোন নাম্বার দেবে না, ব্যস!"

আত্রেয়ী হেসে ফেলল, "আচ্ছা হেগোরাম, দেব না। খুশি?"

আমি রাগি গলায় বললাম, "আমি হেগোরাম নই, আমার পাতলা হাগা হয় না।"

আত্রেয়ী বলল, "আচ্ছা। শক্ত হাগারাম। খুশি? কাল দেখা করবে। বেশি চুমু লাগবে বুঝতে পারছি তোমার, নইলে পাগল হয়ে যাচ্ছ। ভাট বকছ।"

আমি এবার হেসে ফেললাম।

৪১
জীমূতবাহন

মাঝরাত।

বৃষ্টি নেমেছে তুমুল। মনে হচ্ছে আজকেই সৃষ্টির শেষ দিন। ঘুম ভেঙে গেছে।

বউ কাঁপছে আবার। বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, "ছেড়ে যাস না, পাবলোদা, শোন না, শোন, বাবা মা সবাই মারবে আমায়। আমি কী করব বল? এই পাবলোদা, শোন না"...

আমি আলো জ্বালিয়ে ঠেললাম বউকে।

বউ উঠল না। আমি আবার ঠেললাম।

এবার চোখ খুলল, বলল, "কী হল?"

আমি বললাম, "আবার কী সব বলে যাচ্ছো।"

বউ বলল, "কটা বাজে?"

আমি ঘড়ি দেখলাম, "দেড়টা বাজে।"

বউ আনমনে বলল, "হুঁ। কফি খাব।"

আমি বললাম, "এত রাতে কে তোমাকে কফি বানিয়ে খাওয়াবে?"

বউ বলল, "তুমি? খাওয়াও না। ভালো লাগছে না।"

আমি বললাম, "আচ্ছা, দাঁড়াও। দেখছি।"

রুম সার্ভিসে ফোন করলাম। ফোন বেজে গেল। কেউ ধরল না।

মনে পড়ল রুমে ইলেকট্রিক কেটলি আছে। চিনি, চা আর কফির ছোটো ছোটো স্যাশেও আছে। গরম জল বসিয়ে কফি বানিয়ে দিলাম। বউ কম্বল জড়িয়ে খাটের ওপর উঠে বসে কফি খেতে খেতে বলল, "কলকাতা ফিরে আবার ডাক্তার দেখাতে হবে। কমে গেছিল এটা। আবার ফিরে এসেছে।"

আমি বললাম, "দেখিয়ো। বাড়িতে একা ঘুমাতে?"

বউ উপর নিচে মাথা নাড়াল।

বললাম, "একা ঘুমালে বুঝতে কী করে এরকম করছ?"

বউ বলল, "মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতাম। বাবা বা মা ছুটে আসত। বাকি রাতটা আর ঘুমাতাম না।"

আমি বললাম, "তারপর?"

বউ বলল, "একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়েছিলাম। উনি ওষুধ দিয়েছিলেন। কমেও গেছিল। ইদানীং আবার শুরু হয়েছে। মেন্টাল স্ট্রেসের জন্যই সম্ভবত।"

আমি বললাম, "কী রকম স্ট্রেস?"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধ আর আমার কথা যখন শুরু হয়েছিল, আমি ওর সঙ্গে সেভাবে কথা বলতাম না। অনিরুদ্ধ বিভিন্ন কথা বলত, আর আমি তার উত্তর দিয়ে যেতাম। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ব্যাপারটা তো পুরোটাই অভ্যাস আসলে। অনিরুদ্ধ আমার সিস্টেমে ঢুকে গেল। আমরা সারাক্ষণ কথা বলতে শুরু করলাম। সব বিষয় নিয়ে। একটা সময় আমার পাস্ট নিয়েও কথা বলতে শুরু করলাম। ও আমাকে সাপোর্ট দিত। আমি ওকে।"

অনেকটা কথা বলে বউ কফিতে চুমুক দিল।

আমি বললাম, “সেটা বুঝলাম। কিন্তু বন্ধুত্ব হওয়া তো এক জিনিস, তাই না? স্বাভাবিক বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হতেই পারে। তুমি যদি ওকে ভালোবাসতে তাহলে বিয়ে করলে না কেন?”

বউ মাথায় হাত দিয়ে বলল, “আমি যে ওকে ভালোবাসি সেটা বুঝতে পারিনি প্রথমে। একটা সময় ও আমাকে প্রোপোজ করে। আমি সরাসরি না করে দি। আমার থেকে প্রত্যাখ্যান পাবার পর ও একজন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, সে রাজিও হয়ে যায়। আমার সঙ্গে তখন আর ওর কোনও রকম কথা হত না। কিন্তু আমি তো গুমরে গুমরে মরতে শুরু করি। এমনিতেই বরাবর ভীষণ একাকিত্বে ভোগা মানুষ আমি। অনি হুট করে কথা বন্ধ করে দিল, অনলাইন এসেও কথা বলছে না, আমি কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। একদিন দুম করে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হে, বিয়ে হল? অনি জানাল সামনের মাসে বিয়ে। তারপর আবার কথা শুরু। আমি জড়িয়ে গেলাম। বিয়ের পরেও আমাকে কতবার বলেছে আমাকে নিয়ে সব ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আমিই আটকেছি। একটা মেয়ে তো জড়িয়ে গেছে।”

আমি বললাম, “মেয়েটা তো জেনে গেছে, ওকে ছেড়েও দেবে। আমিও তোমাকে ছেড়ে দেব। দুজনে মিলে ভালোভাবে থাকবে এখন। তোমার লাইন ক্লিয়ার।”

বউ কফি খেতে খেতে বলল, “হলে ভালো, কারণ আমি অনিরুদ্ধকে ভালোবাসি। ওর বউ ওকে আমার জন্য ছাড়লে আমি ভেবে দেখতেই পারি।”

আমি হাসলাম, “অবশ্যই। এত সব কিছুর মধ্যে আমার লাইফের কটা দিন নষ্ট করলে এই যা।”

বউ বলল, “কারও জন্য করেছ ভাববে। সমাজসেবা টাইপ। অসুবিধা হবে না। তুমি ভালো মানুষ। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।”

আমি বললাম, “বাপ রে, বিরাট কমপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলে। জানতামই না। আচ্ছা, এবার ঘুমাই। তুমি জেগে থাকলে জাগো।”

আমি শুয়ে পড়লাম। বউ কফি মাগ রেখে বলল, “শোনো না।”

আমি বললাম, “কী?”

বউ বলল, “আমি যদি তোমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাই তোমার অসুবিধা হবে? আমার না ভয় লাগে এত বাজ পড়লে।”

আমি মাথায় হাত দিলাম।

এ কী আজব সমস্যা হল!

৪২
অমৃত

আত্রেয়ীকে আমি ভালোবাসি।

আত্রেয়ীকে আমার স্বপ্নে দেখতে ভালো লাগে।

এই যেমন আজকে ভোরের স্বপ্ন দেখলাম, আমার খুব জ্বর হয়েছে। আত্রেয়ী আমাকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেছে। সারাদিন এক্কেবারে সুচিত্রা সেনের মতো আমার মাথার কাছে বসে আমার সেবা করে যাচ্ছে। ওর বাবা একবার এসে বললেন, “কী রে মা, ঠাকুর দেখতে যাবি না?”

আত্রেয়ী সুজয়দা পুচকির অ্যাডের পুচকির দাদার মতো করে বলল, “তোমরা যাও। আমি থাকি।”

এসব কথা তো বলতে ইচ্ছা করে নাকি? কিন্তু সেটা ভোর ছটা হলে তো বলা সম্ভব না। মেয়েটার স্কুল থাকে। বাড়িতে একগাদা কাজ থাকে।

তবু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলাম। দেখলে ভালো।

বাবা ভোরে উঠে প্রাণায়াম করে। আমি বসার ঘরে গিয়ে দেখলাম কপালভাতি করছে। আমাকে দেখে থামিয়ে বলল, “কী রে, এত সকালে উঠে পড়লি যে? অন্য দিন তো আটটার আগে নামগন্ধ পাই না!”

আমি বললাম, “এমনি, ইচ্ছা হল, উঠে পড়লাম।”

বাবা বলল, “অ। আচ্ছা শোন না, বলছি তোর কখন ইচ্ছা বিয়ে করার? শীতে না গরমে?”

আমি বললাম, “যখন খুশি।”

বাবা বলল, “শীতেই ভালো। লোক খাইয়ে সুখ আছে। গরমকালে গাড়োলে বিয়ে করে। তোর দাদা এক গাড়ল। গরমে বিয়ে করল। পাত্র ঘামছে, পাত্রী ঘামছে, পুরোহিত ঘামছে, বরযাত্রী ঘামছে, কন্যাযাত্রী ঘামছে, সবাই ঘেমো হয়ে বসে আছে। লোকে খাসি খেতে খেতে ঘামছে, অবিশ্যি ছাড়ছে না কেউই। বেশ একটা ইয়ে ব্যাপার।”

আমি বললাম, “আমার ওরকম বিয়ে করার ইচ্ছা নেই বাবা। ছোটোখাটো প্রোগ্রাম হোক। অত লোককে খাওয়ানোর কোনও দরকার নেই।”

বাবা অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

আমি বললাম, “দু বাড়ি থেকে একটা কমন রিসেপশন হোক, সেখানে সবাই এসে খেয়ে যাক। অতগুলো টাকা নষ্ট করার কোনও দরকার নেই।”

বাবা বলল, “তোর কাছে আমি টাকা চেয়েছি? আর কে বলেছে এসব? আত্রেয়ী?”

আমি বললাম, “না না, ও তো বলেই দিয়েছে আমরা যা ঠিক করব ও তাতেই রাজি। কিন্তু আমার মনে হয় বিয়েতে এত টাকা অপচয় করার কোনও যৌক্তিকতা নেই।”

বাবা বলল, “বেশ তো, তাহলে ওর বাবার সঙ্গে কথা বল। দু পক্ষ রাজি থাকলে তো অসুবিধা হবার কথা না। কিন্তু আত্মীয়স্বজনরা যদি উলটোপালটা বলে তাহলে তুই সামলাবি তো?”

আমি বললাম, “ওদের কাজই তো উলটোপালটা বলা। ওদের তুমি আটকাতে পারবে? পৃথিবীর সেরা রান্না হলেও ওরা ঠিক কোনও না কোনও খুঁত খুঁজে বের করবে।”

বাবা বলল, “সেটা তুই ঠিকই বলেছিস। মন্দ না প্রস্তাব তোর। আচ্ছা তোর দাদার সঙ্গে আলোচনা করে নি।”

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, “এটা নিয়ে দাদা আবার কী বলবে? দাদার বিয়ে না আমার?”

বাবা বলল, “দাদা তোর বড়ো না? ওরও একটা মতামত আছে তো নাকি? ওরা যদি বলে, না মানব না, যা হবে ধুমধাম করেই হবে, তখন সেভাবেই করতে হবে। আমি গৃহে অশান্তি চাই না।”

আমি গোঁজ হয়ে বসে রইলাম।

বাবা বলল, “শোন না, বউমার নাম্বারটা দিবি। কথা বলব। কথা বলা দরকার। তোর মা নেই তো, আমাকে তো সব দিক সামলাতে হবে। গয়না কেনার কথা ভেবেছিস কিছু?”

আমি বললাম, “আমি কিছুই ভাবিনি। আমি তো মিনিমালিস্টিক বিয়ের কথাই বলে আসছি বরাবর। নিজেরা নিজেরা বিয়ে হবে, গুচ্ছ লোককে ডেকে গেলাবার কোনও যৌক্তিকতা পাই না আমি।”

বাবা বলল, “এই তোর সমস্যা, একটা জিনিস নিয়ে বলতে থাকলে আর সেই লুপ থেকে বেরোতে পারবি না। আমি সেটা বলেছি তোকে? মিনিমালিস্টিক করে হেদিয়ে মরছিস! শোন, তোর মা তোর বউয়ের জন্য যে গয়নাগুলো রেখে গেছে, সেগুলো আত্রেয়ীকে দেখা, ওর যদি পছন্দ হয় সেগুলোই থাকুক, নইলে আবার নতুন করে কিছু বানানো যাবে। নিমন্ত্রিতদের তালিকা বানাতে হবে, পিওর বাঙালি ফুড না মোগলাই খাবার হবে সব হিসেব করতে হবে, ওরে বাবা কত কাজ, ভাবতেই মাথা ঘুরাচ্ছে, এই তুই আমাকে নোটপ্যাডটা আর পেনটা দে তো। লিস্ট করতে শুরু করি এখন থেকেই। কী চাপ, কী চাপ!”

বাবা সিরিয়াস হয়ে গেল।

যাহ্‌, কী থেকে কোথায় চলে গেল! আমি রেগেমেগে বসে রইলাম।

অনিন্দিতাদি সারারাত জেগে বসেছিল। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেছিলাম। আমায় বলল, "তুই ঘুমা। জাগতে হবে না। একটা রাত দে। আমি ঠিক হয়ে যাব।"

অনিরুদ্ধদা ওর ফোনে বেশ কয়েকবার ফোন করেছে। সম্ভবত বাড়িতে ফোন করে জানতে পেরেছে অনিন্দিতাদি বেরিয়ে গেছে, সে কারণেই ফোন করেছে।

মজার ব্যাপারটা হল, এর মধ্যে আমাকেও ফোন করেছে। আমি ধরিনি আর। মেসেজ করে বলেছে, "প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। সিঙ্গল হবার কী কষ্ট কী করে বোঝাই? আমরা কি বন্ধু হতে পারি না?"

দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তবু অনিন্দিতাদিকে বলিনি। বলে লাভ নেই। অনিন্দিতাদি যা বোঝার বুঝে গেছে।

আমার অবশ্য একটা সময় পরে মনে হচ্ছে অনিরুদ্ধদা মানসিকভাবে অসুস্থ। নইলে একটা মানুষ এরকম করবে কেন? ঘরে বউ আছে অথচ অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে, আবার অন্য একটা নাম্বার পেলে তার সঙ্গেও শুরু করে দিচ্ছে, এরকম মানুষেরা আসলে কি মারাত্মক একাকিত্বে ভোগে? না কোনও রোগ! এগুলো কেমন রোগ? একটা সংসার, একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম অনিন্দিতাদি বাথরুমে কল ছেড়ে দরজা বন্ধ করেছে। সম্ভবত কল ছেড়ে রেখে কাঁদছে যাতে কান্নার শব্দ না বেরোয়।

বাইরের ঘরে গেলাম। বাবা খবরের কাগজ পড়ছিল। আমায় দেখে বলল, "ঠিক আছে অনিন্দিতা এখন?"

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বলল, "আমাকে কি এবার বলা যাবে কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "সাংসারিক সমস্যা। মিটে যাবে হয়তো। নাও মিটতে পারে। কেন, এখানে থাকলে কি তোমার অসুবিধা আছে?"

আমার গলাটা খানিকটা রূঢ় শোনাল, বলে নিজেই বুঝতে পারলাম।

বাবা অবাক হয়ে বলল, "আমার কী অসুবিধা? তোর কী হয়েছে সেটা বল তো! অমৃতর সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছিস নাকি?"

আমার লজ্জা পেয়ে গেল। বললাম, "না। ওসব কেন করতে যাব?"

বাবা বলল, "সে করতেই পারিস। সব সম্পর্কেই একটু আধটু মন কষাকষি, মতের অমিল না থাকলে সে সম্পর্কটাকে সুস্থ সম্পর্ক বলা চলে না।"

আমি বললাম, "না সেসব কিছু না। আমি ওরকম ঝগড়াটে বলে তোমার মনে হলই বা কেন?"

বাবা হেসে ফেলল, "তুই ঝগড়ুটে না?"

আমি রেগে গেলাম, "আমি ঝগড়াটে? তোমার মনে হয় এটা?"

বাবা বলল, "না না। একবারেই না। তুই একবারেই ঝগড়াটে না। মাঝে মাঝে শুধু একটু মাথা গরম করে ফেলিস এই আর কি!"

আমি বললাম, "সে তুমিও করো। সবাই করে। তাতে কেউ ঝগড়াটে হয় না।"

বাবা বলল, "তাহলে কি অমৃত ঝগড়াটে?"

আমি বললাম, "উফ, তুমি কেন এসব কথা বলছ বল তো? আমার অস্বস্তি হচ্ছে এসব শুনলে। দেখছ একজন মহিলা একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেটার সলিউশন বেরোক অ্যাটলিস্ট, তারপর নাহয় তুমি এসব কথা বলো।"

বাবা এবার সিরিয়াস হল, "তা ঠিক, আচ্ছা আমি কি কিছু করতে পারি? বলা যায় আমায়?"

আমি বললাম, "এখনই কিছু না। তবে সেরকম কিছু সমস্যা হলে বলব। অনিন্দিতাদি থাকবে হয়তো কদিন।"

বাবা বলল, "তা থাকুক। কী বাজার করব জানিয়ে দিস। খাওয়াদাওয়াটা ঠিক করে করে যেন। আজকাল আধুনিক যুগে মানুষের সমস্যাগুলো, মানসিক টানাপোড়েনগুলিও বড়ো অদ্ভুত হয়ে গেছে। আমাদের সময় এত জটিলতা ছিল না। টেকনোলজির যত আপগ্রেডেশন হবে, মানুষের সমস্যাগুলিও তেমনি এক-এক রকম ভাবে পালটাতে থাকবে। আমাদের সময় কী ছিল, টাইপরাইটার ছিল। ল্যান্ডলাইন ছিল, মোবাইল ছিল না। তখন মানুষের চলাফেরা একভাবে ছিল। এখন দেখ, মোবাইল আসার পরে সব কিছুই কেমন দ্রুত পালটে যাচ্ছে। এটা হবে। সমস্যা বাড়বে। এর সলিউশন খুঁজতে আমাদেরকেও পালটাতে হবে। নইলে সমূহ বিপদ। যাক গে, তোরা দুজনেই স্কুলে যাবি তো?"

আমি বললাম, "যাব। তাও একবার কথা বলে আসি।"

বাবা বলল, "ঠিক আছে। সেভাবে রান্না করতে বলে দিচ্ছি তবে। নিজের খেয়াল রাখিস মা। সবাইকে ভালো রাখতে গিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়িস না।"

বাবার গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে গেল।

আমার কেন জানি না খুব কান্না পেল।

৪৪

জীমূতবাহন

সকাল আটটা। বৃষ্টি কমলেও কুয়াশা আছে।

বউ পুরো বাচ্চাদের মতো ঘুমাচ্ছে।

সারারাত ওভাবেই ঘুমিয়েছে। আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কোনও মেয়ে এভাবে কোনও দিন আমাকে জড়িয়ে ধরেনি। আমার যা সমস্যা হবার সেগুলো হচ্ছিল।

যখন বুঝলাম ঘুমিয়ে পড়েছে, সোজা হয়ে ওকে সরাতে গেলাম। সরল না। উলটে আরও বেশি করে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমাল। বহুকষ্টে সামলাতে হল নিজেকে।

চিরকাল মেয়েদের থেকে দূরে থাকা ছেলেদের এভাবে নিজেকে সংযত রাখা যে কতটা চাপের, সেটা যার হয়, সে ভালো বুঝতে পারে। আর আমি তো বরাবর "আমাকে কেউ ভালোবাসে না আর আমাকে কেউ দেয় না" ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমার মতো পাবলিককে কোনও মেয়ে জড়িয়ে ধরলে কী হতে পারে সেটা আমি ছাড়া কে বুঝবে?

আমার ঘুম পরে এল। সকালে ঘুম ভাঙার পরও বউ জড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল, তবে এবার ওকে সরিয়ে উঠতে পারলাম।

বাথরুম সেরে এসে জানলা খুলে বাইরেটা দেখে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিলাম। শীতে চা খেতে ইচ্ছা করছিল। রুম সার্ভিসে বলতে দু কাপ চা দিয়ে গেল।

বউকে ঠেললাম। বউ বিরক্তিমাখা গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "চা খাবে?"

বউ বলল, "দাও। খাই।"

আমি চায়ের কাপ দিলাম। বউ খাটে উঠে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আহ, কী ভালো লাগছে! এই, বেরোই চলো।"

আমি বললাম, "কোথায় যাবে?"

বউ বলল, "সাইট সিয়িং করে আসি? সারাদিন ঘরে বসে থাকব নাকি কালিম্পঙের মতো? বৃষ্টি পড়ছে না তো, চলো চলো।"

আমি বললাম, "বাহ, এই তো রামের সুমতি হয়েছে। ঠিক আছে চলো।"

বউ বলল, "ড্রাইভারটাকে ফোন করো। চলো ঘুরে আসি।"

আমি ড্রাইভারকে ফোন করলাম। জানাল নটায় আসবে। বউকে বলতে বউ বলল, "ঠিক আছে, আমি স্নান সেরে আসি।"

আমি বললাম, "তুমি কাল স্নান করোনি, না?"

বউ হাই তুলে বলল, "ভুলে গেছিলাম। শীতে রোজ স্নান করলে ঠাকুর পাপ দেয় জানো না?"

আমি বললাম, "তাই নাকি? কোন ঠাকুর? তোমায় কানে কানে বলে দিয়ে গেছেন বুঝি?"

বউ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ তো, বলে গেছে। এই, তুমি বড্ড নিয়ম মেনে চলো নাকি? রোজ স্নান করো, সব খাবার ঠিক সময়ে খাও?"

আমি বললাম, "অত ভাবিনি। নিয়ম মানামানির কিছু নেই। সময় নষ্ট করার সময় ছিল না তো কোনও দিন।"

বউ বলল, "কেন ছিল না? চিরকাল দৌড়ে বেরিয়েছ? অমলকান্তিকে দেখবে, কত রাত জেগে জেগে লেখে।"

আমি বললাম, "ওরা তো অসাধারণ মানুষ সবাই, অমলকান্তি, কিংবা তোমার অনিরুদ্ধ। আমি ওরকম নই। আমি সাধারণ মানুষ। আমার বাড়ি সামলানো আছে, কর্তব্য আছে, রোজগার না করলে বাড়ি কে সামলাবে আমার? সব হিসেব করে না চললে আমার চলবে না।"

বউ বুঝদারের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "বুঝেছি, তুমি হলে কাঠখোট্টা আনরোম্যান্টিক একজন মানুষ, তাই তো?"

আমি হাসলাম, "না, আমি তাও নই। আমি হলাম ক্রাউড। ভিড় দ্যাখো না সিনেমায়, যারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হিরো হিরোইনের নাচ দ্যাখে? আমি হলাম সেই ভিড়, হিরো হিরোইন তো তোমরা। আমি তোমাদের দেখি। মাঝে মাঝে আমাকেও সিনেমায় নামিয়ে দেয়, তখন হয়ে যায় সমস্যা। ঠিক শেখানো বুলি আউড়াতে পারি না, যেমন চাও তেমন করতে পারি না, তখন সমস্যা হয়ে যায়। তোমার যেমন আমাকে নিয়ে হচ্ছে। ভেবেছিলে ভেড়া টাইপ বর হবে, যা বলবে সেভাবে চলবে। চলছি না দেখে সমস্যায় পড়ে গেলে।"

বউ চোখ মুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি আমাকে সেন্টু দিতে চাইছ? যদি দিতে চাও, লাভ নেই, আমি সেন্টু খাই না।"

আমি বললাম, "খেয়ো না। রেডি হও, বেরোই।"

বউ বলল, "ঠিক আছে। আমি স্নানে যাচ্ছি।"

বউ চায়ের কাপ রেখে বাথরুমে ঢুকে গেল। আমি কিছুক্ষণ বসে থেকে টিভি চালালাম।

আধঘণ্টা পর বাথরুম থেকে টাওয়েল জড়িয়ে বেরোল বউ। আমাকে বলল, "ওহ, তুমি আছ, না? ভুলে গেছিলাম। ওকে, তুমি চোখ বন্ধ করো, আমি চেঞ্জ করব।"

আমি বললাম, "চেঞ্জ করবে? এখানে? বাথরুমে করো! আর চোখ বন্ধ করা যায় নাকি ওভাবে?"

বউ বলল, "করবে না? ওকে। দেখো।"

বউ টাওয়েল খুলে দিল।

আমি "ওরে বাবা রে" বলে চোখ বন্ধ করলাম।

বউ বলল, "চোখ পিটপিট করে দেখবে না?"

আমি বললাম, "না দেখব না।"

বউ বলল, "ভালো করে বললাম, শুনলে না। এখন বসে থাকো এভাবে। আমি বললে তবে চোখ খুলবে।"

আমি বসে বসে শীতের মধ্যেও ঘামতে লাগলাম।

এ কেমন মেয়ে!

এসব তো সিনেমায় দেখতাম রে ভাই!

৪৫

অনিরুদ্ধ

কোম্পানির দেওয়া ফ্ল্যাটে বাথরুমে একটা বিরাট আয়না আছে। আমি সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

আমি কি খুব খারাপ লোক?

খারাপের সংজ্ঞা কী রকম?

মানুষ একই সঙ্গে দুজন কিংবা তার বেশি কাউকে ভালোবাসতে পারে না? প্রতিটা পুরুষ বন্ধু তার মেয়ে বন্ধুটির সঙ্গে একটা রাতও শুতে চায়নি বা তাকে ভেবে হস্তমৈথুন করেনি এটা আমাকে বোঝাতে এলে সে পশ্চাৎদেশে লাথি খাবে।

পুরুষ কী রকম, তা আমি জানি। আমার থেকে ভালো কেউ জানে না।

পুরুষ মাত্রেই বহুগামী। কেউ স্বীকার করে, কেউ করে না।

প্রতিটা পুরুষ বউয়ের সঙ্গে সংগমের সময় অন্য কোনও নারীকে ভাবে। প্রথমে ভাবে না, পরে ভাবে। ভাবতে বাধ্য। জীবনে একঘেয়েমির কোনও জায়গা নেই।

আমি ঋতুজাকে ভালোবেসেছি। আবার অনিন্দিতাকে ভালোবেসেছি বলেই তো সে প্রেগন্যান্ট হয়েছিল।

এবার একই দিনে দুজনই আমার থেকে দূরে চলে যাবে এটা আমি ভাবিনি।

অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে ঋতুজার বর ওকে আগলাচ্ছে বলে। ঋতুজা তো সরাসরি কিছু বলেনি। বলবেও না। ও আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। আর অনিন্দিতা যদি বাচ্চাটা নষ্ট করে দেয়, তাহলে দিক। ওকে আমি এখনও অতটা ভালোবাসতে পারিনি। বাচ্চার বাবা যদি কারও হতে হয়, তাহলে ঋতুজার বাচ্চার বাবা হব।

সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি শোনাচ্ছে? এক জায়গায় বলছি অনিন্দিতাকে ভালোবাসি, আর-এক জায়গায় বলছি অতটাও ভালোবাসি না? হ্যাঁ, আমি এরকমই। ভালোবাসার রকমফের থাকবে তো! নইলে মানুষ আর কুকুরে তফাত হবে কী করে?

মা ফোন করে জানাল অনিন্দিতা বেরিয়ে গেছে, আমি বুঝলাম কোনও একটা জায়গা থেকে ঋতুজার ব্যাপারে জানতে পেরেছে।

তা জানুক, ক্ষতি নেই। অনিন্দিতাকে আমি হিসেবের মধ্যে ধরিওনি কোনও দিন।

আমার মাথায় ঋতুজার নামটাই ঘুরছে। আর ওর বরেরও। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যখন করেছে, এত সহজে ওকে আমি ছেড়ে দেব না। কলকাতায় কামড়ে দেওয়ার জন্য অনেক ভাড়াটে কুকুর পাওয়া যায় যাদের টাকা দিয়ে অবলীলায় আমার কাজে লাগানো যাবে। কত বড়ো সাহস! আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। ওর যে কী হাল করব, আমার মাথায় আগুন চড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই।

অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি দুদিন। আগে অনিন্দিতার কাছে যেতে হবে। পালস বুঝতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর রেগে থাকবে। দাঁড়িপাল্লায় সেন্টিমেন্টের জায়গায় পর্যাপ্ত সেন্টিমেন্ট চড়াতে হবে যাতে রাগটা কমে। বোঝাতে হবে ঋতুজা পাস্ট। তুমিই ফিউচার। দরকার হলে ঋতুজার চরিত্র খারাপ করে দিতে হবে। অনিন্দিতাকে মাথায় তুলতে হবে। একটা বিয়ের সার্টিফিকেট আজকাল মেয়েদের অনেক সুবিধে করে দিয়েছে। অনিন্দিতা সে সুবিধাটা পাবে। আমার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। তাই এই জায়গাটা আগে মেরামত করে নি। তারপর কুকুর ধরতে হবে। ঋতুজার বরকে আমি পায়ের তলায় না আনলে নাম পালটে নাম রাখব। কত বড়ো সাহস ওর, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। ওর যে কী করতে পারি, সে সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই।

গাড়ি এসেছে, স্টেশনে যাওয়ার। গাড়িতে উঠে শহরটাকে দেখছিলাম। প্রতিটা শহর একরকম হয়, আর যেখানে যত বেশি লোক থাকে, সেখানে তত বেশি কেচ্ছা জন্মায় প্রতিটা কোণে। একটা মেয়ে কাল আমায় ফোন করেছিল। মেয়েটাকে মেসেজ করেছি। জাল পেতে যেতে হবে প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা সময়ে। যে মাছ উঠবে, সে মাছটাকেই ভেজে খেতে হবে।

পুরুষ মাত্রেই পলিগ্যামাস। এটা যারা বোঝে না, তারা বোকা।

ঋতুজা বোঝে, ঋতুজা বুদ্ধিমতী। আমি জানি, ওর বরের থেকে ও ঠিক বেরিয়ে যাবে একদিন, পৃথিবীর কোনও মানুষ আমার কাছে আসা থেকে ওকে আটকাতে পারবে না। আমি ঠিক করেছি এখন আর ঋতুজার সঙ্গে যোগাযোগ করব না। ফিরুক কলকাতায়। আমি নিশ্চিত, ঋতুজা আমাকে ফোন করবেই।

করবেই।

না করে যাবে কোথায়?

৪৬
আত্রেয়ী

ডাক্তার চৌধুরীকে অনিন্দিতাদি দেখায়। ওঁর চেম্বারে ওকে বসে থাকতে দেখে কষ্ট হচ্ছিল খুব। কেমন ভেঙে পড়া চেহারা।

আমি হাত ধরে ছিলাম। অনিন্দিতাদি বলল, "তুই স্কুলটা খামোখা গেলি না আজ আমার জন্য। ঠিক করলি না আত্রেয়ী।"

আমি বললাম, "এই কথাটা বারবার কেন বলছ বলো তো? এভাবে বোলো না। আমার দিদি থাকলে আমি কী করতাম? একা রেখে চলে যেতাম?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আচ্ছা। বলব না। কিন্তু নিজের কেরিয়ারটা পরের জন্য..."

আমি অনিন্দিতাদির হাতে আলতো করে চিমটি কেটে বললাম, "এর বেশি বললে আমি খামচানো শুরু করব কিন্তু। আমার নখ ডেঞ্জারাস।"

অনিন্দিতাদি এত দুঃখেও হাসল। বলল, "আচ্ছা বলব না।"

ডাক্তারবাবু অনিন্দিতাকে দেখে চিনলেন। হাসিমুখে বললেন, "ভালো তো সব?"

অনিন্দিতাদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাইরে বসবি?"

আমি বুঝলাম অনিন্দিতাদি আমার সামনে কথা বলতে চাইছে না। আমি মাথা নাড়লাম, "ঠিক আছে। বসছি।"

বাইরে অনেকগুলো কৌতূহলী চোখ আমায় দেখছিল। স্বাভাবিক, এভাবে চেম্বারে ঢুকে কজন বেরোয়! কিন্তু অনিন্দিতাদির যা মানসিক অবস্থা, কিছু মনে করার জায়গাতেই কেউ থাকবে না।

আমি চুপ করে বসে মোবাইল ঘাঁটতে লাগলাম। অমৃত মেসেজ করেছে একগাদা। অনিরুদ্ধদাকে মেসেজ করেছিলাম বলে বেশ রেগে ছিল। এখন আবার সরি বলে যাচ্ছে। পাগল একটা। হাসি পেলেও হাসলাম না, ওকে একটা অ্যাংরি ইমোজি পাঠিয়ে লিখলাম, "অফিস করো। বিয়ের আগেই চাকরিটা যাবে মনে হচ্ছে তোমার।"

অমৃত লিখল, "বেশ তো, বউয়ের টাকায় খাব। আমার কোনও চাপ নেই।"

আমি লিখলাম, "আচ্ছা খেয়ো, আমি অনিন্দিতাদির সঙ্গে এসেছি, পরে মেসেজ করছি।"

অমৃত লিখল, "তুমি বেশি জড়িয়ে যাচ্ছ না তো?"

এই এক সমস্যা ওভার পজেসিভনেসের। মাঝে মাঝে মনে হয় গলা টিপে ধরছে। আমি লিখলাম, "না, জড়ানোর কিছু নেই। তোমার কোনও কলিগের কিছু হলে তুমি হেল্প করতে না?"

অমৃত লিখল, "তা ঠিক। আচ্ছা টেক কেয়ার।"

আমি হাঁফ ছেড়ে ফোনটা রাখলাম। অমৃতর কোনও কোনও ব্যাপার আমাকে বিরক্তও করে এটা কি ওকে বলা ঠিক? ভাবছিলাম। এটা হয়তো প্রেমের শুরুতে হয়। উথালপাতাল ভাব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচিওরিটি আসবে কোনও দিন নিশ্চয়ই। নইলে তো বড়ো ঝামেলা! কোথায় যাব, কী করব, সব কিছুর যদি জবাবদিহি করতে হয় তাহলে বড়ো সমস্যা হয়।

অনিন্দিতাদি মিনিট পনেরো পরে বেরোল।

চোখে মুখে অস্বস্তিটা বোঝা যাচ্ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাইরে বেরিয়ে বললাম, "কী হল?"

অনিন্দিতাদি বলল, "তুই কিছু মনে করিসনি তো? আমার যে কী হল, তুই সবই জানিস, তবু তোকে বাইরে দাঁড়াতে বলে দিলাম।"

আমি বললাম, "ধুস, সেটা তো বুঝেছি। অস্বস্তি হলে কী করবে? তোমার জায়গায় আমি থাকলেও একই ব্যাপার করতাম হয়তো। তুমি কথা বলে স্যাটিসফায়েড তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "হুঁ, ডক্টর চৌধুরী খুব রেগে গেলেন। অ্যাবরশন এখন করানো যাবেই না বলছেন। আর করা গেলেও উনি অন্তত করবেন না।"

আমি বললাম, "সে কী? তাহলে কী করবে?"

অনিন্দিতাদি দিশেহারা মুখে বলল, "ওর বাচ্চা আমি রাখব না আত্রেয়ী। আমি ওকে সামনে দেখলে সহ্য করতে পারব না বিশ্বাস কর। একটা মানুষ সব বিশ্বাস এভাবে ভেঙে চলে যাবে আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওই লোকটা আমার সঙ্গে শুয়েছে, আমার বাচ্চার বাবা হবে, এসব ভাবলেই আমার কেমন যেন হচ্ছে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, একটা কাজ করি চলো, একটা কাফে আছে এখানে, কফি খাই। দুজনে অন্য কথা বলি। তুমি রিসেন্ট কী কী বই পড়েছ সেসব আলোচনা করি। করবে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "কফি খাব? আচ্ছা, চ।"

দুজনে মিলে কাফেটায় গিয়ে বসলাম। দুটো কফি অর্ডার করে বললাম, "বলো দেখি, কী বই পড়লে?"

অনিন্দিতাদি কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলে বলল, "মনে পড়ছে না বিশ্বাস কর।"

৪৭

কপালকুণ্ডলা

বাড়ির আবহাওয়া ভালো নেই। বাবা আজকাল আমার সঙ্গে ঠিক করে কথা বলে না। মাও ঠারেঠোরে বোঝায় এত বড়ো মেয়েকে বেশিদিন টানা যায় না।

আমি চাপ নিই না।

চাপ নেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। আল বাল ছাল লোকের সঙ্গে বিয়ে করে লাইফের মা মাটি মানুষ করার থেকে জীবনেও বিয়ে না করা অনেক ভালো।

বিয়ে করলে নিজের পছন্দের ছেলের সঙ্গেই করব, নইলে করব না।

মেলার মাঠে সার্কাস এসেছে, দেখতে যাব ভাবছি। কাউকে পাই না।

আমার নবকুমারটাও হয়েছে তেমনি। মুখের দিকে তাকাতেই তার সাহস হয়ে ওঠে না। যেন নতুন বউ। তাও অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে।

ফুলশয্যায় দুধ নিয়ে এসেছে!

এর মধ্যে অবশ্য একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি।

তার জন্য সদুজ্যাঠাই দায়ী। এই তো, গত পরশুর কথা।

নবকুমার দোকান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিয়েছে, আমি ক্যাশে বসে মন দিয়ে তার যাওয়া দেখছি, এমন সময় সদুজ্যাঠা আমার পাশে এসে ফিসফিস করে বলল, "শুধু যাওয়াটা দেখছিস? জীবনে যদি কিছু করতে চাস, তাহলে সাইকেলটা নিয়ে যা। নিজে ঠিক কর, কী করবি।"

কথাগুলো যেন যাত্রাদলের বিবেকের মতো বলল সদুজ্যাঠা।

আমারও যে কী হল, সাইকেলটা নিয়ে জোরে চালিয়ে একদম নবকুমারকে পিছন থেকে দুম করে মেরে দিলাম। নবকুমার ছিটকে পড়ল রাস্তায়। আমিও পড়লাম।

আশপাশের বাড়ির কাকিমারা, যারা আড্ডা মারছিল সব হইহই করে ছুটে এল।

সবাই আমাকে আর নবকুমারকে রাস্তা থেকে ধরে তুলল।

আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিল, নবকুমারের দিকে একবারও তাকাইনি।

এক কাকিমা বলল, "কী রে কপাল, তুই দেখতে পাস না? চোখে ন্যাবা হয়েছে?"

নবকুমারের মুখ আড়চোখে দেখলাম। রেগে গেছে বোঝা যাচ্ছে। আমি বললাম, "আমার যে কী হল, মনে হল মাথাটা ঘুরে গেল।"

কাকিমাদের দঙ্গলে সবাই গালে হাত দিল, বলল, "সে কী রে, তোর মাথা ঘুরাল কেন? কী হয়েছে তোর?"

আমি বুঝলাম এরা অন্য মানে বের করার চেষ্টায় আছে, তাতে প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন হতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেলটা তুলে "আমি আসছি পরে কথা হবে" বলে জোরে প্যাডেলে চাপ দিয়ে ধাঁ হয়ে গেলাম। দোকানে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকতেই সদুজ্যাঠার সামনে পড়লাম। আগ্রহী গলায় সদুজ্যাঠা বলল, "কী রে কিছু পারলি বলতে?"

আমি দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, "আমি কী বলব? মাঝখান দিয়ে সাইকেল দিয়ে গুঁতিয়ে দিয়েছি।"

সদুজ্যাঠা অবাক গলায় বলল, "সে কী রে? গুঁতিয়ে দিয়েছিস মানে?"

আমি চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললাম, "সাইকেল দিয়ে ধাক্কা লেগে গেছে। কী করব বুঝতে না পেরে টেনশনে এই হাল হয়ে গেল।"

সদুজ্যাঠা মাথায় হাত দিয়ে বলল, "হা ঈশ্বর, তোর দ্বারা যদি কিছু হত! শেষে এই কেলোর কীর্তি করলি?"

আমি বললাম, "তুমি বলতে গেলে কেন? আমি তো দিব্যি এখানে বসেই ভালো ছিলাম।"

সদুজ্যাঠা বলল, "তো কী করব? নিজে একা একা গুমরে গুমরে মরিস! আমি এত হেল্প করি তাও কোনও লাভ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে তোর বাবাকেই বলতে হবে।"

আমি হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "একদম না, অনেক উপকার করেছ, আর করতে হবে না। বাবাকে বলার প্রয়োজন নেই।"

সদুজ্যাঠা ফিক ফিক করে হাসছিল।

কালকেও ক্যাশে বসে ছিলাম। নবকুমার খেতে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু আমাকে দেখে এমন একটা দৃষ্টি দিল যে বুঝলাম হেবি রেগে আছে।

আমি রাগতে গিয়েও খুশি হলাম।

যাক, রাগ হোক, দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, কিছুতে তো আমাকে মনে রাখছে। নইলে এতদিন তো ঠিক করে তাকাতও না।

আমার খুব ইচ্ছে করে জানতে, নবকুমার ঘরে গিয়ে কী করে। সেই যে ঘরে গিয়ে ঢোকে, আর তো বেরোয়ও না। কী করতে পারে? টিভি দ্যাখে? টিভিতে কী দ্যাখে?

ঘরে একটা সিসিটিভি বসাতে পারলে ভালো হত। সারাদিন ধরে নবকুমারকে দেখা যেত।

এর মধ্যে একটা খবরে মাথা গরম হয়ে গেল।

সাঁপুইদের ছেলে নাকি বাড়িতে জানিয়েছে, বিয়ে করলে আমাকেই করবে, নইলে করবে না।

শোনা অবধি মাথা কাজ করছে না।

লোকের ঝাঁট জ্বালালেও যে তাদের ভালো লাগে, জীবনে প্রথম দেখলাম মাইরি!

৪৮

জীমূতবাহন

কোথাও আপনি বেড়াতে যাবেন, আর এলাকার লোকের সঙ্গে দেখা হবে না, এটা হতে পারে না। ট্যুরের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঠিক দেখা হয়েই যাবে।

আমাদেরও হল।

রাবংলার বুদ্ধ পার্কে টিকিট কাটছি, বউ কানে কানে বলে দিয়েছে রাত্তিরে আমার সঙ্গে বসে হুইস্কি খাবে, ড্রাইভার বলছে এখানে তাড়াতাড়ি করে নিতে, নামচি যাবার রাস্তার হাল খুব খারাপ, এমন সময় পিঠে একটা থাবড়া এসে পড়ল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি অভিজিৎদা। আমাদের পাড়াতেই থাকত, পরে দিল্লি চলে যায়। আমাকে দেখেই বলল, "আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখে যাচ্ছি, এটা আমাদের জীমূত কি না! তোর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।"

মেঘ রোদের খেলা চলছে রাবংলায়। বুদ্ধমূর্তিকে ঘিরে ধরে রয়েছে মেঘ। পাশের পাহাড়গুলোতে মেঘ ধাক্কা খেয়ে বৃষ্টি হয়ে পড়ছে। আমার মনে পড়ল অভিজিৎদা খুব ভালো আউটসুইং দিত। তখন প্রথম প্রথম পাড়ার মাঠে ডিউস বলে খেলতে গেছি। অভিজিৎদা একটা ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিল। পড়াশুনোতেও ভালো ছিল। কলেজ লাইফে সেই যে বাইরে গেল, তারপর খুব কম পাড়ায় আসে।

আমি হাসলাম, "বাহ। আমিও অবাক হলাম তোমায় দেখে। তুমি কোত্থেকে এলে? দিল্লি থেকেই?"

অভিজিৎদা বলল, "না রে আমি এখন মুম্বইতে শিফট করে গেছি। হানিমুনে এসেছি। এই তো বিয়ে করলাম।"

আমি বললাম, "কবে?"

অভিজিৎদার কাছে তারিখটা শুনে অবাক হলাম। একই দিনে আমরা বিয়ে করেছি। অভিজিৎদা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, "কী কোইন্সিডেন্স রে ভাই। কোথায় তোর বউ?"

আমি বউকে ডাকলাম। অভিজিৎদাও ওর বউকে ডাকল। বউদি মারাঠি। অভিজিতদা বলল, "শাইনিং বুদ্ধতে উঠেছি। রাত্তিরে চলে আসিস। আড্ডা হবে।"

আমার বউ ফস করে বলে বসল, "রাত্রে তো হবে না। রাত্রে আমাদের হুইস্কি পার্টি আছে।"

অভিজিৎদা আমার বউয়ের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে বলল, "বাহ বাহ। দারুণ প্ল্যান তো! তা আমায় তো ডাক্তার হুইস্কি খেতে বারণ করেনি। মীরাকেও করেনি। আচ্ছা থাক, তোমরা প্রাইভেসি চাইলে জোর করব না।"

আমি বললাম, "বিকেলে দেখা যাবে অভিজিৎদা। নামচি থেকে ফিরি আগে। যা অবস্থা!"

অভিজিৎদাবলল, "আচ্ছা। জানাস কিন্তু। আমার কার্ড নে। সিঙ্গল মল্ট খাওয়াব কিন্তু।"

আমি কার্ডটা নিয়ে দাঁত বের করলাম। অভিজিৎদারা বেরিয়ে গেল।

বউ বলল, "আমার কিন্তু লোক একদম ভালো লাগে না।"

আমি বললাম, "আমারও না।"

বউ বলল, "একবারে বারণ করে দিলে পারতে।"

আমি বললাম, "তুমি যা বলেছ তা বারণ করার মতোই হল তো।"

বউ বলল, “তা বটে। আমায় মা আবার শিখিয়ে দিয়েছিল শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মেয়েদের কম কথা বলতে হয়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন কম কথা বলতে হয়? এ আবার কী? আমি আমার মতো কথা বলব, কার বাপের কী? শ্বশুরবাড়ি গেছি মানে কি নিজের সব মান সম্মান গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব নাকি? বাল।”

আমি বললাম, “এই তুমি খিস্তি মারলে কেন? একটা পবিত্র জায়গায় তুমি খিস্তি মেরে দিলে?”

বউ বলল, “বাল খিস্তি নাকি? কে বলেছে তোমায় বাল খিস্তি? বাল একটা ইমোশন। অবশ্য অনিরুদ্ধও খিস্তি পছন্দ করে না। ও আমাকে খিস্তি মারলে বকে।”

আমার মোবাইলে অনিরুদ্ধর পাঠানো গালাগালগুলো ওকে দেখানোর প্রবল ইচ্ছা দমন করে আমি বললাম, “ঠিক আছে, চলো ঘুরি। জায়গাটা বেশ সুন্দর।”

বউ বলল, “অনিরুদ্ধর নাম শুনলে তুমি কথা ঘোরাও কেন? তোমার হিংসা হয়? আচ্ছা তুমি কি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছ?”

হুট করে এই প্রশ্নটার কী উত্তর দেব বুঝতে না পেরে বললাম, “ভালোবাসতে যাব কেন খামোখা? তুমি তো আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে।”

বউ বলল, “রাইট। তারপর তুমি একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে বিয়ে করবে যার কোনও দিন প্রেম ছিল না। হেবি ভালো মামণি হবে। সে তোমার সব কথা শুনবে, তার কোনও সমস্যা থাকবে না...”

আমি বউকে বাধা দিয়ে বললাম, “বিয়ে করতেই হবে এরকম কোনও মানে নেই। একটা বিয়েতেই যা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, তাতে আবার বিয়ে করার কথা ভাবলেই আমার অস্বস্তি হচ্ছে। তুমি বরং এসব কথা ছাড়ো। নিজের কথা ভাবো। অনিরুদ্ধকে নিয়ে সংসার করবে তো? কোরো।”

বউ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ?”

আমি বললাম, “না। এখানে ঝগড়া করার কী আছে? আমাদের মধ্যে সব কথাই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে, নতুন কোনও কথা নেই তো আর। আছে নাকি?”

বউ বলল, “তুমি না বহুত ফালতু লোক। কিছু হলেই চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শোনাও। আমি একটু ঘুরতে চাইছিলাম, তুমি মুডটা নষ্ট করে দিলে।”

আমি বললাম, “তুমিই বা ওই শুয়োরের বাচ্চাটার নাম নিলে কেন? না নিলে কিছু হত না।”

বউ বলল, “এবার পবিত্র জায়গায় কে গালাগাল দিচ্ছে?”

আমি বললাম, “পবিত্র জায়গায় অপবিত্র নামই বা নিলে কেন?”

বউ হেসে ফেলল, “হিংসুটে। মোমো খাওয়াবে?”

আমি গোঁ গোঁ করতে করতে মোমো স্টলের দিকে গেলাম।

৪৯

আত্রেয়ী

অনিন্দিতাদি বাড়ি ফিরে দুপুরে অল্প খেল। একেবারেই খেতে পারছিল না। জোর করে খাওয়ালাম।

অনিন্দিতাদিকে ঘরে শুইয়ে এসে দেখি বাবা টিভি দেখছে।

আমাকে দেখে বলল, “কী রে, সব ঠিক আছে?”

আমি বসলাম। ক্লান্ত গলায় বললাম, “নাহ। কিছুই ঠিক নেই। পারিবারিক সমস্যায় জেরবার অনিন্দিতাদি।”

বাবা চিন্তিত গলায় বলল, “এই চিন্তাটাই তো থাকে। মেয়ের বাবাদের এই চিন্তাটাই থাকে। বিয়ের আগে, আর বিয়ের পরে অনেক তফাত। যার জন্য সব ছেড়ে কোনও মেয়ে বাড়ি ছাড়ে, দেখা যায় সেই ছেলেটাই সবথেকে বেশি কষ্ট দিল জীবনে। এরকম গাদা গাদা একজ্যাম্পল আছে। আবার এমন একজ্যাম্পলও আছে, দেখতে গম্ভীর কোনও লোক, একেবারেই বোরিং পারসোনালিটি, কিন্তু সে ফ্যামিলি লাইফে চমৎকার। মানুষ

চেনা কি এতই সহজ? স্বয়ং রবি ঠাকুরও চিনতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের বড়ো প্রিয় মেয়ে ছিলেন বেলা। রূপে, গুণে অতুলনীয়। যত্ন করে বড়ো করে তুলেছিলেন। মেমসাহেব শিক্ষিকা ছিল বেলার। বড়ো আশা করে তিনি বিহারীলাল বাবুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়বেন বলে বিয়ে দিয়েছিলেন। পরিণামে কী হয়েছিল জানিস? সে মেয়ের ক্ষয় রোগে মৃত্যু হয়েছিল। জামাই পছন্দ করত না রবীন্দ্রনাথ মেয়েকে দেখতে আসুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সময় বাবা মা-ই যে ঠিক তাও নয়। সন্তানেরাও ঠিক হতে পারে। আসলে যে-কোনো সম্পর্ক ব্যাপারটাই বড্ড গোলমেলে। কী থেকে যে কী হয়ে যেতে পারে, কেউ জানে না।"

আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম।

বাবা হুট করে বলল, "হ্যাঁ রে, অমৃতর সঙ্গে তোর সব ঠিকঠাক আছে তো?"

আমি বললাম, "কেন বলো তো?"

বাবা বলল, "এমনি বললাম। ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ ঠিক আছে।"

বাবা টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, "বিয়ের পরে চাকরি নিয়ে ওর কোনও প্রবলেম নেই তো?"

আমি বললাম, "না। কেন হবে প্রবলেম?"

বাবা বলল, "ওই যে তোকে বললাম, মানুষের বিয়ের পর আর বিয়ের আগের চেহারায় অনেক পার্থক্য থাকে। কত উদার লোক বিয়ের পরে বউ পেটায়। কত কিছু দেখলাম। আমাদের পাড়াতেই আছে, দুলুদার ছেলে। ওর বউ অসুস্থ না হয়ে পড়লে কেউ জানতেই পারত না ছেলেটা রেগুলার মদ খেয়ে এসে মেয়েটাকে মারত। অথচ কী সজ্জন চেহারা বল তো?"

আমি বললাম, "তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? অমৃত ভালো ছেলে। এসব বোলো না দয়া করে।"

বাবা বলল, "আমি ভয় দেখাচ্ছি না রে। বয়স হলে বিভিন্ন চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করে। আমার তাই হয়েছে। আর কিছু না। তোর মা থাকলে এই চিন্তাগুলো শেয়ার করতাম। এখন তো সেটা সম্ভব না। তাই তোকে বলি। কদিন আর থাকব, যে কদিন আছি, তোকে যেন ভালো দেখে যেতে পারি।"

আমার বুকের মধ্যে একটা কষ্ট দলা পাকিয়ে এল। আমি বললাম, "কী বলছ বলো তো বাবা? তোমার কী হয়েছে? এমন বলছ কেন? আচ্ছা আমায় বলো অমৃতর মধ্যে কি খারাপ কিছু দেখেছ?"

বাবা হাসল এবার, "না না, ধুস, সে সব কিছু না। এগুলো রিটায়ার্ড মানুষের দুঃখবিলাস। আচ্ছা ভাব না, বিয়ের পর তুই যখন থাকবি না, তখন তো আমি একা হয়ে যাব। সেটা ভাবলেও তো কষ্ট লাগে। যখন অফিস করতাম, তখন এসব ভাবতাম না, তোর মার ওপর ছেড়ে দিতাম। এখন বাড়িতে থাকি, তোর মা নেই, স্বাভাবিকভাবেই যত উলটোপালটা চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সবই ইনসিকিউরিটি থেকে আসে। অমৃত চমৎকার ছেলে। ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য আছে। ও তোকে খারাপ রাখবে না। ওর বাবাও যথেষ্ট সজ্জন মানুষ। ভালো পরিবার। পরিবার ঠিক না থাকলে আমি আপত্তি করতাম বই কি।"

আমি হাঁফ ছাড়লাম, "তুমি ভেবো না। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়েও ভেবো না। আমায় কেউ মারলে আমি মার খাবার পাবলিক না, দু ঘা আমিও দিয়ে দেব।"

বাবা বলল, "হ্যাঁ, তা তুই পারবি। ঝাঁসির রানি তো।"

আমি বাবার ভুঁড়িতে ঘুসি মারলাম, "একদম উলটোপালটা ভেবো না তো। এসব ভেবে প্রেশার সুগার বাড়িয়ো না দয়া করে।"

বাবা বলল, "ভাবিস না, নাতি নাতনির মুখ না দেখে আমি মরছি না।"

আমি কপালে হাত দিয়ে বললাম, "এসব কী কথা বাবা?"

বাবা কিছু একটা হেসে বলতে যাচ্ছিল, দরজায় অনিন্দিতাদি তৈরি হয়ে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "আত্রেয়ী, আমি একটু বেরোচ্ছি। অনিরুদ্ধ ফোন করেছিল, কথা বলতে চায়।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কোথায় যাবে? এখানেও তো কথা বলতে পারতে।"

অনিন্দিতাদি ইতস্তত করে বলল, "না রে, এখানে আর কিছু বলব না। আমি বরং তোকে ফোনে সব বলব। এখন বেরোই।"

আমি বললাম, "আচ্ছা। ঠিক আছে। একা পারবে তো?"

অনিন্দিতাদি বলল, "পারব। আমি বেরোচ্ছি।"

আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে অনিন্দিতাদি বেরিয়ে গেল।

আমি বুঝে উঠতে পারলাম না হঠাৎ করে কী হল।

৫০

জীমূতবাহন

পাহাড়ের মধ্যে একটা অদ্ভুত মায়া আছে। না চাইতেও সে শক্তপোক্ত মানুষকেও কবি বানিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। রাবংলার সে গুণটা আরও বেশি আছে।

লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ি পথ ধরতেই মেঘ এসে ধাক্কা খাচ্ছে পাহাড়ে, সেখানেই বৃষ্টি হচ্ছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। আমি মুগ্ধ হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম, বউ বলল, "কলকাতা পচা জায়গা।"

আমি বললাম, "হুঁ। তবু পেটের ভাত দেয়।"

বউ বলল, "দিক। তাতে কী? আমার ভালো লাগে না। এখানে থেকে যেতে ইচ্ছা করছে।"

আমি বললাম, "অনিরুদ্ধকে নিয়ে? ও কি বউ ছেড়ে আসতে পারবে?"

বউ বলল, "ঠিক আসবে। আমি অপেক্ষা করব।"

আমার মনে হল আমার শরীরের ভেতরে কেউ কেরোসিন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। যেটুকু ভালো লাগা এসেছিল, এই কথায় সব কোথায় যেন চলে গেল।

শুধু বললাম, "ওহ্।"

বউ বলল, "অনি পাহাড় খুব পছন্দ করে। কতবার আমরা ঠিক করেছিলাম পাহাড়ে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর করে থাকব।"

আমি চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, "ও।"

বউ বলল, "এখানে জমি কিনে বাড়ি করার প্রসিডিওর জানো?"

আমি বললাম, "তোমার অনিরুদ্ধকে জিজ্ঞেস কোরো। আমি কী করে জানব?"

বউ বলল, "কী করে জিজ্ঞেস করব? ফোন তো তুমি ভেঙে দিলে।"

আমি আমার ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, "এ নাও, ফোন করো।"

বউ বলল, "থাক। লাগবে না।"

আমি বললাম, "লাগবে। কথা বলো। ওকে মিস করছ বুঝতে পারছি।"

বউ জানলার বাইরে মুখ করে বলল, "মিস করার কিছু হয়নি। ভালোবাসাটা একটা অভ্যাস। অনিরুদ্ধ একটা সময়ে না থাকলে আমি চরম একাকিত্বে ভুগতাম। সেটা আমার জন্য মোটেও ভালো হত না। মেন্টাল সাপোর্ট যে দেয়, তার প্রতি একটা সফট কর্নার তৈরি হবেই।"

আমি আর কিছু বললাম না। গাড়ি পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলছিল। আমি সেদিকে মন দিলাম। বুঝতে পারছিলাম যত বেশি ওর কথা শুনব, তত আমার মেজাজ খারাপ হবে।

খানিকটা এগিয়ে নামচির পথ ধরতে দেখা গেল রাস্তায় গাছ পড়েছে। জ্যাম লেগে গেছে।

বউ বলল, "প্রতি পদে বাধা আসছে। ধুস!"

আমি রাস্তায় নেমে এগিয়ে গেলাম। মেশিন আছে কাছাকাছি। আসবে নিশ্চয়ই শিগগিরি। ড্রাইভারেরা অলস হয়ে হাসিঠাট্টা করছে। পাহাড়ের দিক থেকে আর-একটা গাছও বিপজ্জনক ভাবে ঝুলছে। মনে হল

যে-কোনো সময় পড়ে যাবে। আমি সেদিকে সভয়ে তাকাতে তাকাতে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডানদিকে গভীর খাত, বাঁদিকে চড়াই পাহাড়। আমার মনে হল আমার জীবনটাও এখন এরকম হয়ে গেছে। যেদিকেই যাব, কিছুই পাব না।

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল, জীবনে তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি, নাক মুখ গুঁজে পড়াশুনা করেছি, চাকরি করছি ভালো ছেলের মতো, এরকম একটা লাইফ পেলাম... কী করে? কর্মফল না কী বলে, আমি কি কোনও পাপ করেছিলাম কোনও কালে যে এরকম একটা জীবন হল?

বউয়ের প্রতি অসহ্য একটা রাগ হচ্ছিল কেন জানি না। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে ওকে খাদে ফেলে দিই। একটা মানুষের জীবনকে এভাবে নষ্ট করার অধিকার এরা পায় কোত্থেকে? অনিরুদ্ধকে পেলে আমি ছাড়ব না। কপালে দুঃখ আছে ওর।

চোয়াল শক্ত হল আমার।

মেশিন এসে রাস্তা পরিষ্কার করল কিছুক্ষণ পরে। গাড়িতে গিয়ে দেখলাম বউ যথারীতি ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি গাড়ির ভেতর বসতে করুণ মুখে বউ বলল, "বাথরুম পেয়েছে। পেটটা কেমন করছে।"

বৃষ্টি এসে গেছিল। আমি জানলার কাচ তুলতে তুলতে বললাম, "অনিরুদ্ধকে বলে দাও। নিয়ে গিয়ে করিয়ে নিয়ে আসবে।"

বউ বলল, "অনিরুদ্ধ তো নেই এখানে। তুমি আছ, তুমি ব্যবস্থা করো।"

আমি বললাম, "চেপে বসে থাকো। কোনও পেট্রোল পাম্পে ব্যবস্থা করা যায় নাকি দেখছি। এই রাস্তাঘাটে হাগু পাওয়া নিয়ে তোমার অমলকান্তি কোনও কবিতা লেখেনি?"

বউ মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'ফালতু কথা বোলো না এখন। আমার কেমন করছে পেটটা। মোমোর পরে কফি খাওয়া উচিত হয়নি।"

আমি হাসিমুখে বললাম, "উপরওয়ালা আছেন। উনি ঠিক আমার কষ্টটা বুঝেছেন, বেশ হয়েছে।"

বলেই টের পেলাম আমারও পেটটা কেমন কেমন করছে।

৫১

অনিরুদ্ধ

একটা সময় ছিল, যখন ভাবতাম মেয়েরা অন্য গ্রহের প্রাণী। ভয় পেতাম, কথা বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যেত। হাজার রকম ইনসিকিউরিটি চলে আসত।

সময় গেল, যত বড়ো হলাম, যত বিভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে মিশলাম, বুঝলাম মেয়ে হ্যান্ডলিং-এর মতো সহজ কাজ পৃথিবীতে কিছু নেই। আরও বুঝলাম, মেয়েরা কিছু চায় না। কিচ্ছু না। সময় চায়। যত বেশি সময় দেবে, তত তারা ছেলেদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। ঋতুজার ক্ষেত্রেই দেখেছি।

ঋতুজা প্রথমে আমাকে দূর ছাই করত। পাত্তা দিত না। আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। কথা বলে গেছি। দশটা কথায় একটা রিপ্লাই দিত। একদিন হঠাৎ করেই হয়তো, সেদিন যাদের সঙ্গে কথা বলত তারা অনলাইনে ছিল না হবে, আমার সঙ্গে অনেক কথা বলে ফেলল। আমি সেদিনের পরে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য আগে যেমন হাভাতেপনা করতাম, সেটা কমিয়ে দিলাম। ইনফ্যাক্ট পাত্তা দেওয়াই ছেড়ে দিলাম। ব্যস, আর পায় কে, মেয়ে যেই বুঝল ওর ওপর হয়তো আমি ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলেছি, ইগোতে নিয়ে নিল। নিজে থেকে এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। আমি সময় নিয়ে গেলাম। ঋতুজা জানতও না আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। গোটা ব্যাপারটাকে এমনভাবে ওর কাছে সাজালাম, যেন আমি না, আমার বন্ধুরা জোর করে আমাকে বিয়ে করাচ্ছে।

পৃথিবীর কোন বিয়ে কারও অনিচ্ছায় হয় না। আমারটাও হয়নি। ভেতরে ভেতরে অবশ্য আমি নাটকটা চালিয়ে গেছিলাম ঋতুজার সঙ্গে। ফুলশয্যায়, অনিন্দিতার সঙ্গে শুয়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে ঋতুজাকে টেক্সট

করে লিখেছিলাম, “খুব মিস করছি তোমায়।”

ঋতুজা উলটে আমাকে বুঝিয়ে গেছে, এরকম বলে না, বিয়ে করেছ, সংসার করার চেষ্টা করো। কনভারসেশনগুলো পড়েছি, আর নিজের মনেই ফিক ফিক করে হেসেছি। জানি তো, মেয়েরা কিছু চায় না। সময় চায় শুধু।

অনিন্দিতার সঙ্গে আমার রেজিস্ট্রি না হলে আমি জীবনেও এত কষ্ট করে কলকাতা আসতাম না।

ফোনে ওকে যখন দেখা করতে বললাম, প্রথমে গাঁইগুঁই শুরু করল। আমি সেন্টুর ভাণ্ডার খুললাম, “শোনো, আমি জানি আমি মারাত্মক ভুল করেছি। তোমাকে ঠকিয়েছি। আমাকে যা শাস্তি দেওয়ার দাও, জেলে দাও, আমি কিচ্ছু বলব না, কিন্তু আমার সঙ্গে শেষবারের মতো একবার দেখা করো।”

অনিন্দিতা গলেছে। অরিজিতের ফ্ল্যাটের চাবি ছিল আমার কাছে। ওখানে আসতে বলেছিলাম।

যখন দরজা খুললাম, দেখলাম মুখ থমথমে।

আমি ইচ্ছা করলেই ওকে ধরতে পারতাম, কিন্তু ধরলাম না। এই সময়ের নিয়ম আছে, রেগে থাকলে ছুঁতে নেই। বেশি অনুনয় করলে মাথায় চেপে বসবে। ব্যালান্সের খেলায় কখনও মেয়েকে মাথায় চড়তে দিতে নেই।

দরজা ছেড়ে দিলাম, অনিন্দিতা ঘরের ভিতরে গেল।

আমি হালকা গলায় বললাম, “বসো।”

অনিন্দিতা বলল, “আমি বসতে আসিনি, তোমার যা বলার বলে দাও, আমি চলে যাই।”

আমি দেখলাম পারদ চড়ছে। এবার মেয়ে মাত্রেই মা, অন্য দিক দিয়ে সেন্টু দিলে বরফ গলতেই পারে। বললাম, “আমি সেই ভুবনেশ্বর থেকে এলাম তো, পারছি না, শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না কদিন ধরে। খাওয়া হয়নি কিছু। আমি বসি?”

অনিন্দিতা কঠিন গলায় বলল, “বসো।”

আমি বললাম, “প্লিজ বসো।”

অনিন্দিতা শক্ত হয়ে বসল।

আমি ওর উলটোদিকে বসে যতটা পারি কাঁদো কাঁদো অথচ দৃঢ় গলায় বললাম, “আমি জানি, আমি যা করেছি তার কোনও ক্ষমা হয় না। একই সঙ্গে আমি দুটো মেয়েকে ভালবেসেছি। বিশ্বাস কর, আমি ভালোই বেসেছি, এর বাইরে কিছু না। এক অদ্ভুত টানাপোড়েনে জড়িয়ে গেছিলাম। বিয়ের আগে থেকেই ঋতুজার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। সেটা যে বিয়ের পরে কীভাবে থেকে গেল বুঝিনি। কী বলব তোমায়...”

চুপ করে গিয়ে মাথা নিচু করলাম। পালস বোঝার জন্য। আমার কথার ঠিক কী উত্তর আসে জানতে হবে।

অনিন্দিতা বলল, “ভয় পেয়ো না, তোমাকে আমি কোনও রকম কোনও ঝামেলায় জড়াব না। ডিভোর্সটা মিউচুয়ালি করে ফেললে ভালো হয়। আর বাচ্চাটাকে আমি রাখব না।”

আমি বমি করার ভাব করলাম। জোরে জোরে ওয়াক টানতে টানতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে থুতু ফেলতে লাগলাম আর কাঁদতে শুরু করলাম। অনিন্দিতা শক্ত ছিল এতক্ষণ, আমাকে এরকম করতে দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, “কী হয়েছে তোমার?”

আমি বললাম, “এক ধরনের রোগ। তোমাকে বলিনি আগে। এই রোগে মনের সমস্ত যন্ত্রণা শরীরে চলে আসে। আমি ছটফট করছি সারাদিন ধরে, যতবার ভাবছি ঋতুজার ব্যাপারে, আমি মাটিতে মিশে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো অনিন্দিতা, ঋতুজার সঙ্গে আমার কিছু নেই। ওর বিয়ে হয়ে গেছে।”

অনিন্দিতা জল নিয়ে এসে আমার গায়ে মাথায় দিতে দিতে বলল, “ঠিক আছে, সেসব পরে দেখা যাবে। এখন ডাক্তার দেখালে ভালো হয়।”

আমি হাঁফ ছাড়লাম।

এ ধরনের ড্যামেজ কন্ট্রোল রাহুল দ্রাবিড়ের ব্যাটিং-এর মতো। লোপ্পা বলে হাজারো লোভ থাকলেও বল শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে খেলে যেতে হবে। একটা একটা রান।

জয় হবেই।

পর্যাপ্ত পরিমাণে সেন্টু দিলে মেয়েরা গলবেই।

অনিন্দিতা তো শিশু আমার লেভেলের পাবলিকের কাছে।

মেঝেতে শুয়ে অজ্ঞান হবার ভান করলাম।

অনিন্দিতা জল খাইয়ে দিল আমার মাথাটা ওর কোলে নিয়ে।

আমি মনে মনে হাসতে লাগলাম।

৫২

অমৃত

যে দেখা হওয়াটা রোজ হত, যে কথাটা রোজ হত, সেটাই হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে অস্বস্তি হয়। দম বন্ধ হয়ে আসে। আত্রেয়ীকে ফোনে পাচ্ছি না, পেলেও ঠিক করে কথা বলছে না, দেখা করতে চাইছে না, আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল।

কোনও মতে অফিস শেষ করে বাইক নিয়ে রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। ভালো লাগছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল আত্রেয়ী আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক করলাম আর ফোন করব না। যে কাফেটায় আমরা বসে কফি খাই, সেটায় ঢুকলাম। একটা কফি নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

প্রেম করার সময় কাউকে দেখতে পাই না আত্রেয়ীকে ছাড়া। আর এখন আত্রেয়ী নেই, সবাইকে চোখে লাগছে। ওই যে কোণে দুজন বসে বসে খুনসুটি করছে কিংবা এক ভদ্রমহিলা এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে বসে আছেন, এসব দেখতে দেখতে ফোনে আত্রেয়ী আর আমার ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে পরম নিশ্চিন্ততায়। দেখলে মনটা শান্ত হয়। চোখ বন্ধ করে আত্রেয়ীর আদরগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম।

মনে করার চেষ্টা করলাম এই কাফেতেই দুজনে দুজনের হাত চেপে ধরা। ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট মিশে যাওয়ার কথা মনে করলাম চোখ বন্ধ করে। নিজের মনকে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আত্রেয়ী আমার। শুধু আমার। আর কারও নয়। সমস্ত রকম সমস্যা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবেই ও। ওকে আসতেই হবে আমার কাছে।

ফোনটা বেজে উঠল, আত্রেয়ী ফোন করছে ভেবে তড়িঘড়ি সেটা হাতে নিতে দেখলাম বউদি ফোন করছে, ধরলাম, “বলো।”

বউদি বলল, “এই অমু, তুমি কোথায়? ফিরতে দেরি হবে?”

আমি বললাম, “তা একটু হবে, কেন বলো তো?”

বউদি বলল, “শোনো না, আমার বেশ কয়েকটা জিনিস দরকার। তোমার দাদা বাসন্তী পোলাও করতে বলেছিল সকালবেলা, এখন দেখছি গোবিন্দভোগ চালটাই নেই। আর কাজু কিশমিশও লাগবে। তোমার দাদাকে ফোন করছি, বলল, অফিসে ব্যস্ত আছে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তুমি পারবে আনতে? আমিই বেরোতাম, কিন্তু একগাদা কাজ পড়ে আছে...”

আমি বললাম, “না না, তোমাকে বেরোতে হবে না। আমি নিয়ে যাব, ভেবো না।”

বউদি বলল, “ঠিক আছে। তুমি কোথায়? আত্রেয়ী আছে নাকি আশেপাশে? দাও না, একটু কথা বলি।”

আমি বললাম, “ধুস, নেই এখন। যখন থাকবে তখন দেব।”

বউদি বলল, “যাহ্, আমি ভাবলাম আছে বোধহয়। ঝগড়া করোনি তো আবার?”

আমি বললাম, “না। আমি কি ঝগড়ুটে নাকি? এই চিনলে অ্যাদ্দিনে?”

বউদি বলল, "ঝগড়ুটে না হলেও তুমি শর্ট টেম্পারড খুব। আর অধৈর্যও হয়ে পড়ো অল্পে। হুটহাট মাথা গরম কোরো না। বুঝলে ভাইটি?"

আমি বললাম, "বুঝেছি। আর কিছু বলবে?"

বউদি হাসল, "যেগুলো আনতে বললাম, এনো। ভুলো না। হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখব?"

আমি বললাম, "না না লাগবে না। মনে থাকবে, রাখি।"

ফোনটা কাটলাম। আত্রেয়ী ফোন করছিল লক্ষ করিনি। কল ওয়েটিং নোটিফিকেশন এসেছিল বুঝিনি। দুটো মিসড কল দেখাচ্ছে।

তড়িঘড়ি ফোন করলাম। একবার রিং হতেই আত্রেয়ী ধরল, বলল, "কার সঙ্গে কথা বলছিলে?"

আমি বললাম, "বউদি।"

আত্রেয়ী বলল, "ও। আমি ভাবলাম কাউকে জুটিয়েছ নাকি!"

আমি বললাম, "এত তাড়াতাড়ি কেউ জুটে গেলে গিনেস বুকে নাম উঠবে তো। সম্ভব এত তাড়াতাড়ি কাউকে জোটানো?"

আত্রেয়ী বলল, "অনিন্দিতাদির বর পারলে সবাই পারবে হয়তো। আমার আজকাল পুরুষমানুষের ওপর ভরসাটাই উঠে যাচ্ছে।"

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, "কার বর কী করেছে তার জন্য আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমাকে দেখে কি তোমার ফ্রড মনে হয়? আমি যে আদর করেছি, সেগুলো সব মিথ্যা বলে মনে হয়?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি এত জোরে কথা বলছ কেন? কোথায় আছ তুমি?"

আমি বললাম, "কাফেতে।"

আত্রেয়ী বলল, "কাফেতে কী করছ?"

আমি বললাম, "একাকিত্ব উদযাপন করছি। তুমি তো আমাকে ভুলেই গেছ।"

আত্রেয়ী বলল, "আমি তোমাকে ভুলে গেছি? এই কথাটা তুমি বলতে পারলে?"

আমি বললাম, "একবার ফোন করে দু-চারটে চুমু খেলেই হত। সেটা যখন করোনি, মন তো খারাপ হবেই বলো।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি জানো না আমি মানসিকভাবে কতটা ডিস্টার্বড হয়ে গেছি। আমার মুডটা ভীষণ অফ হয়ে গেছে। আর এরকম যখন হয়, তখন সেটা থেকে রিকভার করতে অনেক সময় লাগে আমার।"

আমি বললাম, "হুঁ। ঠিক আছে। সময় নাও। আমি একা বোকা হয়ে ঘুরে বেড়াই। রাখলাম।"

আত্রেয়ী বলল, "রাগ করলে?"

আমি বললাম, "নাহ। রাখি।"

আত্রেয়ী কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি না শুনে ফোনটা কেটে দিলাম।

রাগ দেখাতে গিয়ে মন খারাপটা আরও বেড়ে গেল।

মহা জ্বালা বালের প্রেম করে!

৫৩

আত্রেয়ী

আমার আজকাল মনে হয়, অমৃতর সঙ্গে সম্পর্কটা আমাকে হঠাৎ করে বড়ো করে দিয়েছে। আমার থেকে অমৃত বয়সে বড়ো হলে কী হবে, ওর শৈশব এখনও কাটেনি।

এরকম করবে কেন নইলে? আমি তো রোজই দেখা করি। দু তিন দিন করতে পারছি না বলে এরকম পাগলামি করার কী আছে? আমার যদি মনে হয় আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, সেটা বললেও এরকম উত্তেজিত হয়ে পড়লে তো ভারী বিপদ!

ফোনটা রাখার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল পাগলটা। তারপর হোয়াটসঅ্যাপ করল, "তুমি কি আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে চাও আত্রেয়ী?"

আমি মেসেজটা দেখে বিরক্ত হয়ে ফোন করলাম। ফোন তুলল না।

লিখলাম, "ফোন তুলছ না কেন?"

অমৃত লিখল, "তুলব না। মেসেজে উত্তর দাও। তুমি কি আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে চাও?"

আমি লিখলাম, "এরকম উদ্ভট কথা মনে হল কেন তোমার?"

"এই তো, তুমি যে বললে..."

"কী? কী বললাম?"

"এই যে বললে তুমি ছেলেদের বিশ্বাস করতে পারছ না। কী যেন ওই লোকটা... ওর জন্য।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "আমার মনে হয়েছিল হঠাৎ করে বলে ফেলেছি। এর মানে ব্রেক আপ করা কেন হবে?"

"ও। আচ্ছা।"

"তুমি এখনও কাফেতে বসে আছ?"

"হুঁ।"

"বাড়ি যাও। বাইক চালিয়ে সাবধানে ফিরবে।"

"যাব না। তোমার কোনও কথা শুনব না।"

"এ কেমন পাগলামি?"

"পাগলামি বললে পাগলামি। আমার ভালো লাগছে না কিছু।"

"কী চাও? চুমু? এ নাও।" একগাদা চুমুর স্মাইলি পাঠালাম।

"লাগবে না। তুমি আমাকে অ্যাভয়েড করছ। আমি বুঝে গেছি। কী হয়েছে? বাবা কোনও সম্বন্ধ দেখেছে নাকি?"

আমি রাগি ইমোজি দিলাম কয়েকটা। দিয়ে লিখলাম, "এসব কী বলছ? আচ্ছা আমার কি মুড অফ হতে নেই?"

"হতে আছে। তুমি আমাকে ভালোবাস তো আত্রেয়ী?"

"বাসি। কীভাবে প্রমাণ করব বলো? প্রমাণ দিচ্ছি।"

"প্রমাণ করলে হবে না। আমাকে বললেই হবে। আমার ভালো লাগছে না কিছু বিশ্বাস করো। তুমি না থাকলে আমার মনে হয় সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা অসহ্য কষ্ট হচ্ছে।"

"আচ্ছা। তুমি যদি ভাবো আমার এরকম কিছু হয় না তাহলে ভুল ভাবো। তুমি বাড়ি যাও। এসব দয়া করে ভেবো না।"

"কাল দেখা করবে বলো।"

"তুমি আজই এসো। বাড়ি চলে এসো। খুশি?"

"না বাড়ি যাব না। আমার এক হাজারটা চুমু লাগবে আমার আত্রেয়ী বউয়ের থেকে।"

হেসে ফেললাম। লিখলাম, "ঠিক আছে। দুহাজারটা চুমু দেব। এবার বাড়ি যাবে?"

"যাচ্ছি।"

"ভালো থেকো। গিয়ে মেসেজ করবে। পাগলামি কোরো না দয়া করে।"

"আমি তো পাগলই সোনা। তোমার জন্য।"

"হুঁ। হয়েছে। এবার যাও।"

"যাচ্ছি। ভালোবাসি।"

"ভালোবাসি।"

ফোনটা রাখলাম। ঠোঁটের কোণে হাসি এল একটা।

অবুঝ ভালোবাসার একটা অদ্ভুত শক্তি আছে। কেমন সব মন খারাপ দূর করে দেয়। আমার মনে হচ্ছিল অমৃত আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। চোখে বন্ধ করে ওর চোখ দুটো, নাক, ঠোঁট মনে করতে লাগলাম। সব সময় ছটফট করছে যেন। প্রেম পেতে শুরু করল হঠাৎ করেই।

আরও কিছু ভাবতে যাচ্ছিলাম, কলিং বেল বাজল। বাবা হাঁটতে বেরিয়েছে। আমি দরজা খুলে দেখলাম অনিন্দিতাদি দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, "কী গো, কী খবর?"

অনিন্দিতাদি চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "ও বারবার ক্ষমা চাইল। আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে।"

আমি কয়েক সেকেন্ড অনিন্দিতাদির দিকে তাকিয়ে বললাম, "আচ্ছা। তুমি কী বললে?"

অনিন্দিতাদি বলল, "ক্যাবে বসে আছে বাইরে। আমি ব্যাগ নিতে এলাম।"

আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো বলল অনিন্দিতাদি।

আমি বললাম, "আচ্ছা। তুমি কী করছ, ভেবে নিয়েছ তো?"

অনিন্দিতাদি আমার দু হাত ধরে বলল, "আর কটা দিন দেখি। তুই রাগ করলি না তো?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না না ছি ছি, রাগ করব কেন? তুমি দেখতে চাইলে দেখো। কোনও অসুবিধা নেই। ভালো থাকো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে অনিন্দিতাদি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অনিরুদ্ধদা ক্যাবেই বসে ছিল। নামল না।

আমার প্রবল অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এত সহজে সব কিছু মিটে যায় না।

যেতে পারে না।

৫৪

জীমূতবাহন

আমি দেখেছি সাইট সিয়িং জিনিসটা আমার সঙ্গে যায় না।

মানে কোথাও বেড়াতে গিয়ে পাগলের মতো চরকি ঘোরার মানে কী? অফিস করে ক্লান্ত হয়ে হয়েই তো লোকে বেড়াতে যায় রে বাবা! সেখানে আবার নতুন করে ক্লান্ত হবার দরকারটা কী?

ঘণ্টাখানেক নিম্নচাপ সামলে রাস্তায় গাড়ি যখন ছাড়ল, ড্রাইভারকে বলে বলে একটা পেট্রোল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করানো গেল।

বউ আর আমি একসঙ্গেই ছুটলাম। এই সব তীব্র কষ্টের পর কি আর ঘোরা সম্ভব? ফলশ্রুতি হল হালকা হয়ে ড্রাইভারকে বলে ফের রাবংলার পথেই রওনা হওয়া গেল।

বউ আমার দিকে ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "এইজন্য বলে পরের কষ্টে আনন্দ পেতে নেই।"

আমি রাগি গলায় বললাম, "হুঁ। খুশি হয়েছ তো?"

বউ বলল, "হেবি। এই তুমি সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছ তো?"

আমি বললাম, "কেন ধোব না? আমাকে কী মনে হয়? ধুই না? নিজে ধুয়েছ?"

বউ বলল, "ধুয়েছি। আসলে তুমি সব সময় এমন তিরিক্ষে মেজাজে থাকো, হতেই পারে, এমন রেগে গেলে যে সাবান দিয়ে হাত ধুতেই ভুলে গেছ। হতেই পারে তো, তাই না?"

আমি বললাম, "এসব ফালতু প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আমার নেই। তুমি পাহাড় দ্যাখো না। কী সুন্দর সবুজ পাহাড়, এত সুন্দর পরিবেশে তোমার মাথায় এখনও এসব ঘুরছে কেন?"

বউ বলল, "আমার যখনই মনে পড়ছে আমার ওপর আপারহ্যান্ড নিতে গিয়ে তোমারও নিম্নচাপ এসে গেছিল, তখনই ভীষণ হাসি পেয়ে যাচ্ছে।"

আমি বললাম, "এক কাজ করো, তুমি একবারে হেসে নাও। গাড়ি দাঁড় করাতে বলব?"

বউ বলল, "না না, দরকার নেই। আমার এখন ম্যাগি খেতে ইচ্ছা করছে, ড্রাইভারকে বলে রাখো, যেখানেই পাওয়া যায়, গাড়ি দাঁড় করায় যেন।"

আমি বললাম, "হোটেলে ফিরে যত ইচ্ছা খেয়ো। আবার যদি কোথাও গাছ-টাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, আর-এক কেলোর কীর্তি হবে।"

বউ বলল, "কিছু কেলোর কীর্তি হবে না, কী আর হবে, সারারাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাহাড়ে এসেছ যখন, সব রকম এক্সপেরিয়েন্স করে নাও। মনের মধ্যে সারাক্ষণ বিষ পুষে রাখা ভালো না, বুঝলে?"

আমি বললাম, "সারাক্ষণ অন্যের সংসার ভাঙার কথা ভাবার থেকে মনে বিষ পুষে রাখা ভালো।"

বউ বলল, "মানে? অন্যের সংসার ভাঙা মানে? আমি কোথায় অন্যের সংসার ভেঙেছি?"

আমি বললাম, "অনিন্দিতার সংসার ভাঙছ। একটুও আগে পিছে না ভেবে ভাঙছ। মনে বিন্দুমাত্র পাপবোধ না রেখে ভাঙছ।"

বউ বলল, "শোনো, তুমি এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। তোমার বিন্দুমাত্র সেন্সিটিভ মন থাকলে এসব নিয়ে ভাবতে না।"

আমি বললাম, "সেন্সিটিভ মনের ভাই হয়েছে। সেন্সিটিভের কী আছে? দামড়া ছেলে মেয়ে, অতই যদি প্রেম তবে বিয়ে করে দুজনের জীবন নষ্ট করার কী দরকার ছিল? নিজেদের মধ্যে বিয়ে করে নিজে নিজে মারামারি করে মরলেই পারতে? অবশ্য এখন তাই করবে। এই টাইপের পাবলিকের সঙ্গে দুদিন থাকো না, তাহলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল।"

বউ বলল, "আমার এই সব কথা ভাল্লাগছে না। তুমি টপিক চেঞ্জ করবে? আমি তো তোমাকে বলেছি, ফিরে গিয়ে ডিভোর্স দিয়ে দেব। কেন শুধু শুধু অনিকে টানছ বলো তো?"

আমি গুম হয়ে বসে বললাম, "কষ্ট হয় খুব?"

বউ বলল, "তোমার এ কথার আমি উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

মাথায় আগুন জ্বলছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললাম, "দিয়ো না। তোমার সে বোধ বুদ্ধি থাকলে ওই জন্তুটার সঙ্গে যেতেও না তুমি। গান্ডু কি আর গাছে ফলে?"

বউ বলল, "তুমি আমাকে গান্ডু বললে?"

আমি বললাম, "খারাপ লাগল? গাড়ি থেকে নেমে যেতে পারো। এক কাজ করো, তুমি বরং নেমেই যাও, নেমে তোমার অনিরুদ্ধকে খবর দাও। লাফাতে লাফাতে এসে বানচোদটা তোমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাক।"

বউ থমথমে গলায় বলল, "তুমি এরকম করলে তাই করতে হবে। আমি কদিন এসব ভুলে থাকতে চাইছিলাম। তুমি সেটা দেবে না, তাই না?"

আমি বললাম, "আমার যখনই মনে পড়ে, আমার জীবন, অনিন্দিতার জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছ, আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে।"

বউ বলল, "ঠিক আছে। আগুনটা কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা যায় না? কলকাতা গিয়ে নাহয় সেটায় ফুঁ দিয়ো।"

আমি জানলার বাইরে তাকালাম। প্রকৃতিও চুপ মেরে গেছে।

ড্রাইভারকে বললাম, যে দোকানে ম্যাগি পাওয়া যাবে সে দোকানে দাঁড়াতে।

বউ বলল, "লাগবে না। আমার খিদে চলে গেছে।"

আমি বললাম, "তুমি খেয়ো না। আমি খাব। খেতে হবে না তোমায়।"

বউ আর কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল আমি স্পষ্ট বুঝলাম।

এরকম ইচ্ছাঘুম হলে জীবনটা এত অসহ্য হত না বোধহয় আমার।

৫৫
অনিরুদ্ধ

ঋতুজাকে আমার এমনি এমনি ভালো লাগেনি।

ঋতুজা এমনি এমনি আমার অভ্যাস হয়ে ওঠেনি।

একটা মেয়ের সঙ্গে শোয়ার পর আমি তার ওপর থেকে সমস্ত ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলি।

শোয়া হয়ে গেলে তো মেয়েটার সমস্ত রহস্যই শেষ হয়ে গেল।

তার আগে মেয়েটা কত রকম কথা বলে, তার সঙ্গে সময় দিই, সমস্ত কথায় পার্টিসিপেট করি।

শোয়ার পরও মেয়েটা কথা বলে।

আমি ছুতো খুঁজি পালাবার।

ঋতুজা শোয়ার পরে নানারকম পাগলামি করে। এইজন্য ওকে আমার ভালো লাগে।

ভালোবাসা অবশ্য অন্য জিনিস। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আজ অবধি আমি কাউকে ভালোবাসিনি। ভালোবাসা অত সহজ জিনিসই না।

এখন রাত একটা।

তুমুল ভালোবাসা, শারীরিক সম্পর্কের পরে অনিন্দিতা আমার পাশে ঘুমাচ্ছে সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে। আমার বুকে ওর একটা হাত। ওকে আমি বুঝিয়েছি, ঋতুজা পাস্ট। আমার ভবিষ্যৎ ও-ই। আমার সন্তান আসছে ওর কাছে। এখন অন্য কিছু ভাবতেই পারব না।

হ্যাঁ, আমি ওকে ঠকিয়েছি। স্বীকার করে নিয়েছি। স্বীকার করে নেওয়ার পরে মেয়েরা আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তর্ক করবেন না। স্বীকার করে নেবেন।

আমি অনিন্দিতার হাত ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছি, "বিশ্বাস করো, এ সবই আমি করেছি আমার একাকিত্ব থেকে। আমি ভীষণ একা অনি। তুমি কলকাতা থাকো, আমার মাথায় যেন শয়তান বাসা বাঁধে। সব কিছু জেনেও আমি পতঙ্গের মতো আগুনের দিকে ছুটে যাই। এই, এই দ্যাখো, আমি সবখান থেকে ঋতুজাকে ব্লক করে দিলাম।"

অনিন্দিতা আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কাউকে কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক করেছি, আমি চাকরিটা ছেড়ে দেব। আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব। তোমাকে আর একা থাকতে হবে না।"

আমি প্রমাদ গুনে বললাম, "না, না সোনা, একদম না। চাকরি ছাড়বে কেন? নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ তুমি। কত ইম্পরট্যান্ট বলো তো সেটা? আমি তোমাকে চাকরি ছাড়তে দেব না। আমাকে আর তিন মাস সময় দাও, আমি ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় ট্রান্সফার নিয়েই ছাড়ব। তোমাকে ছাড়া আমি আর কোনও দিকে তাকাও না। প্লিজ আমায় সুযোগ দাও।"

অনিন্দিতা কেঁদেছে, বলেছে, "এভাবে বলতে হবে না।"

আমি আরও কেঁদে বলেছি, "তাহলে কথা দাও আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।"

অনিন্দিতা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

বাকিটা আমি বুঝে নিয়েছি।

এখন কেমন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। মেয়েরা হল নরম জাত। কথায় কী সুন্দর তাদের টুপি পরানো যায়।

ঋতুজা শুধু ফিরুক। ওর শরীরে মুখে না গুঁজে শুলে আমার নামও অনিরুদ্ধ নয়। তবে ব্যাক আপ প্ল্যান রাখতে হবে। শুধু ঋতুজাকে পেলে হবে না। এখন ঋতুজার বর তক্কে তক্কে থাকবে। নজরে রাখবে। ঋতুজার পক্ষে আমার কাছে আসা এখন অত সহজ হবে না।

কিন্তু আমার তো নারী শরীর চাই, নতুন পারফিউমের গন্ধ, যোনির গন্ধ, নাভির স্বাদ, স্তনের আকুলতা চাই! অস্থির লাগছিল। অনিন্দিতা পুরোনো হয়ে গেছে।

ঋতুজা পুরোনো না হলেও দুর্গম হয়ে গেছে।

আমাকে যে মেয়েটা ফোন করেছিল, তাকে ফোন করতে হবে।

ভুবনেশ্বরের মেয়েদের সঙ্গে শুয়ে ভালো লাগে না।

সবথেকে বড়ো বাধা হল ভাষা। তার থেকেও বড়ো ভয় অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে শুলে রোগের। আমার এসকর্ট সার্ভিস ভালো লাগে না।

ভালো লাগে অনাস্বাদিত ঘ্রাণের মতো নতুন নতুন নারী শরীর। প্রতিটা মেয়ে আশ্রয় চায়, ঘর চায়। প্রতিটা মেয়ের প্রচুর ইনসিকিউরিটি থাকে। একটা পুরুষ কাঁধ চায় যেখানে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। সেই ফাঁক দিয়ে আমাকে ঢুকতে হবে।

অনিন্দিতার পেটে হাত বোলালাম। সন্তান আসছে। সন্তান? ধুস! কী বাজে ইমোশনাল ব্যাপার।

হঠাৎ মাথায় একটা কথা আসতে উঠে বসলাম।

ঋতুজার সঙ্গে ছেলেটা শুচ্ছে? ঋতুজা যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে যায়?

৫৬

জীমূতবাহন

আমার এক বন্ধু আছে, বিয়ের আগে থেকে বউকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে পাগল করে দেয়। ওর বউ কোথায় একটা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, সেখানে এক ছেলের পাশে বসে ফটো দিয়েছে, বন্ধু ওর বউকে পাগল করে দিয়েছিল কেন ছেলেটার গা ঘেঁষে বসেছে। ওর বউ বলেছিল ও তো আমার ভাইয়ের মতো। ছেলেটা বলেছিল নিজের মায়ের পেট থেকে তো বেরোয়নি! যে ভাই নিজের পেট থেকে বেরোয়নি, সে ভাইও হতে পারে, সুধীর ভাইও হতে পারে। সে নিয়ে তুমুল বাওয়াল লাগলেও বিয়েটা হল।

বিয়ের কিছুদিন পর সেই বন্ধুকে নিয়ে তুমুল ঝামেলা হয়েছিল ওদের। শেষমেশ বন্ধুটার ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছিল। বন্ধুটা বরাবরই এরকম। মারাত্মক পজেসিভ।

আর রইলাম আমি! পজেসিভ হব কি না বোঝা-টোঝার আগে এমন বউ পেলাম যে কিনা বিয়ের আগে থেকেই সব সেটিং করে এসেছে। ছোটোবেলায় “একটি মোরগের কাহিনী” পড়েছিলাম।

নিজেকে সেরকম মোরগ মোরগ মনে হয়। কেমন আমার রোস্ট করে অনিরুদ্ধ আর আমার বউ খাবে।

আমার বন্ধুটা বলে যে প্রেমিক পুরুষ তার প্রেমিকাকে ছেলেদের সঙ্গে ঘষাঘষি করতে দেখলে রাগে না সে আসলে প্রেমিকই না। ভেড়া মানব।

আমি অবশ্য জানি আমি ভেড়া মানব নই। যেদিন অনিরুদ্ধকে সামনে পাব, কাঠ খুলে হাতে ধরিয়ে দেব।

ওদের কথা ভাবলেই আমার মাথায় ভিসুভিয়াস জ্বলে। মানুষ এত প্যাঁচালো হয় কী করে? কী করেই বা নিজে বিয়ে করার পরেও অন্যের বউকে নিয়ে টানাটানি করে? কেন করবে? কী ধরনের মানসিকতা থেকে এসব প্রবৃত্তি আসে?

আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, যে সম্পর্কটা আমি আর টানবই না, সেটা নিয়ে কেন এত ভাবছি? সব তো শেষ হয়েই যাবে। তারপর এরা যা ইচ্ছা করুক, শুধু আমার ডিভোর্সটা দিয়ে দিক। জ্বলে ওঠা কোনও আগুনকে দুভাবে নেভানো যায়। জল দিয়ে, নয়তো তাকে পুড়তে দিয়ে। পুড়তে পুড়তে একসময় সব ছাই হয়ে যায়।

আমার বউয়ের জ্বলন্ত প্রেমে আমি জোর করে যতই জল দি, খুব ভালো করে বুঝতে পারি ও ঘুরে ফিরে অনিন্দিতার বরের কাছেই যাবে। খামোখা কেন আমি জোর করতে যাই? যা পারে করুক।

গাড়ি রাবংলায় ফিরল বিকেল নাগাদ। হোটেলের রুমে ঢুকলে আমি বউকে বললাম, "তোমাকে একটা ফোন কিনে দেব। তুমি যেখানে ইচ্ছে ফোন কোরো। আমি কিছু বলব না।"

বউ বলল, "দরকার নেই। আমি আবার কথা বলব, আবার তুমি ফোন ছুড়ে মারবে। কলকাতায় গেলে আমি নিজে থেকেই ফোন কিনে নেব। তোমাকে দিতে হবে না।"

আমি বললাম, "ওকে। যা ইচ্ছে তোমার।"

বউ খাটে বসে টিভি চালিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, "তুমি আমাকে ভালোবেসে ফেলছ। সমস্যায় পড়বে।"

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, "মানে?"

বউ বলল, "মানেটা সিম্পল। তুমি জড়িয়ে যাচ্ছ। জড়িয়ো না। ডিভোর্স চাইছ যখন পেয়ে যাবে।"

আমি বললাম, "ভালোবেসে ফেলছি? এইসব ওভারকনফিডেন্স পাও কোত্থেকে? তোমার মতো মেয়েকে আমি ভালোবাসব ভাবো কী করে? আমি কি পাগল?"

বউ হাসল, "তোমার লক্ষণগুলো তো তাই বলছে। সারাক্ষণ অনিরুদ্ধ আর আমাকে জড়িয়ে উলটোপালটা ভেবে যাচ্ছ। গেট এ লাইফ। যাও, হুইস্কি নিয়ে এসো। চিপসও এনো। খাই। আনন্দ করি। আমাকে বন্ধু ভাবো না!"

আমি গোঁজ হয়ে বসে বললাম, "তোমার মতো বন্ধু আমার চাই না।"

বউ বলল, "ঠিক আছে। শত্রুই ভাবো। খুব বাজে, রাস্তার পচা গলা নোংরা একটা মেয়ে ভাবো। কিন্তু মানুষ তো ভাবো? নিজের ছুটিটা নষ্ট কোরো না। আমি খেপি হতে পারি, কিন্তু এটা মন থেকে বললাম। আমি বুঝতে পারছি, এই খেলায় তোমাকে জড়িয়ে আমি তোমার অনেক বড়ো ক্ষতি করে দিলাম। বিশ্বাস করো, আমি বুঝতে পারিনি, ব্যাপারটা এরকম হতে পারে। নিজের মোহে চলতে চলতে কখন যে তোমার আর অনিরুদ্ধর বউয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিলাম, বুঝিনি।"

আমি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললাম, "কী মদ খাবে?"

বউ হাসল, "যা তুমি খাওয়াবে। খেয়ে উলটে পড়ে থাকব।"

আমি রুম সার্ভিসে ফোন করলাম। ওরাই দিয়ে গেল। স্যালাড, চিপস, ড্রাই চিলি চিকেন আর একটু দামি হুইস্কি।

বউ জল না মিশিয়ে একবারে ষাট মিলিলিটার গলায় ঢেলে বলল, "এভাবে বিষ খাওয়া গেলে কবে মরে যেতাম। বেঁচে থাকা বড়ো কষ্ট। টিনএজ প্রেগনেন্সির মতো বাজে জিনিস বোধহয় আর কিছু হয় না।"

আমি কথা না বলে এক চুমুক দিলাম। জিনিসটা গলা দিয়ে নামতে নামতে এক অদ্ভুত হতাশা গ্রাস করছিল আমাকে। বউ চুল ছেড়ে দিয়েছে। কী সুন্দর লাগছে ওকে!

আমি সত্যিই ওকে ভালোবেসে ফেলেছি?

ভয় পেয়ে গেলাম।

ঘেন্না করতে করতে ভালোবেসে ফেললাম নাকি?

৫৭

অমৃত

বউদিকে বাজারের ব্যাগ দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাবার সঙ্গে টিভি দেখতে বসলাম। বাবা মনোযোগ দিয়ে সিরিয়াল দেখছে। বাড়ির বউকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ির বউ কাঁদছে খুব। কঠিন সময়।

বাবা আগে এসব সিরিয়াল দেখত না। রিটায়ার হবার পর দেখতে শুরু করেছে। এই সিরিয়ালের জ্বালায় অফিস থেকে এসে আমি বাবার সঙ্গে বসতে পারি না।

বিরক্ত গলায় বললাম, "নিউজ চ্যানেলটা দাও না।"

বাবা বলল, "তুই টিভি কিনে ফেল। আমাকে দেখতে দে। জ্বালাস না এখন।"

আমি উঠতে যাব, এমন সময় বউদি এসে বলল, "এই তুমি আবার ঝগড়া করছ না আত্রেয়ীর সঙ্গে?"

আমি অবাক গলায় বললাম, "কেন বলো তো? কী হয়েছে?"

বউদি বলল, "তোমাকে আমি গোবিন্দভোগ চাল আনতে বললাম, তুমি মিনিকেট নিয়ে চলে এলে? তোমার কি মাথাটা গেছে?"

আমি বুঝলাম কেলো করে ফেলেছি। বললাম, "ঠিক আছে, নিয়ে আসছি।"

বাবা বলল, "ওকে বলে লাভ নেই, ওর দাদাও যখন প্রেম করত এসবই করত। একবার কাপড় কাচার সাবান আনতে বলায় ফিনাইল নিয়ে এসেছিল। এসব হয় বউমা। তুমি চিন্তা কোরো না।"

বউদি লজ্জায় পালিয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাবা বলল, "এবারে ঝগড়া কী নিয়ে?"

আমি বললাম, "তুমি সিরিয়াল দ্যাখো না। এসব জেনে কী করবে?"

বাবা বলল, "সিরিয়াল দেখতে দেখতেই ঘরসংসারের খবর রাখতে হয়। ইন্দ্রের সভায় অপ্সরারা নাচে না? তাও কি সৃষ্টি চলে না?"

আমি বললাম, "ওসব কাল্পনিক ঘটনা। ওর সঙ্গে তোমার কি যোগ? ভুলভাল বোকো না তো। রিটায়ারমেন্টের পর তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ। এসব সিরিয়াল মানুষে দ্যাখে?"

বাবা বলল, "গোরু ছাগলের মতো ঝগড়া করে প্রেম করার থেকে সিরিয়াল দেখা ভালো। যাক গে, আমার জন্য ফ্লেক নিয়ে আসিস এক প্যাকেট।"

আমি বললাম, "ওসব খেয়ো না। ডাক্তারবাবু বারণ করলেন না?"

বাবা রেগে গিয়ে বলল, "ডাক্তারবাবু নিজে সারাদিন দশ প্যাকেট খাচ্ছে আর আমাকে কী বলল, তাই নিয়ে পড়ে আছিস। আচ্ছা, গোটা প্যাকেট আনতে হবে না। খান পাঁচেক আনলেই হবে। আমার প্যান্টের পকেটে টাকা আছে, নিয়ে যা।"

আমি বললাম, "থাক থাক। আর টাকার গরম দেখাতে হবে না। নিয়ে আসছি।"

বাবা বলল, "হ্যাঁ রে, তুই কি আমায় শান্তি দিবি না? ঝগড়া করেছিস কেন? আমি ভাবছি বিয়ের কথা এগোব, তুই যদি এরকম করতে থাকিস তাহলে তো মহা সমস্যা হবে।"

আমি বাবার কথার উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামলাম।

পাড়ার মুদির দোকানে গিয়ে আবার ভুলে গেলাম কেন এসেছিলাম, বউদিকে ফোন করলাম। বউদি ধরল, "হ্যাঁ বলো।"

আমি বললাম, "তুমি কী আনতে বলেছিলে যেন?"

বউদি বলল, "মধুদাকে দাও। তোমাকে আর বলব না।"

আমি ফোনটা মুদির দোকানদার মধুদাকে দিলাম। মধুদা শুনে চাল দিয়ে দিল। আমি প্যাকেটটা নিয়ে বাড়ি এসে বউদির হাতে দিলাম।

বউদি বলল, "তোমার অবস্থা সঙ্গিন অমু। এরকম হাল করে ছেড়ে দিল তোমাকে মেয়েটা?"

আমি অন্যমনস্ক গলায় বললাম, "হুঁ।"

বউদি বলল, "বিয়ে করে নাও তাড়াতাড়ি। এভাবে যত দূরে থাকবে, তত ঝগড়া হবে। কাছে থাকলে কিচ্ছু হবে না। তখন একটা সিস্টেমে ঢুকে যাবে তো, অত সমস্যা হবে না।"

জ্ঞান শুনতে ভালো লাগছিল না। চুপচাপ সরে পড়ে ঘরে এসে দরজা দিলাম।

রাতে খেলামও না। ভালো লাগছিল না।

অনেক রাতে আত্রেয়ী মেসেজ করল হোয়াটসঅ্যাপে কয়েকটা। দেখলাম। উত্তর দিলাম না। ভালো লাগছিল না।

কয়েক মিনিট পরে আত্রেয়ী ফোন করল, "এই, কী হয়েছে তোমার? রিপ্লাই করছ না কেন?"

আমি বললাম, "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

আত্রেয়ী বলল, "মিথ্যে কথা বলছ কেন? তুমি জানো না আমি মিথ্যে পছন্দ করি না? ঘুমিয়ে পড়েছিলে যখন তাহলে মেসেজগুলো সিন হল কী করে?"

আমি বললাম, "হয়ে গেছে কোনও ভাবে। টেকনিক্যাল ফল্ট হতে পারে ফোনের। তোমার কী খবর? ছেলেদের প্রতি বিতৃষ্ণা এখন কোন স্টেজে আছে? কমেছে না বেড়েছে?"

আত্রেয়ী একটু চুপ করে থেকে বলল, "তোমার মনে আছে অমৃত, আমি একসময় বলতাম আমি আদর পছন্দ করি না, কেউ আদর করার কথা বললেও আমার ভয় লাগে?"

আমি বললাম, "হুঁ।"

আত্রেয়ী বলল, "সেই আমিই তো বারবার তোমায় আদর করি, তোমার ঠোঁটে চুমু খাই, আমিই তো, তাই না?"

আমি বললাম, "হুঁ। তুমিই।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি তো আমাকে পালটে দিয়েছ অমৃত। আমি তোমার জন্য বসে থাকি, তোমাকে একটু ছুঁতে আমার কত ভালো লাগে। সেই তুমি আমাকে একটু সময় দিতে পারো না?"

কথাগুলো শুনে আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল। বললাম, "কী হয়েছে তোমার?"

আত্রেয়ী বলল, "কিছু না। তুমি একটু বড়ো হও না, আমাকে একটু জড়িয়ে থাকো, তাহলেই হবে। আমি আর কিছু চাই না। একটু মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ো, কাছে রেখে দিয়ো... খুব বেশি দাবি তো নেই কোনও দিনই।"

আমি বললাম, "কী হয়েছে বলবে তো!"

আত্রেয়ী বলল, "আমার কিছু ভালো লাগছে না। একটু একটু তোমার কথাও মনে পড়ছে। আদর খেতে ইচ্ছা করছে।"

আমি অবিশ্বাসী গলায় বললাম, "সত্যি? না আমাকে শান্ত করার জন্য এসব বলছ?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি যেটা ভাববে।"

আমি বললাম, "রাতের কলকাতায় আমার বাইকের পেছনে বসে ঘুরবে?"

আত্রেয়ী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "এসো।"

৫৮
অমৃত

ব্রেক আপে কি খুব কষ্ট হয়?

দেখা যাক হয় নাকি!

আমি এই রাতে ঠিক করলাম আত্রেয়ীর সঙ্গে ব্রেক আপ করব।

তৈরি হয়ে বাইক নিয়ে বেরচ্ছিলাম, আত্রেয়ী ফোন করল, ধরলাম, "হ্যালো।"

"তুমি কি বেরিয়ে গেছ?"

"এই বেরোচ্ছি, কেন বলো তো?"

"শোনো না, ইচ্ছা করছে না রাতে বেরোতে। বরং কাল বিকেলেই স্কুলে এসো। অবশ্য যদি অনিন্দিতাদির সঙ্গে কোথাও যেতে হয় তাহলে জানিয়ে দেব। পরে দেখা যাবে। আজ আর এসো না।"

আমি "আচ্ছা" বলে ফোনটা রেখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

ভালোবাসায় দু হাতে তালি না বাজলে বড়ো বিপদ। যার সঙ্গে নিয়মিত দেখা হত, দেখা করার জন্য ছটফট করত, তার সঙ্গে যদি দেখা করতেই তার আর ইচ্ছে না করে তাহলে বুঝতে হবে সে সম্পর্কের মেয়াদ ফুরিয়েছে।

আমি বাইক রাখলাম না। বেরিয়ে গেলাম।

আত্রেয়ী বলত বটে ওর কাউকেই বেশিদিন ভালো লাগে না। আমার ক্ষেত্রেও তেমন হল তার মানে। ওর আমাকে আর ভালো লাগছে না। হতেই পারে। প্রতিটা সম্পর্কই তো সাপের খোলস ছাড়ার মতো হয়। হয়তো অন্য কাউকে ভালো লেগে গেছে ওর। হতে পারে। আমার মধ্যে তো অনেক সমস্যা আছে। আমি গোঁয়ার, একরোখা, পজেসিভ। এসব ওর মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়ে কেন মানতে যাবে?

কলকাতা শহরের বুক চিরে বাইকটা চলছিল। রাস্তায় গাড়ি কমে এসেছে। সায়েন্স সিটির কাছাকাছি চলে এসেছিলাম, একজন পুলিশ হাতছানি দিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল। আমাকে বলল, "কাগজ দেখি।"

আমি গাড়ির ডিকি খুলতে গিয়ে কী মনে হতে পুলিশের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার স্কুলের বন্ধু সব্য। আমি ডিকি বন্ধ করে বললাম, "কী রে ভাই, মাঝরাতে ঘুষ খাবার ধান্দা করছিস লজ্জা লাগে না?"

সব্য হেলমেটের ভিতর দিয়ে আমাকে দেখে বোঝেনি। বলতে যাচ্ছিল, "কে রে?"

আমি তড়িঘড়ি হেলমেট খুললাম। আমাকে দেখে হেসে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, "অমু নাকি! ওরে বাবা। বিরাট ব্যাপার তো!"

আমি বললাম, "ঘুষ খাচ্ছিস নাকি রে?"

সব্য বলল, "না, ঘুষের কিছু না। এই রাত্তিরে বাইকারসের জ্বালায় লোকজন অস্থির হয়ে পড়ে। রুটিন চেক আপ করছিলাম। তোর খবর কী? বিয়ে করলি?"

আমি বললাম, "নাহ। এখনও করিনি। তুই?"

সব্য বলল, "করেছি। একটা ছেলেও আছে বছর চারেকের। আয় ভাই, চা খেয়ে যা।"

থানার ভিতর নিয়ে গেল সব্য। চেয়ারে বসিয়ে যত্ন করে চা খাওয়াল। বলল, "পুলিশের চাকরি যে কী জিনিস ভাই, যারা করে তারাই জানে। কত রকম লোক, কত রকম ক্রাইম, বাড়ি গিয়ে নিজের বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও খিঁচিয়ে উঠি। কালচারাল শকের মধ্যে দিয়ে যাই প্রতিদিন। ভালো লাগে না জানিস তো। সিরিয়াসলি ভালো লাগে না। তবু পেটের ব্যাপার। করতেই হবে। কী আর করার। তুই এত রাতে বেরিয়েছিস কেন?"

আমি বললাম, "গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে। মেজাজ ঠিক করতে ঘুরছি।"

সব্য হো হো করে হেসে উঠে বলল, "বিরাট ঝামেলা বুঝি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ সেরকমই।"

সব্য বলল, "কী করে সে?"

আমি বললাম, "অঙ্কের টিচার।"

সব্য চোখ বড়ো বড়ো করল, "খেয়েছে। খুব রাগি?"

আমি বললাম, "না সেরকম না।"

সব্য বলল, "তা ঝামেলা কী নিয়ে হল?"

আমি বললাম, "হয়েছে। ওই আর কি। চা-টা বেশ ভালো। থানার জল খাব কোনও দিন ভাবিনি। তুই তো থানার চা খাইয়ে দিলি ভাই।"

সব্য বলল, "তা ঠিক। এই একটা জিনিসই ভালো। জাগতে হবে। এসব জায়গা ভীষণ সেন্সিটিভ জানিস তো। কলকাতা পুলিশের রেসপন্সিবিলিটি মারাত্মক, আর পুরোপুরি থ্যাংকলেস জব। কাজ ভালো করলে বাহবা নেই। পান থেকে চুন খসলে তো কাগজ খুললেই দেখতে পাস।"

আমি সব্যর দিকে তাকিয়ে বললাম, "ব্রেক আপ করব ভাবছি।"

সব্য আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "মানে?"

আমি বললাম, "ব্রেক আপ করব। ব্রেক আপ করলে কি খুব কষ্ট হয়?"

সব্য বলল, "এসব কেন ভাবছিস?"

আমি বললাম, "আই থিংক শি লস্ট হার ইন্টারেস্ট ইন মি। ওর এখন অনেক শুভানুধ্যায়ী আছে। তারা কানে কী মন্ত্র দিচ্ছে কে জানে।"

সব্য বলল, "এটা ঠিক। মেয়েদের প্রচুর শুভানুধ্যায়ী থাকে। তারা আবার ভালোর থেকে খারাপটা বেশি চায়। তবে কী জানিস তো ভাই, ব্রেক আপ করলে ভেবে করিস। ব্রেক আপের পর ছেলেটা দৌড়ে বেড়ায়। মেয়েদের অনেক কাঁধ জুটে যায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার ছেলে ঠিক জুটে যাবে। তখন হাত কামড়াস না।"

আমি চায়ের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বললাম, "আমি ব্রেক আপ করব, তারপর কাঁধ জুটুক না কী জুটুক তাতে আমার ছেঁড়া যায়। কাল থেকে আমি ফোন নাম্বার চেঞ্জ করে দেব। আসি রে।"

সব্যর হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে উঠে বেরিয়ে এলাম।

৫৯
জীমূতবাহন

নচিকেতার একটা গানের লাইন, "ভালোবাসা আসলে একটা চুক্তি, জেনো অনুভূতি-টনুভূতি মিথ্যে, কেউ দেবে নিরাপত্তা, কেউ বিশ্বাস, আসলে সবাই চায় জিততে।"

আমি কি জিততে চেয়েছিলাম? চাইনি তো? এমনকি বিয়ের কথাও ভাবিনি কোনও দিন। হঠাৎ করে বিয়েটা হয়ে গেল। স্বপ্নও দেখিনি কোনও দিন কাউকে নিয়ে। একটা দুঃস্বপ্ন এসে সব কিছু ছারখার করে দিয়ে চলে গেল। বউ বলে যাকে ডাকি, সে বউ না। যার পাশে শুয়ে ঘুমাই, সে কেউ না আমার। এক সঙ্গে থাকলে তো কিছু আশা তৈরি হয়, সেটা স্বাভাবিক। একটা কুকুর পুষলেও সে কুকুরের প্রতি একটা মায়া আসে। আর এ তো জলজ্যান্ত একটা সুন্দরী মেয়ে। হুইস্কি খেয়ে কী সুন্দর কম্বল টেনে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি মাথা ভর্তি নেশা নিয়ে জেগে বসে আছি মাঝরাতে।

বৃষ্টিটা আবার নেমেছে। বন্ধুরা হলে বলত এটা বৃষ্টি না রে পাগলা, জীমূতের চোখের জল। সবাই তো খেপিয়েই এল চিরকাল। গার্লফ্রেন্ড নেই বলে, লাজুক ছিলাম বলে। এবারে সবাই বলবে বউ পালানো জীমূত। কী মজার একটা ব্যাপার হবে। সবাই তো খোরাক করতে ভালোবাসে।

মানুষের দুর্দশায় পাশে থাকার চেয়ে তার গায়ে আরও কাদা ছুড়লে মানুষ বেশি খুশি হয়। একটা লোক, যে সুদূর ভুবনেশ্বরে বসে আমার জীবনে কী হবে, আমার বউ কী করবে ঠিক করে দেবে, আর একটা ভেড়া আমি, সারাজীবন সেভাবে চলব। আমার হৃদয় বলে কিছু থাকবে না, সেটা যেন পাথর দিয়ে তৈরি হতে হবে, ওরা তো এটাই ভেবেছিল। যেন কিছু টাকা ধরে দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিলেই মানুষের সব ক্ষত নিরাময় হয়ে যায়। কত সহজ সব কিছু।

পার্শ্বচরিত্র হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীতে এসেছি। বরাবরই এরকম কপাল। ভালো রেজাল্ট করেও মনের মতো চাকরি পেলাম না। বাড়িতে টাকা দিয়েই সব টাকা শেষ হয়ে যায়। শখ, আহ্লাদ কিছুই তো সেভাবে পূরণ করলাম না কোনও কালে। হুট করে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর থেকে যা যা হয়ে চলেছে, তা কোনোটাই আমার হাতে নেই। সব যেন মাদারির খেলা চলছে। নিষ্ঠুর কেউ একজন বিচ্ছিরি হাসতে হাসতে সব নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

টিভি চালালাম। টিভিতে টেনিস চলছে। এক কেরিয়রের শেষ দিকে চলে যাওয়া খেলোয়াড় কী চমৎকার খেলছেন! মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। এদের জীবনে কোনও দুঃখ কষ্ট নেই? সারাদিন খেলে গেলেই হল? কষ্ট তো আছে নিশ্চয়ই। ভেঙে যাবার কষ্ট, দিন ফুরিয়ে যাবার কষ্ট, একজন মানুষের তো সব কিছু মসৃণ হতে

পারে না। শৃঙ্গে যে ওঠে, তারই চাপ সবথেকে বেশি। ওখানে তো একজনই থাকবে। তাকে প্রাণপণে সরানোর চেষ্টা করবে সবাই। সে ক্ষতবিক্ষত হবে, লড়াই করে যাবে, রক্তাক্ত হবে, জিতলেই হবে না, সে লড়াই সর্বক্ষণের।

অনিরুদ্ধকে যেভাবে ঠেকিয়েছি বউয়ের কাছে পৌঁছোতে, সেও তো অনেকটা সেরকমই। মুহূর্তের জয় হয়েছে আমার, জয় বলাও ঠিক না, বউ তো জানে না। কিছুই জানে না। ও জানলে কি আর আমার এই ব্যবহার মেনে নিতে পারত? অনিরুদ্ধকে ও ভীষণ ভালোবাসে। জোর করে একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। কলকাতা ফিরে সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

টেবিলে রাখা গ্লাসে খানিকটা মদ বেঁচে ছিল। সবটা খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। বৃষ্টিটা ধরেছে। শব্দ কমে এসেছে। কোটটা পরে মাফলারটা মাথায় নিয়ে দরজা খুলে বেরোলাম।

ঠান্ডা আছে, শহরটা পুরো নিঝুম নিস্তব্ধ হয়ে আছে। রুমের দরজা বন্ধ করে সেদিকে একবার তাকালাম। একটা লাইন মনে পড়ে গেল, “কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে।”

আমাকে কে কাছে ডাকবে? আমার তো কেউ নেই। এই ঘরেও আমার কোনও কাছের মানুষ নেই।

ফিরে কী হবে আর?

ধুস!

রাস্তার দিকে হাঁটা লাগালাম।

ফিরে আর কী হবে?

৬০

আত্রেয়ী

অমৃতকে ইচ্ছা করেই বারণ করেছিলাম। ওর অফিসে ছুটি নেই। রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরোলেই ঠান্ডা লাগত।

প্রথমে রাজি হয়েও তাই ফোন করে বলে দিয়েছিলাম আসতে হবে না।

সমস্যা হল তারপর হোয়াটসঅ্যাপে পাচ্ছি না, ফেসবুকেও অফ দেখাচ্ছে।

হাসলাম। এই সমস্যা ছেলেটার। এত রেগে যায় অল্পতে যে সে রাগ বাগে আনতে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

আবার ফোনে না পেলে আমারও অস্থির লাগে। অভিমানও হয়। একটু তো কথা বলে ঘুমোনো যেত। অনিন্দিতাদিকে নিয়ে যা গেল, এখন একটু অমৃতর সঙ্গে শেয়ার করলে মাথাটা ঠান্ডা হত। ছেলেটা এরকমই। ভীষণ অবুঝ। বাচ্চাদের মতো। আমার এখন মন খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল চলে গেলেই হত। অন্তত জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম। ভালোবাসায় যে চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরাও এত গুরুত্বপূর্ণ, আগে বুঝিনি। শরীর ব্যাপারটাকেই ভয় পেতাম খুব।

অমৃতর সঙ্গে সম্পর্কটা হল ধূমকেতুর মতো। কীভাবে কোত্থেকে সব হয়ে গেল।

এক মুহূর্তও মনে হয় কাছছাড়া না করি। কিন্তু কী করব? অনিন্দিতাদির ব্যাপারটাই এমন হল যে সে সময়টা মাথা কাজ করছিল না। অনিরুদ্ধদাকে দেখে সবার উপর অবিশ্বাস হতে শুরু করল।

মানুষ এত খারাপ হতে পারে? এত? আমি নিশ্চিত, অনিন্দিতাদির সঙ্গে আবার কোনও সমস্যা তৈরি হবে। হতেই হবে। একটা মানুষ, যে বিয়ের পরে দিনের পর দিন নিজের বউকে লুকিয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারে, সে এত সহজে হাল ছেড়ে দেবে না। সে আবার ময়দানে নামবে অন্য কোনও গেম প্ল্যান নিয়ে। বিকেল থেকে তিনবার ফোন করেছে আমাকে। অনবরত মেসেজ। সিম চেঞ্জ করতে হবে বুঝতে পারছি। একবার লয়ালটি টেস্ট করতে গিয়ে সিমটার বারোটা বাজালাম। ব্যাংকেও এই নাম্বার দেওয়া আছে।

আবার নতুন সিম নিতে হবে। অমৃতর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় এই পারভার্ট ফোন করেছে, তাহলে চিত্তির। অমৃত যা পজেসিভ।

আবার হাসি পেল। আচ্ছা, ছেলেটা কি জানে, সারাদিন ধরে আমি ওর কথাই ভাবি? কী করছে, কী খাচ্ছে, কীভাবে রাগছে, সব... সব ভাবি?

চোখ বন্ধ করে আমি অমৃতকে অনুভব করতে পারি। ঠোঁটটা এগিয়ে আনছে আমার ঠোঁটে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরি। আমার ঘাড়ে চুমু খাওয়ার সময় আমি যেভাবে ওর স্পর্শ অনুভব করি, সে স্পর্শের কথা ভাবার চেষ্টা করি প্রাণপণে। ওর চোখে আমার চোখের দিকে তাকালে যে আকুলতা দেখতে পাই, তা কী করে বোঝাই? ভালোবাসি তো বারবার বলতে হয় না। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একজন মানুষের চোখেই সব থাকে। একটা মেয়ের থেকে মানুষের চোখ বোধহয় আর কেউ ভালো করে বুঝতে পারে না। অমৃত যখন আমার জন্য অপেক্ষা করে ওর বাইকটা নিয়ে, আমি ওর চোখদুটোই দেখি। কী অধীর আকুলতায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এ ছেলে যখন আমার সঙ্গে সংসার করবে, এমনই থাকবে? থাকতেই হবে। না থাকলে কিল ঘুসি মেরে ঠিক করে দেব। ভীষণ আদর করতে ইচ্ছা করছিল আমার।

ঘুমাতে যাবার আগে আর-একবার ফোন চেষ্টা করলাম, যদি পাগলটা অন করে!

নাহ, করেনি। খেপেছে আবার। কী করছে কে জানে!

ছটফট করতে করতে ঘুমালাম।

কেন এরকম করে? জানে না কেন, কেন বোঝে না, আমিও ওকে ততটাই ভালোবাসি যতটা ও ভালোবাসে? এরকম পাগলামি করলে কী হয়?

মাঝরাতের দিকে ঘুম এসেছিল। সকালে বাবা দরজা ধাক্কিয়ে ঘুম ভাঙাল। আশা হল হঠাৎ করে, সেদিনের মতো এল নাকি পাগলটা?

ধড়মড় করে উঠে দরজা খুলে বললাম, “কী হল? কটা বাজে?”

বাবার মুখটা কেমন যেন, আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

বললাম, “কী হল?”

বাবা বলল, “মা, ফ্লাইওভারে অমৃতর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কাল রাতে।”

আমি বললাম, “তারপর?”

বাবা চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

৬১

আত্রেয়ী

একটা দিন যে কখনও এরকম হতে পারে ভাবতে পারিনি।

মা যেদিন চলে গেছিল, সেদিনও হয়তো এরকমই ছিল। মনে করতে পারি না, চাইও না। কিন্তু একটা রাত আর একটা দিনের মধ্যে যে এতটা তফাত থাকতে পারে, আমি কোনও দিন ভাবতে পারিনি।

বাবা যখন আমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে যাচ্ছিল, শক্ত করে ধরে ছিল। আমি কথা বলতে পারছিলাম না। না পারছিলাম কাঁদতে। চোখ থেকে যে ক্রমাগত জল পড়ে যাচ্ছিল সেটা বুঝছিলাম, কিন্তু মোছার শক্তিটুকু ছিল না।

নার্সিং হোমে অসংখ্য লোক, কেউ ডাক্তার দেখাতে এসেছেন, কেউ বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে।

আমরা যখন পৌঁছোলাম, তখন ভিজিটিং আওয়ারস শুরু হয়েছে।

আমি ভাবতে ভাবতে এসেছি, ওকে দেখেই বকব, অনেক কিছু বলব, খুব রাগ করব, কেন আমি যাব না বলার পরেও একা একা বাইকে করে বেরিয়েছিল।

গেটের সামনে বাবা অধৈর্য হয়ে ফোন করল কাউকে। আমি কাউকে চিনতে পারছিলাম না। শুধু দেখলাম একজন পুলিশের পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড় করালেন। আপাদমস্তক

সাদা কাপড় জড়ানো একটা শরীর। আমার ভিতরটা পাক দিয়ে উঠছিল। বাবা আমার হাত ধরে বলল, "চল, এখানে দাঁড়াতে হবে না।"

আমি বাবার দিকে বোবা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম "মানে? কী বলছে? কোথায় ও?"

বাবা আমাকে সরাতে সরাতে বলল, "ঠিক আছে। এখন চল।"

আমি বাবাকে ঠেলে সরিয়ে সাদা কাপড়ে ঢাকা শরীরটার দিকে দৌড়ে গিয়ে কাপড় সরালাম। মাথায় চাপ চাপ রক্ত, ব্যান্ডেজ দেখলাম হয়তো বা, হয়তো সামান্য চিকিৎসা হতে হতেই...

হ্যাঁ...

আমি বসে পড়লাম নার্সিং হোমের মেঝেতেই।

এই মুখটা যে বড্ড চেনা। এই শরীরটার বুকে মাথা রেখেই তো নিশ্চিন্ত হয়েছি কতবার। এই ঠোঁটে চুমু খাবার জন্যই তো স্কুলের প্রতিটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে গেছি আমি। এই তো সেই লোকটা, সেই পাগলটা যে আমার সঙ্গে কোনও কারণ ছাড়াই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করে গেছে। কত রাগ, কত!

আবার সেই ভোরবেলা বাড়িতে এসে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছে। "এই আমার না ভুল হয়ে গেছে বুঝলে, আমি তো মাথাগরম লোকই, তুমি আমাকে সামলাতে পারবে তো আত্রেয়ী? তুমি আমার নদী তো, একটামাত্র নদী, আমার সবচেয়ে আদরের নদী। জানো তো, আমি চোখ বন্ধ করলে তুমি আসো, প্রতিটা রাতে যখন দুঃস্বপ্নে উঠে বসে থাকি, আমি চোখ বন্ধ করে তোমার কথা ভাবি। তুমি যখন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, আমার মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরো, আমি সব ভুলে যাই বিশ্বাস করো। তুমি তো জানো, আমি যতই ঝগড়া করি, যতই রাগারাগি করি, সব কিছুর পরে আমি আসবই ফিরে তোমার কাছে। তুমি না তাড়ালে আমি যাব না, আর যদি কেউ তোমাকে বিয়ে করতে আসে না, তার ঠ্যাং ভেঙে রেখে দেব। পুঁতে দেব শালাকে। কেউ ছোঁবে না তোমায় আমি ছাড়া। কেউ দেখবে না তোমায় আমি ছাড়া। কেউ ভালোবাসবে না, কেউ না। আত্রেয়ী, আমার নদী... পাগলটা খুব জ্বালায় না তোমায় সোনা? আচ্ছা আমাদের ছেলে হলে কী নাম দেবে? আমি একটা নাম ভেবে রেখেছি জানো? খুব কঠিন একটা নাম, শ্রুতকীর্তি। ভালো নামটা? তোমার ভালো লেগেছে? আচ্ছা নাকটা কার মতো হবে? তুমি যে বলো তোমার নাক বোঁচা, একবারেই না। তোমার নাকই আমার চাই। তোমার চোখ চাই, তোমার ভালোমানুষিটা চাই আমাদের সন্তানের মধ্যে। আচ্ছা, শোনো না, একটা ছেলে একটা মেয়ে, ঠিক হবে না? মেয়ে তো বাবার ন্যাওটা হবে, ছেলে নাহয় তোমার হবে। আমরা খুব ঘুরব কিন্তু। এই আমি যে তোমায় ভালো রাখব সব সময় তা না কিন্তু, মাঝে মাঝে তুমুল ঝগড়া করব। তুমুল। তারপর অবশ্য দিনের শেষে পরস্পরের রাগ ভাঙাব। আত্রেয়ী... ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। একশো বা ভালোবাসি, হাজারবার ভালোবাসি, লক্ষবার, কোটিবার ভালোবাসি। এই আজ স্কুলের পরে দেখা করবে তো?"

জ্ঞান ফিরল যখন বাবা বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

সব শেষ হয়ে গেল আমার। সব।

৬২
জীমূতবাহন

মাঝরাতে একটা পাহাড়ি ছোটো শহরের রাস্তাঘাট কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। কলকাতায় প্রচুর মানুষের শহর। গোটা রাতেই ছিটকে ছুটকে কেউ না কেউ বেরিয়ে যাবেই। তার ওপর মাতাল আছে, রাস্তাঘাটে শুয়ে থাকা লোক তো আছেই।

রাবংলার মাঝরাত তেমন নয়। বৃষ্টি থামার পর কুয়াশা ঘনিয়েছে, বেজায় ঠান্ডা, রাস্তার কুকুরেরা পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে কোথায় যেন গা ঢাকা দিয়েছে। কয়েকটা হোটেলের ঘরে আলো জ্বলছে বটে, তবে কোনও শব্দ আসছে না।

হোটেল থেকে বেরিয়ে অনেকটা রাস্তা হেঁটে মোড়ের মাথায় এসে দেখলাম বেশ চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলোর ভিতর উঁকি মারতে দেখা গেল একটা গাড়ির ভেতর ড্রাইভার মোবাইলে সিনেমা দেখছে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে কাচ নামিয়ে হিন্দিতে বলল, "কী চাই?"

আমি বললাম, "এন জে পি যাবে?"

আমাকে পাগল ঠাওরাল হয়তো। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "সকালে যাবেন। এখন কে যায়?"

আমি বললাম, "যা লাগে তার দ্বিগুণ টাকা দেব। যাবে?"

এবার ড্রাইভার নড়েচড়ে বসে বলল, "এখন কেন যাবেন?"

আমি বললাম, "কাজ পড়ে গেছে বাড়িতে। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কলকাতা ফিরতে হবে সকালের মধ্যে।"

লোকটা কী বুঝল কে জানে, আমাকে বলল, "ওহ, পিতাজি অসুস্থ হয়ে গেছে, তাহলে বেশি টাকা নেব কেন? উঠে বসুন। যাচ্ছি।"

আমি তো পুরুষমানুষ। পুরুষদের নাকি কাঁদতে নেই।

লোকটার এই কথাটা শুনে হঠাৎ করে আমার দু চোখের কোণ ভিজে উঠল। চেনে না, জানে না একটা লোক, আমার বাবা অসুস্থ, তাও মিথ্যে করে বলা, একবার যাচাই করারও প্রয়োজন বোধ করল না, আমি বলেছি বলে যেতে রাজি হয়ে গেল?

লোকটা বলল, "রাস্তার হাল ভালো না। তবু আপনার পিতাজি অসুস্থ বলে যাব। উঠুন।"

আমি বোলেরো গাড়িটায় উঠলাম। লোকটা গাড়ি স্টার্ট দিল। কুয়াশা চিরে গাড়ি এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলল রাবংলা ছেড়ে। এগিয়ে চলল এমন একটা মেয়েকে পিছনে ফেলে, যাকে আমি বউ ডাকছিলাম।

রাস্তায় ট্রাক যাচ্ছে, খুব সন্তর্পণে গাড়ি চালাচ্ছে ড্রাইভার। আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। একটা উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষ কেন বাঁচে? সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরেও মানুষ কি আদৌ বেঁচে থাকে, না তাকে বেঁচে থাকার অভিনয় করে যেতে হয় প্রতিনিয়ত?

অনিন্দিতা কী করছে এখন? একটা চাকরিহীন মেয়ে তো সব জেনেশুনেও থেকে যেতে পারে এই ধরনের জানোয়ারের সঙ্গে, অনিন্দিতা কেন থাকতে যাবে? ছেড়ে দিয়েছে অনিরুদ্ধকে? কষ্ট পাবে না?

একগাদা চিন্তা মাথায় ঘুরতে শুরু করল। ড্রাইভার বলল, "রাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে সমস্যা হল চোখ বন্ধ হয়ে আসে। আপনি চেষ্টা করুন না ঘুমাতে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেলে নিউজপেপার হেডলাইন হয়ে যেতে হবে দুজনকে।"

আমি বললাম, "তা ঠিক।"

মদের নেশায় আমারও ঘুম পাচ্ছিল। বেশ খানিকটা রাস্তা যাবার পর মাথায় পোকা নড়ে উঠল। নিজের ফোনে একটা ফেক কল করলাম। নিজেই ভুলভাল বকে ড্রাইভারকে বললাম, "এন জে পি যেতে হবে না। বাবার খবর এসেছে। ঠিক আছে এখন। রাবংলা ফিরে চলুন।"

ড্রাইভার সজোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি পাগল?"

আমি ভালো মানুষের মতো মুখ করে বললাম, "ফোন এসেছিল দেখলেন তো।"

ড্রাইভার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "আপনি আসলে পাগল। আমার বোঝা উচিত ছিল।"

আমি বললাম, "আসলে বউকে ফেলে এসেছিলাম হোটেলে, এখন মনে পড়ল।"

ড্রাইভার হাত নেড়ে বলল, "জীবনে বিরাট শিক্ষা হয়ে গেল। মাঝরাতে পাগল আর মাতালের পাল্লায় পড়লে কোথাও যেতে নেই। আপনি শিওর মদ খেয়েছেন। এবার কিন্তু আমি এন জে পি যাওয়ার ফুল টাকা

নেব।”

আমি বললাম, “আচ্ছা সে দেব। আমি খুব দুঃখিত।”

গোটা রাস্তা গজগজ করতে করতে ড্রাইভার রাবংলা ফিরে এল।

ভোর হয়ে গেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। সব হোটেলের ছাদে লোকজন তুমুল উৎসাহে সেটা দেখছে।

আমি হোটেলে ফিরে এসে রুমের বাইরে দাঁড়ালাম। বেশ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপলাম।

বউ দরজা খুলল।

আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “সারারাত তুমি কোথায় গেছিলে? তুমি জানো আমার মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেছিল, আমি আর ঘুমাতে পারিনি ভয়ে?”

আমি ঘরে ঢুকে বললাম, “আমি কলকাতা চলে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আর যাওয়া হল না।”

বউ বলল, “ওহ্। পালিয়ে যাচ্ছিলে?”

আমি বললাম, “ওইরকমই। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। অনিরুদ্ধ তোমাকে ফোন করছিল। আমার নাম্বার জোগাড় করেছে। আমি তোমাকে ফোন দিইনি। আটকে দিয়েছি। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে নাও। চিন্তা করছে হয়তো।”

বউ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কী করে ফিরতাম তুমি ভাবোনি?”

আমি বললাম, “না। গিয়ে অনিরুদ্ধকে জানিয়ে দিতাম। হানিমুন করতে চলে আসত।”

বউ বলল, “তোমার ওকে খুব হিংসা, না?”

আমি বললাম, “না। হিংসা হবার কিছু নেই তো। সোনাগাছির বেশ্যাদেরও বাবু থাকে। তা বলে কি অন্য লোকেরা সে বাবুদের ঘেন্না করে?”

বউ কথাটা শুনে বসে পড়ল খাটে, “তুমি আমায় বেশ্যা বললে?”

আমি বললাম, “না, তোমায় বলিনি। জাস্ট একজাম্পল দিলাম। শোনো, আমার এই ভুলভাল খেলা আর ভাল্লাগছে না। এই খেলাটা শেষ হোক। আজ ফিরে চলো। গিয়ে যা খুশি করো তুমি, আমাকে মুক্তি দাও। আমি আর ঘুরতে চাই না।”

বউ কেঁদে ফেলেছিল। কথা বলতে পারল না।

৬৩
অমৃত

রাতের কলকাতা শহরে বাইক চালানোর মজাই আলাদা। সব্যর সঙ্গে চা খেয়ে যখন বেরোলাম, রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা কম। হুশহাশ করে কয়েকটা গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। বাইক নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ এদিক সেদিক গেলাম। সল্টলেক, রাজারহাট হয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তায় ঢুকলাম।

বাইকটা পার্ক করে এয়ারপোর্টের বাইরে খানিকক্ষণ ঘুরে ইচ্ছা হল কোথাও একটা ঘুরে আসি। ভোরবেলা গৌহাটির ফ্লাইট দেখাচ্ছে। চলে যাব? আমার বন্ধুরা গতবছর তাওয়াং গেছিল। ছবি দেখিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম আত্রেয়ীকে নিয়ে যাব।

আর গিয়ে কী হবে? সেই তো ব্রেক আপ করে দেব। মানুষজন কত তাড়া নিয়ে এত রাতেও এয়ারপোর্টে ঢুকছে।

ধুস। কী হবে কোথাও গিয়ে যদি আত্রেয়ীকে নিয়েই না যেতে পারি? দরকার নেই।

বেরিয়ে গেলাম বাইক নিয়ে আবার। ভি আই পি রোড ফাঁকা। পুলিশের গাড়ি দুবার দাঁড় করাল। কাগজপত্র দেখল। একজন বলল, “কী কেস ভাই এত রাতে?”

আমি বললাম, “বাবা ভরতি আছে, দেখতে যাচ্ছি।”

আর কোনও প্রশ্ন করল না। ভি আই পি রোড হয়ে, ফাঁকা ই এম বাইপাস হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি নিস্তব্ধ। তালাবন্ধ।

চাবি নিয়ে গেছিলাম। ঘরে ঢুকে শুলাম।

ঘুম আসছে না। আত্রেয়ী আর আমার ছবিগুলো বের করে দেখতে লাগলাম। আমাকে পরম নিশ্চিন্তে জড়িয়ে ধরে আছে। আত্রেয়ী আমাকে ভালোবাসে না!

আমার রাগ হল। আবার সেই গোঁ। কেন আমাকে ফোন করছে না ঠিক করে? কেন দেখা করছে না? এরকম কেন করবে আমার সঙ্গে? কেন অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলবে? কেন আমাকে ফোন করবে না? কেন কেন কেন?

উঠে বসে রইলাম।

বিরক্তি লাগছে। জামাকাপড় পরে নিলাম আবার।

ভোর হয়েছে। বাইক বের করলাম। আত্রেয়ীদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

পৌঁছে দেখছি আত্রেয়ীর বাবা বাড়ির সামনে পায়চারি করছেন।

আমাকে দেখেই হেসে ফেলে বললেন, "তোমরা পারো সত্যি। দিনে কবার ঝগড়া হয় বলো তো তোমাদের?"

আমি মাথা চুলকালাম।

আত্রেয়ীর বাবা বললেন, "যাও, ওর ঘরে গিয়েই ডেকে দাও। এই বুড়ো মানুষটাকে আর এর মধ্যে জড়িয়ো না। নিজেদের কেস নিজেরা মেটাও। আমি আজকেই তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব। তোমরা সংসার করো, তুমুল ঝামেলা করো, যাই করো, নিজেরা করো। আমি নেই এর মধ্যে। উফ। চা খাবে?"

আমি মাথা নেড়ে ওদের বাড়ির ভেতর দৌড় লাগালাম।

আত্রেয়ীর ঘর বন্ধ ছিল। আমি নক করলাম।

খুলছে না। আমি চ্যাঁচালাম, "আত্রেয়ী, এই আত্রেয়ী।"

দরজা খুলল।

আত্রেয়ী ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিস্ফারিত চোখে। আমি বললাম, "কী হয়েছে? আরশোলা ঢুকেছে ঘরে?"

আত্রেয়ী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে আমার বুকে জোরে জোরে ঘুসি মারতে শুরু করল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এই কী হয়েছে? এরকম করছ কেন? কী হয়েছে বলবে তো?"

আত্রেয়ী চোখের জলে আমার জামা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি খুব খারাপ। খুব। আমিও খুব খারাপ। এই তুমি একদম বাইক চালাবে না আজ থেকে।"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "মানেটা কী?"

আত্রেয়ী ধমক দিল, "যা বলছি শোনো। একদম বাইক চালাবে না।"

আমার কপালে ঠোঁটে গলায় চুমু খেতে লাগল আত্রেয়ী।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "এই পাগলি, বাবা আছেন তো, এখনই চলে আসবেন।"

আত্রেয়ী বলল, "আসুক। তুমি বলো আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বলো সত্যি করে।"

আমি বললাম, "আচ্ছা বাবা, যাব না বললাম তো।"

আত্রেয়ী আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল।

আত্রেয়ী

অমৃত লাজুক লাজুক মুখে আমার খাটে বসে আছে। আমি কাঁদছিলাম তখনও।

অমৃত অস্বস্তিতে পড়ছিল। ভাবছিল বাবা যদি চলে আসে। আমি দরজা ভেজিয়ে দিলাম। অমৃতকে জড়িয়ে ধরলাম।

অমৃত বলল, "এই আত্রেয়ী, কী পাগলামি করছ বলো তো? আমাকে একটু খুলে বলবে কী হয়েছে?"

আমি বললাম, "আমি তোমার সঙ্গে দুদিন কথা বলিনি। কালকেও তোমাকে বারণ করে দিয়েছিলাম আমাদের বাড়ি আসতে। আমার সাবকনশাস মাইন্ড যে আমার ভেতরে বিচ্ছিরি একটা অপরাধবোধ তৈরি করছিল আমি বুঝতে পারিনি। আমি তোমাকে নিয়ে ভীষণ খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি।"

অমৃত হেসে ফেলে বলল, "আমি মরে গেছি এরকম দেখেছ?"

আমি ওর মুখে হাত দিয়ে বললাম, "প্লিজ বোলো না। প্লিজ। আমার ভালো লাগছে না কিছু। একদম ভোরবেলা এই স্বপ্নটা দেখলাম।"

অমৃত বলল, "এইসব ভোরের স্বপ্ন টাইপ মিথ বিশ্বাস করতে নেই। পাগল কোথাকার। শোনো না, দরজাটা খুলে দাও, বাবা কী ভাববেন বলো তো?"

আমি উঠে দরজা খুললাম।

অমৃত বলল, "আমি সত্যিই কালকে রাগ করেছিলাম। ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। মনে হচ্ছিল তুমি যেন আমাকে অ্যাভয়েড করছ। সারাক্ষণ এটাই ভেবে যাচ্ছিলাম যে তুমি আমাকে আর চাও না। ভীষণ রাগ হচ্ছিল তোমার ওপর। তারপর যত রাত পেরোতে লাগল, আমি বুঝতে পারলাম, তোমাকে ছাড়া আমার কোনও অস্তিত্বই নেই আত্রেয়ী। জানি না এ কদিনে আমাদের মধ্যে ঠিক কী হয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করো, অমৃতর পাশে আত্রেয়ী ছাড়া আর কোনও নাম বসতেই পারে না।"

আমি ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললাম, "তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছিলে? ছেড়ে দিয়ে কী করতে?"

অমৃত অধৈর্য গলায় বলল, "বললাম তো সোনা, আমি জাস্ট ভেবেছিলাম। কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেল আমার সেই মনই বিদ্রোহ করে বসল। আমি পারব না তোমায় ছেড়ে। সিম্পলি পাগল হয়ে যাব।"

আমি বললাম, "আমাকে বিয়ে করতে পারবে আজ? এখনই?"

অমৃত অবাক হল, "এখানে? তোমার বাবা? আমার বাবা?"

আমি বললাম, "তুমি সামলাও সবাইকে। আমি বিয়ে করতে চাই। আজ। এখনই।"

অমৃত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, তাই হবে। চলো।"

আমি উঠলাম। অমৃত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে বসার ঘরে এল। বাবা টিভি দেখছিল। আমাদের বেরোতে দেখে বলল, "কী হল? ঝগড়া মিটেছে আজকের মতো?"

অমৃতর মুখ বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে হচ্ছিল ঘর থেকে বেরোনোর সময়। বাবার সামনে কেমন হয়ে গেল। বলল, "কালকে ইন্ডিয়া জিতল?"

বাবা অমৃতর দিকে তাকিয়ে বলল, "কালকে তো ইন্ডিয়ার কোনও খেলা ছিল না! ছিল? কীসের কথা বলছ, ক্রিকেট না ফুটবল?"

অমৃত মাথা চুলকে বলল, "খো খো? শ্রীলঙ্কার সঙ্গে?"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোর সঙ্গে কি এরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

আমি বুঝলাম অমৃত ট্রিপ করে গেছে। এখন আর ওর পক্ষে ঠিক করে কথা বলা সম্ভব না। আমি বাবাকে বললাম, "আমরা ঠিক করেছি আজ বিয়ে করব বাবা। আমি আজ থেকেই ওর বাড়িতে থাকব।"

বাবা চমকাল না। টিভির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। করে ফেল।"

আমি বললাম, "তোমার তো কিছু ভূমিকা নেওয়া দরকার।"

বাবা বলল, "আমি ভূমিকা নিতে গেলেই তো সবাইকে নিয়ে এগোতে চাইব। তাহলে তোদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ বা ভাজা কিছুই হবে না। তোরা বরং এক কাজ কর, দুজনে কালীঘাট বা কোথাও গিয়ে একটা বিয়ে

করে অমৃতর বাড়ি গিয়ে হাজির হ। সকাল সকাল একা আমার হার্ট অ্যাটাকের চান্স হবে কেন, ওদের বাড়ির লোকেরও হোক।”

আমি রেগে গিয়ে বললাম, “বাবা আমি কিন্তু সিরিয়াস।”

বাবা বলল, “আমিও তো সিরিয়াস। একবারও মনে হচ্ছে আমি ইয়ার্কি মারছি?”

অমৃত সোফায় বসে পড়ে বলল, “লুচি খেতে ইচ্ছা করছে। তুমি লুচি বানাতে পারো?”

আমি রেগে গেলাম, “তোমার এখন লুচি মাথায় এল? তুমি যে বললে আজই সব ব্যবস্থা করবে?”

বাবা টিভিটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকাল, “কী হয়েছে মা? এরকম পাগলের মতো করছিস কেন? আমাকে বলা যায়?”

আমি আবার কেঁদে ফেললাম। বাবার পাশে বসলাম।

বাবা আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “পাগলিটা বড়ো হল না এখনও।”

অমৃত বলল, “তাহলে কি পালানোর প্ল্যানটা ক্যান্সেল? লুচি করবে?”

আমি কাঁদতে কাঁদতেই রেগে গিয়ে বললাম, “তুমি যাও তো। সারাক্ষণ খালি খাই খাই।”

অমৃত কেমন গোবেচারা মুখ করে বসে রইল।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরি।

এরকম সর্বনাশ কবে হল আমার? এত ভালোবেসে ফেললাম কবে?

৬৪

জীমূতবাহন

হোটেলে চেক আউট প্রসেসিং করতে বললাম। হোটেল থেকেই একটা গাড়ি ঠিক করা গেল। ড্রাইভারকে বললাম, এন জে পি যেতে হবে।

ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছিল। পাউরুটি অমলেট। বউ ছুঁল না।

আমি অনুরোধ করলাম না একবারও।

খেয়ে নিলাম।

ব্যাগ গাড়িতে তুলে রওনা দিলাম যখন তখন নটা বাজে। রোদ ঝলমল করছে। এখান থেকে এই সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাওয়া যায় না। আজ যাচ্ছিল।

বউ সেদিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মাথা নিচু করল। ড্রাইভার গান চালিয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের “হে আপনা দিল তো আওয়ারা।” পাহাড় চুঁইয়ে জল পড়ছে। রাস্তা ভেজা এখনও। বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে সারে সারে। আর-একটা কর্মব্যস্ত দিন শুরু হচ্ছে পাহাড়ি মানুষদের জন্য।

পরিবেশটা ভালো হতে পারত। দুর্দান্ত হতে পারত। সব উপাদান ছিল।

ছিল না আমার কপাল। চুপ করে বসে রইলাম।

চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টাও করলাম, ঘুম এল না।

ঘণ্টাখানেক যাবার পর বউ কথা বলল, “অনিরুদ্ধ ফোন করেছে, তুমি আমাকে ফোনটা দেবে না, এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা। এটা আনএক্সপেক্টেড কিছু ছিল না। কিন্তু তুমি আমাকে যে কথাটা বললে সেটা ভেবে বললে? একটা মানুষ একাকিত্ব থেকে অনেক কিছু করতে পারে যেটা সবার বোধগম্য নাও হতে পারে। আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করেছি, সময় নষ্ট করেছি এটাও ঠিক, কিন্তু তা বলে...”

বউ চুপ করে গেল।

আমি উত্তর দিলাম না। জানলার বাইরে তাকালাম।

বউ বলল, “ছোটোবেলাটা মানুষের চিরকাল থাকে না তো। সবথেকে বড়ো সমস্যাটা হয় যখন সে বুঝতে পারে সে বড়ো হয়ে গেছে। বড়ো হয়ে যাওয়াটাও যদি বুঝতে হয় কোনও কলঙ্ক থেকে, সেটা যে কী

ভয়ংকর হতে পারে সেটা যার সঙ্গে হয় সে বুঝতে পারে। বাকিরা তো তাকে দাগিয়ে দিতেই ব্যস্ত থাকে। পাবলোদার সঙ্গে টিনএজ প্রেমটা যে নিষিদ্ধ সেটুকু বুঝতাম, কিন্তু যেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না, আর পাবলোদা এসে অনেক আদর করল সেদিনই আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। সে আদরে শরীরের থেকেও অনেক বেশি ছিল একটা মেয়ের প্রথম প্রেমের আবেগ। পিরিয়ড মিস হল, সবাই জানতে চেয়ে পাগল করে দিল কার কাজ, একটা কথাও বলিনি। সেদিন থেকে আমি খারাপ মেয়ে। অ্যাবরশন ক্লিনিকের ওই অন্ধকারটা এখনও আমার দুঃস্বপ্নে আসে। আমি কেঁদে উঠি। শিউরে উঠি, পালাতে যাই, পথ পাই না। অনিরুদ্ধর সঙ্গে যেদিন প্রথম কথা হয়েছিল, অতটা বলিনি ওকে। তারপর একদিন রাতে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে বসলাম। কেউ অনলাইন ছিল না অনিরুদ্ধ ছাড়া। ওকে আমি নিজে পিং করে সবটা বলেছিলাম। পরের দিন সকাল হলে লজ্জা লেগেছিল। কেন একটা অপরিচিত লোককে সব বলে দিলাম। অনিরুদ্ধ মেসেজ করত রাতের দিকে। প্রেম কি না বুঝিনি, কথা বলতাম। অভ্যাস। ও আমাকে প্রোপোজ করল একদিন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বিয়ে? আমি করব? তারপর আবার সমস্যা শুরু হয় যদি? না করে দিলাম। অনিরুদ্ধ অনেকবার বলেছিল, কিছুতেই রাজি হলাম না। ওর বিয়ে ঠিক হল। অনিরুদ্ধ অন হয়েও কথা বলত না, আমি ভাবতাম ওর হবু বউয়ের সঙ্গে কথা বলছে। আমার একাকিত্ব আবার আমাকে পিষে ফেলতে শুরু করল। ভয় হল, সারাজীবন একা থাকব? তারপর একদিন অনিরুদ্ধ বিয়ের কার্ড দিতে এল। যাওয়ার সময় বলল, তোমাকে একবার জড়িয়ে ধরতে পারি? আমি বললাম, ধরো। অনিরুদ্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমিও কেঁদে ফেললাম। অনিরুদ্ধ চলে গেল। সেদিন থেকে নতুন করে যোগাযোগ শুরু হল। আমাকে বিয়ে করতেও ও-ই বলেছিল। অমলকান্তিকেও ওর ঠিক করা। অমলকান্তির পালানোটা আর তোমার আসাটা হিসেবের বাইরে। আমি খারাপ মেয়ে, কিন্তু একাকিত্ব আর সেই অ্যাবরশন রুমের আতঙ্ক আমাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়াবে আমি জানি। কলকাতা গিয়ে ডিভোর্সের জন্য কী করতে হবে বলে দিয়ো। করে দেব।”

আমি এ কথারও কোনও উত্তর দিলাম না।

৬৫

অমৃত

আত্রেয়ী কেমন পাগলের মতো করছে। আমি বুঝতে পারছি ও রাতে এমন কোনও স্বপ্ন দেখেছে, যেটা ওর মনে বড়ো কোনও প্রভাব ফেলেছে। আসলে যারা তাদের চারপাশে একটা কাঠিন্যের আবরণ দিয়ে রাখে, ভেতরে ভেতরে তারা যে কতটা ভেঙে থাকে সেটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। একটা মেয়ে একটা ছেলের মধ্যে অনেক তফাত থাকে।

আর আত্রেয়ী তো একেবারেই আলাদা। জানি, যারা ভালোবাসে, তারা তাদের ভালোবাসার মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতেই ভালোবাসে। কিন্তু নিরপেক্ষ জায়গা থেকে দেখলেও আত্রেয়ী বাকিদের মতো নয়।

আমি ওর ঠিক উলটো। একদিন কথা না বললে আমি পাগল হয়ে যাই, লাফ ঝাঁপ দিয়ে রিয়্যাক্ট করি। আত্রেয়ী রিয়্যাক্ট করে না। বোঝেই না হয়তো আমাকে মিস করছে। অবচেতনে জমতে থাকে আমাকে ছেড়ে থাকাটা। তারপর যখন সেটা ফেটে পড়ে, হাতের বাইরে চলে যায়।

এখন যেমন গেছে। অফিস ছুটি নেওয়াল, নিজে স্কুল গেল না। বাইকে করে বেরিয়েছি, পিঠে মুখ গুঁজে কেঁদে চলেছে।

আমি বেশ খানিকক্ষণ বাইক চালিয়ে বাইকটা দাঁড় করালাম। পিছন ফিরে বললাম, “এই যে সোনা, বুচি বুড়ি আমার, রাস্তার লোকজন কী ভাবছে বলো তো?”

আত্রেয়ী চোখ মুছে বলল, “ভাবতে দাও। আমার কিছু যায় আসে না।”

আমি বললাম, "মহা জ্বালা হল। আমার বাড়ি যাবে?"

আত্রেয়ী বলল, "তোমার বাড়িতে সবাই আছে তো। এখন যাব না। পরে নিয়ে যেয়ো, যাব। আজ শুধু তোমার সঙ্গে থাকব। আমি আদর খাব।"

আমি হেসে ফেললাম, "এরকম আদাড়েবাদাড়ে, রাস্তাঘাটে? হোটেলে যাবে?"

আত্রেয়ী মাথা নাড়ল, "না, আমার হোটেল ভয় লাগে। হোটেল পচা জায়গা। যাব না।"

আমি একটু ভেবে বললাম, "আচ্ছা, দাঁড়াও!"

সৌরভকে ফোন করলাম। আমার কলিগ। বালিগঞ্জে ফ্ল্যাটে একা থাকে। সৌরভ ফোন তুলল, "বল রে!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ রে, তোর ফ্লাটের চাবিটা আজকের জন্য পাওয়া যাবে?"

সৌরভ কোনও প্রশ্ন করল না, বলল, "কোথায় নিবি বল?"

বললাম, "বেরিয়ে গেছিস তুই?"

সৌরভ বলল, "বেরোচ্ছি। রুবিতে থাকতে পারবি?"

আমি বললাম, "ঠিক আছে!"

ফোন রেখে আত্রেয়ীকে বললাম, "এবার শান্তি?"

আত্রেয়ী পিঠে মুখ গুঁজল, "হুঁ।"

আমি বললাম, "এরকম করছ কেন বাবু?"

আত্রেয়ী বলল, "জানি না। আজ আমার শুধু তোমাকে চাই। আর কিছু জানি না। জানতেও চাই না। আমার মাথা কাজ করছে না।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, বলতে হবে না!"

আত্রেয়ীকে নিয়ে রুবির বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ালাম। সৌরভ সেই বিরল প্রজাতির ছেলেদের মধ্যে একজন, যার কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও কোনও ইন্টারেস্ট থাকে না। আমাকে ওর ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েও কোনও প্রশ্ন করল না।

আত্রেয়ীকে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছোলাম, ঘড়ির কাঁটা এগারোটা ছুঁই ছুঁই।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করতে আত্রেয়ী আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে বলল, "তুমি একা একা বাইক চালাবে না।"

আমি আত্রেয়ীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, "বেশ, আর?"

আত্রেয়ী কেঁদে ফেলল আবার। বলল, "আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। আমি তোমার কাছে থাকব।"

আমি বললাম, "বিয়ে অবধি?"

আত্রেয়ী বলল, "হুঁ, আর তুমি ছোটো ছোটো ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে পাগল করবে ততদিন, তাই না? আমি পারব না অতদিন অপেক্ষা করতে!"

আত্রেয়ীকে নিয়ে সোফায় বসিয়ে বললাম, "আমি তো তুমি রিপ্লাই করছিলে না বলে অমন করছিলাম সোনা। এই আমি তোমাকে কথা দিলাম, আর অবিশ্বাস করব না সারাজীবন।"

আত্রেয়ী আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ, চোখের জল আমাকে অদ্ভুত অসহায় করে দিচ্ছিল। আমার চোখও ভিজে গেল কখন বুঝতে পারলাম না। আত্রেয়ী আমাকে চুমু খেতে শুরু করল পাগলের মতো। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম। আমার কাম জাগছিল অস্বীকার করব না, কিন্তু তার থেকেও বেশি কষ্ট হচ্ছিল। আত্রেয়ী বলল, "আমাকে আদর করো। আমাকে আদর করো।"

আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম অনেকক্ষণ ধরে। আত্রেয়ী আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

চুমু খাওয়া শেষে আমি ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, "চলো বিয়ে করি। আজ থেকেই একসাথে থাকি। অনুষ্ঠান পরে হোক। রাজি?"

আত্রেয়ী আমার হাত ওর ঠোঁটে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, "রাজি।"

৬৬
অনিরুদ্ধ

অনিন্দিতা বেশ ভেঙে পড়েছিল। সারারাত আদর করলাম। ওর প্রেগনেন্সি সেলিব্রেট করলাম। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলাম অনিন্দিতার সারা শরীর। ওর পেটে হাত রেখে আমাদের সন্তানের দিব্যি দিয়ে বললাম, এরকম আর কোনও দিন হবে না।

এসব যখন করতে হয়, ভীষণ সিরিয়াস মুখে করতে হয়। মেয়েরা ন্যাকা জাত। তারা ন্যাকামি পছন্দ করে। চোখে জল এনে আবেগের কথা বললে, ভিক্টিম প্লে করলে ওরা গলে যায়।

অনিন্দিতাকে বললাম, ছোটোবেলাটা আমার ভালো যায়নি। আমার এক আত্মীয় আমাকে রেগুলার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করত। তাই মানসিকভাবে আমি একাকিত্বে ভুগি। এই কারণেই বিভিন্ন মেয়ের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু আর নয়। আমার নিজের সন্তান আসছে। এখন থেকে আমি আর কারও কথা শুনব না। কারও দিকে তাকাব না।

আমি, অনিন্দিতা আর আমাদের সন্তান ছাড়া আমি আর কাউকে চাই না।

আমার এখনকার একটা রোগের কথাও বললাম। দুবার অজ্ঞান হয়ে যাবার নাটকও করলাম। তাতে অনিন্দিতা ঘাবড়ে গেছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ওকে সে সুযোগে বেশি করে সিডিউস করলাম। যৌনতার সুযোগে আরও ব্রেন ওয়াশ করে দিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখলাম অনিন্দিতা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। আমি মনে মনে হাসলাম। মেয়েদের বোকা বানানো কত সহজ! একটু ভালো ভালো কথা বললেই এরা কাত হয়ে যায়।

পরক্ষণেই আমার চোয়াল শক্ত হল। ঋতুজার বর, কী নাম যেন শুয়োরের বাচ্চাটার, ওর এবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে মারতে হবে যাতে একটা বা দুটো পা চিরকালের মতো খোঁড়া হয়ে যায়। বাসে মেট্রোতে উঠলে প্রতিবন্ধী সিটে বসার সুযোগ পায়।

অনিরুদ্ধ রাউতের সঙ্গে এত বাজে ভাবে কথা বলার সাহস যখন পেয়েছে, তখন তার ফলও ওকে ভুগতে হবে।

কাকে বলব? আপাতত দুজনকে চিনি। খিদিরপুরের মুস্তাক আর রাজাবাজারের ইমানুল। ইমানুলের সমস্যা হল, মারতে গিয়ে ওর তালজ্ঞান থাকে না। হাত পা ভাঙতে গিয়ে খুন করে বসতে পারে। সেটা করলে হবে না। এ ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখে সারাজীবন পুড়িয়ে মারতে হবে। এই বানচোদকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে রেখে আমি ঋতুজাকে আদর করব।

কতদিন ঋতুজাকে চুমু খাওয়া হয় না। ঋতুজা আবেগপ্রবণ। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। সে সময়টাই আদর করতে বেশি মজা লাগে।

ঘুমের ঘোরে অনিন্দিতা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চোখ বন্ধ করলাম। কল্পনা করলাম অনিন্দিতা না, ঋতুজা আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। শক্ত হচ্ছিলাম, অনিন্দিতাকে ঘুমের ঘোরে চুমু খেলাম। অনিন্দিতা জাগল। আমাকে জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষণ ধরে ওকে আদর করলাম।

আদর শেষে অনিন্দিতা বলল, "তোমার শরীর এখন ঠিক আছে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

অনিন্দিতা আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ডাক্তার চৌধুরীর কাছে নিয়ে যেয়ো। বাচ্চা নষ্ট করব বলে রেগে গেছিলেন। এখন খুশি হবেন।"

আমি ওর কপালে চুমু খেয়ে বললাম, "নিয়ে যাব সোনা। তুমি তৈরি হও। স্কুল যাবে না?"

অনিন্দিতা আমার থুতনিতে চুমু খেয়ে বলল, “যাব না। ইচ্ছা করছে না। আজ সারাদিন তোমাকে জড়িয়ে ধরে থাকি।”

প্রমাদ গুনলাম। খিদিরপুর যেতে হবে তো! বললাম, “আচ্ছা, আমি শুধু একবার বেরোব আজ।”

অনিন্দিতা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “না। আজ তুমি কোথাও যাবে না। আমি পায়েস রাঁধব। তুমি খাবে।”

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আরও আদর করলাম।

শুয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। শ্বাস ছাড়লাম।

যাক! অনিন্দিতাকে ঠিক করে নিয়েছি মানে আর চিন্তা নেই। একমাত্র ওর পক্ষেই আইনিভাবে আমাকে সমস্যায় ফেলা সম্ভব ছিল।

এবার ঋতুজাকে ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন করিয়ে নিতে পারলেই শান্তি।

করুক, কলকাতায় ফিরে নিশ্চয়ই ফোন করবে ও।

অধীর আগ্রহে সেদিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

কতদিন ঋতুজাকে চুমু খাই না, আহ!

৬৭

জীমূতবাহন

টাকা বেঁচে গেছিল। বাগডোগরায় চলে এসেছি। প্লেনে ফিরব। তাহলে আর ট্রেনের ধকলটা নিতে হয় না। সময়ও বাঁচে। তাড়াহুড়োয় সেবক থেকে শিলিগুড়ি যাবার রাস্তার দৃশ্যটা প্রাণভরে উপভোগ করতে পারলাম না।

বউ... না থাক, ঋতুজাকে যত তাড়াতাড়ি ওর বাড়ি দিয়ে আসতে পারব তত ভালো। অনিচ্ছুক মানুষকে জীবনে টেনে নিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না।

পাহাড়ের মনোরম আবহাওয়া থেকে সমতলে নামার পর গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছে। এয়ারপোর্টে গিয়ে টিকেট কেটে এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকলাম। চারটেয় ফ্লাইট। তার কিছুক্ষণ পরেই ও নিজের বাড়ি গিয়ে অনিরুদ্ধর সাথে দেখা করবে।

যা করে করুক। পরের মেয়ে পরমানন্দ, যত গোল্লায় যায় ততই আনন্দ।

ঋতুজা চুপ করে আছে। বোর্ডিং পাস নিয়ে সিকিউরিটি পেরিয়ে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসলাম। ছোটো এয়ারপোর্ট। লোক গিজগিজ করছে। চেয়ারে বসে হেলান দিলাম।

ঋতুজা বলল, “আমি একটা ফোন করে আসছি।”

আমি বললাম, “অনিরুদ্ধকে করবে তো? আমার ফোন নাও। এটা থেকেই করো।”

ঋতুজা মাথা নেড়ে বলল, “অনিরুদ্ধকে না। বাবাকে ফোন করব। এ কদিন একবারও ফোন করিনি বাবাকে।”

আমি ফোন এগিয়ে দিলাম। ঋতুজা ওর বাবার সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ কথা বলে আমার দিকে ফোনটা এগিয়ে দিল।

আমি শ্লেষাত্মক গলায় বললাম, “যাকে ফোন করতে ইচ্ছা করছে তাকে করো, লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমি তো কিছু বলব না। তোমার ওপর আমার তরফ থেকে কোনওরকম রেস্ট্রিকশন নেই। চিন্তা কোরো না।”

ঋতুজা বলল, “আমি জানি না ও কোথায় আছে, ওর বউ আছে নাকি। না জেনে তো ফোন করি না।”

আমি বললাম, “তা বটে। লুচ্চামি করলে তো বউকে না জানিয়েই করতে হয়। তবে এখন চিন্তা কোরো না, ওর বউ সব জেনে গেছে। ময়দানে অবাধে খেলতে সমস্যা হবে। আচ্ছা, তুমি কতবার ওর সঙ্গে সেক্স করেছ?"

ঋতুজা চমকে চারদিকে তাকাল। সবাই নিজের নিজের কাজ করছে। আমার গলার স্বরও কম ছিল। তবু ও চমকাল। বলল, "আস্তে কথা বলো। সবাই শুনবে তো!"

আমি বললাম, "শুনলে শুনবে। এক কাজ করি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে তোমাদের কথা বলি। দেখা যাক কজন তোমার পক্ষে আছে আর কজন বিপক্ষে।"

ঋতুজার বিষ অনেক আগেই ঝরে গেছিল। এখন দৃশ্যত ওকে ক্লান্ত লাগছিল। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমি একটু বাড়ি যেতে চাই। আমি কি কোনওরকম ঝামেলা ছাড়া সেটা যেতে পারি?"

আমি বললাম, "আমার তো ইচ্ছা করছে পায়ের জুতোটা খুলে তোমাকে আগাপাশতলা জুতোতে, কিন্তু সমস্যা হল ভদ্রতা জিনিসটা আমার একটু বেশি, তাই বেঁচে গেলে। আচ্ছা অনিরুদ্ধ রাউত যদি ওর বউয়ের পাশে তোমাকে নিয়ে এক খাটেই শোয় তাহলে শোবে? একসঙ্গে সেক্স করবে?"

এই কথাটা একটু জোরে বলে ফেলেছিলাম। পাশের সিট থেকে এক ভদ্রমহিলা চমকে তাকালেন।

ঋতুজা কোনও উত্তর দিল না।

আমার ভীষণ রাগ হল। অত লোকের সামনেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কতবার সেক্স করেছ জানোয়ারটার সাথে? ওর বউ আছে জেনেও, ওর বউকে না জানিয়ে কতবার সেক্স করেছ? কতবার ঠকিয়েছ ওর পরিবারকে? অনিরুদ্ধর রক্ষিতা হয়ে বাকি জীবনটা কাটাবে, নাকি ওকে নিয়ে এমন কোনও জায়গায় পালাবে যেখানে অনিন্দিতা যেতে পারবে না?"

চত্বরসুদ্ধ লোক তাকাল আমাদের দিকে। ঋতুজা যেন মাটিতে মিশে যাচ্ছিল। পাশের বয়স্কা ভদ্রমহিলা আমার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালেন। আমি ওঁকে বললাম, "এই মেয়েটিকে দেখছেন, আমার বিয়ে করা বউ। বিয়ে করার পর জানতে পারলাম, ইনি এক বিবাহিত লোকের বউকে না জানিয়ে তার সাথে সম্পর্ক রেখে চলেছেন। এরকম মেয়ের সাথে কী করা উচিত বলে আপনার মনে হয়?"

ঋতুজা এবার কেঁদে ফেলল। তারপর উঠে দৌড়ে বাথরুমের ভিতর ঢুকে গেল। আমার মাথার মধ্যে যেন আগ্নেয়গিরি জ্বলছিল।

সবার কৌতূহলী চোখেও সে আগুন নিভল না।

৬৮

আত্রেয়ী

আমার মার স্বপ্ন ছিল বিয়ের সময় আমার বরকে বরণ করবে, আমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে। মা যেদিন চলে যায়, একটা গ্রীষ্মের দুঃসহ দুপুরে যখন মাকে ওরা নার্সিং হোম থেকে নিয়ে এসেছিল, আমি পাথর হয়ে বসেছিলাম।

কোনও কথা বলতে পারিনি। চোখ দিয়ে একফোঁটাও জল পড়েনি।

মা তো আমার আকাশ জুড়ে ছিল। জুড়ে বলা ভুল, আমার আকাশটাই মা ছিল। কী খাব, কী পড়ব, কোথায় যাব, সব, সবটাই মা। মা না থাকা আমাদের ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ব্যাপার হল। আমি আর বাবা দিশেহারা হয়ে গেছিলাম। জল গরম করতে পারত না যে মেয়ে, সে রান্না করা শিখে গেল। তেল, নুন, লংকা প্রথম প্রথম কিছুই ঠিক করে দিতে পারতাম না। বাবা সোনা মুখ করে তাই খেয়ে নিত।

কোত্থেকে জানলাম আমি মাঙ্গলিক। গাদাখানেক সাইট সার্চ করে জেনে ফেললাম মাঙ্গলিক হবার দোষ কী কী হতে পারে।

অমৃত যখন প্রথম আমাকে প্রোপোজ করল, আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি মাঙ্গলিক? অমৃত রেগে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি অঙ্কের টিচার? লজ্জা লাগে না এই প্রশ্নটা করতে?

আমি হেসে দিয়েছিলাম।

আমাকে কেউ বুঝিয়েছিল মাঙ্গলিকদের অনেক বাধা থাকে জীবনে, হাজার সমস্যা থাকে। আমার মনে গেঁথে গেছিল। ভাবতে শুরু করলাম আমার মাও হয়তো আমার জন্য চলে গেল। ভেতর ভেতর শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। ক্ষয়টা বুঝতে পারছিলাম।

মারাত্মক ডিপ্রেশন, সে ডিপ্রেশনের কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। শুয়ে আছি ছাদের দিকে তাকিয়ে। এক অব্যক্ত হাহাকার আমাকে ছারখার করে দিতে শুরু করেছিল প্রতিক্ষণে।

অমৃত আমার জীবনে দমকা হাওয়ার মতো। সারাদিন অসহ্য গরমের পর কালবৈশাখীর মতো এল। আমার অবচেতনে যে কখন ছেলেটা এত শিকড়বাকড় গজিয়ে বাসা বানিয়ে ফেলেছে আমি বুঝতেও পারিনি। বুঝতে চাইও না। যেটা বুঝি, আমার এই পৃথিবীতে দুজন আছে। আমার বাবা আর অমৃত। আমার আর কিছু চাই না। ওর কোমর আঁকড়ে ধরেছি রাস্তার পুরোটা সময়। পিঠে মাথা গুঁজে থাকতে থাকতে কখন যেন দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে গেছে বুঝতেও পারিনি।

মন্দিরে পৌঁছে অমৃতকে বললাম, "পুরোহিতকে বলবে আমি মাঙ্গলিক। প্রথমে মনে হয় দোষ কাটাতে গাছের সাথে বিয়ে দেয়।"

অমৃত আমাকে চমকে আমার হাতে একটা জোর চিমটি কেটে বলল, "আমার আত্রেয়ীর কোনও দোষ থাকতেই পারে না। আর গাছ কেন, তোমার সব সময় আমার সঙ্গেই বিয়ে হবে। চলো তো।"

আর কিছু ভাবিনি। পাগলটা আমাকে বিয়ে করল মন্দিরে। হাসিও পাচ্ছিল বাবা কী ভাববে ভেবে। তবে ভোররাতের দুঃস্বপ্নটা দেখার পরে আমার মাথায় আর কিছু কাজও করছিল না। মনে হচ্ছিল বিয়েটা হলেই যেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে সব হয়ে গেল। কপালে যখন সিঁদুর পরাল অমৃত, আমার মনে হল মা কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। আমি কেঁদে ফেললাম। অমৃত আমাকে জড়িয়ে ধরে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, "শোনো, এখানে সবাই পালিয়ে এসে বিয়ে করে, তোমার কান্না দেখে যদি লোকে ভাবে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি, বেদম ক্যাল খেয়ে যাব মাইরি!"

কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেললাম।

অমৃত বলল, "চলো এবার আমাদের বাড়ি।"

এবার আমার ভয় লাগল। ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "কাকু বাড়ি আছেন?"

অমৃত আমায় ধমক দিয়ে বলল, "কাকু কী? বাবা বলো। হ্যাঁ আছে। আমার বাবা কুল বাবা। চাপ নেই। চলো তো। আর শোনো, আমার ইচ্ছা করছে গোটা শহরকে চেঁচিয়ে বলি, আত্রেয়ী আজ থেকে আমার। শুধু আমার। পুরোপুরি আমার।"

আমি ওর হাতটা শক্ত করে ধরলাম।

ঠিক বলেছে।

ও আমার, শুধু আমার। পুরোপুরি আমার।

৬৯

জীমূতবাহন

বাগডোগরা থেকে কলকাতা প্লেনে বেশিক্ষণ লাগে না। তবু এটুকু সময়ই আমার মনে হচ্ছিল জীবনের দীর্ঘতম সময়।

বাড়িতে একবার খুব বিড়ালের উপদ্রব হয়েছিল। বাবা বলেছিল কয়েকটাকে বস্তায় করে অন্য পাড়ায় ছেড়ে আসতে।

আমার মনে হচ্ছিল ঋতুজাকে যেন আমি সেরকম বেড়াল পার করতেই যাচ্ছি। আর সেটা করতে পারলে আমি বেঁচে যাই। সারাজীবন ভালো না বাসার যন্ত্রণা সহ্য করার থেকে একবারে সব মিটে গেলে ভালো।

প্লেনে ওঠার আগে যখন এয়ারপোর্টের ওয়াশরুম থেকে এল, চোখে একফোঁটা জল নেই। দূরে গিয়ে বসল। প্লেনে ওঠার সময় অচেনা মানুষের মতো আমার পেছনে দাঁড়াল।

আমার মাথা সামান্য ঠান্ডা হয়েছিল। আমি আর কোনওরকম সিন ক্রিয়েট করলাম না।

চুপচাপ সিটে বসে রইলাম।

পাহাড়ি রাস্তায় যেভাবে ঘুমাচ্ছিল পড়ে পড়ে, এই রাস্তায় একবারও ঘুমাল না। চোখ মুখ শক্ত, একটাও কথা না। চুপ করে বসে রইল।

প্লেন যখন সন্ধ্যার কলকাতার আকাশ চিরে দমদম বিমানবন্দরে নামল, আমি হাঁফ ছাড়লাম।

নেমে ব্যাগেজ কাউন্টার থেকে ব্যাগ নেওয়ার সময় ও আমার পাশে থাকল। ব্যাগ নিয়ে আমি চুপচাপ বেরোচ্ছিলাম, ও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমি চলে যেতে পারব।"

আমি কিছু বললাম না। চোখ মুখ কঠিন করে দাঁড়ালাম।

ঋতুজা বলল, "আমার সঙ্গে এই খারাপ ব্যবহারটা করার দরকার ছিল। তুমি ঠিক করেছ। এটা আমার প্রাপ্য ছিল। কিছু জিনিস মানুষ সব বুঝেও না বুঝে অবুঝের মতো বসে থাকে। আমিও তেমনই ছিলাম। অনিরুদ্ধর বউ আছে জেনেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে গেছি। হ্যাঁ, হতে পারে অনিরুদ্ধ আমাকে ভালোবাসেনি। ব্যবহার করেছে। হতে পারে ও নিজের বউকেও ভালোবাসে না, আমাকেও ভালোবাসে না। আমার তাতেও কিছু হয়নি। দোষ কারও না। দোষ আমারই। আমার যোগাযোগ রাখা উচিত হয়নি। হয়তো অনিরুদ্ধ খুব দোষী। হয়তো কিছুই দোষী না। কিন্তু আমি ওকে কোনও দোষ দেব না। আমি না চাইলে তো কোনও যোগাযোগ হত না। আমি ছুঁতে দিতে না চাইলে ও ছুঁতেও পারত না। কিন্তু কী করব বলো, একা থাকার সমস্যা আমার মারাত্মক। ডিপ্রেশন মারাত্মক হয়। এর থেকে চাইলেই বেরোনো যায় না। আর আমি তো বেরোতেও চাইনি কোনও দিন। শিখব হয়তো কিছু এ সমস্ত ভুল সিদ্ধান্ত থেকেই। তোমার ওপরেই এসবের জন্য সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ল। আমি এজন্য নিজেকে কোনও দিন ক্ষমা করতে পারব না। তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো না। প্রতারণার কেস করতে পারো। আমি ডিফেন্ড করব না। আমি যাই। সাবধানে ফিরো।"

ঋতুজা কথাগুলো একটানা বলে গেল। যেন গোটা রাস্তা এই কথাগুলোই ও প্র্যাকটিস করে এসেছে।

কথা শেষ করার পরও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল।

আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে জোর পায়ে বাইরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পিছনের দিকে আর তাকালাম না।

তাকাতে ইচ্ছা করছিল না। মাথার ভিতর অনেক কিছু এদিক ওদিক করে যাচ্ছিল। বেরিয়ে দেখলাম কেউ গাড়ি এনেছে, কেউ ট্যাক্সি নিচ্ছে, কেউ বা ক্যাব, আমি ওই রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগলাম।

মুক্তির আনন্দ হচ্ছিল না। বিচ্ছেদের কষ্ট হচ্ছিল নাকি বুঝতে পারছিলাম না, তবে মনে হচ্ছিল ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। এত কষ্ট আমি অনেকদিন পাইনি। এয়ারপোর্টের বাইরের রাস্তায় আমার ব্যাগটা কাঁধে নিয়েই অনেকটা হেঁটে রাস্তাতে বসে পড়লাম। কিছু বোঝার আগেই একটা কান্না ভেতর থেকে উঠে এল যেন। এমন কান্না বহুদিন আসে নি।

রাস্তাতে বসে পড়ে প্রাণপণে জিভ কামড়ে কান্না আটকানোর চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। আশপাশ দিয়ে গাড়িগুলো গালাগাল দিতে দিতে যাচ্ছিল। ঠিকই তো, শহরের ব্যস্ত রাস্তা কি মানুষের কাঁদার জন্য?

আমি অনেক কষ্টে উঠে আবার হাঁটতে হাঁটতে ভি আই পি রোডে এলাম। একটা বাস জ্যামে দাঁড়িয়েছিল। দেখলামও না বাসটা কোথায় যাবে, উঠে পড়লাম। সিট ফাঁকা ছিল। বসে মাথা নিচু করলাম।

এ কী সমস্যা শুরু হল এবার? এত সমস্যা, এত কষ্ট হচ্ছে কেন? আমার এসব কেন হচ্ছে?

আত্রেয়ী আমার। শুধু আমার।

আজ থেকে নাম দুটো পাশাপাশি বসবে।

ভাবতেই ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগছে ও যখন আমার হাতটা ধরছে। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলছে।

এতদিন যখন বাড়ি গেছি, ভেবেছি সময়টাকে কেন আটকে রাখতে পারছি না। কেন আত্রেয়ী সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবে না!

আজ থেকে সেই ভাবনাটাই আসবে না ভাবতে নিজেকে পৃথিবীর সবথেকে সুখী মানুষ মনে হচ্ছিল।

অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনের মতো আত্রেয়ীকে নিয়ে শহরটায় ঘুরলাম। এই সেই শহর, যাকে নিয়ে কত কবিতা, কত গল্প লেখা হয়েছে। আজ থেকে আমাদের অধ্যায়টাও যুক্ত হল এ শহরের মহাকাব্যে।

অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে বাইক থামাতে হঠাৎ দেখি আত্রেয়ী জোরে হেসে উঠল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কী হল? হাসছ কেন?"

আত্রেয়ী হাসতে হাসতেই বলল, "তোমার ভারী সমস্যা হবে কিন্তু আজ থেকে।"

আমি বুঝলাম না। অবাক হয়ে বললাম, "কেন? কী সমস্যা?"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি তো রোজ আমার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে আর রোজ আমার বাড়ি চলে আসতে। এবারে কী করবে?"

আমিও হেসে ফেললাম। বললাম, "এসব বলে লজ্জা দেওয়া বন্ধ হোক। খিদে পাচ্ছে। স্যান্ডউইচ খাবে?"

আত্রেয়ী বলল, "চলো।"

আর-একটু এগিয়ে একটা ক্যাফে উদ্ধার হল। পিৎজা, চিকেন স্যান্ডউইচ আর লেমোনেড অর্ডার করা হল।

আত্রেয়ী বলল, "আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না কিছু। সব স্বপ্ন মনে হচ্ছে। আমায় একটা চিমটি কাটো তো।"

আমি বললাম, "কেন স্বপ্ন মনে হচ্ছে?"

আত্রেয়ী বলল, "জানি না। মনে হচ্ছে তো মনে হচ্ছে। আমি কী করব? এই শোনো, এবার কী করব? আমি আমার বাড়ি ফিরে যাব, তুমি তোমার বাড়ি?"

আমি বললাম, "কভি নেহি। বিয়ে কি ইয়ার্কি মারতে করেছি? তুমি আমার বাড়ি যাবে।"

আত্রেয়ী বলল, "আমার কেমন ভয় করছে। ঠিক করছি তো আমরা? তোমার বাড়িতে... কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া... যদি খুব অশান্তি হয়?"

আমি বললাম, "এই তোমার কি টেনশন নেওয়া ছাড়া কাজ নেই? এরপর কিন্তু শাস্তিস্বরূপ ভেজ বিরিয়ানি খাওয়াব তখন বুঝবে।"

আত্রেয়ী বলল, "তুমি তো পাগল। সমস্যা হলে লাফ ঝাঁপ দেবে না তো? বাবার মুখে মুখে তর্ক কোরো না কিন্তু, আমার বড়ো খারাপ লাগে সেটা।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "ধুস, দাঁড়াও তো।"

ফোন বের করে আমি বাড়িতে ফোন করলাম। বউদি ধরল, "কী হল? মাথা ঠিক হল তোমার? খেলে কিছু?"

বললাম, "বউদি, বাবাকে দাও তো।"

বউদি কৌতূহলী গলায় বলল, "কেন? কী করলে আবার?"

আমি বললাম, "আহ, দাও না। প্লিজ!"

বউদি বলল, "আচ্ছা ধরো। বাবা ঘুমাচ্ছেন কিন্তু।"

আমি বললাম, “তাও দাও!”

আত্রেয়ী দেখলাম ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বউদি বাবাকে জাগিয়ে ফোন দিল। বাবা ঘুম ঘুম গলায় বলল, “কী হল?”

আমি শান্ত গলায় বললাম, “বাবা আমি বিয়ে করেছি।”

বাবা ততোধিক শান্ত গলায় বলল, “তো আমি কী করব? নাচব?”

আমি বললাম, “আরে আমি সিরিয়াস!”

বাবা বলল, “ভালো করেছিস। ফেরার সময় আরসালানের বিরিয়ানি নিয়ে আসিস। মিষ্টিও আনবি। নইলে বউ নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেব না। তুই যে লেভেলের পাগল তাতে এসব করবি আমি জানতাম। যাই হোক, ঘুমালাম। জ্বালাবি না। আত্রেয়ীকে নিয়ে রাস্তায় না ঘুরে বাড়ি আয়। আমি ওর বাবার সাথে ফোন করে কথা বলে নিচ্ছি ঘুম থেকে উঠে। এখন আবার ফোন করলে ত্যাজ্যপুত্র করে দেব মাথায় রাখিস।”

ফোনটা কেটে গেল।

আত্রেয়ী বলল, “কী হয়েছে?”

আমি বললাম, “আরসালান যেতে হবে আবার।”

আত্রেয়ী বুঝল না, “মানে?”

আমি কিছু বলার আগে দেখি বাড়ি থেকে ফোন। নিশ্চয়ই বউদি। ফোনটা আত্রেয়ীকে দিয়ে বললাম, “কথা বলো। আমার হ্যাজাতে ভালো লাগছে না। যা ইচ্ছে বলো।”

আত্রেয়ী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফোনটা কানে দিল।

৭১

কপালকুণ্ডলা
নবকুমার নবকুমার
তোমার বাড়ি যাব,
নবকুমার তুমি কি কখনও
আমার কথা ভাবো?

সদুজ্যাঠা বলে, যে মানুষের কোনও দিন আমাদের হওয়া সম্ভব না, আমরা সে মানুষের টানেই সবথেকে বেশি যাই। এটাই আমাদের নিয়তি।

আমি যেমন, যে হাবলু মিত্রের বাড়ি কোনও দিন যাইওনি, নবকুমারকে একবার দেখব বলে সে বাড়ি গিয়ে মিত্র কাকিমার সঙ্গে ভাট বকতে শুরু করি। সে ছেলে ঘরে ঢুকে সেই যে দরজা দেবে, বেরোনোর নাম অবধি করে না।

আমিও বিফল হয়ে ফিরে আসি। শেষতক সাঁপুইবাড়িতে মিনিমাগনার ঝি-গিরি করে সারাজীবন কাটাতে হবে? তাই হবে হয়তো। যে ছেলের আমার উপর বিন্দুমাত্র চাপ নেই, তার পিছনে ঘুরে আর কী করব? হেরে যাওয়াটাই নিয়তি বুঝতে পারছিলাম দিনের শেষে।

সদুজ্যাঠাও এটাই বলে, মেয়েদের মনটাই বুঝি এরকম। যে ছেলে যত বেশি কষ্ট দেবে, মেয়েটা তার কাছেই তত বেশি করে যাবে।

সব মানুষের কত গল্প থাকে, তাদের জীবনযাপন থাকে, কষ্ট থাকে, আনন্দ থাকে। আমার কিচ্ছু নেই। আমার দিনযাপন আছে, আর আছে রোজ একবার করে অনির্বাণের দৃষ্টি আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা।

আর এই চেষ্টার নিষ্ফল হওয়াটা যে আমাকে কতটা মরিয়া করে তুলেছিল সেটা বোধহয় আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

কাকিমারা বাড়ি ছিলেন না, বাড়ি ফাঁকা করে কলকাতায় কোথাও একটা গেছিলেন, অনির্বাণ ফিরতেই আমি গোটা বিকেলটা ও বাড়ির সামনের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে ঘুরতে শুরু করলাম। বুকের মধ্যে হৃদযন্ত্রটা যে এমন পাগলামি শুরু করে দেবে, আগে বুঝিনি কোনও ভাবেই।

সন্ধে হতে ছেলেটার অমোঘ আকর্ষণে আমি সাইকেল রাস্তায় রেখে মিত্র বাড়িতে ঢুকে অনির্বাণের দরজার বাইরে কান পেতে দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম কী করছে।

হাঁটাচলার শব্দ না পেয়ে ভাবলাম ঘুমাচ্ছে, জানলা এমনভাবে বন্ধ করা কিছুতেই বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না, দরজায় কান দেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

বুকের ঢিপঢিপ শব্দ নিজেই বুঝতে পারছিলাম, এক মন বলছিল পালা, আর-এক মন কিছুতেই যেতে চাইছিল না, এমন সময় আমাকে হতভম্ব করে দরজাটা খুলে গেল।

আমি দরজায় প্রায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, অনির্বাণ দরজাটা খুলতে ওর গায়ে গিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটা স্বপ্নের মতো হতে পারত। হল না।

না, অনির্বাণ আমাকে প্রবল অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারত, বা যেরকম সিচুয়েশনগুলো ভাবতাম, সে স্বপ্নের মতোই ভীষণ রোম্যান্টিকভাবে বলতে পারত, “এখানে?”

তেমন কিচ্ছু হল না।

আমি ওর গায়ে গিয়ে পড়তে ও আমাকে শক্ত করে ধরল। আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি চোখ বন্ধ করলাম লজ্জায়। ভাবছিলাম এই বুঝি ছেলেটা ভয় পেয়ে হাউমাউ কান্না জুড়ে দেবে।

আচ্ছা, প্রবল ভালোবাসার মানুষ যদি ধর্ষণ করে, তবে একটা মেয়ে কী করে? যে মানুষটাকে একটা মেয়ে প্রবলভাবে ভালোবেসে এসেছে, স্বপ্ন দেখে এসেছে একসঙ্গে থাকবে বলে, সে মানুষটা যদি প্রবল আক্রোশে বলে, “এই মাগিটার খুব রস, রোজ আমায় ফলো করা, না? আয় তোর সব রস নামিয়ে দি” বলে খাটে ঠেসে ধরে, একপ্রকার নির্বাক হতভম্ব করে ধর্ষণ করে, সে মেয়ের কী করার থাকে?

আমারও কিছু করার ছিল না। আমি তো নিজের মধ্যেই ছিলাম না। আমার গালে চড় মারতে মারতে, আমার স্তন মুখ দিয়ে প্রায় ছিঁড়ে নিতে নিতে অনির্বাণ আমার সমস্ত ভালোবাসা ওইটুকু সময়েই সফলভাবে ভস্ম করে দিতে পারল।

ওর প্রতিটা আঘাতে আমার দু চোখ দিয়ে নিঃশব্দে জল নেমে এল। আমার মনে হচ্ছিল আমি বোধহয় আবার সেই বিচ্ছিরি দুঃস্বপ্নটা দেখছি যেটা দেখে আমি রাতে উঠে বসে থাকতাম। যেটার ভয়ে আমি সন্ধে হলে একসময় বাড়ির বাইরে বেরোতাম না পর্যন্ত।

সব কিছু হয়ে যাবার পর অনির্বাণ আমার পাজামাটা আমার দিকে ছুড়ে প্যান্ট পরতে পরতে বলল, “যা বাড়ি যা। আসিস ইচ্ছা হলে রাত্রে। দরজা খুলে রাখব।”

মিত্র বাড়ি থেকে আমাদের দোকান ছ-সাতশো মিটার হবে। সে রাস্তাটুকু আমার দীর্ঘতম রাস্তা হয়ে রইল সারাজীবনের জন্য।

৭২

অমৃত

এই যে এত ইনসিকিউরিটি, এত সন্দেহ, এত হারিয়ে ফেলার ভয়... এত সব কিছুর পরে যখন সে আমার হয়ে যায়, তখন এক অদ্ভুত ভালোবাসার জন্ম হয়। ভালোবাসায় তো হারিয়ে ফেলার ভয় বরাবরই থাকে। যে মেয়েকে আমি ভালোবাসি, সব সময় মনে হয় তাকে নিয়ে থাকি। হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন, অথচ সে মেসেজ না করলে পৃথিবীটাই অন্ধকার হয়ে আসে। মনে হয় সব শেষ হয়ে গেল।

এখন অবশ্য অন্য দৃশ্য। বাড়ির দরজায় বিকেলবেলা হাতে মাটন বিরিয়ানি আর চিকেন চাপের প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দুজন। আত্রেয়ী ভয়ে আছে, তবে প্রাণপণে হেসে সিচুয়েশন হালকা করতে চাইছে।

দরজা বাবা খুলল। আমাদের দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার দিকে একবারও না দেখে আত্রেয়ীকে বলল, "ঘরে যাও মা। তোমার কপালে অশেষ দুঃখ দেখতে পাচ্ছি। এক উৎকৃষ্ট মানের বানরের গলায় মুক্তোর হার হয়ে তুমি থাকবে।"

আমার এ কথা শুনে রেগে যাওয়া উচিত ছিল। আমি রাগলাম না। হেসে ফেললাম। আত্রেয়ীও হেসে ফেলল।

ঘরে ঢুকতেই বউদি হইহই করে এসে আত্রেয়ীকে নিয়ে ওর ঘরে চলে গেল। আমি ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা বলল, "বল এবার তোর দাবি কী?"

আমি বললাম, "তুমি ওর বাবার সঙ্গে কথা বলেছ?"

বাবা বলল, "হ্যাঁ, ওর বাবা কাকা জেঠুরা আসছেন সব। এখানেই রেজিস্ট্রার আসবেন সে ব্যবস্থা করেছি।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

বাবা বলল, "দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিছু বলবি?"

আমি বললাম, "দাদাকে বলেছ?"

বাবা বলল, "না। বড়ো বউমাকেও বলতে বারণ করে দিয়েছি। একা আমি শক খাব কেন? সবাই শকে থাক। বাড়ি এসে তোর কাণ্ড দেখবে। একটু পরে পাড়ায় বেরোব। পাড়াতেও জানাতে হবে তোর কীর্তি।"

আমি বললাম, "পাড়ার লোককে বলবে কেন?"

বাবা বলল, "কারণ তুই তাপস পাল না যে ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেবার মতো ঘরে বউ ঢুকিয়ে দিলেই সবাই মেনে নেবে। এখানে সামাজিকতা রক্ষা করতে হয়।"

আমি গোঁজ হয়ে বললাম, "লোকে কী বলবে ভেবে তো আমি কিছু করিনি। লোকের কথা ম্যাটার করে না আমার কাছে।"

বাবা বলল, "কোনও পাপও করিসনি যে কাউকে বলতে হবে না। লোকের কথা ম্যাটার করে না তো। আমার কাছে এসব কোনও কালেই ম্যাটার করেনি। তবে পাড়ার সবাই এসে আত্রেয়ীকে দেখে যাক। অঙ্কের শিক্ষিকা, ভালো গায়িকা, এত ভালো একটা মেয়েকে সবাই আশীর্বাদ করুক। তুই এসবে ঢুকবি না। এক কাজ কর, যা ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমি সব দেখছি।"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, "ঘুমিয়ে পড়ব? এখন?"

বাবা বলল, "হ্যাঁ এখন। অন্য সময় হলে তো ঘর বন্ধ করে আত্রেয়ীর সঙ্গে ঝগড়া করতি। এখন আর সে উপায় নেই।"

বাবা হাসতে হাসতে টিভির ঘরে গিয়ে টিভি চালাল।

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দাদার ঘরে উঁকি মেরে দেখি আত্রেয়ীকে নিয়ে বউদি কত গল্প করছে। আমাকে দেখে বউদি বলল, "অমু তুমি কেটে পড়ো এখন। তোমার বউকে রাত্তিরে হ্যান্ডওভার পাবে। এখন আমার সাথে গল্প করুক।"

আমি আত্রেয়ীর দিকে তাকালাম।

আত্রেয়ী আমাকে পাত্তাই দিল না।

বড়ো দুঃখ হল।

হয় হয় এমনই হয়। এভাবেই কাছের মানুষগুলো দূরে চলে যায়।

যত্তসব!

আমি বললাম, "আমি এখন কোথায় যাব?"

বউদি বলল, "বাজার ঘুরে এসো!"

আত্রেয়ী বলল, “বাইক নিয়ে যেন না যায় ও।”
আমি বললাম, “মানে? বাইক নিয়ে যাব না তো কী নিয়ে যাব?”
আত্রেয়ী বলল, “আমি জানি না কী নিয়ে যাবে, কিন্তু বাইক নিয়ে যাবে না।”
বউদি গালে হাত দিয়ে বলল, “কেন কেন? আমি শুনতে পারি কেন যাবে না?”
আত্রেয়ী লজ্জা পেল।
বলল, “পরে বলব।”
এবার আমার ভালো লাগল। হ্যাঁ, এই তো বেশ প্রেম আছে। ভুল ভাবছিলাম আমি।
গম্ভীর গলায় বউদির দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমি ঘরে শুলাম। বাবা ঘুমাতে বলেছে। বাবার কথা তো আর অমান্য করা যায় না।”
বউদি হাসতে হাসতে বলল, “বাবা, কত পিতৃভক্ত হনুমান তুমি!”
আমি পালালাম নিজের ঘরে। এখানে থাকলেই সমস্যা। ঘুমাই এখন। আর ফোনে আত্রেয়ী আর আমার ছবিগুলো দেখি। এই ছবিগুলো অদ্ভুত এক শান্তি এনে দেয়। সব ভুলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে।

৭৩
কপালকুণ্ডলা

সাইকেলটা মিত্রকাকুদের বাড়ির সামনেই পড়ে ছিল। ব্যস্ত পাড়া, ব্যস্ত বাজার, শুধু এলোমেলো চুলে আমি দোকানের ক্যাশে গিয়ে যখন রোজের মতো বসলাম, আমার মধ্যে যে কত বড়ো পরিবর্তন হয়ে গেছে সেটা কেউ দেখল না একজন ছাড়া। সদুজ্যাঠা।
আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে বলল, “এদিকে আয়।”
সদুজ্যাঠা গেল।
আমি সদুজ্যাঠার পেছন পেছন সদুজ্যাঠার ঘরে গিয়ে বসলাম। সদুজ্যাঠা ঘরে ঢুকেই আমাকে বলল, “কী হয়েছে তোর? মা মেরেছে?”
আমি মাথা নাড়লাম।
সদুজ্যাঠা চোখ ছোটো ছোটো করে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তাহলে? কী হল?”
আমি মাথা নিচু করলাম, “কিছু না।”
কথা শেষ করতে পারলাম না, ডুকরে কেঁদে উঠলাম। কাঁদতে কাঁদতেই কখন যে অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম, বুঝতে পারিনি।
সদুজ্যাঠা চোখে মুখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাস জোরে পড়ছিল।
সদুজ্যাঠা আমার হাত ধরে জোরে নাড়িয়ে বলল, “বল মা, কী হয়েছে তোর।”
আমি বললাম, “ছেলেটা আমায় নষ্ট করে দিল সদুজ্যাঠা।”
সদুজ্যাঠা অবাক হয়ে বলল, “মানে?”
আমি কোনও মতে বোঝালাম।
সদুজ্যাঠা আমার কথা শেষ হবার আগেই তীব্র বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
আমার বমি হয়ে গেল ভয়ে, যন্ত্রণায়। তলপেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। জল নিয়ে নিজের মাথাতেই দিচ্ছিলাম।
কিছুক্ষণ পরেই হইহই শব্দ এল বাইরে থেকে। সদুজ্যাঠা এ ঘরে এসে আমাকে বলল, “ওঠ। আমার সঙ্গে আয়।”
আমি বললাম, “কোথায় যাব?”
সদুজ্যাঠা বলল, “আয়।”

আমাকে ধরল সদুজ্যাঠা। আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি আর নিজের মধ্যে ছিলাম না।

দোকানের বাইরের রাস্তায় নিয়ে এল সদুজ্যাঠা। দেখলাম অনির্বাণকে মেরে মেরে চোখ মুখ থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে পাড়ার লোক।

আমি সদুজ্যাঠার দিকে অবাক চোখে তাকালাম। সদুজ্যাঠা একটা সিঁদুরের কৌটো অনির্বাণের হাতে দিয়ে বলল, "যা, ওর কপালে পরিয়ে দে।"

অনির্বাণকে যে ভীষণ মারা হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। ও হাতে সিঁদুরের কৌটোটা নিতে পারল না। কৌটোটা পড়ে গেল। বাজারের লোক জমে গেছিল। প্রায় সবাই মারমুখী। সদুজ্যাঠা হাত দিয়ে সবাইকে আটকাল।

পুরো ব্যাপারটা বুঝতে আমার একটু সময় লাগল। যখন মাথায় ঢুকল, বুঝলাম অনির্বাণের সঙ্গে সদুজ্যাঠা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছে।

আমার মাথা ঘুরছিল। সদুজ্যাঠাকে বললাম, "এ তুমি কী করছ? একে আমি বিয়ে কেন করব? জেনে শুনে একজন ধর্ষককে বিয়ে করব কেন?"

সদুজ্যাঠা থমকে দাঁড়াল।

পাড়ার ভিড়টাও।

বাবা কোথাও একটা গেছিল গাড়ি করে। কেউ ফোন করেছিল হয়তো। এসে কোনও দিকে না তাকিয়ে আমাকে চড় মারতে যাচ্ছিল। সদুজ্যাঠা আটকাল। বাবা বলল, "এ ছেলেটাকে ছেড়ে দে। আমার মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে নাকি? ছেড়ে দে, এ বরং পাড়া ছেড়ে পালাক। তোরাও সব ভুলে যা।"

আমার সীতার পাতালপ্রবেশের কথা মনে পড়ে গেল।

মেয়ের বিয়ে দেওয়া এত দায়? এত? আমি এতটাই বোঝা বাবার ওপরে?

সদুজ্যাঠা কিন্তু বাবার কথা শুনল না, অনির্বাণকে কলার ধরে নিয়ে দোকানের ভিতর ঢুকিয়ে বলল, "চেহারা, স্বভাব চরিত্র এমন করে কিছু মানুষ ঘুরে বেড়ায়, এদের দেখে মনে হয় না আসলে একজন অপরাধী পুষে বেড়াচ্ছি আমরা। একে ছাড়লে আর-একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করবে কে দায় নেবে? তুই?"

বাবা রেগে গিয়ে দাপাতে দাপাতে বলল, "আমার মেয়েকে নিয়ে তুই সিদ্ধান্ত নিবি?"

আমি বসে পড়েছিলাম একটা বেঞ্চে। বাবাকে বললাম, "না বাবা, আমাকে নিয়ে আমিই সিদ্ধান্ত নেব। আর কেউ নেবে না। পুলিশে খবর দাও। ও ছেলেকে নিয়ে যাক।"

অনির্বাণ চমকে গিয়ে আমার দিকে তাকাল। বাবা দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে আমার বাবার উপর ভীষণ অভিমান হল। মেয়েরা এতটাই পর হয় মানুষের?

৭৪

জীমূতবাহন

আমার জীবনে যে কোনও দিন একটা রাত এরকম আসতে পারে, আমি কোনও দিন ভাবিনি। আমার মতো কারও কোনও ক্ষতি না করা মানুষের জীবনে এরকম একটা দিন কেন আসবে আমি জানি না। হয়তো মানুষের জীবনটাই এরকম। কেউ জানেই না কাল কী আসতে পারে। এভাবে কষ্ট পেয়ে থাকাই যে আমার নিয়তি হতে চলেছে আমি এই সেদিনও জানতাম না।

কষ্ট শুধু নিজের জন্য হচ্ছিল না, ঋতুজার জন্যও হচ্ছিল। বারবার মনে হচ্ছিল আমার তো ডিভোর্স হয়েই যাবে, অকারণ কেন মেয়েটাকে আমি অতগুলো অচেনা মানুষের সামনে ওসব বলে ফেললাম? এই মেয়েটাই তো কুঁকড়ে শুয়ে থাকে, দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে কথা বলে, ঘুম না হলে জেগে বসে থাকে।

অনিরুদ্ধকে যদি ভালোবেসেও থাকে, সেই স্পেসে আমি কেন ঢুকতে গেলাম? আমাকে কোনও দিন ও ভালোবাসবে না, এটাই আমার রাগ ছিল?

বাসটা হাওড়াগামী ছিল। কলকাতা ঘুরে ঘুরে কখন স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল খেয়াল করিনি।

ব্যাগ নিয়ে হাওড়া ব্রিজের উপর দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পরে হঠাৎ ইচ্ছা হল মরে যেতে।

মনে হল বেঁচে থেকে কী হবে? একটা অকারণ বাজে জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়াই তো হবে।

মার মুখটা মনে পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

অনিরুদ্ধকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল। একটা মানুষ ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এরকম হয়, সেটাও জানতে ইচ্ছা করছিল।

লোকটা কি জানে লোকটা অসুস্থ? জানে না বোধহয়। অনিরুদ্ধর উপরেও তেমন আর রাগ হচ্ছিল না। লোকের উপর রাগ করে কী হবে? কপাল খারাপ থাকলে এটাই তো হবার।

চোখ ভিজে যাচ্ছিল। চোখ মুছতে মুছতে হেঁটে গেলাম অনেকটা। শেষমেশ বাড়ি ফেরাই ঠিক করলাম। মধ্যবিত্ত একটা বাড়ি।

ক্যাব বুক করলাম।

বাড়ি যখন পৌঁছোলাম, রাত বারোটা বেজেছে। দরজা বন্ধ ছিল। বেল বাজিয়ে সবাইকে জাগালাম। বাবা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, “এখন?”

আমি বললাম, “ঘুমিয়ে পড়ো, সকালে বলছি।”

মা উঠে এসেছিল। আমায় দেখে বলল, “তোর চোখ ফোলা কেন রে বাবু? কী হয়েছে?”

আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম অনেকক্ষণ। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, “ঘরে যা। বউমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি? মেয়েটা কখন এসে উপরের ঘরে গিয়ে শুয়েছে। খেলও না। তুই খেয়েছিস?”

আমি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললাম, “মানে? এখানে এসেছে?”

মা আমার থেকেও বেশি অবাক হয়ে বলল, “তুই জানিস না?”

আমি সিঁড়িতে লাফ দিয়ে উপরে যেতে যেতে বললাম, “তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো। সকালে কথা বলছি।”

মা বাবা দুজনেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি আমার ঘরের সামনে গিয়ে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে দরজা নক করলাম। ঋতুজা ঘুমচোখে দরজা খুলে বলল, “কোথায় ছিলে এতক্ষণ?”

আমি অবাক হলাম। এই মেয়ের কি শর্ট টার্ম মেমোরি লস হয়? আমি গম্ভীর গলাতেই বললাম, “তুমি এখানে?”

ঋতুজা বলল, “বাবা বাড়ি তালা দিয়ে আসানসোলে পিসির বাড়ি গেছে, আমি কী করব? আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই, এখানের কথাই মনে পড়ল। আজ থেকে কাল চলে যাব। অসুবিধা আছে, না বাইরে শোব কোথাও?”

আমি বললাম, “না, শোও। আর সরি।”

ঋতুজা বলল, “সরির কিছু নেই। আমি আমার লাইফটাকে এরকম করেছি, এসব তো আমার প্রাপ্য ছিল। ইটস ওকে।”

আমি ওর দিকে তাকালাম। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে খাটে গিয়ে শুল যেন কতদিন এ বাড়িতে আছে।

আমার কেমন নিশ্চিন্ত লাগছিল। ভালো লাগছিল এটা জানা সত্ত্বেও যে ও কাল গেলে আর ফিরবে না।

আমি চেঞ্জ করে ওর পাশে শুয়ে পড়লাম।

ঋতুজা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে আমার গায়ে ঠ্যাং তুলে দিল। আমি চুপ করে শুয়ে থাকলাম।

আমিও বোধহয় ওর মতো পাগলই হয়ে গেছি।

একটা দুঃস্বপ্ন দিয়ে শুরু দিন, একটা স্বপ্নের মতো বাস্তব দিয়ে শেষ হলে কার না ভালো লাগে? বাবা যখন এ বাড়িতে এল, আমায় দেখে শুধু ফিক ফিক করে হেসে যাচ্ছে। একগাদা লোকের মাঝখানে আমি না পারছি রাগতে, না পারছি বাবাকে কিছু বলতে। একটা সময় আমাকে একা পেয়ে বাবা বলল, "তোরা এটা কী করলি রে? তবে যা করেছিস বেশ করেছিস। অমৃতর বাবার সঙ্গে আমিও একমত। তোর এরকমই কিছু একটা দরকার ছিল। একজন বন্ধুর দরকার ছিল। ডিপ্রেশন আসবে না দেখিস এর পর থেকে। তোরা দুটো পাগলে ঝগড়া করেই সব ভুলে থাকবি আমি জানি।"

আমার এবার কান্না পেয়ে গেল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "ওষুধগুলো খাবে ঠিক করে। রাতে কোনওরকম সমস্যা হলে একবারও না ভেবে ফোন করবে। আর আমি নেই বলে মনের সুখে তেল মশলা খাবে না কিন্তু বলে দিলাম।"

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আচ্ছা। আমার কথা ভাববি না। দেখা হবে তো। অমৃতরা খুব ভালো মানুষ। তোকে ভালো রাখবে আমি জানি। ঝগড়া-টগড়া সব হবে, সেসব তো একটা সম্পর্কর জন্য ভালোই। তবে সেটা মাত্রাতিরিক্ত না হয়, তুই-ই দেখিস। অমৃত ছেলেমানুষ।"

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, "ছেলেমানুষ? আমার থেকে অন্তত সাত বছরের বড়ো তোমার ছেলেমানুষ।"

বাবা বলল, "তাতে কী? মানুষ কি শুধু বয়সেই বাড়ে? মনেও তো বাড়তে হয়। ও ছেলে বয়সেই বেড়েছে বুঝলি। এখনও ওর মধ্যে একটা কৈশোর আছে। সেটা যেন সারাজীবন থাকে তুই দেখিস।"

আমি ঠোঁট ফুলিয়ে বললাম, "হয়েছে, হয়েছে। থামো এবার। খালি ওর প্রশংসা করে যাচ্ছো। আমি বানের জলে ভেসে এসেছি বুঝি?"

বাবা বলল, "তা নয়। তবে তোর মধ্যে তো তোর মায়ের ছায়া আছে। ওর মতোই তুই সবাইকে আগলে রাখতে জানিস। তাই তোকেই বললাম।"

অমৃত কাছেই ঘুরঘুর করছিল। এই করে যাচ্ছে। বাড়িভর্তি লোক, অথচ শুধু আমার চারপাশে ঘুরছে। লজ্জা লাগছিল, রাগ হচ্ছিল, আবার ভালোও লাগছিল। এতগুলো অনুভূতি যে একসঙ্গে আমার কোনও দিন হতে পারে ভাবতে পারিনি।

পাড়ার বেশ কয়েকজন এলেন। চিনি না তাঁদের। আশীর্বাদ করে গেলেন।

রাত আটটায় অমৃতর দাদা এসে হতভম্ব। বুঝতে কিছুক্ষণ সময় নিলেন। আর বুঝে উঠতেই হইহই করে ফুলশয্যার খাট সাজাতে লেগে পড়লেন পাড়ার বন্ধুদের নিয়ে। আমার যে কী লজ্জা লাগছিল।

অমৃতর বউদি কানে কানে বললেন, "প্রোটেকশন নিতে বোলো ভাই। এখনই ট্যাঁ নেবে না তো?"

শুনে কান-টান লাল হয়ে একশা। খেতে বসে আর-এক কেলো। নিজের প্লেটের মুরগির ঠ্যাং অমৃত আমার প্লেটে সবার সামনে তুলে দিল। আমার মনে হচ্ছিল ওকে খুন করে দি। আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই দুজনেই সে দেখে হো হো করে হাসি।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ অমৃতর দাদা আর বউদি আমাদের ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন।

একটা ঘর। ফুলে ফুলে সাজানো।

আমি আর পাগলটা।

মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল বলো?"

আমি বুঝলাম পাগলটা আবার খেই হারিয়ে ফেলছে। চাইছে আমাকে জড়িয়ে ধরতে অথচ লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে।

এগিয়ে গিয়ে আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। ও আমাকে জড়িয়ে ধরল।

মিনিটখানেক চুমু খাবার পর বলল, "মাইরি এরকম ফুলশয্যা হয় জানতাম না তো? তুমি দুধের গ্লাস নিয়ে এলে না তো?"

আমি হেসে ফেলে বললাম, "আবার শুরু করলে? অনেক হয়েছে। এবার আদর করো তো!"

অমৃত পরম মমতায় আমার কপালে চুমু খেয়ে বলল, "আমার নদী। আমার সোনা। আমার আত্রেয়ী। ভালোবাসব সারাজীবন সোনা। ভালোবাসব বউ।"

ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করার থেকে সুখীতম মুহূর্ত আর কিছু হয় কি?

৭৬
জীমূতবাহন

আমি ক্লান্ত ছিলাম। ডিস্টার্বডও।

তবু ঘুম ভেঙে গেল সকাল সাতটা নাগাদ।

ঋতুজা সারারাতে ওঠেনি।

আমি আমার গা থেকে ওর পা সরিয়ে সন্তর্পণে নিচের ঘরে নেমে এলাম।

বাবা প্রাণায়াম করছিল। আমাকে দেখে সেসব বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল, "আমি কি জানতে পারি এ বাড়িতে কী হচ্ছে?"

আমি শান্ত ভঙ্গিতে বাবার সামনে মেঝেতেই বসে পড়ে বললাম, "বাবা, আমাকে যখন ওদের বাড়িতে সবাই বিয়েটা করার জন্য জোর দিচ্ছিল, তুমি আমাকে বারণ করোনি কেন? তোমার একবারও মনে হয়নি এটা আমার কতটা ক্ষতি করতে পারে?"

বাবা থতোমতো খেয়ে বলল, "আমি কি অত বুঝে কিছু করেছি? আমি ভেবেছিলাম আমার ছেলে একটা ভালো কাজ করছে। কেন? কী হয়েছে?"

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "কিছু না।"

বাবা বলল, "ভাবিস না। যা হয় ভালোর জন্যই হয়।"

আমি জোরে হেসে উঠলাম। বাবা অবাক হয়ে বলল, "পাগল হয়ে গেছিস? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? হাসছিস কেন?"

আমি বললাম, "তুমি জানো বাবা, পৃথিবীর সবথেকে বড়ো ঢপ এই কথাটা? যা হয় সব ভালোর জন্য হয়? তাহলে বলতে চাও হিরোশিমা নাগাসাকিও ভালোর জন্য হয়েছিল?"

বাবা বলল, "হুঁ, যদি বলি সেটা হয়েছিল বলেও মানুষ নিউক্লিয়ার বোমার ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছিল?"

আমি বললাম, "সেটাই যদি বলো তাহলে তো পৃথিবীতে একটা বিয়ের পর আর বিয়েই হত না। সবাই বিয়ের ভয়াবহতা বুঝে যেত।"

বাবা আমার দিকে চোখ ছোটো ছোটো করে তাকিয়ে বলল, "ঝগড়া করেছিস? দেখ এসব সব সম্পর্কে হয়। ভাবিস না। এক কাজ কর, বাজার করে আন। ভালো লাগবে।"

আমি বললাম, "কী খাবে?"

বাবা বলল, "যা ইচ্ছা। তুই আর বউমা যা ভালোবাসিস তাই নিয়ে আয়।"

আমি উঠলাম "ঠিক আছে। ঘুরেই আসি।"

বাবা বলল, "যা।"

বাজার ভোরের দিকে বসে যায়। আমি ব্যাগ নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরলাম।

হঠাৎ করে মনে পড়ল ঋতুজার কী পছন্দ হতে পারে? জিজ্ঞেস করা হয়নি তো। পাবদা খাবে? ভালো পাবদা উঠেছে। মা পাবদার ঝাল বানায় বেশ ভালো।

নিয়ে নিলাম।

মাংসও নিলাম। যদি চলে যায় তবে এগুলো কে খাবে? ভাবতে কেমন একটা অস্বস্তি এল। চলে যাবে? আর আমিই বা ওকে দেখে কাল অত খুশি হচ্ছিলাম কেন? আমার মধ্যে এমন একটা মানুষ বসে ছিল

এতদিন, অথচ আমি নিজেকে দেখতে পাইনি?

নিজেকে তো আবেগহীন মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছি বরাবর। সে মানুষটা এরকম হয়ে গেল কী করে?

প্রতিটা জিনিস নিচ্ছি আর ওর কথা মনে হচ্ছে। একজন অন্য মানুষের ভালোবাসার লোক, আমাকে ভালোবাসে না জেনেও আমি কেন তাকে ভালোবাসতে যাচ্ছি? জড়িয়ে পড়ার থেকে ভয়ংকর কিছু হতে পারে না।

ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছিলাম, এমন সময় দেখি ফোন বাজছে। ধরলাম, "অনিন্দিতা বলছি।"

আমি বললাম, "বল।"

অনিন্দিতা গলা নামিয়ে বলল, "একবার আমার স্কুলে আসতে পারবি আজ?"

আমি বললাম, "কটায় বল?"

অনিন্দিতা বলল, "আগে আয়। সাড়ে নটার দিকে আমি স্কুল গেটের সামনে চলে যাব। তোকে ঠিকানাটা পাঠাচ্ছি, দেখ।"

আমি বললাম, "ওকে। কোনও সমস্যা হয়েছে?"

অনিন্দিতা বলল, "তুই আয়, তখন বলছি।"

ও ফোন রাখল। আমার উৎকণ্ঠা বাড়ল। আবার কী হল?

বাড়ি পৌঁছেও দেখি ঋতুজা ঘুমাচ্ছে।

ডাকলাম না। মাকে ব্যাগ দিয়ে বাইক স্টার্ট করলাম। অনিন্দিতার স্কুলের যে ঠিকানা পাঠিয়েছে সেটা আমি চিনি। একবার কোনও একটা কাজে ওই অঞ্চলে যেতে হয়েছিল, মনে থেকে গেছে।

বাইকে যেতেও সময় লাগল। পৌঁছে দেখি অনিন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল, "এখানেই বলব?"

আমি বললাম, "বল না। কী বলবি বল।"

অনিন্দিতা মাথা নিচু করে বলল, "তুই ওকে ক্ষমা করে দে জিমূত। আমাদের সন্তান আসছে। এটা শোনার পর থেকে অনিরুদ্ধ একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে। জানিস তো আমি সন্তানটা নষ্ট করতে চলে গেছিলাম। কিন্তু এখন আর করব না। আমি বুঝতে পারছি ও অনেকটাই চেঞ্জ হয়েছে। তুই প্লিজ আর কিছু..."

আমি কয়েক সেকেন্ড অনিন্দিতার মুখের দিকে তাকালাম। কতটা বিশ্বাস থেকে এত কিছুর পরেও মানুষ এই কথাগুলো বলতে পারে। আমার ওর জন্য কষ্ট হচ্ছিল।

বললাম, "দিলাম ক্ষমা করে। ভালো থাক তোরা। আর কিছু বললাম না। আসি রে।"

বাইকটা স্টার্ট দিয়ে এগোলাম। লুকিং গ্লাসে দেখলাম অনিন্দিতা তখনও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৭৭

অনিরুদ্ধ

অনিন্দিতা স্কুলে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

হোম ফ্রন্ট সামলে নিয়েছি। এটা সবথেকে বেশি দরকার ছিল।

অনিন্দিতাকে লুকিয়ে ঋতুজার সঙ্গে যোগাযোগ করাটা খারাপ দেখালেও আসল কথা হল অনিন্দিতার মতো হোঁৎকা কুশ্রী মেয়ের সাথে কীভাবে আমার বিয়ে হল সেটাই বুঝতে পারি না।

বিয়ে জিনিসটাই আসলে বাজে জিনিস। বন্ধুরা ধরল, মেয়েটা প্রোপোজ করল, ঋতুজা বারণ করল আর আমি মেনে নিলাম। ঐতিহাসিক ভুল। বিয়ে করা মানে একজনকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া। এমন স্বীকৃতি দেওয়া যে আমার ক্ষতি করে দিতে পারে। জেলে পাঠাতে পারে। আমার যা ইচ্ছা করাটা আটকাতে পারে।

বিয়ে আমার করা উচিত হয়নি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছিল। এখন আমাকে অনেক সামলে খেলতে হবে।

ঋতুজাকে আমি ছাড়তে পারব না। ও একটা নেশার মতো। আর অনিন্দিতা হল দায়বদ্ধতা। হ্যাঁ, একসঙ্গে শোয়ার সময় আমার এসব মনে হয়নি। তবে আমার কন্ট্রাসেপ্টিভ ঠিকঠাক ইউজ করা উচিত ছিল। ডাক্তার চৌধুরী লোকটা ভালো না। ঠিক জোর করে বাচ্চাটাকে নেওয়াবে।

এ বাচ্চা হয়ে গেলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে। আমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে তা হল, এই বাচ্চাটাকে অ্যাবর্ট করাতে হবে। হাতে ডাক্তার আছে, চৌধুরীর কাছে না পাঠিয়ে আমার লোকটার কাছে পাঠাতে হবে যাতে ঠিক ভুজুং ভাজুং দিয়ে বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দেওয়া যায়। বাচ্চা জিনিসটাই একগাদা সেন্টিমেন্ট। অনিন্দিতাকে নিয়ে আমি পরে কী করব ঠিক করে উঠতে পারিনি, তবে আমি এ বাচ্চা নেব না, এটাই প্রাথমিক প্ল্যান।

ঋতুজা যেদিন কলকাতা আসবে নিশ্চয়ই আমাকে ফোন করবে। আমার সঙ্গে দেখা হলে কী হবে ভাবতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। ওর বরের থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে। তবে শুধু ঋতুজা কী বলল, তা নয়, ওই শুয়োরটার মুখ না ভাঙা অবধি আমার শান্তি নেই। লোক লাগানো হবে, ঋতুজার থেকেই ডিটেলস নিয়ে নেব। তারপর ঠ্যাং ভাঙব নিজের হাতে।

অনিরুদ্ধ রাউতের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করলে কী হতে পারে তার প্রমাণ পাবে জানোয়ারটা।

মা এল ঘরে ব্রেকফাস্ট নিয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোদের মিটেছে?”

আমি খাবারের ট্রে হাতে নিয়ে বললাম, “হ্যাঁ।”

মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “কী নিয়ে ঝামেলা করলি? বউমা তো কোনও দিন এসবে থাকে না? কী হয়েছিল?”

আমি হাসি দিয়ে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করে বললাম, “ও তুমি বুঝবে না।”

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তোকে নিয়ে আমার ভয় লাগে অনি। বরাবরই তোর দয়া মায়া কম। আর কেউ না জানুক, আমি জানি, রায়দের বাড়ির বাচ্চা বেড়ালটাকে খাবারে বিষ মিশিয়ে তুই মেরেছিলি। তুই এখন এসব পাগলামি করিস না তো বাবা?”

আমি অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললাম, “হঠাৎ এই কথা বললে কেন বলো তো?”

মা বলল, “মেয়েটা প্রেগন্যান্ট। তোর সন্তান। কোনও পাগলামি করিস না দয়া করে।”

আমি বললাম, “তুমি কী করে জানলে ও প্রেগন্যান্ট? তোমাকে বলেছে?”

মা বলল, “আমাকে বলার জায়গা হলে তো বলবে। আমি শুনেছি। কানে আসে ঠিক। তুই আমাকে বল আগে, তুই ঠিক আছিস তো?”

আমি মার দিকে তাকালাম। মা কেমন একটা অপ্রকৃতিস্থের মতো তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি হাসতে চেষ্টা করলাম, “কবে ছোটোবেলায় কী করেছি তুমি সেসব মনে করিয়ে কী ভাবছ বলো তো? এসব মাথায় আসছে কেন তোমার? আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছি তো। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি ভেবো না।”

মা বলল, “তোর বিয়ের আগে বাড়ির ফোনে একটা মেয়ে ফোন করে খুব কাঁদছিল। আমি শুনেছিলাম, সেদিন কিচ্ছু বলিনি। আজ বলছি, মেয়েটার”সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে তোর?"

আমি সবে খেতে যাচ্ছিলাম। মার কথা শুনে আমার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

যাদের কখনও হিসেবে ধরি না, তারা মাঝে মাঝে কোত্থেকে হঠাৎ করে সব এলোমেলো করতে চলে আসে? মা ঋতুজার সেই ফোন কলটা শুনেছিল?

গুড গড!

দুপুরবেলা ঋতুজা খুব তৃপ্তি করে খেল। মার কাছে বায়না করে আর-একটা মাছ বেশি নিল।

খাওয়া হয়ে গেলে হাত ধুয়ে বাবার সামনেই আমাকে বলল, "বাবা মনে হয় ফিরে এসেছে। আমি এবার যাই, বুঝলে?"

বাবা খাচ্ছিল। ঋতুজার কথা শুনে একবার থমকে আমার দিকে তাকিয়ে আবার খেতে শুরু করল।

আমি বললাম, "আচ্ছা। সাবধানে যেয়ো।"

ঋতুজা বলল, "তুমি একটু দিয়ে আসবে আমাকে?"

আমি বললাম, "বাইকে তেল ফুরিয়ে গেছে।"

বাবা বলল, "আমার স্কুটারটা নিয়ে যা।"

আমি বিরক্ত মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি স্কুটার চালাতে পারি না। ও ক্যাব ধরে চলে যাক।"

বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছিল, একই সঙ্গে ভীষণ রাগও হচ্ছিল। কী দরকার ছিল আশা জাগাবার?

ঋতুজা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমি রেডি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

ঋতুজা উপরের ঘরের দিকে রওনা দিতে বাবা আমাকে বলল, "কী হচ্ছে জানতে পারি?"

আমি বললাম, "বাড়ি যাবে। মিউচুয়াল ডিভোর্স করতে হবে বাবা। আমাদের তো রেজিস্ট্রি হয়নি। কী করতে হবে জানো কিছু?"

মা খেতে দিয়ে স্নানে গেছিল বলে বাবাকে সরাসরি প্রশ্নটা করলাম।

মা থাকলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলত।

বাবা বলল, "বিয়েটা টেকাতে পারলি না?"

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বলল, "দিয়ে আয় ওকে। একা ছাড়া ঠিক না।"

আমি বললাম, "নাহ। যাক। যাবে যখন ঠিক করেছে, একাই যাক।"

বাবা বলল, "দেখ কী করবি।"

আমি উপরের ঘরে গেলাম।

দরজা বন্ধ ছিল। নক করলাম। ঋতুজা দরজা খুলতে দেখি অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে বললাম, "আমি পরে আসছি।"

ঋতুজা ঠান্ডা গলায় বলল, "শরীরে লজ্জা পাবার কিছু নেই। এটা খুব স্বাভাবিক একটা জিনিস। চোখ খোলো। যা বলতে এসেছিলে বলো।"

আমি বললাম, "না, তুমি কিছু পরে নাও, তারপর কথা বলব।"

আমার প্রবল শারীরিক অস্বস্তি হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম।

ঋতুজা বলল, "পরেছি। চোখ খোলো।"

চোখ খুলতে দেখলাম কিছু পরেনি। আমি আর কিছু বললাম না। খাটে বসলাম।

বললাম, "এখন নিশ্চয়ই সরাসরি অনিরুদ্ধর কাছে যাবে?"

ঋতুজা কুর্তা পরতে পরতে বলল, "গেলে খুশি হবে?"

আমি বললাম, "খুশি হব নাকি বলিনি তো! জানতে চেয়েছি শুধু।"

ঋতুজা বলল, "আমার উপর খুব রাগ হচ্ছে, না? পাড়ার লোকেদের ডেকে আমাকে ঝাড়তে পারো সবার সামনে। এক্সপোজ করে দিতে পারো একজন বিবাহিত মানুষের সাথে বিয়ের পরেও যোগাযোগ করছিলাম এই অপরাধে। তোমার সে অধিকার আছে। করতে চাইলে করো।"

আমি বললাম, "ডিভোর্সটা যেন হয়ে যায় তাড়াতাড়ি।"

ঋতুজা আয়নার সামনে ঠোঁট দুটো এগিয়ে লিপস্টিক মাখতে মাখতে বলল, "আর?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, “আর কী?”

ঋতুজা বলল, “তোমার সময় নষ্টের ক্ষতিপূরণ? চাই না? এক কাজ করো...”

ঋতুজা গলার হার খুলে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে বলল, “এটা বের করে ভালো টাকা পাবে। দু-এক দিন অপেক্ষা কর, আমি আরও ব্যবস্থা করছি।”

আমার মাথায় আগুনটা হাওয়া পাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম। ওকে বললাম, “হারটা পরো। তোমার টাকায় আমি থুতু ফেলি। তৈরি হয়ে বেরিয়ে যাও। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়ো না দয়া করে।”

ঋতুজা হারটা তুলে পরে নিয়ে বলল, “তোমার দ্বিতীয় বউ লাকি হবে। তুমি বদরাগি হলেও মানুষ ভালো।”

আমি বললাম, “সে সার্টিফিকেট আমার তোমার কাছ থেকে নিতে হবে না। তৈরি হয়ে বেরোও।”

ঋতুজা বলল, “তাড়াবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন বলো তো? কোনও মেয়ে আছে নাকি?”

আমি বললাম, “না। তুমি একাই গোটা নারীসমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগাতে কাফি। আর কাউকে চাই না আমার। একা থাকব।”

ঋতুজা কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ফাইন। বেরোলাম।”

ব্যাগ নিয়ে মিনিট দু-একের মধ্যে ঋতুজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

মাথা কাজ করছিল না।

কয়েক মিনিট পরে দরজা কে নক করল।

দেখলাম ঋতুজা এসে দাঁড়িয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “রাতে ঘুম না এলে আমাদের বাড়ি আসতে পারবে? আচ্ছা, একবার তো বলা যেত। আজকের রাতটা যদি বাড়ি না গিয়ে এখানে থাকি তবে তুমি কি খুব রাগ করবে?”

৭৯

অনিরুদ্ধ

মুস্তাক আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “স্যার টাকা কিন্তু ফুল পেমেন্ট করে দিতে হবে প্রথমে। আমি পরে টাকা নিই না। আর কোনওরকম বিলা হলে আমার দায় নেই। আমি শুধু বাইকে মালটার দুটো পা পিষে দেব। রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাব। তাই তো?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

মুস্তাক বলল, “টাকা দিন। ছবি দিন।”

আমি ঋতুজার বিয়ের ছবি থেকে ছেলেটার ছবিটা বের করে রেখেছিলাম। মুস্তাকের হাতে দিয়ে বললাম, “টার্গেট কলকাতায় আছে কি না আমার কাছে এখনও খবর আসেনি। এলে তোমাকে লোকেশন দিয়ে দেব।”

মুস্তাক মাথা নেড়ে বলল, “পেমেন্ট ক্যাশে করবেন না পেটিএমে?”

আমি দশটা দুহাজার টাকার নোট নিয়ে এসেছিলাম। মুস্তাকের হাতে দিলাম। মুস্তাক টাকা নিয়ে বলল, “ঠিক আছে। ফোন করে দেবেন। আর অ্যাডভ্যান্স কিন্তু ফেরত হবে না। পরে যদি বলেন ডিসিশন চেঞ্জ করেছেন, টাকা ব্যাক পাবেন না।”

আমার চোয়াল শক্ত হল, “ডিসিশন কোনও অবস্থাতেই চেঞ্জ হবে না। ডিসিশন ফাইনাল।”

মুস্তাক সেলাম দিল।

আমি বেরোলাম।

রুবি আমার একজন বাঁধা মেয়েছেলে। কিছু টাকা দি কলকাতা এলে। ফোন করে জানা গেল দুপুরটা ফাঁকা আছে।

রুবির ফ্ল্যাট বালিগঞ্জে। পৌঁছোলাম যখন, তখন দুপুর হয়েছে। কলিং বেল বাজাতে দরজা খুলল। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরে বলল, “ভালো আছ?”

আমি ঘরে ঢুকে বললাম, “আছি। তোমার লাঞ্চ হয়ে গেছে?”

রুবি বলল, “এই খেতে যাচ্ছিলাম। বসো। তুমিও খাও।”

খেতে বসলাম।

রুবি ভাত বেড়ে আমার সামনে বসে বলল, “আমার কিছু টাকা লাগবে।”

আমি বললাম, “কত?”

রুবি বলল, “লাখ দেড়েক।”

আমি অবাক হয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে বললাম, “এত?"

রুবি ভাত দিয়ে ডাল মাখতে মাখতে বলল, “একটা নেকলেস কেনার আছে।”

আমি বললাম, “এখন সম্ভব না। পরে দেব।”

রুবি বলল, “বেশ তো। অনিন্দিতা রাউতের স্কুলটা আমি চিনি।”

আমি একটুও না চমকে বললাম, “ইউ আর ফ্রি টু ডু এনিথিং। কিন্তু কোনও লাভ হবে না এটুকু বলতে পারি।”

আমি উঠে পড়লাম টেবিল থেকে। রুবি খাওয়া থামিয়ে বলল, “পুলিশে যাব। তোমার কপালে দুঃখ আছে।”

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, “করতে পারো। তবে এরপরে লাশ শেয়াল কুকুরে খেতেও আসবে না তোমার, আমি সে ব্যবস্থা করে রাখব তোমার জন্য। একটা চিপ কলগার্লের এত বাড়াবাড়ি ভালো না রুবি। আমাকে ছাড়া আর কারও সাথে শোও না তুমি?”

রুবি বসে বসে হাসতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, “কী হল? হাসছ কেন?”

রুবি বলল, “বসো বসো। খাও। আমি দেখছিলাম তুমি কী করো। ইয়ার্কি মারছিলাম। এ দ্যাখো, আমার বুবস দ্যাখো। ঠিক আছে না?”

রুবি ব্লাউজ ফাঁক করল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। রুবি কোনও দিন এরকম করে না তো! আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, “কী হয়েছে তোমার?”

রুবি বলল, “কিচ্ছু না। এমনি। তোমাকে একটু ঘাবড়ে দিতে ইচ্ছা করল। তুমি তো জানো তোমাকেই আমি সবথেকে বেশি ভালোবাসি। আমার ইচ্ছা হয় না বুঝি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে? খেয়ে নাও।”

আমি খেতে বসলাম। রুবি আমার প্লেটে অনেকটা মাংস দিয়ে বলল, “আগের সপ্তাহে তাজপুর নিয়ে গেছিল এক স্কুলটিচার। স্কুলে পড়ায়, অথচ এসবের কী ইচ্ছা। সারারাত জাগিয়ে রেখেছিল।”

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, “আচ্ছা। তোমার নেকলেস হবে। কিন্তু এখন না। একটু অপেক্ষা করো। আমি ঠিক দেব তোমায়।”

রুবি হেসে বলল, “আচ্ছা আমি কি লেগ পুল করতে পারব না তোমার? আমি তো জানি তুমি এরকমই। বিশ্বাস করে আমাকে সব বলেছ। আমি কেন তার ফায়দা নিতে যাব? ভেবো না।”

আমি আশ্বস্ত হলাম।

রুবি বিভিন্ন কথা বলে চলল। আমি চুপচাপ খেয়ে চললাম। আমার মনটা রুবির কাছে ছিল না। ঋতুজাকে কতদিন আদর করি না। এখন তো ও বিবাহিত। জানোয়ারটার সামনে আমরা মিলিত হব। অদ্ভুত এক আনন্দে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল আমার। আজ ঋতুজাকে ভেবে রুবির সঙ্গে মিলিত হব।

খাওয়া শেষ হলে রুবি বলল, “বেডরুমে গিয়ে শোও। আমি চেঞ্জ করে আসছি। তোমার পছন্দের ড্রেস পরে। কন্ডোম এনেছ?”

আমি বললাম, "সেসব আবার কবে থেকে লাগে আমার?"

রুবি বলল, "ঠিক আছে। অপেক্ষা করো। আসছি।"

আমি উত্তেজিত হচ্ছিলাম। আমার ভেতরের জন্তুটা জাগছিল। এক-একটা মানুষের যৌন ক্ষুধা এক-এক রকম হয়। আমার বেশি। মারাত্মক বেশি।

রুবির বেডরুমটা ছোটো, কিন্তু অদ্ভুত একটা সুগন্ধ আছে ঘরটায়। আমি খাটে বসলাম। ফোন বের করে দেখলাম অনিন্দিতা মেসেজ করেছে, লাঞ্চ করেছি নাকি। ওকে জানিয়ে দিলাম করেছি।

আলো কম ঘরটার। ভাত খেলে আমার ঘুম পায়। জল খেতে ইচ্ছা হল। খাটের পাশে একটা ছোটো টেবিলে জলের জগ রাখা। জগটা নিয়ে জল গ্লাসে ঢালতে গিয়ে দেখি জগের তলায় একটা খাম।

কৌতূহল হল।

খামটা থেকে কাগজ বের করলাম। একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট।

রুবি এইচ আই ভি পজিটিভ!

৮০

জীমূতবাহন

ঋতুজা মার কাছে গিয়ে রান্না শিখছে। ব্যাপারটা প্রথমে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার। রান্নাঘরে যেতে ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

টিভির ঘরে এসে চুপ করে বসলাম। বাবা টিভি দেখতে দেখতেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা তোর লাইফ না মহারাষ্ট্র বিধানসভা? কী হচ্ছে একটু বুঝিয়ে বলবি?"

আমি মাথা চুলকিয়ে বললাম, "আমি বুঝলে তোমাকে বুঝিয়ে বলব। আমি নিজেও তো বুঝে উঠতে পারলাম না ঠিক করে।"

বাবা হেসে ফেলল। বলল, "বিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস জানিস তো। তুই চাইলে এর সব কিছু অস্বীকার করতে পারিস। কেউ কেউ পারেও। আবার কারও কাছে এ এমন এক বন্ধন, চাইলেও সারাজীবনেও এর থেকে বেরোতে পারে না। কিছু কিছু সম্পর্ক আছে দূর থেকে দেখতে খুব ভালো লাগে, ভেতরে গেলে দেখা যাবে পুরোটাই ফাঁপা। লোক দেখানো জিনিসে ভর্তি। আবার কোনও কোনও সম্পর্ক আছে, সারাদিন ঝগড়া হচ্ছে, এই বুঝি সুতোটা ছিঁড়ে যাবে যে-কোনো মুহূর্তে, শেষমেশ আর ছেঁড়ে না। দেখা যায় সেই সম্পর্কের সুতোর জোরই আসলে সবথেকে বেশি ছিল!"

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "তুমি কি বলতে চাইছ আমার সম্পর্কটা এরকম?"

বাবা বলল, "আমি কিছুই বলতে চাইছি না। তবে তোর বাবা তো। যদি এরকম হয়, তাহলে সবথেকে খুশি আমিই হব। আর কোন বাবা চায় তার ছেলে বউ বিরহে হাওড়া ব্রিজের রাস্তায় কেঁদেকেটে একশা হবে? ওরকম করে তাকিয়ে লাভ নেই, সেদিন তোকে পঙ্কজ দেখেছিল বাসে যেতে যেতে। আমাকে ফোন করে বলেছিল তোকে ডাকবে নাকি। আমি বারণ করেছিলাম।"

আমি লজ্জা পেলাম। উঠে বললাম, "ঘুরে আসি।"

বাবা বলল, "বউমার বাড়ির লোককে ডাকিস একদিন। ভালো করে পরিচয় করা যাক। মনে হচ্ছে এ যাত্রায় তোর বিয়েটা টিকেই যাবে।"

আমি আর দাঁড়ালাম না। বাড়ির বাইরে চলে এলাম। বাবা বড়ো সোজাসুজি কথা বলে। পঙ্কজকাকা আমাকে হাওড়া ব্রিজে কাঁদতে দেখেছে বলে বিচ্ছিরি লাগছিল। নিজের ওপরে রাগও হচ্ছিল। কী দরকার ছিল ওভাবে রিয়্যাক্ট করার? একইসঙ্গে ইচ্ছা হচ্ছিল ঋতুজা... থুড়ি বউকে জড়িয়ে ধরতে।

অনিরুদ্ধর কথা মনে পড়তে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ঋতুজার সামনে ও এলে কী করবে? তখন কি আর আমাকে ভালোবাসবে?

পাড়ার পার্কে গিয়ে বসলাম।

ফোন বাজছিল। নামটা দেখে চমকালাম।

অনিরুদ্ধ।

ধরলাম না প্রথমে।

ফোনটা কেটে দিলাম।

কিন্তু ওপাশ নাছোড়বান্দা।

এবারে ধরলাম। "হ্যালো।"

"আমি আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করতে ফোন করেছি।"

গলাটা ভেঙে পড়া। এ আবার কী? নতুন কোনও ড্রামা?

শক্ত গলায় বললাম, "কী?"

ওপাশে গলাটা একটু থেমে গিয়ে বলল, "ঋতুজাকে বলে দেবেন, আই অ্যাম সরি।"

আমি বুঝলাম না। বললাম, "মানে?"

"আমি অনেকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। যা ইচ্ছে তাই করেছি। এমনকি আপনাকে মারতেও আমি লোক ঠিক করেছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি, বেলাইনে চলতে গিয়ে কখন নিজেই রাস্তা থেকে ছিটকে গেছি। আমি সারাজীবনে নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি। আপনি ঋতুজাকে ভালো রাখুন। আর পারলে অনিন্দিতাকেও দেখবেন। কারণ... থাক। চলি।"

ফোনটা কেটে গেল।

অবাক হয়ে ফোনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

বাড়ি ফিরলাম রাত নটা নাগাদ। ঋতুজাই খাবার বাড়ল। বাবা শুধু ফিক ফিক করে হাসতে লাগল খাবার সময়টা। আমার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

রাতে খেয়েদেয়ে ঘরে আসতে ঋতুজা খাটে বসেই বড়ো বড়ো হাই তুলতে তুলতে বলল, "উফ, এই খাটটা আমার ফেবারিট। কী সুন্দর যে ঘুম হয়!"

আমি বললাম, "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। অনিরুদ্ধ ফোন করেছিল।"

ঋতুজা বলল, "আমার ওকে নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। ঘুম নিয়ে আছে। আমি ঘুমাতে পারি?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "সে কী? শুনতে চাইবে না ও কী বলেছে?"

ঋতুজা হেসে বলল, "আমি খুব স্বার্থপর পাবলিক। নিজের ঘুমের থেকে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু না। তোমার ওর কথা মনে পড়লে তুমি ভাবতে পারো, আমি বরং ঘুমাই। গুড নাইট।"

আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে সত্যিই ঋতুজা খাটে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সেদিকে তাকিয়ে মাথা চুলকালাম। এ কী ঘুম রে বাবা! এরকম ঘুমাতে পারলে আমি সত্যিই গর্ববোধ করতাম।

ব্যালকনিতে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। তার একটু পরেই ফোনটা এল।

অনিন্দিতা।

অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটির পর জানাল অনিরুদ্ধ মেট্রোতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সুইসাইডের মিনিটখানেক আগে হোয়াটসঅ্যাপে শুধু অনিন্দিতাকে জানিয়ে গেছে, অনিন্দিতা যেন এইচ আই ভি টেস্ট করে নেয়।

এইচ আই ভি? অনিন্দিতাকে করতে হবে? তাহলে কি ঋতুজাকেও?

৮১

কপালকুণ্ডলা

"ছেলেটার জেল হয়েছে।" আমি বললাম অনিন্দিতাদিকে।

অনিন্দিতাদি ম্যাগাজিন পড়ছিল। আমাদের দুজনের একই দিনে তারিখ পড়ে। আমার এক সমস্যা। অনিন্দিতাদির অন্য।

প্রথম প্রথম আমরা কেউ কারও সাথে কথা বলতাম না। কবে যে বলতে শুরু করলাম, আমার মনে নেই। মেয়েরা নাকি ভালো বন্ধু হতে পারে না।

দুঃখী মেয়েরা ভালো বন্ধু হতে পারে হয়তো। দুজনেই অনেকক্ষণ কথা বলি রোজ।

আমার কথা শুনে অনিন্দিতাদি খুব খুশি হল। সত্যিকারের খুশি। আমার বাবার মতো খুশি না। সদুজ্যাঠার মতো খুশি।

বলল, "তুমি পড়াশুনা কমপ্লিট করবে না এবার?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ। কলকাতার কলেজে ব্যবস্থা করছে সদুজ্যাঠা। বাবার ইচ্ছা ছিল দূরে কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। সদুজ্যাঠা খুব চ্যাঁচামেচি করেছে। এত দিন সদুজ্যাঠা কিচ্ছু বলত না। বাবা যা বলত সব মেনে নিত। এবারে মানেনি।"

অনিন্দিতাদি বলল, "তুমি আমার বাড়ি থেকো। যদি বিনা পয়সায় থাকতে অসুবিধা হয়, তবে নাহয় পেয়িং গেস্ট হয়ে থেকো। ভালো লাগবে আমার। আমারও একজন বন্ধু দরকার।"

আমি বললাম, "তোমার সব ভুলে এগিয়ে যাওয়া দরকার। কী জানো তো, আমি গ্রামের মেয়ে, তবু আমার মনে হয় তুমি এবার তোমার অতীতটা ভুলে যাও।"

অনিন্দিতাদি মাথা নিচু করল। চোখ থেকে দু-এক ফোঁটা জল পড়ল। সেটা মুছল না ও।

বলল, "আমার বাবার কথায় রাজি হয়েছিলাম। গত সপ্তাহে এক ছেলে দেখতে এসেছিল।"

আমি বললাম, "তারপর?"

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি ছেলেটাকে সব বলে দিলাম। অনিরুদ্ধকে আমি কতটা ভালোবাসতাম, কীভাবে ও আমাকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে গেছে। ওরা আর যোগাযোগ করেনি। এরকম কোনও ছেলে নেই যে সব শুনে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে। একলা থাকাটা অনেক বেটার অপশন। মুভ অন মানে তো একলা থাকাও হয়। একটা ছেলে সারাজীবন একলা থাকার অপশন নিতে পারলে আমি কেন পারব না? আমার মনে হয় না সারাজীবন আমি আর কারও সঙ্গে কোনও ভাবে থাকতে পারব। যত কাউন্সেলিং করি, যত ওষুধ খাই অ্যান্টিডিপ্রেসিভ, আমি ওকে ভুলতে পারব না। একটা রোবট হয়ে সারাজীবন কোনও ছেলের সঙ্গে থেকে একইসাথে তার এবং আমার, দুজনের জীবন আমি নষ্ট করতে পারব না।"

আমি বললাম, "আমি ভেবেছিলাম একলা থাকার সিদ্ধান্তটা আমার একারই। যাকে সারাদিন একটু দেখার জন্য পাগল হয়ে যেতাম, সে যখন..."

অনিন্দিতাদি আমার হাত ধরে বলল, "এসব ভেবো না।"

আমি বললাম, "অ্যাবরশন রুমের অন্ধকারটা খুব ভয়ংকর জানো তো। মনে হয় কেউ দম বন্ধ করে গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলে দিচ্ছে। একসময় আমি খুব ভূতের ভয় পেতাম। এখন আর পাই না।"

অনিন্দিতাদি বলল, "ভয়গুলো এভাবেই কাটে হয়তো আমাদের। সামনে যে মানুষগুলো আমাদের দ্যাখে, যারা আমাদের সঙ্গে সবসময় কথা বলে, তারা কি জানে আমাদের ভিতর দিয়ে কতখানি ঝড় চলে যাচ্ছে? আরো বাজে লাগে আমার মানুষের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি। আমি তো কারও সহানুভূতি চাইনি কোনও দিন। মানুষ কি বোঝে না, এই দৃষ্টিগুলো, বা 'আহা তোর কী হবে' টাইপ কথাগুলো আসলে আমাদের আরও বেশি করে মেরে ফ্যালে রোজ রোজ?"

আমি বললাম, "তোমার সত্যি এখনও কোনও প্রেমিক হয়নি অনিন্দিতাদি?"

অনিন্দিতাদি আমার দিকে ক্লান্ত মুখে তাকিয়ে বলল, "একজন আছে। ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল অনেক আগে। অনিন্দ্য নাম। বাড়ি অবধি চলে এসেছিল। আমি খুব বাজে ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিতে গেলাম। গেল

না। আমি কী করব, খারাপ লাগল। বসিয়ে খাওয়ালাম। খেয়েদেয়ে সে চলে গেল। মাঝে মাঝে মেসেজ করে, আমরা কি একসঙ্গে থাকতে পারি না? আমি উত্তর দি, না।"

আমি হেসে ফেললাম, "আহা রে, সত্যি ভালোবাসে তোমাকে।"

অনিন্দিতাদি বলল, "আমি তো আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। খামোখা তার জীবনটা নষ্ট কেন করতে যাব? তার লেখা পড়েছিলাম, ভালো লেগেছিল, বলেছিলাম। সে এটাকে ভালোবাসা বুঝে নিয়েছিল হয়তো। আমার পক্ষে আর কারও সঙ্গে জড়ানো অসম্ভব।"

অনিন্দিতাদির ডাক এল। ও উঠে বলল, "তুমি আমার কাছেই থেকো কপালকুণ্ডলা। একজন ভালো বন্ধু পেলেও হয়তো বাকি জীবনটা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।"

আমি ম্লান হেসে বললাম, "থাকব। তুমি যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

অনিন্দিতাদি চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আর শোনো, বাচ্চাটা আমি নেব ঠিক করেছি। নষ্ট করব না। আমার বর যা করে থাকুক, আমি তো সৎ ছিলাম। আমার সন্তানকে সেটুকু সততা দিয়ে মানুষ করব। ভুল করছি আমি?"

আমি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললাম "একদম না... একদম না"...

৮২

জীমূতবাহন

গাড়ি চলেছে পাকদণ্ডি বেয়ে। আমরা আবার পাহাড়ে এসেছি। বউ অবশ্য আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চোখ বুজে ফেলেছিলাম কখন বুঝতে পারিনি।

মানুষ একবার হানিমুন করে।

আমি দুবার করি।

দ্বিতীয়বার হানিমুন করি প্রথমবারের ফ্লপ সিনেমাটাকে ভুলে যাওয়ার জন্য।

ঘিঞ্জি দার্জিলিং-এ পৌঁছোলাম আমরা। প্রচণ্ড ঘিঞ্জি অথচ প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। একটুও মেঘ নেই। বউ আমায় জড়িয়ে ধরে বলল, "রোমান্টিক লাগছে খুব।"

আমি গলা নামিয়ে বললাম, "ড্রাইভার কী ভাববে?"

বউ বলল, "ভাববে নিজের বউকে আদর করছ।"

আমি ওর কপালে চুমু খেয়ে বললাম, "বাকিটা হোটেলের জন্য থাক?"

বউ বলল, "আমার এইচ আই ভি ধরা পড়লে কী করতে তুমি? ফেলে দিতে রাস্তায়?"

আমি মাথা নাড়লাম, "না। চিকিৎসা করাতাম। আমার মনে হয় অনিরুদ্ধরও আদৌ কিছু ছিল না। একটা মানুষ ভুল কাজ করতে করতে ভাবতে থাকে সে সবই ঠিক করছে। একটা সময় এমন আসে যখন হঠাৎ করে সমস্ত পাপ এসে ঢেউয়ের মতো তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। অনিরুদ্ধর তাই হয়েছিল। ও তুমুল আতঙ্কে কাজটা করে ফেলেছে। খারাপ লাগে অনিন্দিতার জন্য।"

বউ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "পরের বউয়ের জন্য খারাপ লাগে আর নিজের বউকে তো কোনও দিন বলতেও আসনি যা করছি ঠিক করছি না? সব সময় শুধু মেজাজ নিয়ে গেছ।"

আমি বললাম, "বলেছি। আমার বলার ভাষাটা উগ্র ছিল হয়তো। বোঝাটাও হয়তো ঠিক বুঝিনি। মানুষ যখন ভালোবাসায় থাকে তখন ঠিক ভুলের হিসাব বুঝতে পারে না। তুমিও বুঝতে পারোনি। তুমি নিরুপায় ছিলে।"

বউ আমার নাক টিপে বলল, "কত বোঝো তুমি। কত্ত জানো!"

আমি হাসলাম, "তবুও রাতে ঘুম হয়। অবশ্য তোমার মতো না। যা নাক ডাকো, বাপ রে!"

বউ রেগে বলল, “নিজেও নাক ডাকো। একা আমার দোষ দেবে না একদম। পচা লোক একটা। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক, তোমার কাছে থাকলে আমায় ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না। তোমার মধ্যে জাদু আছে।”

আমি বললাম, “বেশ তো, তাহলে যে যে মেয়ের রাতে ঘুম হয় না তারা আমার কাছে এসে থাকলেই পারে।”

বউ বলল, “সব পুরুষের ভিতরই অনিরুদ্ধ আছে বুঝলে? তুমিও ওর মতোই।”

আমি বললাম, “তাই বুঝি? খুব মিস করো, না?”

বউ বলল, “করি। খুউউউউব মিস করি। গাধা কোথাকার। এই, শোনো, বর হয়েছ, বরের কাজ করো। আমায় কফি খাওয়াও।”

আমি বললাম, “খাওয়াব তো। আর কী খাবে?”

বউ দুষ্টু হেসে বলল, “অনেএএএক আদর। আর সেই পাগলামি ট্যুরটা আবার শুরু করব। গাড়ি করে বেরোব। যে-কোনো অজানা গ্রামে সন্ধেটা থাকব। ঝিঁঝির ডাক শুনে রাত কাটাব। হেব্বি মজা হবে বলো?”

আমি বউকে জড়িয়ে ধরে বললাম, “হেব্বি মজা হবে।”

দুজনে হেঁটে ম্যালে এলাম। একজোড়া বয়স্ক দম্পতি আইসক্রিম খাচ্ছেন।

বউ মুগ্ধ চোখে সে দিকে তাকিয়ে বলল, “আমরা এরকম বয়সে এতটা ভালোবাসায় থাকব তো?”

আমি ওর গালে টোকা মেরে বললাম, “থাকব।”

বউ বলল, “অনিন্দিতার জন্য মাঝে মাঝে কষ্টও হচ্ছে জানো। আমি ওর সঙ্গে ঠিক করিনি বলো?”

আমি বললাম, “আমরা যখন কোনও ঘোরে থাকি, তখন কেউ কারও সঙ্গে ঠিক করি না। যখন নিজেদের ভুল বুঝতে পারি, তখন বড্ড দেরি হয়ে যায়। তোমার দেরি হয়নি। তুমি ওকে দেখো। খেয়াল রেখো।”

বউ বলল, “ও আমাকে সহ্য করতে পারে না। দেখলে রেগে যায়। তুমিই খোঁজ নিয়ো বরং। আমি তোমাকে সন্দেহ করি না। ভেবো না। ইউ আর এ গুড ম্যান।”

আমি বউয়ের হাতটা শক্ত করে ধরলাম।

আমার বউ।

জাপটে ধরে রেখে সারাজীবন কাছে রাখার মানুষ...

৮৩

আত্রেয়ী

অমৃতর বাইকে করে শহর ঘুরতে বেরিয়েছি। জাপটে ধরে আছি আমার বরটাকে।

পাগল একটা মানুষ।

অফিস থেকে ফেরার সময় একগাদা চকোলেট নিয়ে আসবে।

বউদির সামনে পড়লে সব চকোলেট বউদির হাতে দিয়ে বলবে, “তোমাদের জন্য এনেছিলাম।”

বউদি তখন ছদ্ম রাগ দেখিয়ে বলে, “হ্যাঁ গো ঠাকুরপো, আগে তো আমার জন্য একটা বাতাসাও আনতে না, এখন কবে থেকে এত খেয়াল করা শুরু করলে আমার?”

আমার লজ্জায় পালাই পালাই অবস্থা হয়।

আরও পালাই পালাই লাগে যখন আমি স্কুল থেকে বেরোই আদৃতাদের সঙ্গে আর তিনি বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আদৃতা অবশ্য আমায় কানে কানে বলেছে “ওরে আতু, যা আনন্দ করার করে নে, কদিন পরে এই বর আর আসবে না। এই হয়। প্রথম প্রথম হেব্বি আঠা।”

আমি মুখে বলি, “ঠিক বলেছিস।”

মনে মনে হাসি।

যদি তা হয়ও, তাতেও কিছু যায় আসে কি? এই পাগলটাকে সারাজীবন জড়িয়ে ধরে বসে থাকব, তাহলেই আমি খুশি। এরকম পাগল কি খুব সহজে পাবে কেউ? কোনও কোনও দিন ঘুম থেকে উঠে বলে, "চলো কোনও নাম না জানা স্টেশনে নেমে ঘুরে আসি।"

বাড়ির কাউকে না বলে চলে গেলাম। যে এলাকায় নামি, লোকজন কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকায়। বাড়ি ফিরলে শ্বশুরমশাই আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে তাকিয়ে বলেন, "তুইও অমুর পাল্লায় পড়ে পাগলি হয়ে গেলি মা?"

তুমি থেকে তুই হয়ে গেছি কখন যেন এ বাড়িতে। কখনও মনে হয় না অন্য কারও বাড়িতে আছি। আমার বাবাও মাঝে মাঝে চলে আসে। অমৃতর বাবার সঙ্গে মিলে আমার লেগপুল করে। আমি খুব রাগ করি।

বউদি তখন আমার পক্ষ নিয়ে লড়াই করে।

দাদা মাঝেমধ্যেই অফিস থেকে ফেরার পথে কখনও বিরিয়ানি, কখনও পরোটা মাংস নিয়ে আসে। বাবা প্রথমে রাগ দেখায়। বাইরের খাবার খাবে না বলে। খাওয়ার সময় গম্ভীর হয়ে বলে, "ঠিক আছে, একটু টেস্ট করে তো দেখাই যায়, দেখি মা আমাকে একটু দে তো।"

আমিও মাথা নিচু করে ফিক ফিক করে হাসতে থাকি।

আমার মনে হয় আমি যেন কোনও রূপকথার মধ্যে আছি, যেন কোনও স্বপ্ন দেখছি।

অনিন্দিতাদি স্কুলে আসে। অনিরুদ্ধদা মারা যাবার পর অনিন্দিতাদি মানসিকভাবে মারাত্মক ভেঙে পড়েছিল। কাউন্সেলিং চলছে। মাঝে মাঝে একটা মেয়েকে নিয়ে আসে। মেয়েটার নাম কপালকুণ্ডলা। পাগলি একটা। কী সব পাগলামি করে চলে! কে বলবে কত বড়ো একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছে ওর সঙ্গে। আমরা সবাই মিলে ঠিক করেছি ওকে আবার পড়াশুনা করাব। অনিন্দিতাদির সঙ্গে থাকে মেয়েটা। মায়াবী একটা মেয়ে। আমাকে দেখলেই বলবে, "এই দিদি, তুমি এরকম করে চুল কেটেছ কেন? তোমার না কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। আচ্ছা তুমি আমাকে অঙ্ক করাবে? আমার না অঙ্কে হেবি ভয়। করাবে? বলো না?"

আমি ক্লাসের ফাঁকে ওকে অঙ্ক দেখাই। ওর চোখে শেখার আগ্রহ দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগে। মেয়েদের তো এভাবেই ঘুরে দাঁড়ানো উচিত। আমরা একা কে বলেছে? আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য যথেষ্ট।

কপালের বাবা মাঝে মাঝেই স্কুলে এসে কাঙালের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন। আমাদের অনুরোধ করেন, "বলুন না মেয়েটাকে। আমরা অনুতপ্ত বিশ্বাস করুন। ওর মা সারাদিন কাঁদে ওর জন্য। ওকে বলুন না বাড়ি ফিরে যেতে।"

আমরাও বোঝাই। কপালকুণ্ডলা কিছুতেই শুনতে রাজি নয়। ওর একটাই জেদ। আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তারপর বাড়ি ফিরবে। আমার ওকে দেখে শক্তি আসে।

অনিন্দিতাদি চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে কেঁদে ফ্যালে। বলে এরকমই নাকি হয়। অনিরুদ্ধদার মতো মানুষদের যখন অনুতাপ আসে, তখন এভাবেই ওরা নিজেদের শেষ করে দেয়। একদিকে ভালোই হয়েছে হয়তো। কিছু কিছু মানুষ আর সংশোধিত হবার জায়গায় থাকে না। যখন বুঝতে পারে, আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

আমরা সবাই মিলে অনিন্দিতাদিকে আগলে রাখি। এ ছাড়া তো আমরা আর কিছু করতে পারি না।

অমৃত চেঁচিয়ে বলল, "এই তুমি ফুচকা খাবে?"

আমি বললাম, "বাইক চালাতে চালাতে কথা বোলো না দয়া করে। চুপ করে চালাও।"

অমৃত বাইক থামায়। আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আমি ছিটকে উঠি, "এই, রাস্তার মধ্যে এসব কী?"

অমৃত বলে, "বেশ করেছি। আমার নিজের বিয়ে করা বউকে আদর করেছি। কার বাবার কী?"

আমি জোরে জোরে মাথা নাড়ি, "একদম না। ঈশ! আমার লজ্জা লাগে না?"
অমৃত আমার নাকে আলতো করে আদর করে বলে, "ঠিক আছে, চলো সূর্যাস্ত দেখি।"
দুজনে মিলে গঙ্গার তীরে গিয়ে নৌকায় উঠি।
গোধূলির মায়াবী হলদে আলো গঙ্গাকে সোনায় রূপান্তরিত করে। আমরা সেই মায়াবী আলোয় পরস্পরের হাত ধরে বসে থাকি। অমৃত আমার কানে কানে বলে, "ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি।"
আমি বলি, "আজীবন বেসো।"
অমৃত ফিসফিসিয়ে বলে, "বাসব সোনা। আমার আতুবুড়ি, আমার বুচি সুন্দরী। বাসব।"

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে

১
মিলির ডায়েরি

সকাল থেকে বাড়িতে এক্কেবারে যা-তা অবস্থা চলছে। বাবার স্বভাব হল ঘুম থেকে উঠেই বাথরুমে চোখ বন্ধ করে দৌড়োবে। বাথরুমের ভেতরে যদি কেউ থাকে তাহলে তার অবস্থা খারাপ করে দেবে। বাইরে থেকে চেঁচিয়েই যাবে। আজ বাবা আর চেঁচাতে পারছে না। দাদা এসেছে। দাদার সঙ্গে বউদিও।

দাদা ইঞ্জিনিয়ার। গুরগাঁওতে থাকে। বউদি একদম শহরের স্পেশাল পালিশ করা চিজ। বাথরুমে গেলে বেরোবার নাম করে না। ওরা আসবে বলে বাড়ি রং করা হয়েছে। বাড়ি রং করতে গিয়ে দেখা গেছে ঘরের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। সবকিছুতে কেমন চুন চুন ভাব। সেটা পরিষ্কার করতে গিয়ে মা-র, আমার আর দিদির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান ক্লোজে আছে বলে কমোডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এত কিছু করে আজকে বাবা সকালে চোখ বন্ধ করে বাথরুম যেতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে দরজা বন্ধ। একবার ক্ষীণস্বরে "কে?" বলে চেঁচানোর পরেই ভেতর থেকে বউদির গলা ভেসে এসেছে, "আমি বাবা।"

তারপর থেকে করুণ মুখে বারান্দায় চেয়ার টেনে বসেছে। বাবা ইসবগুলের ভুসি খেয়ে ঘুমায়। সকালে উঠে ভুসি এক্কেবারে তাড়া করে বাবাকে। যতক্ষণ না পুরো জিনিস ডাউনলোড করতে পারে ততক্ষণ বাড়ি মাথায় করে তোলে। আজকে বাবাকে দেখে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। বউদি আছে বলে বেচারা কিছু বলতেও পারছে না। মা রান্নাঘরে সকাল থেকেই জাতির উদ্দেশে ঝাঁপ দিয়ে বসে আছে। দুপুরের রান্নার কাটাকাটিগুলো করছে। এদিকে দিদি লুচি আলুরদম বানাচ্ছে। আমার অবশ্য একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি অলরেডি দেওয়া শুরু করেছে যে যখনই সব রান্না শেষ হবে তখনই বউদি নাক কুঁচকে বলবে, "সো মাচ অয়েল। আমি লুচি একদম খাব না। ইয়াক।"

তার জন্য দিদি কোনও ব্যাক আপ প্ল্যান রেখেছে নাকি জানি না অবশ্য। আমি খুব একটা চাপ নিচ্ছি না। মোবাইল ঘেঁটে যাচ্ছি সকাল থেকেই। অয়নদা ডিপি চেঞ্জ করেছে। ঢলানি মধুমিতাটা যথারীতি ন্যাকামি শুরু করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর গায়ে লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দি। সব ছেলেদের কাছেই একটা করে ইট পেতে রেখে দিয়েছে। যেখান থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাবে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। অয়নদা আমাদের বাড়ি এলেই টুক করে কোনও না কোনও ছুতোতে এসে পড়বে। এসেই হাজারটা ভাট শুরু করবে। দিদি অবশ্য ওকে কিছু বলে না। ও জানে মধুমিতা এলেই আমি রেগে যাই খুব, কিন্তু তা সত্ত্বেও ও মধুমিতাকে কিচ্ছু বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। অয়নদা নোটসগুলি চুপচাপ নিয়ে চলে যায়। আর...

উফ! আমার এই বদভ্যেস। লিখতে বসেছিলাম বাবার বাথরুম কেলেংকারি নিয়ে, আর কথাগুলো যথারীতি অয়নদার দিকে চলে গেছে। ডায়েরির শেষ পাতায় এম + এ অবশ্য অনেক লুকিয়ে লিখে রাখি। দিদি দেখলে আর রক্ষা নেই। খেপিয়েই মেরে ফেলবে। সেদিন একটা যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখেছি। অয়নদা আর আমি রিকশা করে কোথায় একটা যাচ্ছি আর প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রিকশাওয়ালা রিকশার হুড তুলে দিয়েছে, প্লাস্টিকটা সামনে ফেলে দিয়েছে, আর অয়নদা আমার হাত ধরেছে। সকালে উঠে স্বপ্নটা যতবার ভেবেছি ততবার মনে মনে হেসে ফেলেছি। মরেছে... আবার বেলাইন।

যাই হোক, যেটা বলছিলাম আর কী, বাবা এদিকে বাইরে চেয়ারে বসে মনে মনে বউদির বাপবাপান্ত করছে, এদিকে মুখটা করুণ করে রেখেছে, সেটা দিব্যি বুঝতেই পারছিলাম। এদিকে লুচির গন্ধে বাড়িটা

একেবারে ম-ম করা শুরু করে দিয়েছে। দাদা চিরকালই এগারোটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না বাড়িতে থাকলে, তাই কোনও চাপ নিচ্ছে না।

সকাল আটটা। এখনই রোদ্দুর বাবাজি রোদ্দুর রায়ের মতোই মেজাজ খারাপ করতে শুরু করে দিয়েছেন। দিদির মোবাইলে মনে হয় একটা মেসেজ এল।

অনেক কন্ট্রোল করেও শেষ অবধি পারলাম না। কালকেই প্যাটার্ন লকটা দেখেছিলাম। দিদি রান্নাঘরেই চাপ নিয়ে রান্না করে যাচ্ছে। তবু আর-একবার সেদিকটা দেখে দুরুদুরু বুকে ফোনটা আনলক করলাম।

অয়নদা! লিখেছে, "বিকেলে আসছি। থাকবি তো?"

অয়নদা! দিদি! সত্যি?

২

রূপম জানে শ্রাবন্তী তাদের বাড়ি আসতে পছন্দ করে না। মফস্সল ওর পছন্দ না। কিন্তু সে সবকিছু জেনেও চুপচাপ চলে আসে। এটা নিয়ে ওদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলে। শ্রাবন্তীর আবার উপর উপর দেখনদারিটা ভালোই আছে। সে ভালো করেই জানে রূপম তাকে ছাড়া বাড়ি গেলে সেটা মোটেও তার পক্ষে ভালো বিজ্ঞাপন হবে না। সুতরাং এদিক-ওদিক অনেক অজুহাত দেখিয়ে শেষমেষ তাকে যেতেই হয় রূপমের সাথে।

শ্রাবন্তী তাকে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিয়েছে। এই জিনিসগুলি তার চাই। তার জন্য বাড়ি আসার অভিনয়টুকু ও অনায়াসে করে দিতে পারে। লিস্টের মধ্যে যেগুলো আছে -

১) একটা টু বিএইচকে ফ্ল্যাট। রাজারহাটে হলে ভালো। নইলে কলকাতার অন্য কোনও ক্রিম লোকেশনে।

২) একটা সেডান গাড়ি।

৩) বছরে অন্তত একবার একটা বড়ো বিদেশ ট্যুর।

রূপম লিস্টটা মোবাইলের নোটে সেভ করে রেখেছে। মাঝে মাঝে বের করে দেখে। শ্রাবন্তীর এই লিস্টের বাইরেও তার নিজের একটা লিস্ট আছে আলাদা নোটে। সেগুলি হল -

১) বাবার পেনশনে ঘর খুব একটা ভালোভাবে চলে না। তার জন্য বাড়িতে একটা ভালো অ্যামাউন্টের টাকা পাঠাতে হবে।

২) বাবা তাকে বলে রেখেছে তাকে পড়াতে পিএফের একটা বড়ো অংশ চলে গেছিল। দুটো বোনের বিয়ের জন্য টাকা যেন সে রেখে দেয়।

আজকেও রূপম ঘুম থেকে উঠে দুটো লিস্ট দেখল। আর-একবার মোবাইল ব্যাংকিংয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স দেখল। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে "দূর বাল" বলে পাশ ফিরে শুল। চাপ সে কোনওকালেই নিতে পছন্দ করে না, কিন্তু শ্রাবন্তী মাঝে মাঝে ভালো চাপেই ফেলে দেয়। গেল মাসে পাশের ফ্ল্যাটের আগরওয়ালের বাচ্চাটার জন্মদিন গেল। সে অত চিন্তা করেনি। অফিস থেকে ফিরে শ্রাবন্তীকে নিয়ে চলে গেছিল শপার'স স্টপে। শ্রাবন্তীকেই কিনতে বলে দিয়েছিল যা কেনার। শ্রাবন্তী জিনিস পছন্দ করে হাসি হাসি মুখে তাকে বলল, "ক্রেডিট কার্ডটা দাও।" সে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে মোবাইলে ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানস খেলায় মনোযোগ দিতে না দিতে বিস্ফারিত চোখে লক্ষ করল তার বউ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার গিফট কিনে ফেলেছে। সে ওখান থেকে বেরিয়ে শ্রাবন্তীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতেই শ্রাবন্তী তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিল, "এটা কি তোমার ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর পেয়েছ? সোসাইটিতে আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। তা ছাড়া অত্ত কিউট একটা বাচ্চা।"

রূপম বরাবরের মতোই দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর কিছু বলল না। শ্রাবন্তীকে তার বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। আসলে কাউকেই তার বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। ছোটোবেলা থেকেই সে ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট।

বিয়ের পরে আরও বেশি করে খোলসে ঢুকে গেছে। মাঝে মাঝে চুপিচুপি বাবার অ্যাকাউন্টে এনইএফটি করে বাড়িতে ফোন করে দেয়। এবার যেমন পইপই করে সবাইকে বলা আছে মাসে পাঠানো টাকার অ্যামাউন্টটা যেন শ্রাবন্তীর সামনে একেবারেই আলোচনা না হয়। ফিল গুড, ফিল গুড, আছে দিন, আচ্ছে দিন পরিবেশে যেন ভালোয় ভালোয় তারা গুরগাঁও ফিরে যেতে পারে।

বাড়িতে আজ লুচি হচ্ছে। তার ফেবারিট। মা আর রূপসী সেইজন্যই জান লড়িয়ে দিয়েছে সে ভালো করেই জানে। শ্রাবন্তী সকাল থেকে বাথরুম আলো করে বসে আছে। বাবা শেষমেষ পাশের বাড়ি দৌড়েছে আর চাপতে না পেরে। সাড়ে আটটায় ঘুম ভেঙে গেলেও রূপম বাড়িতে থাকলে সাধারণত বিছানা ছেড়ে ওঠে না। আজ উঠল। নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তেই রূপসী তাকে দেখে ডাক দিল, “এই দাদা, বউদি কি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করতে বাথরুমে ঢুকেছে নাকি রে?”

হেসে ফেলল রূপম। রূপসী শ্রাবন্তীর ভালোই লেগ পুলিং করে। তবু সে অবাক হয়ে দেখেছে তাদের বাড়ির মধ্যে একমাত্র রূপসীকেই শ্রাবন্তী কিছুটা পছন্দ করে। এর কারণটা সে এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেই আবিষ্কার করতে পারবে।

৩

ছেলেকে আজকাল একটু ভয়ই পান বিভাসবাবু। ছোটো থাকতে কতবার পিটিয়েছেন, কান ধরে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, বাথরুমে সিগারেটের গন্ধ পেয়ে আগাপাশতলা জুতিয়েছেন, নরেন মাস্টারের মেয়ের সাথে প্রেম করতে গেছিল বলে তিনবেলা খেতে দেননি, এসব আজকাল ভাবলেও ভয় লাগে তার।

রিটায়ারমেন্টের আগে বুকে বল ছিল, দেহে শক্তি ছিল, আগে পিছে ভেবে কাজ করতেন না, যেটা ইচ্ছা সেটা কিনে ফেলতেন... হঠাৎ করে রিটায়ারমেন্টের পরে নিজেই বুঝতে পারলেন এই বেশি বয়সে বিয়ে করা একটা ঐতিহাসিক ভুল হয়ে গেছে। বিয়ে করেছিলেন তাও ঠিক আছে, তিনটি ইস্যু ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। স্ত্রী অনামিকার সাথে তাঁর দশ বছরের পার্থক্য। বিয়ে করার আগে মেয়েমহলে ভালোই জনপ্রিয় ছিলেন এককালে। ভেবেছিলেন এভাবেই কেটে যাবে। শেষ পর্যন্ত বাবা রেগেমেগে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেন।

যা হয়েছে অবশ্য বিভাসবাবুর কাছে একদিকে ভালোই হয়েছে। হিসেব করে দেখেছেন যে ক-টা মেয়ের সাথে তিনি এককালে লাইন মেরেছিলেন, তার একজনও অনামিকার নখের যোগ্য নয়। একটু একটু করে টাকা বাঁচিয়ে, কীভাবে সংসারটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তা অনামিকার থেকে ভালো কেউ জানেন না। এদিকে হামলে পড়ে সংসার করাও আছে, অন্যদিকে তাঁর দিকেও কড়া নজর। স্বামীর ডায়াবেটিসের প্রেমের ছোঁয়া লাগার পর থেকে কীভাবে চায়ে চিনি কমিয়েও চা-টাকে চায়ের মতো বানাতে হয় তাতে অনামিকার মাস্টার ডিগ্রি করা আছে। আবার সামান্য কুচো চিংড়ি যে ইঁচড়কে কোন স্বর্গীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে এ ব্যাপারেও তিনিই সেরা। সুতরাং গিন্নি ভাগ্য বিভাসবাবুর ভালোই।

কিন্তু বিভাসবাবু আজকাল ছেলেকে ভয় পান। যে সামান্য সঞ্চয় আছে তাঁর তা এই বাজারে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সোনার দাম থেকে শুরু করে ফাউ খেয়ে নিন্দে করে যাওয়া পাঁচশো লোকের খাওয়ানোর খরচও কম না। রূপমের বিয়ের সময়েও বেশ মোটা টাকা খরচা হয়ে গেছে। রূপম তখন সবে সবে চাকরিতে ঢুকেছে। বিয়ে করার জন্য হাত পেতে বসল। চাকরি ছিল তখন। পিএফ থেকে নন-রিফান্ডেবল লোন তুলে ফেললেন ভালো অ্যামাউন্টের। এর আগেও নিতে হয়েছিল রূপমকে পড়াবার সময়ে। এখন ব্যালান্স শিট মিলছে না। মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য তাই রূপমের মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁকে থাকতেই হবে। আর রূপমের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হলে ছেলেকে একটু ভয় পেতেই হবে তাকে।

বউমা বাথরুমে গেলেও বিভাসবাবু তাই বেশি জোরে চেঁচাতে পারেন না। শেষে লুঙ্গিতেই হয়ে যাবে বলে পাশের বাড়িতে দৌড়োতে হয় তাকে। মোট কথা তিনি একেবারে ভালো নেই। ভেতরে ভেতরে ভয়ে ভয়ে

তিনিও চান ভালোয় ভালোয় ছেলে বউমাকে নিয়ে এ ক-টা দিন থেকে আবার গুরগাঁও ফিরে যাক। ওই ফোনে "কী রে কেমন আছিস, খাওয়াদাওয়ার দিকে নজর দিস" টাই ঠিক আছে। সামনাসামনি হওয়াটাই টেনশনের। কেমন যেন একটা চোরা অস্বস্তি কাজ করে মনের ভিতর।

বাড়িতে লুচি হচ্ছে। বেজার মুখে কাগজটা খুলে বসে মনে মনে খিটখিট করতে থাকেন তিনি। অনামিকা তাঁকে লুচি দেবে না। ডাক্তার বলেছে তেলের জিনিস যত কম শরীরে প্রবেশ করে ততই মঙ্গল। অনামিকা সেই গাইডলাইন এক্কেবারে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেন। এমনকি বাপের অত প্রিয় মেয়ে দুটোও। কিছুতেই একটা ওই হালকা তেলে ভাজা স্বর্গীয় ময়দার জিনিসটা তাঁর পাতে পড়ার কোনও চান্স নেই। সেই রুটি আর ভ্যাদভ্যাদে পেঁপের তরকারি দিয়েই ব্রেকফাস্ট সারতে হবে।

ডাইনিং টেবিলে বসে কাগজ পড়তে পড়তে তাই নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করছিলেন তিনি, এই সময়ে রূপম এল। বিস্মিত হলেন তিনি, কারণ রূপম সাধারণত বাড়িতে থাকলে এগারোটার আগে ওঠে না। কাগজ পড়তে পড়তেই চশমার ফাঁক দিয়ে ছেলেকে দেখলেন বিভাসবাবু। কেমন শান্ত হয়ে বসে আছে টেবিলে। ছেলের অবস্থা ভেবে তিনিও একটু মুষড়ে পড়লেন। বেচারা! এই বয়সেই এত কিছু চাপ নিয়ে চলতে হচ্ছে। খারাপ লাগছিল। ভয়টা পেরিয়ে আস্তে আস্তে খারাপ লাগাটাই জাঁকিয়ে বসল। গলা খাঁকরানি দিলেন একটা, "কী রে, এত সকালে উঠলি আজ?"

রূপম তার হাতের কাগজটার খেলার পাতা দেখছিল, বাবার প্রশ্ন শুনে বলল, "ঘুম ভেঙে গেল। আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। আচ্ছা বাবা, তুমি তো একবার গুরগাঁও ঘুরে যেতে পারো! তোমার ইচ্ছা করে না আমার ওখানে গিয়ে থাকতে?"

ছেলের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে "পাগল নাকি" বললেও বাইরে সে মুখের ভাব প্রকাশ করলেন না। বললেন, "না রে, এখন আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। তোর বোন দুটোর বিয়ে হোক, তখন নাহয় মাঝে মাঝে..."

মিলি এসে বসল টেবিলে। বলল, "বাবা! আমাদের বিয়ে ছাড়া কি তোমার আর-কোনও চিন্তা নেই?"

বিভাসবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মেয়েকে তিনি কী করে বোঝাবেন... এই চিন্তাটা কীভাবে দিনরাত তাঁর মাথাটাকে ঘিরে পাক খেয়ে যাচ্ছে!

৪
মিলি

স্যার একটা কঠিন মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। দোষের মধ্যে স্যার আকবরের শাসনকাল নিয়ে বকবক করে যাচ্ছিলেন আর আমি মধুমিতাকে ফিসফিস করে দিদির মোবাইলে দেখা মেসেজটার কথা বলছিলাম। মধুমিতাদের বাড়িতে স্যার পড়াতে আসেন। প্রথম প্রথম "স্যার তুমি" করে বলতাম। একদিন দিদি শুনে সে কী হাসি। বলে, 'পাগলী স্যারকে তুমি করে বলে নাকি? স্যার তো আপনি।" তারপর থেকে আমার আপনি বলা শুরু হয়েছে।

বাড়িতে দাদা বউদি এসেছে কোথায় আজকে ছুটি পাব তা না, মা জোর করে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্যারের পেছনে গুচ্ছখানেক টাকা যখন যায় তখন স্যারের কাছে একদিনও মিস করা যাবে না! মাথা বেশ গরম ছিল। কিন্তু মধুমিতাদের বাড়িতে আসার পরই প্ল্যানটা চেঞ্জ করলাম। দিদিকে ট্র্যাক করতে হবে। এদিকে ক্লাসমেট আর ওদিকে লাইন চলিতেছে! তাও কিনা আমার ক্রাশের সাথে। সবকিছু জানতে হবে আমায়। সত্যিই কি কিছু আছে কি না! আর এইজন্য মধুমিতাকেই লেডি ফেলুদা নিযুক্ত করতে হবে। সত্যি বলতে কী ছেলে গোয়েন্দারা যতই বড়ো বড়ো সমস্যা সমাধান করে ফেলুক, কারও হাঁড়ির খবর বের করতে মেয়ে গোয়েন্দাদের জুড়ি নেই। একবার যদি এরা মনে করে কোনও তথ্য দরকার, আস্তে আস্তে সব

পেট থেকে ঠিক সব কথা টেনে বের করে নেবে। মধুমিতা কিছুদিন অয়নদাকে নজরে রাখুক। দেখুক কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে।

এইসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাই চলছিল আর সেই সময়েই স্যার পড়া থামিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। স্যার এমএ-র ছাত্র। আমাদের থেকে বেশি বড়ো না। কিন্তু তেজে এক্কেবারে বিরাট কোহলি।

বললেন, "তোমরা তো সবই জানো দেখছি। পড়াবার কি আর কিছু দরকার আছে? খামোখা পড়াচ্ছি। মাস গেলে মাইনে নিয়ে গেলেই পারি!"

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, "না স্যার, আসলে আমরা রাত্রে একটা গ্রুপ স্টাডির প্ল্যান করছিলাম তো তাই আর কি..."

বলছিলাম আর মনে মনে হাসছিলাম। গ্রুপ স্টাডি না ছাই। কিন্তু ইমেজটাও তো ঠিক রাখার একটা ব্যাপার আছে, তাই না?

স্যার যদিও আমার প্রশ্নে খুব একটা সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "সেটা তো পড়ার পরেও করা যেত, তাই না? আমি দেখেছি, এই ব্যাচে তুমি আর মধুমিতাই একটু বেশি গসিপিং করো। দ্যাখো, সেরকম হলে কিন্তু তোমার বাবা মা-র সাথে কথা বলব আমি।"

আমি বুঝে গেলাম কেলো আসন্ন। এক্কেবারে আত্মসমর্পণ করে দিলাম, "স্যার, প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আর হবে না।"

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে দেখছি, এরপরে যদি হয় তাহলে বুঝতেই পারছ।"

স্যার পড়ানো শুরু করলেন আবার। আমাদের ব্যাচটা সাতজনের। আমি আর মধুমিতা মেয়ে আর পাঁচটা ছেলে। পাঁচটা ছেলের চারটে এক্কেবারে রাহুল দ্রাবিড়ের মতো কপিবুক ভালো ছেলে। আর-একটা আছে, পার্থ। ব্যাটার নজর ভালো না। কথা বলতে বলতে বুকের দিকে তাকানোর বদভ্যাস আছে। মাঝে মাঝে মনে হয় চোখ গেলে দি পেন দিয়ে। এখনও যখন স্যারের সাথে আমার এই কনভোটা চলছে, মিটিমিটি হাসছিল। স্যার পড়ানো শুরু করতেই আমি কড়া চাউনি দিলাম একটা ওর দিকে। সামনাসামনি চাউনি খেয়ে একটু ভেবলে গেল।

সত্যি কথা বলতে কী আমিও জানি, আমার বাবা মা-ও জানে পড়াশোনা আমার বেশি হবে না। কোনওমতে মাধ্যমিক পাশ করেছি বটে কিন্তু দাদা আর দিদির মতো সায়েন্স পাইনি। ভাগ্যিস পাইনি, কারণ অঙ্ক দেখলে আমার গায়ে রীতিমতো ভূমিকম্প দিয়ে জ্বর আসে। তা ছাড়া পৃথিবীর সবাইকে অঙ্ক জানতে হবে এরকম মাথার দিব্যিও কেউ দেয়নি। এই কথাটা অবশ্য আমার না। অয়নদার কথা। অয়নদার এই কথা কেন, সব কথাই দারুণ। অয়নদার সঙ্গে কাটানো সব ক-টা সময়ই দারুণ।

অয়নদার হাসি দারুণ, অয়নদার হাতের লেখা দারুণ, অয়নদার লেখা কবিতাগুলি দারুণ, এমনকি অয়নদা যে গ্লাসে জল খায় সেই গ্লাসটা পর্যন্ত দারুণ। আমি গ্লাসটা ধুই না। ওই গ্লাসেই জল নিয়ে খাই। কেমন একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়।

আমি একটা জিনিস ঠিক করে নিয়েছি, দিদির সাথে যদি অয়নদার কিছু থেকেও থাকে, আমি তবু অয়নদাকেই ভালোবাসব। তাতে যা হবার হবে।

৫

অনেকদিন কচি মেয়ের গায়ের গন্ধ পায়নি সে।

নিজের মুদির দোকানে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল নারান। বয়স হচ্ছে। কিন্তু ইচ্ছাটা তো একইরকম আছে। কাঁহাতক আর এক মেয়েছেলে নিয়ে শরীরের খিদে মেটানো যায়! ওইসব পাড়াতে গেলে আবার বিভিন্নরকম রোগের ভয় আছে। আর ওপরে ফাউ টাকা দিয়ে আসতে হয়, কী দরকার!

এই বাধা থেকেই তো সে প্রথম রেপ করেছিল সেভেনের মেয়েটাকে। স্কুল থেকে ফিরছিল। আমবাগানের ভিতর দিয়ে শর্টকাট। নারান ক-দিন ধরেই ওঁত পেতে ছিল। একদিন সাইকেল আটকে মুখ চিপে কাছের পরিত্যক্ত ইটভাঁটার কাছে নিয়ে গিয়ে যা করার করে ফেলল। মেয়েটা গোঁ গোঁ করছিল, নারান বুঝতে পারছিল জোরটা বেশিই হয়ে গেছিল। মাথাটা অবশ্য বরাবরই ঠান্ডা তার। জীবনের প্রথম খুনটা করতেও কোনও অসুবিধা হয়নি। যখন মনে হচ্ছিল মেয়েটা একটু বেশিই কাহিল হয়ে পড়েছে, আর রিস্ক নেয়নি সে। গলাটা খানিকক্ষণ অবহেলায় ধরে শ্বাস বন্ধ করে দিল। দশ মিনিট পরে আবার বাজারে নিজের দোকানে নির্বিকারভাবে বসে থাকতে দেখা গেছিল তাকে। এলাকায় ক-দিন ধরে হইচই, দোকানে দোকানে কথা, বাজারে, চায়ের দোকান সরগরম, লোকে লোকারণ্য, নারান কিন্তু চুপচাপ। আর পাঁচটা লোকের মতোই দোকানে বসে আছে। জিনিস বিক্রি করছে। বাড়িতে বউয়ের কথা অনুযায়ী বাজার এনে দিচ্ছে, ছেলেকে সাইকেল করে স্কুলে দিয়ে আসছে। কস্মিনকালেও কেউ কোনওদিন ভাবতে পারেনি এত বড়ো কাণ্ডের মূলে তার মতো একজন "নির্বিরোধী, নিরীহ" লোক এই কাজ করেছে।

একবার না, দুবার না, নারানের হিসেবে এখন পাঁচটা ধর্ষণ করে খুন করা হয়ে গেছে। কেউ বুঝতে পারে না কে করছে এত কিছু। ঘটনা ঘটার ক-দিন খুব পুলিশি তদন্ত চলে, এলাকার পুরোনো পাপীগুলোকে পুলিশ তুলে নিয়ে চলে যায়। এই ক-টা দিন নারান চুপচাপ থাকে। এক্কেবারে কোনওরকম বেচাল করে না। গত তিন বছর আগে শুরু করেছিল এই কাজটা। তিন বছরে পাঁচবার মানে ছ-মাসে একবার। তার নিজের কাছে স্ট্রাইক রেট ঠিকই আছে।

কচি মেয়েগুলি যখন ছটফট করে, প্রথমে প্রবলভাবে বাধা দিতে দিতে একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ে, সেই সময়টাই তার নিজেকে সবথেকে বেশি পরিতৃপ্ত মনে হয়। একবার গায়ের জোর পুরোদমে প্রয়োগ হয়ে যাবার পরে তো নিস্তেজ হয়েই থাকে, তারপরে সুইচ অফ করে দেবার মতো করে খুন করাটা আজকাল তার কাছে জলভাত হয়ে গেছে। শেষবারের সময় অবশ্য মেয়েটা মারাই গেল। তাতেও অবশ্য সে কাজটা অসম্পূর্ণ রাখেনি। করেই নিয়েছিল।

দোকানে বিভিন্নরকম বিশেষজ্ঞ বসে। সে সবার কথাই শোনে। এক পক্ষ বলল এটা কিছুতেই একা কেউ করতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনও গ্যাং আছে এর পেছনে। কোনও পক্ষ আবার পুরো ব্যাপারটা রসিয়ে রসিয়ে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল।

সে চুপচাপ নির্বিকার মুখে এদের কথাগুলি শোনে। নারান খুব ভালো করেই জানে, একা এভাবে করাটা কতটা কঠিন। কিন্তু সে নিজেকে একজন শিল্পী বলে মনে করে। যে লোকটা ভালো ছবি আঁকতে পারে, তার থেকে সে নিজেকে কোনওভাবেই কম করে দ্যাখে না। একা একা বসে এক-একটা কেস মনে করে, আর নিজের তারিফ করে। কী অবিশ্বাস্য নিখুঁত দ্রুততায় গোটা ব্যাপারটা করে ফেলেছিল সে।

দোকানে বসে বসে আগের কেসগুলির কথাই ভাবছিল সে। প্রায় সাত মাস হতে চলল সে চুপচাপ বসে আছে। লাস্ট কেসটায় খুব হইচই হয়েছিল। এক মেয়ে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ঝুলিয়ে গ্রামের নির্জন দিকটায় এসেছিল কীসব ফটো তুলতে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিল। নারান তক্কে তক্কে ছিল। তিনদিনের মাথায় সাফল্য এল। কিন্তু মেয়েটার মাথাটায় চোট লাগার ফলে মেয়েটা আগেই মরে গিয়েছিল। নারান মাথা লক্ষ্য করে ইট মেরেছিল। কাছে গিয়ে দেখেছিল বেজায়গায় লেগে ওখানেই পড়ে আছে। মরে যাবে আগে বুঝতে পারেনি। কাবু করাটাই টার্গেট ছিল। সেটা হয়ে ওঠেনি বলে খারাপ লেগেছিল।

তারপর লাশটাকে কাছের পুকুরে ফেলে চলে এসেছিল সে।

কদিন ধরে আবার মনটা কেমন করছিল তার। অনাবৃত দেহের গন্ধটা স্বপ্নেও আসছিল তার। দোকানে বসে বসেই চোয়াল শক্ত করল সে। অনেকদিন হল। এবার আবার নামতে হবে।

বন্ধুদের মধ্যে কেউ সফল হলে পাড়ার বাকি বন্ধুরা সবাই যে উদ্বাহু নেত্য করে, তা নয়। রূপম জানে, যে বন্ধুদের সঙ্গে কৈশোরে, বয়ঃসন্ধিতে ঘুরে বেড়িয়েছে, মেয়ে দেখেছে, নারী-পুরুষের মিলন সম্পর্কিত জিগস পাজল সলভ করেছে, তারাই এখন অনেক দূরে চলে গেছে। তবু সন্ধেগুলো বাড়িতে বসে সময় কাটাতে তার ইচ্ছা করল না। এর আগেও ক্লাবে গিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। এবারে বসে বসে টিভিতে ঘ্যানঘ্যানে হিন্দি সিরিয়াল দেখার চেয়ে বাইরে যাওয়াটাই ঠিক করল সে। বাড়ির একমাত্র টিভিটা বোনেরা বউদিকে ছেড়ে দিয়েছে। শ্রাবন্তী বসে পড়েছে যথারীতি।

মা আবার রান্নাঘরে লেগে পড়েছে। রূপম ধীর পায়ে রান্নাঘরে ঢুকল। মা বেগুন কাটছে, রূপম বলল, "রূপসী নেই? তুমি তো একাই করে যাচ্ছ দেখছি।"

মা হাসল। বলল, "পড়বে না নাকি রে? তুই জামাকাপড় চেঞ্জ করলি যে? বেরোবি কোথাও?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ, ক্লাবে যাব ভাবছি।"

মা ক্লাবে যাবার নাম শুনে খুশি হল না। বলল, "দেখিস, পার্টি নিয়ে কোনও কথা বলিস না। এখন সময় ভালো না। কে কখন কোথায় গিয়ে লাগিয়ে দেয়। খাদ্য সুরক্ষা নামে এক নতুন জিনিস শুরু হয়েছে, জানিস আমাদের বাড়ির নামই তোলেনি। তোর ওই বন্ধু, কী নাম যেন, হ্যাঁ বাপ্পা। ওকে তোর বাবা গিয়ে ধরল। বলে কিনা, কাকু বুবাই তো বিরাট চাকরি করছে। কী দরকার। অথচ ওরা নেতা। ওদের যা আয় তাতে তোর পাঁচবার মাইনে হয়ে যাবে। কে বোঝাবে বল এসব?"

রূপম বলল, "খাদ্য সুরক্ষা হোক আর যাই হোক, সেসব নেবার দরকার কী আছে? আমি যা পাঠাই তাতে হচ্ছে না?"

মা বলল, "হয়, কিন্তু সবাই পাবে, আমরা কেন বাদ যাব বলতে পারিস? ছেলে বাইরে চাকরি করে, কলকাতার মেয়ে বিয়ে করেছে, সবার চোখ টাটায় এটা বুঝিস না?"

রূপম হেসে ফেলল, "মা তোমার গর্ব হয়, না?"

মা-ও হাসল। "হবে না? ক-টা ছেলে আছে পাড়ায় তোর মতো? ওই তো একটা সেই ব্যানার্জিবাড়ির ছেলেটা। কিন্তু ওর পেছনে ওর বাপ মা কত খরচ করেছিল সেটা ভুললে হয়? আর তুই তো সব নিজের স্কলারশিপের টাকাতেই পড়েছিস। বাকিগুলো সব কেউ নেতার চামচা, কেউ এর ওর তার সাথে ঝগড়া করে ঘুরে বেড়ায়। গর্ব তো হবেই।"

রূপম বলল, "তাহলে ওদের কিচ্ছু বলার দরকার নেই। উপেক্ষা করো। ওদের কাছে হাত পাততে হবে এত খারাপ দিন আমাদের আসেনি।"

মা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বয়সে এত চাপ নিস কী করে? এত বড়ো একটা সংসারের বোঝা নিয়ে চলছিস, পারবি? তার থেকে আমরা এই করে যদি কিছু করতে পারি সেটাই ভালো হবে।"

রূপমের একটু খারাপ লাগল। শ্রাবন্তী কি মাকে ঠারেঠোরে কিছু শুনিয়েছে? মা তো কোনওদিন এইসব কথা বলত না! সে শক্ত হল। বলল, "দ্যাখো মা, আমি ওইসব বুঝি না। চাপ নিতে হলে নিতে হবে। আমি তো বাড়িরই ছেলে। আমি আরামে থাকব আর তোমরা ওই বাপ্পাদের মতো চামচাদের ধরে রেশনের চা খেয়ে বাঁচবে সেটা হতে দেব না। সে যে যাই বলুক।"

মা হাসল, "সত্যি, তুই সেই রকমই রয়ে গেলি। যাহ্, ঘুরে আয়। আমি আর কাউকে কিছু বলছি না। খুশি?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। খুশি। আমি বেরোলাম।"

মা বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরিস।"

রূপম ভাবছিল কোনও কোনও জিনিস কোনও অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না। সে যখন বিকেলে খেলতে যেত তখনও মা এভাবেই বলত তাড়াতাড়ি ফিরিস। আর আজকেও...

টিভির ঘর দিয়েই বাইরে যাবার দরজা। রূপমকে বেরোতে দেখে শ্রাবন্তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। রূপম বলল, “আসছি ঘুরে। তুমি টিভি দ্যাখো।”

বাবার দিকে একবার তাকিয়ে কোনওমতে হাসি চেপে বাইরে বেরোল সে। বাবা বউমার সামনে এক্কেবারে তটস্থ হয়ে বসে আছে। টিভির দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে। এমনি সময় সে বা বোনেরা টিভিতে সিরিয়াল দেখলে বাড়ি মাথায় করে তুলত। এখন চুপচাপ বসে বউমার সাথে সিরিয়াল দেখছে।

ক্লাবের দিকে রওনা হতেই তার দেখা হয়ে গেল বাপ্পার সাথে। তাকে দেখে বাইক আস্তে করল। বেশ একটা হোমরাচোমরা ভাব এসেছে। বাপ্পাকে তারা ছোটোবেলায় শালিখ বলে ডাকত। শালিখ নামটা বাপ্পাদের পারিবারিক নাম। সে শুনেছে বাপ্পার বাবাকেও তার বাবা শালিখ বলে ডাকত। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নাম বলা যেতে পারে। বাপ্পা দাঁড়াতেই সে ঠিক করল সেই নামেই ডাকবে। মা-র কাছে খাদ্য সুরক্ষার ব্যাপারে কথা শুনে তার বেশ রাগ হচ্ছিল। সে হাসতে হাসতেই বলল, “কী রে শালিখ, কেমন আছিস?”

বাপ্পার বাইকের পেছনে মনে হয় একটা চামচা বসেছিল। এই ডাকটা শুনে সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। বাপ্পা ব্যাপারটাকে হালকা করতে চাইল হেসে, “আহ গুরু, তুমি এখনও সেই ছোটোবেলাতেই আছ দেখছি।”

রূপম বলল, “হ্যাঁ তুই যে নেই সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। ন্যাতা হয়েছিস নাকি?”

বাপ্পা অপ্রস্তুতের মতো হাসল, “হে হে, গুরু, ওসব কিছু না, সোশ্যাল সার্ভিস আর কি। আগের পার্টি তো সব শেষ করে দিয়ে গেছে, তাই আমাদেরই একটু বেশি দায়িত্ব নিয়ে দেশটা বাঁচাতে হচ্ছে বুঝতেই পারছিস।”

রূপম হাসল, “হ্যাঁ তা তো বুঝতেই পারছি। তা ব্যবসা কেমন চলছে?”

বাপ্পা দাঁত বের করে হাসল, “তা গুরু ভালোই। সবই সোশ্যাল সার্ভিস কি না। যাক গে, তুই বাইকে ওঠ। এই ঘোৎনা, তুই হেঁটে আয়, আমি ক্লাবে যাব।”

রূপম দেখল পেছনের চামচাটাকে নামিয়ে দিল বাপ্পা। সে চুপচাপ বাপ্পার বাইকের পেছনে গিয়ে উঠল। মজাই লাগছিল তার শালিখের সঙ্গ। কেমন একটা হনু হনু ভাব, আর তলায় বইছে একটা জোকারির মলয় বাতাস।

৭
মিলি

দিদি মোবাইলটা খুটখুট করছে। আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে ওকে দেখছি শুধু। ওর সঙ্গে এমনভাবে মিশতে হবে যেন ও জানতেও না পারে ও কী করে বেড়াচ্ছে সেটা আমি জানতে পেরে গেছি।

করছে বলতে অবশ্য সেরকম কিছুই করেনি। অয়নদার সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতো পড়তে যায়, মধুমিতা ফলো করবে কাল থেকে। খেলার নিয়ম পরিষ্কার। দিদি এখন আমার শত্রু। আর মধুমিতা যতই শয়তান হোক, এখন আমরা বিক্ষুব্ধ শ্রেণি। আমাদের হাত মেলাতেই হবে।

দিদির মোবাইল আজ আরও একবার ঘাঁটার সুযোগ পেয়েছি। ও যখন স্নানে গেছিল। বেশ কয়েকবার চেক করে নিয়েছি। অয়নদার সাথে বিরাট কিছু কথা হয় না। কিন্তু বেশ কিছু কথা অনেক কিছু মিন করে।

যেমন -

অয়নদা- আজ কলেজের পরে দাঁড়াস। কথা আছে।

দিদি- বটগাছ।

এরপরে শুধু অয়নদার একটা স্মাইলি, তাও হাসি হাসি মুখওয়ালা। এর থেকেই বোঝা যায় এদের মধ্যে একটা গভীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। কলেজের পরে কোথায় দেখা হবে একগাদা কিচ্ছু লেখেনি। দিদি শুধু বটগাছ লিখেছে তাতেই দুজনে যা বোঝার বুঝে গেছে। হাইলি সাসপিশাস ব্যাপার, মানতেই হবে। তবে

আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কোথায়! আমিও আমার ফোন থেকে অয়নদাকে একটা জোক পাঠিয়ে দিলাম। ইন্টেলেকচুয়ালওয়ালা। ননভেজ পাঠাই না কোনওদিন। মধুমিতা প্রচুর ননভেজ জোক পাঠায়, কোনও-কোনওটা পড়লে রীতিমতো গা ঘিনঘিন করে। সেগুলো পড়েই অবশ্য ডিলিট করে দিই। দিদির চোখে পড়লে দিদি যদি মাকে বলে দেয় তাহলে আর দেখতে হবে না। মা এখনও আমাকে মাঝে মাঝে দু-চার ঘা দিয়ে দেয়। বড্ড লাগে। আমারও একটা প্রেস্টিজ আছে। আমি যে এখন বড়ো হয়ে গেছি মা সেটা বুঝতেই চায় না। ওদিকে নিজেই বলে মেয়েদের শরীর খারাপ হয়ে গেলে মেয়েরা বড়ো হয়ে যায়। দিদিকে মা আমার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসে। সেটা আমি বুঝতে পারি। বাসুক। আমাকে কাউকে ভালোবাসতে হবে না। অয়নদা ভালোবাসলেই হবে।

বাবা টিভির ঘরে বউদির সাথে হিন্দি সিরিয়াল দেখছে। বেচারা অন্যান্য দিনগুলিতে এই সময় নিউজ চ্যানেলগুলি খুলে বসে থাকে। আজকে সেটাও করতে পারছে না। দিদিকে বললাম, “এই দি, চ’ বাবাকে একটু জ্বালিয়ে আসি।”

দিদি চোখ পাকিয়ে তাকাল আমার দিকে, “খুব মজা না? যা না, বউদির ওখানে গিয়ে তুই বস না। বাবা বরং একটু ঘুরে আসুক। ওখানে বউদির সঙ্গে কাউকে না কাউকে তো বসতেই হবে। আমরা বসতে পারব না বলেই তো বাবা বসেছে।”

আমি মাথা নাড়লাম জোরে জোরে, “না না, আমার কাল পরীক্ষা আছে টিউশনে। একটা কাজ কর না, তুই-ই যা তাহলে।”

দিদি রেগে গেল, “তাহলে চুপচাপ পড়ে যা। সার্কাস দেখতে হবে না। মাকে ডাকব?”

আমি আর দিদির দিকে তাকালাম না। জোরে জোরে পড়তে লাগলাম। দিদিটা এমনি ভালোমানুষ আছে। কিন্তু বাবাকে কিছু বললেই রেগে যায়। বাবার ন্যাওটা একটা। আমি অবশ্য ছটফট করছি একবার দেখে আসি বউদির সামনে বাবা কী করে সেটা দেখতে।

আজকে সকালে অবশ্য একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। লুচি নিয়ে বউদি কোনও অভিযোগ করেনি। বরং চারটে দিয়েছিল মা প্রথমে, চেয়ে নিয়েছে আরও দুটো। খাওয়াদাওয়ার পরে আমাদের সবাইকে অবাক করে মাকে বলেছে ইলিশমাছ রান্না শিখতে চায়। দাদা অবশ্য সেসব শুনে কেশে-টেসে একশা করেছে। তাতে আবার বউদি রাগও করেছে। তবে দাদার উপর বউদি রাগ করলেও সেটা আমাদের সামনে বেশি দেখায় না বউদি। বেশ সবার সামনে হাসি হাসি মুখ করে থাকে। আমার সেটা কেমন যেন লাগে। এত ভদ্রতাও মাঝে মাঝে চোখে লাগে।

খানিকক্ষণ পড়লাম। কিন্তু আর ইচ্ছা করছিল না।

দিদিকে আবার খোঁচাতে ইচ্ছা হল, “কী রে? একটা বিশ্বস্ত জায়গা থেকে শুনলাম তুই নাকি প্রেম করছিস?”

দিদি রেগে গেল, “আমি মাকে ডাকি?”

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, “ডাক না। মাকেও বলি তাহলে?”

দিদি একটু শান্ত হল যেন, “কে এই সব ফালতু কথা তোকে বলে?”

আমি মিটিমিটি হাসতে লাগলাম। “সত্যি কি না বল।”

দিদি রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভালোই রেগেছে মনে হচ্ছে। মোবাইলটা ফেলেই গেছে। আমি আবার হাতালাম ফোনটা।

৮

ক্লাবটা যে মোটামুটি পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে, রূপমের এ সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। ক্লাবের মধ্যেই ভোটের জিনিসপত্র সব ডাঁই করে রেখেছে বাপ্পারা। ভেবেছিল ক্লাবে ঢুকে নস্টালজিক হবে, সেটা

আর হওয়া হল না। বাপ্পা এসেই তাকে হঠাৎ করে খুব খাতির করে সবাইকে "এই আমাদের গুরু এসেছে রে" বলে ডেকে নিল। বেশিরভাগ মুখই অপরিচিত। কারও কারও চেহারা দেখেই বোঝা যায় স্বাভাবিক নিয়মে জীবনযাপন করার পাবলিক এরা কেউই নয়।

তাকে ঘিরেই মোটামুটি সব বসল। বাপ্পা বলল, "গুরু তুই তো ঘ্যাম চাকরি করছিস! আমাদের পার্টি ফান্ডে কিছু দে!"

পাপনও ছিল ওখানে। বাপ্পার কথা শুনেই তেড়ে উঠল, "ছেলেটাকে একটু বসতে দে। আসতেই নিজের ধান্দার ঝুলি খুলে বসলি?"

পাপনের সঙ্গে চিরকালই রূপমের বেশি জমত, সে পাপনের কথা শুনে হেসে ফেলল, "বাপ্পাটা বহুত ধান্দাবাজ হয়ে গেছে বল? আর এটা তো আমাদের পাড়ার ক্লাব। এখানে পার্টির কথা আসছে কেন হঠাৎ?"

বাপ্পা দেঁতো হাসি দিল তার কথা শুনে। বলল, "আহ গুরু, তুইও না তেমনি। ক্লাবে একটু ওসব রাখতে হয়। তুই বুঝবি না। গরমেন্টের অনেক গ্র্যান্টের ব্যাপারস্যাপার আছে। সেগুলো তো ক্লাবের কাজেই লাগছে নাকি? এই দেখ না, গত মাসে কম্বল বিতরণ করে ফেললাম।"

রূপম অবাক হল, "এই গরমের মধ্যে কম্বল দিয়ে কী হবে?"

বাপ্পা আক্রমণাত্মক হবার চেষ্টা করল, "কম্বল কত কাজে লাগে জানিস? যারা ফুটপাথে থাকে তাদের তোশকের কাজও করে।"

রূপম হাত তুলে থামতে বলল বাপ্পাকে, "ঠিক আছে। আমি এই ব্যাপারে আর কিছু বলব না। যা ভালো বুঝিস কর। এলাম ক্লাবে পুরোনো বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে, আর কিছুই মিলছে না দেখছি।"

বাপ্পা আহত গলায় বলল, "এরকম করে বলিস না। আমি কি তোর বন্ধু না? পাপনও তো আছে।" রূপম বলল, "বন্ধুর থেকে তোকে শাসক বেশি মনে হচ্ছে আজকে।"

পাপন ফুট কাটল, "ও তো এখন পুরোদমে নেতা-ই রে। পরের বার কাউন্সিলরে দাঁড়াচ্ছে।"

বাপ্পা পাপনের দিকে একটা আগুনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "ফালতু কথায় কান দিস না, আমি মানুষের সেবাই করে যেতে চাই বাকি জীবনটা।"

রূপম আর কিছু বলল না। মা-র কথাটা মনে পড়ে গেল। এখানে এখন একটা অদ্ভুত সময় চলছে। কোনও কিছুই নর্ম্যাল না। সবাই কেমন তেতে থাকছে। সবাই কিছু একটা হবার চেষ্টা করছে। সোজা পথে চাকরি হবার রাস্তাঘাট বন্ধ প্রায়। পুরোটাই বাঁকা পথে সমাজসেবা টাইপ ডায়লগ মেরে কেমন একটা পাবলিক গিমিকের চেষ্টা।

পাপন বলল, "তুই আছিস ক-দিন?"

রূপম বলল, "সাত দিন। অফিসে ছুটির হাল খুব খারাপ আসলে। পুজোয় তো আসতেই পারলাম না। এলাকার খবর কী রে?"

বাপ্পা দাঁত বের করল, "ফাইন। একদম ঝাক্কাস।" বাকি ছেলেগুলি তাদের কথোপকথন শুনছিল, কেউ কোনও কথা বলছিল না। ওদের শীতল চোখগুলির দিকে তাকিয়ে রূপমের হঠাৎ একটু অস্বস্তি হওয়া শুরু হয়েছিল। একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল।

পাপন বাপ্পার কথা শুনে মুখ কুঁচকোল, "ফাইনই বটে। মাঝে মাঝেই লাশ পড়ছে। ছ-সাত মাস পর পর রেপ হচ্ছে, ফাইন ফাইন।"

বাপ্পা পাপনকে একটা ধমক দিল, "ফালতু কথা বলবি না। আমাদের প্রতাপনগর কি ভারতের বাইরে? সব জায়গায় যেরকম রেপ মার্ডার হয়, এখানেও হয়। বিহারে ইউপিতে এর থেকে অনেক বেশি হয়। আর তোরা এই রেপ মার্ডার আগের আমলে দেখিসনি? সব কি এই আমলেই হচ্ছে?"

পাপন ছাড়ল না, "সব আমলেই হয়েছে। কিন্তু এরকম বুক বাজিয়ে কোনও গুন্ডাকে নেতাগিরি করতেও দেখিনি।"

বাপ্পা বলল, "দেখ পাপন, এখানে ও এসেছে। আবার শুরু করিস না প্লিজ। তুই আমার বন্ধু বলে এসব বলে পার পেয়ে যাস। আমাদের দলের ছেলেরা যথেষ্ট কথা শোনে আমার তাই। আমি কিন্তু সবসময় তোকে বাঁচাতে পারব না এটা মনে রাখিস। কখন কোন অন্ধকারে মারধোর খেয়ে যাবি, তখন তো আবার কাঁদতে কাঁদতে সেই আমার কাছেই আসতে হবে তোকে।"

রূপম চমৎকৃত হল। বাহ। বাপ্পার তো প্রচুর উন্নতি হয়েছে!!!

৯
মিলি

বাড়ির সামনে কদিন ধরে একটা পাগল আস্তানা গেড়েছে। কোত্থেকে এসেছে কে জানে। বসে থাকে চুপচাপ আর পাড়ার কুকুরগুলি সব তাড়া করে। বউদি একবার দেখেই আমাকে বলে দিয়েছে এইসব ওদের ওখানে ভাবাই যায় না। ট্রেসপাসারস ইত্যাদি নাকি ওদের অ্যাপার্টমেন্টের গেটে ঢুকতেই পারে না। ওরা যেদিন এল সেদিনই আমাদের পিছনের বাড়িতে বিরাট ঝগড়া লেগেছিল। আমাদের মফস্সলে এইসব স্বাভাবিক ঘটনা। বউদি সেটা দেখেও বেশ কয়েকবার বিরক্তি প্রকাশ করেছে।

আমার তো ঝগড়া দেখতে চরম লাগে। একবার যদি দেখি ঝগড়া লেগে গেছে, টুক করে ছাদে চলে যাই, একটু আচার ম্যানেজ হয়ে গেলে তো কথাই নেই। কতরকম নতুন নতুন গালাগাল যে শেখা যায় তার তো সীমা নেই কোনও। বোকাচোদা শব্দটা এই ঝগড়া থেকেই শিখেছিলাম। তখন আমি ক্লাস ফাইভ। দিদির সাথে কী একটা নিয়ে লেগেছিল, মা-ও ছিল ঘরে, আমি দিদিকে "বোকাচোদা" বলে দিয়েছিলাম। মা সেটা শুনে কী মার যে মারল, আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি কেন মেরেছিল। পরে মধুমিতা শিখিয়ে দিয়েছিল বোকাচোদা মানে কী। শুনে ফিকফিক করে অনেকক্ষণ হেসেছিলাম আর মা-র সেই মারটা মনে পড়ে গেছিল। মধুমিতা অবশ্য আমাকে অনেক গালাগালির মানেই শিখিয়ে দিয়েছিল। তার সঙ্গে সব ক-টার সন্ধিবিচ্ছেদ। তবু বাড়ির পিছনে এই সাহাবাড়ির ঝগড়াটা হলেই আমি কান খাড়া করে আমার গালাগালির ভোকাবুলারি বাড়ানোর চেষ্টা করে যাই। ক্লাসে তো সবই নিরিমিষ গালাগালি শুনতে পাই। এখানে মাঝে মাঝে কয়েকটা কড়া জিনিস শোনা যায়। খানকির ছেলে এদের কাছে নার্সারির গালাগালি। কতরকম যে এদের স্টকে আছে কে জানে!

এদের বাড়িতে তিন ভাই। মা আর বাবা থাকে। এরা সব একসাথেই থাকে। এমনিতে এদের বাড়িতে নিজেদের মধ্যে বিরাট গলায় গলায় ভাব। বাইরের লোকে এক ভাইয়ের কিছু করলে বাকি দু-ভাই পারলে খুন করে আসে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এদের মাঝেমধ্যেই লাগে। বিষয়গুলিও হাইফাই। একদিন বড়ো ভাইয়ের পাতে মাছ কেন ল্যাজার পিস দিয়েছিল মেজো বউ, সে নিয়ে লাগল। তখন আমি পরীক্ষার পড়া করছিলাম। এদের ঝগড়া শুনে ছাদে গিয়ে দেখছি বড়ো বউ আর মেজো বউ ঝাঁটা নিয়ে উদোম গালাগাল শুরু করেছে, মেজো ভাই বড়ো ভাই আর ছোটো ভাই মিলে তাস খেলছে। তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই যে এত বড়ো ঝগড়া লেগেছে কোথায় সামলাবে! মানে চাপের যেন কোনও ব্যাপারই নেই। আমি ইতিহাস মিলিয়ে খুঁজে পেলাম না এরকম কেস কেউ কোনওদিন দেখেছে নাকি! শেষে আর চাপ না নিয়ে নিচে চলে এলাম। ভাইদের মধ্যেও লাগে। তাস খেলা নিয়ে। বিরাট হাতাহাতি। তখন আবার দেখেছি বউরা সেসব ব্যাপারে বেশি নাক গলায় না। মানে টোটাল ডেমোক্রেসি আর কি!

এদের ঝগড়া বাঁধলে পাগলটা এদের বাড়ির সামনে গিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দাড়ি-টাড়ি চুলকায়। একা একা লাফায়। মাঝে মাঝে আমি পাগলটাকে খাবারও দিতাম। তারপর দিদি যখন বলল পাগল-টাগলদের কাছে বেশি না ঘেঁষতে, এদের নাকি হুট করে শরীরে হাত দেবার প্রবণতা থাকে; তারপর থেকে আর দিই না। শরীরে হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য পাগলদের থেকে ভদ্রলোকেরা কোনও অংশেই পিছিয়ে থাকতে দেখিনি। বাসে উঠলেই ছুতোনাতায় পেছনে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কখনও কনুইটা বুকে ছুঁইয়ে

ফেলে, এমন একটা ভাব যেন পুরো ব্যাপারটাই অ্যাক্সিডেন্টালি ঘটছে। জেনেবুঝে করেনি। আমি অবশ্য ছোড়নেওয়ালির মধ্যে পড়ি না। একদিন একটা বুড়ো মাল বাসের মধ্যে হঠাৎ বুকের মধ্যে কনুইটা ঠেকিয়েছিল আর আমি দিয়েছিলাম এক চিৎকার, "দাদু কনুইটা ইচ্ছা করেই তোলো নাকি? খালি বাসেও কাছে ঘেঁষে দাঁড়াতে হয়?" বাসের বাকিরা বুড়োটাকে ভালোমতোই দিল। বুড়োটা দেখলাম হে হে করতে করতে পরের স্টপেজে নেমে গেল।

হারামি আর কাকে বল। ইশ, বাজে ভাষা বেরিয়ে গেল। মা শুনলে এবার আমার সব চুল কেটে ছোটো করে দেবে।

১০

দোকানের ছেলেটার হাতটান আছে। নারান ওকে চোখে চোখে রাখে। একটু চোখের নজর এদিক-ওদিক হলেই খুচরো-টুচরো যা পায় পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। সবসময় বকাঝকা দেওয়া সম্ভবও না। বাজারে সবাই তাকে বোকাসোকা দোকানদার হিসেবেই চেনে। দোকানের সামনে বেঞ্চিতে বসলে বিকেলে ছ-টার সময় চা ফ্রিতে পাওয়া যায় বলে অনেকে বসেও। চারদিকের গল্পসল্প হয়। দেশের বিভিন্ন কথাও আলোচিত হয়। নারান ভালোমানুষের মতো মুখ করে সবই শোনে।

রেপ নিয়ে আলোচনা অনেকদিন হচ্ছে না। কারণ বেশ কয়েকদিন সেটা বন্ধ আছে। এখন কথা হচ্ছে এলাকায় পলাশের ফিরে আসা নিয়ে। সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। পলাশ নাকি বাঘের বাচ্চা। দেবু হালদারকে তুলে নিয়ে গেছে। ক-দিন পরে নাকি লাশ পাওয়া যেতে পারে।

নারান জানে এসব যত বেশি হবে তত ভালো। লোকের ধ্যান সব এইসব রাজনৈতিক ঝামেলার মধ্যে থাকবে। সে কী করে বেড়াচ্ছে কেউ তত খোঁজ রাখবে না। অথবা ভাবতেই পারবে না। রেপের ক্ষেত্রে সবাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের পাবলিকদেরই সন্দেহ করে। এমনিতেই কচি বয়সের ছেলেপুলেই দলগুলিতে বেশি থাকে। তাদের গায়ের রক্ত বেশি গরম থাকে। নারান জানে, ওদের রক্তে উত্তেজনা থাকলেও ওদের ভুল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কোনওরকম হোমওয়ার্ক ছাড়াই ওরা মাঠে নামে। এসকেপ প্ল্যান থাকে না। খুব সহজে ধরা পড়ে যায়। আর ধরা পড়ে যাবার পর লোকলজ্জা কিংবা মিডিয়ার ভয়ে রাজনৈতিক দলের হাত ওদের মাথার ওপর থেকে সরে যায়। ওরা যতটা আনন্দে এই অপরাধ করে, জীবন ততটাই দুর্বিষহ হয়ে যায়। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এইসব করে বুক চিতিয়ে চলাফেরা করা পাবলিকও আছে। তবে তাদের বাপের প্রচুর পয়সা। নেতা থেকে শুরু করে মেয়ের বাপ সবাইকেই কিনে নেয় তারা। কেউ টাকায় বিক্রি হয়, কেউ হয় ভয়ে।

নারান এইসবের কোনওখানেই তাই থাকতে চায় না। কাজ যেখানে শুরু হবে সেখানেই শেষ হবে। মাঝখানে কোনও কিছু ফেলে রাখার পক্ষপাতী সে নয়।

সন্ধেবেলা দোকানে বসে হিসাব মেলাতে বসেছিল নারান। শ্যাম্পুর স্যাশের হিসেব মেলাতে অনেকক্ষণ সময় লেগে যায়। একটু চোখের আড়াল হবার জো নেই, দেড় টাকা, তিন টাকা চোখের নিমেষে নিজের পকেটে চালান করে দেয় ছেলেটা। দোকানের সামনে কয়েকজন বয়স্ক লোক প্রতিদিনই বসে, তাদের কথাই কানে আসছিল মাঝে মাঝে, একজন যেমন বলছিল, "ভোটের সময় বাপু একটু শান্তিতে থাকা যায়, সবাই কেমন তেল মারে দেখবে এসে, এরকম সারাজীবন যদি ভোট থাকত তাহলে তো ভালোই হত, কী বলো?"

আর-একজন বলল, "যা বলেছ, তবে আমাদের পাড়াতে আবার অত শান্তিও নেই। মাঝে মাঝেই হুমকি শুনতে হচ্ছে। ওই যে তোদের ওই কী যেন নাম হাতকাটা পল্টু না কী, ব্যাটা এখন থেকেই বলে দিচ্ছে ভোটের দিন যেন একটু বুঝেসুঝে ভোট দিই। আমি তো আবার বলেই দিয়েছি, চিন্তা কোরো না বাপু, আমি তো তোমার দলেরই লোক, শুনে কোথায় ভাবলুম খুশি হবে, বলে কিনা, তাহলে কাকু এ বছর চাঁদাটা একটু বাড়িয়েই দিয়েন, অনেক এক্সটারনাল সোর্স তো বন্ধই আছে। বোঝো।"

এর কথা শুনে চারদিকে খুকখুক করে একটা হাসি উঠল। নারান মনে মনে একটা গাল দিল। মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদী পাবলিক সব। সুবিধা নেওয়ার সময় আমি তোমাদেরই একজন, আর একটু এদিক-ওদিক হলেই গালাগাল স্টার্ট। ঠিকই করেছে ছেলেটা বেশি চাঁদা চেয়ে। এদের এরকমই শায়েস্তা হওয়া দরকার। এর একটা নাতনি আছে। বেশ ভালো ফিগার। নারান চোখ বন্ধ করে গোটা শরীরটা একবার কল্পনা করে নিল। বেশ কয়েকবার আলতো নজরে লক্ষ রেখেছে সে। কলেজ থেকে ফেরার সময় কেউ না কেউ সবসময়েই সাথে রাখে। একজন থাকলে সেই লক্ষ্যকে বাতিলের খাতায় রাখার নিয়ম নারানের। কিন্তু হয় না, রক্ত সঞ্চালন দ্রুত হয়ে যায় নগ্ন শরীরটা মাথায় চলে এলে।

দুটো মেয়ে হাসতে হাসতে তার দোকানে ঢুকল। সামনের বুড়োদের ভিড়টা একটু নড়েচড়ে বসল। নারান আবার মনে মনে খিস্তি মারল। শালা চুলগুলো একটাও কাঁচা নেই, তবু কচি মেয়ে দেখলে সবারই মনের ভিতরে মরূদ্যান তৈরি হয়, ধর্ষণের ইচ্ছা সবারই থাকে, শুধু ধক থাকে না সবার এই যা।

এই বয়সের মেয়েগুলি সবকিছুতেই হাসে। কারণে হাসে, অকারণে হাসে। দুটো মেয়েরই ফিগার বেশ ভালো, তবে একজনেরটা তার রাতের ঘুম ভুলিয়ে দেবার পক্ষে আদর্শ। এলাকায় নতুন মনে হচ্ছে। অথবা তার দোকানে এই প্রথম এল। এসেই দিব্যি দোকানের ছেলেটার কাছে একটা লিস্ট দিয়ে দিল, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করে দিল। নারান চোখ বন্ধ করে ওদের কথায় কনসেন্ট্রেট করল। দুটো নাম কানে এল, মিলি, আর মধুমিতা।

কোন মেয়েটার নাম কোনটা, সেটা বুঝতে এবার চোখ খুলল সে।

১১
মিলি

অয়নদার সব ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর মুখে জ্ঞান দেওয়া শুরু করে যে কী বলব। দিব্যি ছিলাম, বাইরে গেছিলাম, ফিরে অয়নদার গলা শুনে খুশিই হয়েছিলাম, কিন্তু ও হরি!

ব্যাটা এসেই দিদির সাথে তুমুল তর্ক জুড়ে দিল। কী নিয়ে শুরু হয়েছিল জানি না, কারণ তখন বউদি কীসব কিনতে দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এসে দেখছি হুলস্থুল কাণ্ড। পৃথিবীর নাকি যা গর্ব, সবই আসলে গরিব শ্রমিকদের শোষণ করে গড়ে উঠেছে। পিরামিড থেকে তাজমহল, আসলে দেখতেই ভালো লাগে, কিন্তু এর পিছনে যে কত লোকের রক্ত আছে সেটা আমরা ভুলে যাই। দিদি যতই বলে, তুই সবকিছু এত গরিব লোকে নিয়ে যাচ্ছিস কেন, কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটা তর্কও করতে পারে। দিদির কথা শুনে বলে, “তুই থাম, গরিব লোকের কথা ভুলব মানে? গরিব লোক সব জোগান দিয়ে যাবে আর আমরা সেটা ভোগ করে যাব? আমরা তো নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি, তবু গরিব লোকেদের কথা আমরাই ভুলে যাই কেন?”

দিদি একেবারেই ঝগড়া করতে পারে না। ঝগড়া করতে গেলে দিদির কান মাথা সব লাল হয়ে যায়। অয়নদা যদিও আমার জান, তবু, দিদিকে এই অবস্থায় দেখে আমি খুব একটা খুশি হতে পারলাম না। কিন্তু আমিও যুক্তি খুঁজে পাই না। শেষমেষ আমি আর দিদি চুপচাপ বসে থাকলাম আর অয়নদা যত দুনিয়ার গরিব মানুষদের নিয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখি অয়নদা চুপ করে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি কখন যেন বউদি এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের দরজায়।

বউদি বলল, “রূপসী, ও তোর সাথে পড়ে?”

দিদি মাথা নাড়ল। আমি খুব উত্তেজিতভাবে ইন্ট্রো দিতে গেলাম, “জানো বউদি, অয়নদা খুব ভালো পড়াশোনায়, যে-কোনও সময় বিদেশে রিসার্চ করতে যেতে পারে।”

বউদি বলল, “মিলি তুই একবার শুনে যা।”

বউদি বলেই নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিল। আমি একবার দিদির দিকে একবার অয়নদার দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বউদির ঘরের দিকে গেলাম। দাদার ঘরে ঢোকার পরে বউদি দরজা ভেজাতে বলল

আমায়। দাদা এখন বাড়ি নেই। কোথাও একটা বেরিয়েছে। পাড়াতেই হয়তো।

দরজা ভেজানোর পরেই বউদি যেন খুব বড়ো কোনও কথা বলবে এভাবে আমাকে ফিসফিস করে বলল, "এখানে তোদের ঘরে একটা ছেলে চলে আসছে, তোর বাবা মা কেউ কিছু বলে না?"

আমি বউদির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। এটা নিয়ে তো কোনওদিনই আমরা ভাবিনি। অয়নদা যখন ফাইভে পড়ে তখন থেকেই আমাদের বাড়ি আসে। বাবা বা মা-ও তো এটা নিয়ে কোনওদিন ভেবেছে বলে মনে হয় না।

আমি বললাম, "না, ও তো বন্ধু। দিদির বন্ধু। তা ছাড়া খুব ভালো পড়াশোনায়।"

বউদি বিরক্ত গলায় আমাকে থামাল, "বন্ধু মানে কী? বন্ধু বলে আবার কিছু হয় নাকি? একটা বয়সের ছেলে তোদের ঘরে ঢুকবেই বা কেন? স্ট্রেঞ্জ!"

আমি অবাক হলাম। বউদি তো কনভেন্টের স্টুডেন্ট। ওদের আবার এত সমস্যা থাকে নাকি ছেলেমেয়ে নিয়ে? নাকি আমাদের বাড়িতে একটু বেশি গার্জিয়ানগিরি ফলাচ্ছে? অয়নদাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে কোনওদিন যে কোনও সমস্যা হতে পারে সেটাই আমার কোনওদিন মাথাতে আসেনি।

আমি বললাম, "অয়নদাকে কিন্তু তুমি যেরকম ভাবছ সেরকম না।"

বউদি গলা নামিয়ে বলল, "ওরকম তোরা ভাবছিস। কত বদনাম হতে পারে সে খেয়াল আছে? লোকে কত কথা বলবে তোদের নামে, তোদের বিয়ে দেওয়াটাই চিন্তা হয়ে দাঁড়াবে একসময়।"

আমার ভীষণ হাসি পেল। মধুমিতা একটা কথা বলে আজকাল খুব। কিছু হলেই এই কথাটা বলে। এখন খুব সেই কথাটা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল। বললে বউদির মুখটা কেমন দাঁড়াবে সেটা ভেবেই আমার পেটের ভিতরটা গুড়গুড়িয়ে উঠছিল। কথাটা আর কিছুই না, সেটা হল "বউদি, তোমায় দেয় কে?"

১২

জীবনটা আসলে সিনেমা না। তাই কোনও কোনও গল্প শেষ হয়ে গেলেও সেটা ফিরে ফিরে আসে। যে অস্বস্তিকর অধ্যায়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবে সবাই, জীবনে সেটা হয় না। নইলে মোমের সাথে দেখা হবার কোনও মানে হয়?

সে বেরিয়েছিল সন্ধেবেলায় হাঁটতে। ক্লাবে গতকাল যাবার পর থেকে ভুলেও ভাবেনি আর যাবার কথা। যেখানে শুধু রাজনীতি ছাড়া আর কিছু হয় না সেখানে যাওয়ার কোনওরকম স্পৃহা তার আর ছিল না। ঘরে থাকতেও ইচ্ছা করে না। একা একাই হাঁটতে বেরিয়েছিল। অনেকদিন পরে নিজের মফস্সলে নিজেকে আবিষ্কার করছিল সে। এই রাস্তা দিয়েই সে পড়তে যেত, সেই মুদির দোকানটা, সব একইরকম আছে। অচেনা মানুষও চোখে পড়ছিল। কেউ অনেক ছোটো ছিল, বড়ো হয়ে গিয়ে কেমন একটা দেখতে হয়ে গেছে। কয়েকজন এসে পরিচয় দিয়ে গেল, কেমন আছে জানতে চাইল, সে কথা এগোচ্ছিল না, দেঁতো হাসি দিয়ে এক-আধটা কথা বলে কাটিয়ে যাচ্ছিল।

মোমের মুখোমুখি হল মোমের বাড়ির সামনেই। তার অবচেতনে যে মোমকে দেখার ইচ্ছা ছিল না সেটা সে অস্বীকার করতে পারে না কখনোই। কিন্তু মোমের বাড়ি ফেরার সময়ই মোমের সাথে দেখা হওয়াতে একটু অপ্রস্তুতই হল সে। মোমই তাকে দেখে এগিয়ে এল, সে ভেবেছিল তাকে হয়তো না দেখার ভান করে চলে যাবে।

মোমই প্রথম কথা বলল, "আরে তুই? ভালো তো?"

রূপম হাসল, "হ্যাঁ, তুই?"

মোম বলল, "দারুণ! বউ কেমন?"

রূপম হাসিটা বজায় রাখল, "ভালোই। তুই বিয়ে করলি?"

মোম হেসে ফেলল, "নাহ। বিয়ে করার সময় পাইনি এখনও।"

রূপম বুঝতে পারছিল না এরপরে কী বলবে। অনেক ভেবে বলল, "দাদার বিয়ে হয়েছে?"
মোম বলল, "হ্যাঁ, আগের বছর। আয় ঘরে আয়।"
রূপম কাটাতে চাইছিল কিন্তু একটা অদ্ভুত চুম্বকের কারণে সে না করতে পারল না। মোমের পিছন পিছন ওদের বাড়িতে ঢুকল সে।
মোমকে তালা খুলতে দেখে সে বলল, "কেউ নেই বাড়িতে?"
মোম বলল, "নাহ। মা দাদার কাছে আছে।"
রূপম উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "এখন চারদিকে যা চলছে তুই এই বাড়িতে একা থাকিস কী করে?"
মোম হাসল, "আমি মনে হয় যমেরও অরুচি", ঘরে ঢুকতে গিয়ে ছোটো বারান্দায় মোমের হাতটায় একটু হাত ঠেকে গেল তার। বিদ্যুৎ পরিবহন এখনও হয়! শারীরিক চাহিদা তো শ্রাবন্তী মেটাচ্ছে। মোম কি এখনও তার কাছে সেই আবেদন নিয়ে আসে? নাকি এককালে মোমের সম্পর্কে ভালোবাসার থেকে শরীরটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল?
মোম হাতের ব্যাগটা সোফায় ফেলে বলল, "তুই বস, আমি চা বসিয়ে আসি।"
রূপম আপত্তি জানাল, "নাহ, চা খাব না।"
মোম হাসল, "আরে আমি তো খাব। এই এলাম স্কুল থেকে।"
রূপম হাল ছাড়ল, "ঠিক আছে। দে।"
মোম রান্নাঘরে গেল। রূপম ঘরের চারদিকটা দেখল। সেই একইরকম আছে। যখন সে পড়তে আসত এই বাড়িতে। সাজানো গোছানো। মোমের মা খুব ভালো চাউমিন বানাতেন। সে এলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। একদিন স্যার চলে যাবার পর কেউ যখন ছিল না মোমকে প্রথম চুমুও এই ঘরেই। জীবনের প্রথম চুমু। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। প্রথম সবকিছুর মতোই প্রথম চুমু সবসময়েই স্পেশাল। রূপম ধীরে ধীরে উঠে রান্নাঘরের দিকে গেল। মোম রান্না করছে। একটা অস্বস্তি হল হঠাৎ। এটা কি ঠিক হচ্ছে? শ্রাবন্তী যাই হোক, তার তো বিয়ে করা বউ। একটা অপরাধবোধ গ্রাস করে ফেলল তাকে। সেটা থেকেই হঠাৎ করে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল সে, "এই মোম, একটা খুব ভুল হয়ে গেছে রে। আমি আসছি।"
মোম তার দিকে ফিরল, কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দিল না, শুধু বলল, "আচ্ছা, তাহলে চা খাবি না?"
রূপম বলল, "না রে, সরি।"
আর পিছু ফিরল না সে। ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে জোর পায়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

***

বাড়ি ফিরে ড্রয়িংরুমে বসতেই শ্রাবন্তীর তলব, "একটু শোনো।"
রূপম কিছু বলল না। চুপচাপ নিজের বেডরুমে প্রবেশ করল, "বলো।"
শ্রাবন্তী দরজাটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে বন্ধ করল। বাড়িতে অন্যরাও আছে, রূপমের দেখে একটু অস্বস্তি হল, কিন্তু কিছুই বলল না। এগুলিকেই তো অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে। কিংবা বিয়ের পরের পরিবর্তন।
শ্রাবন্তী জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিসফিস করে বলল, "তোমার বোনের বেডরুমে ছেলে ঢুকে যাচ্ছে তুমি জানো?"

১৩

মিলির কথা

বাড়িতে বিচারসভা বসেছে। আমার বেশ মজা হচ্ছে। টিভির ঘরে বাবা দাদা বউদি মা আমি আর দিদি। সভায় মূল অভিযোগকারী বউদি। যা বোঝা গেছে, দাদাকে বউদি জ্বালিয়ে খাচ্ছিল অয়নদার ব্যাপারটা নিয়ে, তাই রাতে খাবার পরে দাদা বাবাকে বলেছিল, বউদি নাকি আমাদের কিছু বলতে চায়। বাবা ঘাবড়ে-টাবড়ে

গেছিল। আমি তখন ওখানেই ছিলাম বলে জানতে পেরেছিলাম। বাবা দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “কী ব্যাপার বল তো?”

দাদা বিরক্ত আর অন্যমনস্ক গলায় বলেছিল, “দ্যাখো মাথায় কী চেপেছে কে জানে! যাই হোক, সবাইকে কী বলবে বলুক। বেশি কিছু বোলো না, যা বলবে শুনে যেয়ো। ও তো আর বেশিদিন থাকবে না, সুতরাং যা বলবে প্রতিবাদ কোরো না।”

বাবা দাদার কথা শুনে বলল, “আচ্ছা। ঝামেলা না হলেই হল।”

বাবার এই এক স্বভাব। সারাক্ষণ সব ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসে। ক-দিন আগে আমাদের পিছনের বাড়ির যতীন জেঠু দিব্যি ওদের বাড়ির পাঁচিল তোলার সময় আমাদের বাড়ির খানিকটা জমিও জড়িয়ে নিল। মা বলতে গিয়ে কথা শুনে এসে বাবাকে বলল, “দ্যাখো কী করবে।”

বাবা গম্ভীর এবং উদার গলায় বলে দিয়েছিল, “থাক না, ওইটুকু জমি নিয়ে ওরা যদি খুশি থাকতে চায় থাকুক না। ঝামেলা না হলেই হল।”

মা-ও দিব্যি গজগজ করতে করতে রান্নাঘরে চলে গেছিল।

আমি কিন্তু এরকম না। নিজের হকের কোনও কিছু আমি ছাড়ি না। নেহাত বাবা ওরকম করল বলে, আমি হলে যতীন জেঠুর প্যান্ট হলুদ করে ছেড়ে দিতাম। ক্লাসে একবার এরকম একটা ঝামেলা হয়েছিল। নন্দিতা আমার একটা পেন দিব্যি তিনদিন আগে নিয়ে আর ফেরত দেয় না। শেষে চাইতেই হল। চাইতেই দেখি আকাশ থেকে পড়ল। আমি দেখিয়ে দিলাম ওকে ওই পেনে আমার নাম খোদাই করা আছে। একটা সাইট থেকে স্পেশাল নাম লেখানোর সিস্টেম দেখে অয়নদা কতগুলি পেন বানিয়ে আমাদের দিয়েছিল। দিদি আমি আরও কয়েকজন বন্ধুকে। আমার নামের পেন ঝেড়ে দেবে! তাও অয়নদার দেওয়া!!! ভাবতেই একদম শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছিলাম।

যাই হোক এবার কাজের কথায় আসি। দিব্যি আমরা খেয়ে-টেয়ে নিয়ে টিভির ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। টিভিতে সিরিয়াল চলছিল। বউদি গম্ভীর গলায় বাবাকে বলল, “টিভিটা বন্ধ হলে একটু খুশি হতাম। নইলে আমাদের সবার মনোযোগ ওই টিভির দিকে চলে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে।”

বাবা তাড়াতাড়ি রিমোটটা নিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিল। ঘরে থমথমে পরিবেশ। বউদি নাটকীয়ভাবে শুরু করল, “আপনারা জানেন দেশে আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি কী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে?”

বউদির কথা শুনে বাবা খুকখুক করে কেশে নিল। দাদা মোবাইল ঘাঁটছিল। বউদি দাদার মোবাইলটা কব্জা করল, “আমি যখন কথা বলব আমার কথা শুনতে হবে।”

দাদা ব্যাজার মুখে বউদির দিকে তাকাল। আমি এটা দেখে দিদিকে একটা চিমটি কাটলাম। প্রত্যুত্তরে দিদিও একটা কাটল। দিদিরটায় জোর অনেক বেশি ছিল। আমার বেশ লাগল। কিন্তু আমি আর রিপ্লাই দিলাম না। পরের জন্য তোলা থাকল। পরে সময় করে হিসেব মিটিয়ে নিলেই হল।

বউদির আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সির কথা শুনে বাবা কী বুঝল কে জানে, বলে বসল, “বউমা, তোমরা আধুনিক কালের মেয়ে। বাচ্চা নেবে না নেবে না সেটা তোমরাই ঠিক করো। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। ক-দিনই বা বাঁচব। তবে যাওয়ার আগে নাতি বা নাতনির মুখ দেখে যেতে পারলে খুশি হতাম, এই যা।”

বউদি অত্যন্ত বিরক্ত হল বাবার কথায়, “আহ, আমি আমার কথা বলিনি।”

বাবা হতভম্ব হয়ে বলল, “তাহলে কার কথা বলছ?”

মা কোনও কথা বলল না। চুপচাপ শুনে যাচ্ছে।

বউদি বলল “আমি রূপসী আর মিলির জন্য বলছি। একটা বাড়িতে মেয়েদের বেডরুমে একটা ছেলে দিব্যি ঢুকে পড়ছে, গল্প করছে, এটা কিন্তু আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি আনতে পারে।”

আমি খিলখিল করে হেসে দিলাম বউদির কথায়। বউদি রেগেমেগে বলল, “হাসির কী হল মিলি?”

আমি বললাম, “এমনি, একটা জোক মনে পড়ে গেল তাই।”

বউদি আরও রেগে গেল আমার কথায়। "এখানে কী মীরাক্কেল হচ্ছে না আমি কমেডি নাইটস উইথ কপিল করছি?"

দাদা বউদির কথা শুনে বলল, "আহ। তুমি যেটা বলার বলো। আমি যাই। আমার ঘুম পেয়েছে।"

বাবা বলল, "না না, বউমা বলো না। কোন ছেলের কথা বলছ?"

বউদি বিরক্ত গলায় বলল, "ওই যে সকালে যে ছেলেটা এসেছিল, কী নাম যেন রূপসী ওর?"

দিদি ভাবলেশহীন গলায় বলল, "অয়ন।"

বউদি নিজের হাতের তালুতে আর-একটা হাত দিয়ে একটা ঘুসি মারল, "ইয়েস, অয়ন।" এবার বাবা আর মা-র দিকে ফিরল, "ওই ছেলেটা যে ওদের বেডরুমে গিয়ে আড্ডা মারে আপনারা জানেন না?"

মা বলল, "হ্যাঁ, ও তো বন্ধু ওদের।"

বউদি রেগে গেল, "বন্ধু মানে? বন্ধু হলে বেডরুমে ঢুকে পড়বে? ইয়ার্কি নাকি এটা?"

বাবা অসহায়ের মতো বউদির দিকে চেয়ে বলল, "আচ্ছা বউমা, এরপরে অয়ন এলে বলব টিভির ঘরে গল্প করতে। ওদের বেডরুমে না।"

বউদি বাবার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "ডিসগাস্টিং।"

বলে গটগট করে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। বাবা দাদার দিকে তাকাল, "কী রে, বউমা রেগে গেল কেন?"

দাদা হেসে বলল, "ভাগ্যিস রেগেছে। নইলে রাতবিরেতে লেকচার শুনতে হত। যাও তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো। নইলে আবার এলে আবার উলটোপালটা বকে মাথা খারাপ করে দেবে।"

বাবা বোকা বোকা চোখে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকল।

১৪

সন্ধেবেলা সাধারণত বিভাসবাবু বেরোন না কিন্তু আজ বেরোলেন। বাড়িতে বউমা যতদিন আছে, ঠিক করেছেন রোজই বেরোবেন। এই মেয়েটিকে একটু ভয় পাওয়া শুরু করেছেন তিনি। ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলি বড়ো করে দেখে সেটা নিয়ে ঝামেলা পাকানোতে এই মেয়ে কম যায় না। তিনি জানতেন রূপমের তার ক্লাসের একটি মেয়ের সাথে বোঝাপড়া আছে। এই নিয়ে একবার বাড়িতে ঝামেলাও করেছিলেন। ছেলে প্রেম করবে কলেজ লাইফে, রক্ষণশীলতার কারণে মেনে নিতে পারেননি। একদিন ভীষণ বকেছিলেন রূপমকে। তারপর রূপম কয়েকদিন গুম মেরে ছিল। চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেল। ভেবেছিলেন কলেজে পড়লে প্রেম করলে হয়তো ছেলেটার রেজাল্ট খারাপ হবে। বকেছিলেন এইজন্যেই যে যা হবে তা খানিকটা যেন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে। পরে মেয়ের বাপের সঙ্গে কথা বলে বিয়ে দিয়ে দিলেই হল। মেয়েটা ভালোই। পরিবারও ভালো। মাঝে মাঝে খেজুরও করেছিলেন মেয়েটার বাবার সাথে। ওদের বাড়ি থেকেও ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ছেলে যে অতটা চাপ নিয়ে নেবে বোঝেননি।

বাপের বকা খেয়ে মেয়েটাকে একেবারে ভুলেই গেছিল। তারপর হঠাৎ ফেসবুকে শ্রাবন্তীর সাথে আলাপ। বাড়িতে ফোন করে বলল, "বিয়ে ঠিক করো।" সব কেমন তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। আজকাল মনে হয় ছেলেটা রাগের বশে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। এই বাড়ির জন্য এত হাইফাই মেয়ে দরকার ছিল না। এইসব মেয়েরা কলকাতার ফ্ল্যাটে থাকা মেয়ে। বাপ-মায়ের এক মেয়ে, নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে মানুষ। জীবনেও কারও সাথে কোনও কিছু শেয়ার করতে হয়নি, বুঝবেই না সবাইকে নিয়ে কীভাবে থাকতে হয়। বাড়িতে এলেই কেমন একটা থমথমে পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। তা ছাড়া মফস্সলে শহরের অনেক মেয়েরই মানিয়ে নিতে কষ্ট হয়। শ্রাবন্তী তো তার ওপরে গুরগাঁওতে থাকে। আরও নাকউঁচু হয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন। এতশত ভেবে একপ্রকার পালিয়েই বাজারের দিকে রওনা দিলেন তিনি।

নারানের মুদির দোকানে তাঁদের সমবয়সিদের একটা আড্ডা চলে। চায়ের জোগানও থাকে। বহুদিন সিগারেট ছেড়েছেন। ওখানে গেলে বাকিদের খেতে দেখলে উশখুশ হয় মনে। মাঝে মাঝে টেনেও নেন

ধোঁয়া। আজকে গিয়ে বসতে জমজমাট আলোচনার মধ্যে পড়লেন। সামনে ভোট। রতন চাকলাদার ফিনান্স স্পেশালিস্ট। পিএফ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেন প্রতিদিনই। প্রায় লাখ দেড়েক টাকা চিটফান্ডে রেখেছিলেন। মায়ের ভোগে যাবার পর প্রায়ই সরকারের নীতি নিয়ে সমালোচনা করেন। লেগ পুলিংও কম হয় না। ঘোতু সরখেল তো বলেই দিলেন, "তা তুমিই বাপু সস্তায় কিস্তিমাত করতে গেছিলে কেন? রিটায়ার্ড স্কুলমাস্টার। কেউ টাকা রাখে ওখানে? লোভ তো তোমার কম না যা দেখছি।"

রতন রেগে কাঁই হয়ে যান ঘোতুর কথায়, "ফালতু কথা বলবে না একদম, সব কি নিজের ইচ্ছায় চলা হয়? এখানে কে আছে যে নিজের ইচ্ছায় চলে? ছেলের বন্ধু বাপ্পা এসে ধরল, নতুন কোম্পানি দারুণ রিটার্ন, গিন্নির কাছে কাঁচুমাচু মুখ, বেকার ছেলে, একরকম গিন্নির কথাতেই পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলে রেখেছিলাম, সে আমি কী করে বুঝব সব টাকা নিয়ে কোম্পানিতে লাল আলো জ্বলে যাবে? শুরুতে তো কম টাকাই রেখেছিলাম। তারপরে যখন দেখলাম এমআইএসের টাকাটা ঠিকঠাক দিচ্ছে আর সুদ পোস্ট অফিসের থেকে ঢের বেশি, রাখলাম খানিক ওখানে। তাও কপাল ভালো দেড় লাখের ওপর দিয়ে গেছে। আমাদের এখানে অনেকের পুরো পিএফ-ই মায়ের ভোগে গেছে।"

পীযূষ ফুট কাটলেন, "কোম্পানি লাটে উঠল, কিন্তু একটা জিনিস দেখেছ, বাপ্পা কিন্তু ভালোই বাড়ি-টাড়ি করল। প্রথমে খুব কান্নাকাটি করল, বলেছিল সুইসাইড করবে, আমরাই তো ধরেবেঁধে আটকালাম। ক-দিন পরে দেখলাম ছেলে তিনতলা হাঁকিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারগুলি বেশ ফিশি যাই বলো।"

রতন বললেন, "ওরকম বোলো না। ছেলেটার ব্যবসাও আছে। ওখান থেকেই হয়তো।"

পীযূষ বললেন, "তা কী করে ব্যবসায় অত তাড়াতাড়ি আঙুল ফুলে কলাগাছ হল শুনি? কোন ব্যবসায় এত তাড়াতাড়ি রিটার্ন আসে? সেটা না, আসল কথাটা বলো।"

রতন অবাক হলেন, "কী আসল কথা?"

পীযূষ মিচকি হাসি দিয়ে বললেন, "শাসক দলের লোক, কিছু বললে পাছে রাতবিরেতে তোমার ধুতি ধরে টান মারে, হে হে, মানে ভয়েই স্রেফ চুপচাপ মেনে নিলে সবটা"...

রতন এবার রেগে গেলেন, "ফালতু কথা বোলো না। নকশাল আমল কাটিয়ে আসা পাবলিক বুঝলে হে? ভয় পেতে যাব কেন?"

পীযূষ বললেন, "সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। তোমার সেই চওড়া ছাতিতে এখন পেসমেকার। ছেলে বাইরে থাকে। বুড়ো বুড়ি একা থাকো মেয়ের বিয়ে দিয়ে। কিছু কি আর বুঝি না?"

লেগে গেল দুই বুড়োয়। বিভাসবাবু এদের দেখে হাসছিলেন, মনটা খানিকটা ভালো হল। একটু আগেও কেমন মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে এখানে এসে বসতে হবে।

১৫

"আমরা ফিরছি কবে যেন?" ভারী গলায় রূপমকে প্রশ্ন করল শ্রাবন্তী। রূপম বুঝতে পারল ঝড় আসার চান্স আছে একটা। সে সাবধানে ডিফেন্স করল, "শনিবার। কেন বলো তো?"

শ্রাবন্তী বিরক্তি প্রকাশ করল, "এখনও চারদিন। উফ! কী এমন রাজকার্য এখানে আছে তোমার বলো তো?"

রূপম মোবাইলে মেইল চেক করছিল। অফিসের কলিগদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রচুর মেসেজ এসছে। নোটিফিকেশন ভরে গেছে। সেসবের দিকে মন দেওয়ায় শ্রাবন্তীর প্রশ্নটা ঠিকঠাক শুনতে পেল না, বলল, "কী? কিছু বললে?"

শ্রাবন্তী তার হাতের মোবাইলটা কেড়ে নিল, "আমার সাথে কথা বলার সময় মোবাইল ঘাঁটবে না বলেছি না? আগে আমাকে উত্তর দাও।"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে, বলো কী প্রশ্ন আছে।"

শ্রাবন্তী বলল, "আমরা দু-দিন আগে তো এখান থেকে যেতে পারি! বাবার জন্য মনখারাপ করছে আমার।"

রূপম জানত এই কথাটা শ্রাবন্তী যে-কোনও সময় বলবে, প্রশ্নের উত্তর তৈরি করাই ছিল তার, "দু-মাস আগেই তো গেছিলে। এবার একটা কাজ করো না, তুমি কাল বরং চলে যাও। আমি গাড়ি ঠিক করে দিচ্ছি।"

শ্রাবন্তী তার দিকে আগুনে দৃষ্টিতে তাকাল। রূপম অবাক হবার ভঙ্গি করল, "কোনও সমস্যা?"

শ্রাবন্তী বলল, "তোমার আমাদের বাড়ি যেতে কী সমস্যা সেটা আগে বলো!!!"

রূপম ঠান্ডা গলায় বলল, "তুমি তার আগে বলো আমাদের বাড়িতে থাকতেই বা তোমার কী সমস্যা?"

শ্রাবন্তী চিরুনিটা ছুঁড়ে মারল মেঝেয়, "যা ইচ্ছা করো, আমি জানি না কিছু।"

রূপম হাত বাড়াল, "মোবাইলটা।"

শ্রাবন্তী রূপমের দিকে ছুঁড়ে দিল তার দিকে মোবাইল। বলল, "এই নাও। শুরু করো খুটখুট।"

রূপম কিচ্ছু বলল না উত্তরে। হোয়াটসঅ্যাপ খুলে আবার বন্ধুদের মেসেজ দেখা শুরু করল। কেউ রাজনীতি সংক্রান্ত ছবি পাঠিয়েছে, কেউ পর্ন পাঠিয়েছে, মনে মনে হাসল রূপম। পর্নের চাহিদা মনে হয় তাদের চিতায় ওঠার আগে অবধি থাকবে। সবাই বিবাহিত এই গ্রুপে, কিন্তু ভালো পর্ন পেলেই কেউ না কেউ গ্রুপে দিয়ে দেবে।

রূপম যখন ঠান্ডা হয়ে যায় শ্রাবন্তী সেই সময়টা রূপমকে একটু ভয়ই করে। যদিও সেটা বাইরে দেখায় না। বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে বলল, "তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।"

রূপম মোবাইলের দিকে চোখ রেখেই বলল, "আবার?"

শ্রাবন্তী থমথমে গলায় বলল, "ডেট মিস হয়েছে।"

রূপম অবাক হল, "মানে? কীসের ডেট? কিছুই বুঝলাম না। কী বলতে চাইছ?"

শ্রাবন্তী বলল, "তুমি কিছুই বুঝবে না! ডেট মানে পিরিয়ডের ডেট মিস হয়েছে। নট শিয়োর আই অ্যাম প্রেগনেন্ট অর নট।"

রূপম হাঁ করে শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "তাহলে কীভাবে শিয়োর হবে?"

শ্রাবন্তী বলল, "ওইজন্যই তো বাড়ি যেতে চাইছি। ওখানে ডক্টর আন্টিকে একবার দেখাই।"

রূপমের মাথাটা ঘুরে গেল খানিকটা। প্রেগন্যান্ট মানে বাচ্চা হবে? মানে সে বাবা হবে? এই মুহূর্তে তার যা পরিস্থিতি তাতে এতে খুশি হবে না দুঃখ পাবে ঠিক বুঝতে পারছিল না সে।

কী করবে সিদ্ধান্ত নিতেও পারছিল না। বলল, "তাহলে কালকে কলকাতা চলো। তোমাকে দিয়ে আসি।"

শ্রাবন্তী এগিয়ে এসে তার হাত ধরল, "তুমি থাকো। আমি টেন্সড।"

রূপম বলল, "বেশ। থাকব। বাচ্চা হলে খারাপ না, তাই না?"

শ্রাবন্তী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ইটস টু আর্লি। আর-একটু সময় পেলে ভালো হত। কিছুই তো এনজয় করতে পারলাম না! ভালো করে হানিমুনে পর্যন্ত যাওয়া হল না।"

রূপম বলল, "ঠিক আছে, এখন নিশ্চয় হাতে সময় আছে। তুমি কালকে বাড়ি যাও। ডাক্তার আন্টির সাথে ব্যাপারটা ডিসকাস করো। যা যা টেস্ট লাগে সেগুলি করো। তারপর ডিসিশন নিয়ো।"

শ্রাবন্তী বলল, "আচ্ছা। কিন্তু ওই ছেলেটা যেন ওদের ঘরে না ঢোকে আমরা না থাকলে, এটা সবাইকে বলে দিয়ো।"

রূপম এবার বিরক্ত হল। মেয়েটার মনে হয় সিডি কাটা রোগ আছে। একবার সিডি কেটে গেলে একটা কথাই বারবার বলে যায়!!!

কচি মেয়ে হল না এবারে। নারানের তাই সাধ মিটল না। প্রায় সাত মাস হয়ে গেছিল কিছু হচ্ছিল না। শেষমেষ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। একটা মেয়ে ছিলই। রোজ অফিস থেকে ফিরে ইটভাঁটার ওখান দিয়ে শর্টকাট করত। একে নারান খারাপ সময়ের জন্য ছাড় দিয়ে রাখত। এবার আর কাউকে না পেয়ে একেই টার্গেট করেছিল।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একটা স্তূপের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। হাতে হাতুড়ি ছিল। মেয়েটা যখন যাচ্ছিল নারান প্রথমে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল। তারপরে মেয়েটা চেঁচাতে যেতেই নারান আগে হাতুড়ি দিয়ে সবেগে মেয়েটার মুখে আঘাত করল। দরদর করে রক্ত গড়ানো শুরু করল মুখ দিয়ে। চ্যাঁচানোটাও স্তিমিত হয়ে এল ধীরে ধীরে।

তারপরে নারান আর বেশি চাপ নিল না। বডিটা তুলে এক কোনায় নিয়ে গিয়ে বিবস্ত্র করে যা করার করে নিল। মেয়েটা বাধা দিল না, বা বাধা দেবার মতো জায়গায় ছিল না। ব্যাগ-ট্যাগগুলি কোনওকালেই নারান হাত দেয় না, এবারেও দিল না। তাকে দেখে মেয়েটা চিনতে পেরেছিল। সে যখন মেয়েটার শরীরের ওপর উঠেছিল মেয়েটা অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। ব্যথাবেদনা ভুলে যাচ্ছিল সম্ভবত। এই সময়টাই নারানকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয়। এক অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি লাভ করে সে প্রত্যেকবার। আতঙ্কের থেকেও অবিশ্বাস ভর করে আসে বেশি করে মেয়েগুলির। তাকে সবাই চেনে। বাজারে কিছু না কিছু প্রয়োজনে সবাই আসে তার দোকানে। মধ্যবয়স্ক পরিচিত মুখটা যখন এরকম পাশবিক কাজকর্ম করে তখন স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসটাই আতঙ্ককে ছাপিয়ে যায়। সবকিছু হয়ে যাবার পর মেয়েটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। নারান একগাদা নুড়িপাথর মেয়েটার যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা আর-একবার আর্তনাদ করাতে হাতুড়ি দিয়ে ওর মুখে আবার আঘাত করল সে। তারপরে গোটা শরীরটাকেই আঘাত করে যেতে থাকল। শরীরটা অনেক আগেই নিথর হয়ে গেছিল, কিন্তু তাতে নারানের ভ্রূক্ষেপ হচ্ছিল না। হাতে নাকে মুখে রক্ত ছিটকে এসে লাগছিল তার। এক পাশবিক উল্লাসে শরীরটাকে থেঁতলে যেতে লাগল। প্রায় আধঘণ্টা পরে শান্ত হল সে।

ইটভাঁটার পাশেই একটা পুকুর। মফস্বলের এক কোনায় হওয়ায় একরকম পরিত্যক্তই থাকে। সেখানে স্নান সেরে নিয়ে নারান স্তূপের পাশে রাখা কিটব্যাগটা খুলে গামছা বের করল। ভালো করে গা-হাত-পা মুছে জামাকাপড় চেঞ্জ করে নিল। প্রথমে সে এই জামাকাপড় পরেই বেরিয়েছিল। এখানে এসে বারমুডা আর একটা টি-শার্ট পরে অপেক্ষা করছিল। বারমুডা আর টি-শার্টটা স্নান করার পরে ভেজা ছিল। দুটো থেকে ভালো করে জল নিংড়ে নিয়ে একটা বড়ো প্লাস্টিক বের করে কিটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। জামাকাপড় পরে বেরোতে যাবে এমন সময় একটা বড়ো সাপ হেলতে দুলতে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। নারান সাপে ভয় পায় না। অবশ্য এই সাপটা বিষধর নয়। সে সাপ চেনে ভালোমতন। তার আরও একটা গুণ আছে। সে অন্ধকারেও সমান ক্ষিপ্র। কিন্তু এই গুণগুলি তার বউও জানে না। কাউকে বলার প্রয়োজনীয়তা সে কোনওকালেই বোধ করেনি। সে জানে নিজের গোপন অস্ত্র যত গোপন থাকে ততই ভালো। ব্যাগ থেকে আয়নাটা বের করে নিজেকে ভালো করে একবার দেখে নিল সে। শেষবারের মতো লাশটাকে দেখে ধীরেসুস্থে বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

বাড়িতে বলে এসেছিল কলকাতা যাবার আছে। সে আর বউ আলাদা শোয়। বউয়ের শুচিবাই আছে। তার ঘরে প্রবেশ করে না। সদর দরজা খোলাই থাকে তাদের বাড়ির। বউ আর সে ছাড়া বাড়িতে কেউ থাকে না। এই সময়েই সে কলকাতা থেকে আসে বলে দরজা খোলা রেখেই দুপুরে ঘুমোয় বউ। নারান চিন্তা করে না। তাদের এলাকায় চুরি কম হয়। আর তাদের পাড়ায় তো একেবারেই হয় না।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিল সে। কিটব্যাগটা খাটের তলায় রাখল। আয়নার সামনে দাঁড়াল একবার। কানের নিচে সামান্য রক্ত লেগে আছে। একবার চট করে চিন্তা করে নিল রাস্তায় আসার সময় কার কার সাথে দেখা হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখল সেরকম কেউই না, বরং সন্ধে ঝুপ করে নামার ফলে যদি কেউ তাকে দেখেও থাকে রক্তটা লক্ষ করার কথা না।

আর-একবার স্নান করতে ঢুকল সে। অনেকদিন পর মনটা খুশি লাগছিল। মনের আনন্দে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দিল বাথরুমে।

১৭

সকাল সাতটাতেই গাড়ি বলে রেখেছিল রূপম। প্রথমে ঠিক ছিল শ্রাবন্তী একাই চলে যাবে। পরে ঠিক করল দিয়ে আসবে ওকে। একা একা অজানা ড্রাইভারের হাতে পাঠানো ঠিক হবে না। এমনিতে ভোরে ওঠা অভ্যাস নেই তার, কিন্তু গতকাল রাতেই রূপসীকে বলা ছিল, তারা না উঠলে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারতে। মিলি আর রূপসী ভোর হতেই প্রবল উৎসাহে দরজায় ধাক্কা মারা শুরু করে দিল।

শ্রাবন্তী ঘুমঘোরেই তাকে বলল, "ওদের বলো তো বিরক্ত না করতে, আর-একটু ঘুমিয়ে নি, ক-টা আর বাজে।"

রূপমের ঘুম ভেঙে গেছিল। সে উঠে দরজা খুলে দিল, মিলি সামনে ছিল, ঝাড়বে ভেবেও কিছু বলল না। মনে পড়ল তার কথাতেই তো ওরা এটা করছিল। মিলি বলল, "দাদা ছ-টা বাজে। বউদিকে তুলে দে।"

রূপম বেসিনের দিকে মুখ ধোবার জন্য যেতে যেতে বলল, "দাঁড়া তো। ঠিক তুলে দেব।" রান্নাঘরের দিকে চোখ পড়তে খানিকটা লজ্জিত হল সে। মা সকাল থেকে উঠেই রান্না শুরু করে দিয়েছে। তারা ব্রেকফাস্ট খেয়ে কলকাতা যাবে তারই তোড়জোড় চলছে। সে একটু রাগল, "মা তোমার সকালে ওঠার কী দরকার ছিল বলো তো? আমরা তো রাস্তাতেই খেয়ে নিতে পারতাম।"

মা হাসল, "রাস্তার খাবার খেয়ে আর পেটখারাপ করার দরকার নেই। ওখানে তো বাইরের খাবারই খাস। বাড়িতে যখন এসেছিস তখন বাড়ির খাবার খা। আর কষ্টর কী আছে? তোর বাবার যখন অফিস থাকত ক-টায় উঠতাম ভুলে গেলি?"

রূপম আর কিছু বলল না। মাকে বলে লাভ নেই। মা কিছুতেই বুঝবে না। যত কষ্টই হোক, ঠিক সকালে উঠে রান্না করতে বসবেই। সে দাঁত মেজে দাড়ি কাটতে শুরু করল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা আজকাল নতুন না, কিন্তু একমুখ দাড়ি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা একটু কেমন যেন লাগে। মিলি পড়তে গেল, সকালে ওর নাকি পড়া আছে। শ্রাবন্তী উঠে বাইরে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল।

রূপম বুঝতে পারছিল না আজকে কী করবে। শ্রাবন্তীকে দিয়ে আসাটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পর্যায়ে চলে যাবে। একটা সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার আছে। শ্রাবন্তী অনেকদিন থেকেই বলছিল এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা ও কিছুতেই চায় না। অ্যাক্সিডেন্টালি সেটা হয়ে যাওয়ায় এখন একটা সিদ্ধান্ত তো নিতেই হবে। রূপম দাড়ি কাটতে কাটতে আড়চোখে শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। সকালে এত কিছু মাথাতে রাখেনি ও। দিব্যি মা-র সাথে কথা বলা শুরু করেছে।

বেল বাজল। মা অবাক হয়ে বলল, "এত সকালে আবার কে এল? মিলির কি পড়া হল না নাকি? এই রূপসী।"

রূপসী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দরজা খুলতে ছুটল। কয়েক সেকেন্ড পরেই এসে বলল, "দাদা, তোকে বাপ্পাদা ডাকছে, দেখ তো কী ব্যাপার।"

রূপম অবাক হল, "এত সকালে বাপ্পা? ওকে আসতে বল না!"

রূপসী বলল, "না না, কেমন একটা লাগছে ওর মুখ দেখে। তুই দেখ শিগগির।"

রূপসীর কথা শুনে শ্রাবন্তী বলল, "বাপ্পা কে?"

মা বলল, "পাড়ার ছেলে। রূপমের বন্ধু।"

রূপমের প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল দাড়ি কাটা। সে মুখে জল দিয়ে বাইরে বেরোল। বাপ্পার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে সবকিছু শুষে নিয়েছে। অবাক হয়ে সে বলল, "কী রে! এত সকালে? কিছু হয়েছে নাকি?"

বাপ্পা বলল, “বাইরে আয়।”

রূপম বাইরে বেরোল। বাপ্পা কাঁপছিল। রূপম বুঝতে পারল না কী এমন হয়েছে বাপ্পা এরকম করছে। সে আবারও জিজ্ঞেস করল, “আরে এত ভয় পেয়েছিস কেন? কেউ মার-টার দিয়েছে নাকি?”

বাপ্পা বলল, “মোমকে রেপ করে কে ফেলে দিয়ে গেছে ইটভাঁটার ওখানে। গোটা বডিতে অসংখ্য আঘাতের দাগ। লাশটা সকালে দেখেছে ওই পালপাড়ার কে একজন।”

রূপম বুঝতে পারল না কী বলবে। তার মনে হচ্ছিল পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। সে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল। বাপ্পাও বসল। বলল, “আমার কিছু মাথায় আসছে না রে কী করব। আমি একদম ব্ল্যাংক হয়ে গেছি।”

শ্রাবন্তী কৌতূহলবশত বাইরে চলে এসেছিল। তাদের দুজনকে রাস্তার ওপরে বসে থাকতে দেখে অবাক হল, বলল, “কী হল? ওখানে এরকম বসে আছ কেন?”

রূপম উত্তর দিল না। তার মাথা কাজ করছিল না। বাপ্পা উঠে দাঁড়াল। শ্রাবন্তীর কাছে গিয়ে বলল, “আমাদের এক ছোটোবেলার বন্ধু মারা গেছে বউদি। তাই আমরা একটু আপসেট হয়ে গেছি।”

শ্রাবন্তী তার দিকে এগিয়ে গেল, “এই ঘরে এসে বসো। চলো ঘরে চলো।”

রূপমের মাথা হঠাৎ ভীষণ গরম হয়ে গেল। চেঁচিয়ে উঠল, “চোপ। একদম চোপ। যাও ঘরে যাও।”

রূপম এত জোরে চ্যাঁচাল শ্রাবন্তী কেঁপে উঠল। রাস্তার মাঝখানে লোকজনের সামনে রূপমের এই ব্যবহারে অপমানিত হয়ে সে রেগেমেগে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। রূপম সেদিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। রূপসী বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে দাদার চিৎকার শুনে। বউদিকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দেখে সে শ্রাবন্তীকে সামলাতে ছুটল। বাপ্পা কিছুটা ধাতস্থ হয়েছিল। বলল, “বউদিকে এভাবে বলাটা তোর ঠিক হল না রে।”

রূপম রাস্তার ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। মোম!!!

শেষে মোম!!!

১৮

সাফল্য পাওয়াটা জীবনে খুব কঠিন। এককালে পাস কোর্সে সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট হয়েও নারানকে শেষমেষ মুদিখানার দোকান দিতে হয়। আজকাল নিজেও ভুলে গেছে যে সেই সময়টা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চাকরি না পাওয়ার হতাশায় কেটে গেছে।

আর আজকাল তো হতাশা জিনিসটাই তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবথেকে আনন্দ হয় ঘটনাটা ঘটার পরের দিন। কোনও খেলা জেতার পরে সমর্থকরা যে আগ্রহ নিয়ে পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার অপেক্ষা করে, তারও সেরকম হয় ঘটনা ঘটার পরের দিন। যখন তারই দোকানে বসে বুড়োগুলো দেশের আইনশৃঙ্খলাকে গালিগালাজ শুরু করে। উত্তেজনা প্রথম দু-তিনদিন শিখরে থাকে বুড়োগুলোর। নারানের সেই দিনগুলি দারুণ কাটে। সে চুপচাপ ভালোমানুষের মতো মুখ করে বুড়োগুলোর বাতেলা শোনে। কেউ কেউ আবার রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে। কী করে কী করে ব্যাপারটা হয়েছিল। নারান বুঝতে পারে অবচেতনে এই লোকগুলিও আসলে তার মতোই ধর্ষক।

সকালেই এলাকা সরগরম হয়ে গেছিল। দোকানের ছেলেটা সকাল আটটায় দোকান খোলে। সে রোজ ন-টায় দোকানে পৌঁছোয়। খুব শরীর খারাপ না করলে এই সময়ের নড়চড় হয় না। “কাণ্ড” ঘটানোর পরের দিন উত্তেজনা একটু বেশি থাকে কোন লোক কী কী বলল সেটা শোনার জন্য। সেদিনগুলিও একদম ন-টাতেই পৌঁছোয় অন্যদিনের মতো। কোনও সময়ের আগুপিছু করে না। ধীরেসুস্থে দোকানে গিয়ে লক্ষ্মী আর গণেশকে পুজো চড়িয়ে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে বসে পড়ে নিজের জায়গায়। পুজোটা নারান মন দিয়েই করে। মাঝে

মাঝেই তীর্থ করে আসে। যেটুকু পাপ হয়, তা তো গঙ্গাস্নানেই ধুয়ে মুছে যায়। নিজের কাছে তাই তার কোনও পাপবোধ নেই।

বাজারে এইচআইভি কথাটা আজকাল খুব শোনা যায়। কন্ডোম ব্যবহারের কথা বারবার বলে। তার আবার কন্ডোমে একেবারেই আসক্তি নেই। তার মতে রসগোল্লা তো আর প্লাস্টিকে জড়িয়ে খাওয়া যায় না। এই জিনিসও তাই। সে কুমারী মেয়েদের টার্গেট করে যাতে এইচআইভির কোনওরকম রিস্ক না থাকে।

সকালে দোকানে পৌঁছে পুজো চড়াতেই ছেলেটার উত্তেজিত কণ্ঠে রিপোর্টটা পেয়ে গেল সে। কে বা কারা আবার রেপ করে ইটভাঁটার ওখানে একটা মেয়েকে খুন করে রেখে গেছে। এলাকায় আগামী কাল বন্ধ ডাকা হয়েছে বিরোধী পার্টির পক্ষ থেকে। মন্ত্রী, পুলিশমহলের মাথারা সবাই তাদের এলাকায় আসছে আজ। একজন অবিবাহিতা স্কুলশিক্ষিকাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা কেউ মেনে নিতে পারছে না। বিরোধী দল থানা ঘেরাও করে রেখেছে সকাল থেকেই। এলাকা এক্কেবারে থমথমে। যে-কোনও সময় বড়ো ঝামেলা বেঁধে যেতে পারে।

নারান চুপচাপ বসে সব শুনে কয়েকবার সহানুভূতিসুলভ শব্দ করল। দোকানে খদ্দের আসা শুরু হয়ে গেছে। দোকানের সামনের বেঞ্চিতে কয়েকজন এসে বসে তুমুল তর্ক শুরু করেছে। নারান কান খাড়া করল। বিভিন্নরকম মন্তব্য ভেসে আসছে -

“এ তো আচ্ছা সমস্যা শুরু হয়েছে মশাই। রাস্তাঘাটে মেয়েদের বেরোনো চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।”

“সরকার কী করছে বলুন তো দাদা? চুরি পরে বসে আছে?”

“এটা বিরোধী দলের লোকও তো করতে পারে দাদা। ইচ্ছা করে এমন করা যাতে সবাই সরকারকে দোষ দিতে পারে।”

কয়েকজন আবার অতি উৎসাহে লাশ দেখতে যাবে বলল। নারান মুখ ব্যাঁকাল। যাক। সবাই দেখে আসুক। সে লাশ দেখতে যায় না। লাশ দেখতে গিয়ে যদি চোখে পড়ে কোনও ক্লু ফেলে এসেছে সেটা টেনশনকে বাড়িয়ে দেয়। পুলিশ না বুঝলেও সে তো বুঝতে পারবে ক্লু ফেলে এসেছে। তারপর রাতের ঘুমের দফারফা হয়ে যাবে খামোখা। পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে অনেকে যেমন বাড়ি ফিরে আর উত্তর মেলাতে বসে না পাছে কোনও ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে সেটা টেনশন বাড়িয়ে দেয়, নারান একেবারে সেই গোত্রে পড়ে।

দোকানের ছেলেটা একটু পরে এসে খবর দিল, থানা ঘেরাওয়ে বিরাট লাঠিচার্জ হয়েছে। পুলিশকে ইট মারায় পুলিশও প্রবলভাবে পিটিয়ে দিয়েছে বিরোধী দলের লোকেদের। তিন-চারজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি করতে হয়েছে। ওসির মাথা ইট লেগে ফেটে গেছে। সব মিডিয়া এসে গেছে।

নারান নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াচ্ছিল মনে মনে। তার জন্য এত বড়ো ব্যাপার হয়ে গেছে, এটাই তো প্রমাণ করে সে একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক। মোটেও ফেলনা নয়।

খানিকক্ষণ বাদে বিকেলের বুড়োদের দলের কয়েকজন এল। প্রত্যেকের মুখই থমথমে। এর আগের বেশিরভাগ কেসগুলোই একটু গরিব মানুষের বাড়ির কেস করে আসছিল নারান। এবার একেবারে স্কুলটিচার শিকার করেছে, স্বাভাবিকভাবেই লোকের ক্লাস-কনশাসনেস চাগাড় দিয়ে উঠেছে। এবার তাদের ঘরেও হাত পড়ে গেছে ধরে নিয়ে সবাইকেই বেশ মুষড়ে পড়া দেখাচ্ছিল।

মেয়েটার শরীরটার কথা আর-একবার মনে করে নিল নারান চোখ বন্ধ করে। শরীরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। প্রতিটা অজানা শরীর একটা নতুন না-পড়া বইয়ের মতো। প্রত্যেকটায় আলাদা আলাদা মজা। সবকিছু হয়ে যাবার পর ক্ষতবিক্ষত শরীরটার স্মৃতি তার ছুঁচিবাইগ্রস্ত বউয়ের শরীর থেকে দূরে থাকা অতৃপ্ত শরীরটাকে তৃপ্ত করে।

পরের টার্গেট ঠিক করার কাজে লেগে যেতে হবে। চোখটা লোভে জ্বলজ্বল করে উঠল নারানের।

অফিসার-ইন-চার্জ মাইতিবাবুর মাথা সকাল থেকেই খারাপ হয়ে আছে। আজ যাবার কথা ছিল কলকাতায়, বড়ো শালির মেয়ের বিয়ে, তিনদিনের ছুটি নিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে স্টেশন লিভ করতে যাবেন এমন সময় এসপি-র ফোন এসে গেল। ধরব না ধরব না করেও ফোনটা ধরতে হল। আর ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড বকাঝকার শব্দ, "কী হচ্ছে বলুন তো মাইতি? দিনের পর দিন আপনার এলাকায় রেপ, মার্ডার হচ্ছে আর আপনি কী করছেন?"

মাইতিবাবু আমতা আমতা করতে লাগলেন, "না মানে কই সে তো অনেকদিন হয়ে গেল..."

ওপাশ থেকে রাগে ফেটে পড়লেন বড়োসাহেব, "আপনি কিচ্ছু জানেন না। অথচ আমাকে মিনিস্টার সাহেব সকাল থেকে ফোনে মাথা খেয়ে নিচ্ছেন। একজন স্কুলমিস্ট্রেস কাল ওখানে রেপড হয়ে মার্ডার হয়েছেন। আপনি শোনেননি?"

মাইতিবাবুর অজান্তেই মাথায় হাত চলে গেল। বরবাদ হয়ে গেল বিয়েবাড়ি খাওয়া। এবার শোনেননি বললে তো আরও কেস, তাই ম্যানেজ করার চেষ্টা করলেন, "হ্যাঁ স্যার। আসলে আজকে স্টেশন লিভ করছি তো, তাই মণ্ডলকে চার্জ হ্যান্ডওভার করে যাচ্ছিলাম আর কি।"

ওপাশ থেকে ধমক ভেসে এল, "সব যাওয়া ক্যান্সেল করুন। মিনিস্টার আসবেন ওখানে। ফুল ফোর্স যেন থাকে। এক্ষুনি স্পটে যান। বিরোধী দল যদি থানা ঘেরাও করে একদম বরদাস্ত করবেন না। কড়া নির্দেশ আছে। ভোটের সময় কেউ যেন আপার হ্যান্ড নিতে না পারে। মনে রাখবেন।"

ফোনটা কেটে দিলেন বড়োসাহেব। মাইতিবাবু গিন্নির দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। বললেন, "তোমরা যাও। দেখি যদি ম্যানেজ করে রাতে যেতে পারি।"

গিন্নি কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা দাও। আমি কিনে নিচ্ছি সোনার কিছু একটা কলকাতা থেকে।"

মাইতিবাবু করুণ চোখে গিন্নির দিকে তাকিয়ে এটিএম কার্ডটা দিয়ে দিলেন। বললেন, "এটা রাখো।"

গিন্নি ছেলেকে নিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণ্ডলকে ফোন করলেন, "কী হল মণ্ডল! আবার মার্ডার? কোথায় যেতে হবে?"

মণ্ডল অবাক হল, "সে কী স্যার, আপনি কলকাতায় যাননি?"

মাইতি উদ্গত খিস্তিটাকে কোনওমতে সামলে বললেন, "আর যাওয়া। সকাল সকাল এসপি সাহেব ফোন করে বললেন মিনিস্টার আসবেন। আর শোনো, থানা ঘেরাও-টেরাও হলে পাতি লাঠিচার্জ করে উঠিয়ে দিতে বলেছে।"

মণ্ডল বলল, "অলরেডি ঘেরাও শুরু হয়ে গেছে স্যার। তবে শান্তিপূর্ণ। লাঠিচার্জ করলে বরং সমস্যা বেশি।"

মাইতি এবার রেগে গেলেন প্রচণ্ড, "আমি ওসব জানি না। উপরমহলের যখন অর্ডার আছে, তোমাকে কে চিন্তা করতে বলেছে হে ছোকরা? মেরে ফাটিয়ে দাও। আর বডি কোথায়?"

মণ্ডল বলল, "স্যার পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে গেছে।"

মাইতির রাগ কমছিল না, "তুমি একবার তো আমায় ইনফর্ম করতে পারতে! জানো কী অপদস্থটাই না আমায় হতে হল। একে বিয়েবাড়ি যাওয়া হল না। এ নিয়ে গিন্নির অশান্তি নিতে হবে, তারপরে তোমার ওই। যাই হোক, পোস্টমর্টেম হয়ে গেলে বডি ছেড়ে দিয়ো। মেয়েটার বাড়ির লোকজন?"

মণ্ডল বলল, "স্যার যা শুনলাম মেয়েটার মা ওর দাদার কাছে থাকে। এখানে থাকে না। বাড়িতে মেয়েটা একাই থাকত।"

মাইতি অবাক হলেন, "একা থাকত? তা তারা খবর পেয়েছে? আসবে কবে? ততদিন কি মর্গে ফেলে রেখে দেব নাকি? এই কথাগুলি ঠিক করেছ কিছু?"

মণ্ডল আমতা আমতা করতে লাগলেন, "মানে স্যার, সকাল থেকে যা যাচ্ছে, তাতে এত কিছু তো ভাবিনি। আচ্ছা আপনি থানায় আসুন, এখানে বরং সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

অফিস কোয়ার্টার থেকে থানা মিনিট পনেরোর হাঁটাপথ। মাইতিবাবু ইউনিফর্ম পরে থানার দিকে এগোতেই দেখতে পেলেন জটলা। বেশ ভালো লোক জড়ো হয়ে গেছে। সব বিরোধী দল না, দেখে যা মনে হচ্ছে। সাধারণ পাবলিকও আছে। তিনি বিরোধী দলনেতাকে দেখে তাঁর দিকেই এগিয়ে গেলেন। পরিতোষ বসু। এলাকায় আগে এমএলএ ছিলেন, তাঁকে দেখে ভিড়ের বাকিরা জোরে জোরে স্লোগান দিতে থাকল। "অপদার্থ পুলিশ" ইত্যাদি কথা আজ আর তাঁর রক্ত গরম করে না। অনেক শুনেছেন মাইতিবাবু। আগে যখন এরা ক্ষমতায় থাকত তখন এখনকার শাসক দলের লোকেদের কাছেও শুনতেন কথাগুলি।

পরিতোষবাবুকে বললেন, "স্যার এলাকা খালি করে দিন। আমাদের কাছে লাঠিচার্জের অর্ডার আছে।"

পরিতোষবাবু পুরোনো ঘুঘু। তাঁর কথা শুনে বুঝে গেলেন অনেকদিন পরে হিরো হবার চান্স এসেছে। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "সে আপনারা যা করার করতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।"

মাইতি আর কথা বাড়ালেন না। ফোর্স জড়ো করা শুরু করে দিলেন থানার সামনে। এমনি সময়ে একটা ইট এসে কনস্টেবল অমল নস্করের পায়ে এসে লাগল। কিছু করার থাকল না। সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, হয়েও গেল। সবকিছু যখন শেষ হল দেখা গেল মাইতিবাবুর কখন মাথা ফেটে গেছে।

হাসপাতালে ব্যান্ডেজ করার সময়েই খবর এল মিনিস্টার আসছেন। এসপি-ও। মাইতিবাবু মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ভাবতে লাগলেন আজকে ঠিক কার মুখ দেখে উঠেছিলেন!

২০

মিলি

আমি মাঝে মাঝে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। দিদি জানে ব্যাপারটা। মাকে বলতে বারণ করেছি। ভীষণ অস্বস্তি হয় স্বপ্নটা দেখলে। সেটা হল আমি রাস্তায় বেরিয়েছি। রাস্তায় লোকজন ভর্তি। আর একটা সময় দেখছি সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। এই সময় আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা হিম স্রোত বয়ে যায়। কারণ এই সময়টা আমি আবিষ্কার করি আমার পরনে একটা সুতোও নেই। বাজারের সবাই আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। তারপর একে একে সবাই আমার দিকে এগোচ্ছে। এই সময়টা আমি দৌড়োতে চেষ্টা করি কিন্তু দৌড়োতে পারি না। যেদিকেই যাওয়ার চেষ্টা করি, পা সরে না। এদিকে সবাই এগিয়ে আসে। এই সময় চেঁচাই আমি। চেঁচিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। গলা শুকিয়ে আসে। দিদি প্রথম প্রথম ভয় পেত। আজকাল মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

যেদিন থেকে আমাদের এখানে এরকম রেপ শুরু হয়েছে, যেদিন প্রথম জানতে পেরেছিলাম, আমি তখন টিউশনে ছিলাম। সবাই দেখতে যাবে বলল, ওদের সাথে আমিও চলে গেলাম। আর ওটাই হয়েছিল আমার ভুল। পুলিশ তখন ল্যাংটো শরীরটার গায়ে বাড়ির লোককে কাপড় পরাতে বলছে। আমি তৎক্ষণাৎ ওটা দেখেই বমি করে দি। বাড়ি এসে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। সারাক্ষণ মনে হত এই বোধহয় কেউ আমাকে রেপ করতে আসছে। দিদি ভীষণ বকেছিল ওখানে গেছিলাম বলে। আসলে অত ভেবে যাইনি আমি। তারপর ছ-সাত মাস অন্তর যতবার এই ঘটনাটা আমাদের এলাকাতে হয়েছে, তারপর আমি এই দুঃস্বপ্নটা দেখতে শুরু করি। আর-একটা স্বপ্ন দেখি, অঙ্ক পরীক্ষায় বসেছি, আর কিচ্ছু পারছি না। কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নটা এতটা ভয়ংকর না, যতটা এটা।

আজকে সকালটা যে এরকম দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে তা ভাবতে পারিনি। দাদার যাবার কথা ছিল কলকাতায়। আর আজকেই সেই ভয়ংকর খবরটা এল। আমি তো এত কিছু জানতামই না। পড়তে গেছি। সবে স্যার নোটস দেওয়া শুরু করেছেন আর তখনই স্যারের মোবাইলে আমার বাড়ি থেকে ফোন এল। আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে বলছে। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। এরকম তো কোনওদিন হয়নি! কী এমন

সিরিয়াস ব্যাপার ঘটল, সেটা জানতে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ি গিয়ে শুনতে পারলাম কী ঘটেছে।

শোনার পর থেকে আমি বাথরুমে কল চালিয়ে মাথা ধুয়ে যাচ্ছি শুধু। আমি তো জানি, মোমদি একটা সময় আমাদের কাছে কী ছিল! এমনকি এখনও। রাস্তায় দেখতে পেলে জোর করে ওদের বাড়িতে নিয়ে যেত। কিছু না কিছু না খাইয়ে তো ছাড়তই না, তার ওপরে এটা সেটা কিছু না কিছু দিয়েই ছাড়ত। আজকে ব্যাগ, কালকে একটা বই তো পরশু একটা দারুণ একটা কস্টিউম জুয়েলারিই দিয়ে দিত। আমি যদি বলতাম তোমার সবই কি আমাকে দিয়ে দেবে? মোমদি হেসে বলত, "দেব, তাতে সমস্যা আছে কোনও?"

শুধু দাদার কথা উঠলে মোমদি একটু অন্যরকম হয়ে যেত। মনে হত কেউ জোর করে এক টান মেরে ওর মুখ থেকে হাসিটা সরিয়ে নিয়েছে। আমিও চেষ্টা করতাম যতটা সম্ভব দাদার কথা না তুলতে। তবু চলে আসতই। মোবাইলটা দাদা দেবার পরে যখন ওর বাড়ি গেছিলাম, আমার হাতে মোবাইল দেখে মোমদি বলেছিল, "নতুন মোবাইল?"

আমি ক্যালানের মতো বলে দিয়েছিলাম, "হ্যাঁ, দাদা দিয়েছে।"

কথাটা শুনে সাথে সাথে মোবাইলটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছিল মোমদি। দাদা আর মোমদির মধ্যে যখন কুছ কুছ হত তখন আমি নিচের ক্লাসে পড়ি। তবে মোমদি এলেই আমি মোমদিকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকতাম। ভীষণ প্রিয় ছিল মোমদি আমার। আর মোমদি আমাকে নিজের ছোটো বোনের মতোই ভালোবাসত।

আমার দুঃস্বপ্নটা যে মোমদির ক্ষেত্রেই এভাবে সত্যি হয়ে যাবে আমি ভাবতে পারিনি। যতবার সেই আগে দেখা ধর্ষিতা মহিলার মুখে মোমদির মুখ বসাচ্ছি, আমার কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হচ্ছে। এটা যে আমাদের বাড়ির উপর কতটা প্রভাব ফেলবে তা খানিকটা হলেও আন্দাজ করতে পারছি। দাদা সেই যে বেরিয়েছে বাপ্পাদার সাথে এখনও ফেরেনি। গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে আমি আসার পর থেকে দেখছি বউদি দরজা বন্ধ করে বসে আছে। কী হয়েছে কিছুই বুঝলাম না। বাবা কথা বলতে পারছে না। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে আছে। শুধু মা এত কিছুর মধ্যেও রান্না করে যাচ্ছে। কোনওমতে সবকিছু স্বাভাবিক রাখার একটা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু ভেতরের কষ্ট কি আর এভাবে আটকানো যায়? মোমদি তো মারও ভীষণ প্রিয় ছিল। আমাদের বাড়ি এলেই শুধু চাউ খেতে চাইত মা-র কাছে। ওর মা-র থেকেও নাকি আমার মা বেশি ভালো চাউ বানায়। আর কী আশ্চর্য, আজকে সকালে আমি মা-র কাছে চাউ খেতেই চেয়েছিলাম! দিদি চুপচাপ রান্নাঘরেই বসে আছে। কোনও কাজ করছে না। আমিও কী করব বুঝতে না পেরে চুপচাপ নিজের ঘরে এসে বসলাম। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। মনে হচ্ছে কোনওদিন এই মাথা ধরা সারবে না আমার।

২১

বাড়ির মাথা হবার অনেক সমস্যা। বাড়ি সামলাতে হয়। বাইরের ঝড়ঝাপটা সামলে বাড়ি ঠিক রাখতে হয়। বিভাসবাবু জানেন তাঁরই কাজ এত কিছুর পরে বাড়িটা ঠিকঠাক রাখা। কিন্তু আজ ভীষণ অসহায় বোধ করছিলেন। নিজের প্রতি একটা অদ্ভুত ঘেন্না আসছিল তাঁর। পুরো ব্যাপারটার জন্য অবচেতনে নিজেকেই দায়ী করে যাচ্ছিলেন তিনি।

ব্যাপারটা যখন শুনলেন টিভির ঘরের সোফায় চুপ করে বসে পড়েছিলেন তিনি। প্রথম যে কথাটা তাঁর মাথার মধ্যে এসেছিল সেটা হল রূপমের সঙ্গে বিয়ে হলে হয়তো মোমের এই পরিণতিটা হত না। এত কিছুর পরেও মেয়েটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আর-কোনও সম্পর্কে জড়াতে পারল না। এই কি নিয়তি ছিল?

বয়স হলে অনেক সমস্যা বাড়তে থাকে। সুগার প্রেশার স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে বিভাসবাবুর। মাঝে মাঝে বেশি হাঁটলে হাঁফও ধরে আজকাল। বার্ধক্য থাবা বসাচ্ছে জীবনীশক্তিতে। খবরটা শোনার পরে মাঝে

মাঝে মাথাটা ব্ল্যাংক হয়ে যাচ্ছে তাঁর। কাউকে বলছেন না। বাড়িতে বজ্রপাত হয়েছে স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। ছেলে বেরিয়ে গেছে, বউমা দরজা বন্ধ করেছে। নিশ্চয়ই কিছু আঁচ করছে। আজকের পরে ওদের সম্পর্কটাও বোধহয় স্বাভাবিক থাকবে না।

কলিংবেল বাজতে বিভাসবাবু বাইরে গিয়ে দেখলেন বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পাড়ারই পল্লবের গাড়ি। মনে পড়ল রূপমদের আজ কলকাতা যাবার কথা ছিল। ছেলেটিকে বসিয়ে বিভাসবাবু রান্নাঘরের দিকে এগোলেন। গিন্নি মনের সমস্ত শক্তি রান্নায় লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি গিন্নিকেই বললেন, "পল্লব গাড়ি পাঠিয়েছে তো। কী করবে?"

গিন্নি মুখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর চোখেও সংশয়ের ছাপ স্পষ্ট। বললেন, "বউমাকে একবার জিজ্ঞেস করবে?" তারপরই গলা খাটো করে বললেন, "না না, এক কাজ করো, রূপসীকে বলো রূপমকে ফোন করতে। কী বলে দ্যাখো। নইলে কিছু টাকা দিয়ে গাড়িটাকে না করে দিতে হবে তো। এভাবে সারাদিন আটকে রাখা যাবে না তো!"

রূপসী নিজেদের ঘরে ছিল। বিভাসবাবু ডাকলেন ওকে। গাড়ির কথা বললেন। রূপসী বেশ কিছুক্ষণ ফোনে ট্রাই করে হাল ছেড়ে দিল, বলল, "দাদা তো ফোনই তুলছে না বাবা।"

বিভাসবাবু অসহায় বোধ করছিলেন। চুপচাপ সামনের ঘরে গিয়ে বসলেন। ছেলেটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বিভাসবাবু বললেন, "তুমি চলে যাও এখন। ওরা যাবে না আজকে। বিকেলের দিকে এসো। কিছু টাকা দিয়ে দেব।"

ছেলেটার মুখ দেখে বোঝা গেল রাগ হয়েছে। কিন্তু বয়স্ক মানুষ দেখে মুখে কিছু বলল না। চুপচাপ গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। বিভাসবাবুর মনে হচ্ছিল বউমার সাথে কথা বলা দরকার। মেয়েটা একা আছে। অভিমান করেছে। পাড়ার লোকের সামনে রূপমের অপমান- ব্যাপারটা ভাবলেই অস্বস্তি হচ্ছিল বিভাসবাবুর। বাড়ির বউ, তার সঙ্গে এই ব্যবহারটা মেনে নেওয়া যায় না। আবার রূপমের দিকটাও দেখতে হবে। প্রথম প্রেম, ভোলা কোনওদিনই অত সহজ হয় না। এই খবরটা তো ওর কাছে একটা মারাত্মক শক তৈরি করবে।

রূপমের জন্য হঠাৎ করেই টেনশন শুরু হল বিভাসবাবুর। ছেলেটা যে মানসিক শক পেল, মাথা ঠিক রাখতে পারবে তো? কোথায় গেল ঝোঁকের মাথায়? উদ্বেগটা মাথা চাড়া দিতে লাগল। ছেলেটা ফোন তুলছে না। একবার যাবেন ঘটনাস্থলে? পরক্ষণেই প্ল্যানটা ক্যান্সেল করলেন। সামনাসামনি দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব না।

বেশ খানিকক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন। শেষমেষ টিভি চালালেন। খবরের চ্যানেলে তাদের এলাকার কোনও খবরই নেই। মোম এখনও হেডলাইনে আসতে পারেনি। কলকাতা হলে যত তাড়াতাড়ি হেডলাইনে আসত, জেলার মফস্সল বলেই হয়তো সেই দামটা পাচ্ছে না খবরটা। মামুলি লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা হলে দেবে, নইলে না দিলেও হয়। আর ধর্ষণটা এখন এমন জলভাত হয়ে গেছে দিনের পর দিন, যে এই খবরগুলি পাবলিক আজকাল আর খুব বেশি খায় না। খবরের মাঝে জাপানি তেল, বা রকেট ক্যাপসুলে মানুষের মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেওয়াটাও সংবাদমাধ্যম বেশ দায়িত্বের সাথেই পালন করে চলেছে। বিভাসবাবু মনে করতে পারলেন না, কবে থেকে খবরের নামে, ব্যবসার নামে এসব শুরু হয়েছে। অথচ একটা সময় ছিল, খবর পড়াটা যান্ত্রিক হলেও, তার একটা গাম্ভীর্য ছিল, একটা আভিজাত্য ছিল। এখন মনে হয় যাত্রাপালা চলছে। একই খবর সারাদিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখিয়ে যাবে, খবরের থেকে বিজ্ঞাপন চারগুণ দেখাবে, বিভাসবাবু খানিকক্ষণ দেখার পরে সহ্য করতে না পেরে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন।

মাথাটা ভার হয়ে এসেছে। প্রেশারের ওষুধ সকালে খেয়েছেন নাকি মনে করতে পারছিলেন না। আজকাল এই এক উপসর্গ যুক্ত হয়েছে। প্রায়ই ভুলে যান কোন ওষুধ খেয়েছেন আর কোন ওষুধ খাননি। মাঝে একবার দুবার প্রেশারের ওষুধ খেয়ে ফেলায় প্রেশার ফল করে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছিল।

কিন্তু আজ কি খেয়েছেন? মনে করতে পারছিলেন না তিনি। শেষমেশ কিছু না করে টিভির ঘরে বসেই রইলেন। একা একা।

২২

বাপ্পা কোনওকালেই প্রেম-ট্রেম দু-চোখে দেখতে পারে না। সে জানে জীবনে উন্নতির পথে আসল বাধা হল এই প্রেম। ছেলেপিলে স্কুল পালিয়ে, অফিস পালিয়ে প্রেম করবে আর তারপর সফল হলে ওই মেয়েটাকেই বিয়ে করে আন্ডাবাচ্চা নিয়ে হোল লাইফ খিস্তাখিস্তি করে কাটিয়ে দিতে হবে, আর প্রেম ব্যর্থ হলে নেশা তো আছেই, জীবনেরও লাল লাইট জ্বলে যাবে। এই যে এত সফল ছেলে রূপম, দিব্যি লাল টুকটুকে কলকাতার বউ নিয়ে বাইরে গাড়ি ফ্ল্যাট নিয়ে আছিস, সেই তো পুরোনো ব্যথার যেই দেখলি এত বড়ো কেস হয়ে গেছে, রাস্তার উপর বউকেই ধমকিধামকি দিয়ে চলে এলি? এটা কি ঠিক হল? সে দু-চারবার রূপমকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ভাই তুই বাড়ি যা, লাশ-টাশ পোস্টমর্টেমে গেলে তারপরে তোকে ডাকছি, কিন্তু কে শুনবে কার কথা! ছেলেটা চিরকালই একটু ট্যারা। স্কুল লাইফে ভালো ছাত্র ছিল, কিন্তু কোথাও কোনও কিচাইন হলে সবার আগে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াত। পাড়ার ঝামেলাতেও থাকত। পালিয়ে যেত না।

কিন্তু এখন ওকে কে বোঝাবে সময় অনেক পালটে গেছে। পলিটিক্স এখন খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে গেছে। কোত্থেকে কী হয়ে যায় কেউ জানে না। সকাল থেকে ইটভাঁটার জায়গাটায় তাকে নিয়ে এসে বসে আছে।

বডিতে কাপড় আলগাভাবে দেওয়া ছিল। চোখ মুখ থ্যাঁতলানো। চাপ চাপ রক্তে মাছি ঘুরঘুর করছে। বাপ্পা একবার দেখেই চোখ সরিয়ে নিল। যদিও যা লোকজন এসেছে, সবাই সেটাই ড্যাবডেবিয়ে দেখছে। বাড়িতে সবারই মেয়ে বউ আছে, কিন্তু পরনারীর শরীর সব সময়েই আকর্ষণীয়, হোক না সে জীবিত কিংবা মৃত।

রূপম এসে পুলিশকেই ধমকি দিয়ে দিয়েছে বডি কেন কভার করা হয়নি বলে। থানার মেজোবাবু ছিল, একবার ওকে মেপে নিয়েছে। তারপর তাকে পাশে দেখে ডেকে নিয়েছে। সে-ই বোঝাল মেজোবাবুকে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার খবরটা পেয়ে, সেটা শুনে মেজোবাবু আর কিছু বললেন না। মেয়েটার মা দাদার কাছে থাকে। তার ফোন থেকেই ফোন করল। রূপমের প্রায়ই ফোন বেজে উঠছিল। ফোন ধরছিল না। চোখ-টোখ লাল হয়ে গেছে। বেশ খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করে মাথায় হাত দিয়ে মাটিতেই বসে পড়ল। তারপর বলল, "আমি কী করি এবার?"

বাপ্পা বুঝতে পারছিল সান্ত্বনা দেবার বিরক্তিকর কাজটা তাকেই করতে হবে। সে কোনওমতে কাঁধে-টাধে চাপড় মেরে শান্ত করার চেষ্টা করল রূপমকে। কিন্তু সে বুঝলে তো! এদিকে উপরতলার নেতারা তাকেই ফোন করতে শুরু করেছে। বাপ্পা ধরবে না ধরবে না করেও ধরল, এমএলএ। কলকাতার লোক, এখানে ভোটের পরে তাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। কোনও দরকার হলে তাদের ফোন করেই এলাকা দেখাশোনার কাজ করে ফেলেন। এমএলএ-র নাম্বার দেখলে আগে বাপ্পা লাফালাফি জুড়ে দিত যে, যাক, আজকাল উপরমহলেও তার নাম পৌঁছোচ্ছে, কিন্তু এখন বিরক্ত হল, একে রূপমকে নিয়েই মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে, এরপর আবার কী ঝামেলা গায়ের ওপর আসে কে জানে!

ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে দাদার খোঁয়াড়ি ভাঙা গলা ভেসে এল, "কী হে বাপ্পা, ওখানে রেপ হয়েছে নাকি?"

বাপ্পা একটু সরে গেল রূপমের কাছ থেকে। রূপমের সামনে এখন এই নিয়ে কোনওরকম আলোচনাই করা যাবে না। এমনিতেই লোক গিজগিজ করছে জায়গাটাতে। বিরোধী দলের কিছু পাবলিকও সুযোগ বুঝে সেন্টু বেচা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিন হলে ছেলেপিলে এনে অ্যাকশান শুরু করে দিত, আজকে চুপচাপ থাকাটাই বাঞ্ছনীয় মনে হচ্ছিল তার।

বাপ্পা প্রশ্নটার উত্তর দিল, "হ্যাঁ দাদা, কাল রাতে হয়েছে, ভোরে লাশ পাওয়া গেছে।"

"লাশ পাওয়া গেছে, তা রেপ হয়েছে কী করে জানলি? ক্যামেরা লাগানো ছিল নাকি?"

প্রশ্নটা শুনে দপ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল বাপ্পার। কিন্তু বুঝতে পারছিল এখন তাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। বলল, "না মানে জামাকাপড় ছিল না তো গায়ে।"

একটা হিসহিস শব্দ ভেসে এল ওপাশ থেকে। তারপর শুনল, "ইশ রে, কচি একদম?"

বাপ্পার মনে হচ্ছিল ফোনের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে শুয়োরের বাচ্চাটার গলা টিপে দেয়, কিন্তু কিছু বলল না। কাটানোর চেষ্টা করল, "হ্যাঁ দাদা, আমার বন্ধুর বান্ধবী ছিল একসময়।"

"অ।" ও প্রান্ত একটু সতর্ক হল, "যাই হোক, অপোনেন্টের মাদারচোদগুলি বেশি লাফালাফি করলে গাঁড় ভেঙে দিবি। এখন ইলেকশনের সময়। মাথা যেন কেউ না তুলতে পারে। বুঝলি?"

বাপ্পা হ্যাঁ বলে ফোনটা রেখে গোঁজ হয়ে রইল। আজকে সে অ্যাকশান করতে পারবে না। অপোনেন্ট যা করার করুক। সব দিন অ্যাকশান করার দিন হয় না।

কিছু কিছু দিন কিছু না করেও কাটিয়ে দেওয়া উচিত। আজকে সেই দিন।

বিরোধী পার্টির চিত্ত ছেড়ে দেওয়ার ছেলে না। তাকে দেখতেই স্লোগান দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। বাপ্পা গুটিগুটি এগিয়ে গেল চিত্তর দিকে। তাকে এগোতে দেখে চিত্ত একটু হকচকিয়ে গেল। বাপ্পা বলল, "ভাই একটু এদিকে আয়।" চিত্ত সন্দিগ্ধ মনে চারদিক দেখে তার সাথে সাইডে চলল। বাপ্পা বলল, "ভাই, তোরা আজ যা পারিস কর, আমাকে ছেড়ে দে। আমার বন্ধুর কেস। এখানে প্লিজ কিছু করিস না।"

চিত্ত তার দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড পজ নিয়ে বলল, "বন্ধু মানে?"

বাপ্পা রূপমকে ইশারায় দেখাল। চিত্ত বলল, "হাজব্যান্ড?"

বাপ্পা বলল, "আগে প্রেম করত। বাইরে থাকে। সকালে জানতে পারার পর থেকে পাগলের মতো করছে। এখানে সিন ক্রিয়েট হলে আরও সমস্যা হয়ে যাবে। তোরা দেখ অন্য কোথাও কিছু করলে কর, এখানে লাশটাকে নিয়ে কিছু করিস না আজ।"

চিত্ত একটু ভেবে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে আমি ম্যানেজ করছি। থানা ঘেরাও করতে বলি বরং।"

বাপ্পা কৃতজ্ঞ হল। মাঝে মাঝে কথা বললে রাজনীতিতে অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। এটা যে কেন অনেকে বুঝেও বোঝে না সে জানে না।

২৩

রূপম বাড়ি ফিরল রাত বারোটায়। ফোন ধরেনি একটাও। এলাকা গরম থেকে গরমতর হয়ে গেছে। র‍্যাফ নেমেছে বিকেলের দিকে। বিভাসবাবু কাউকে না পেয়ে শেষে বাপ্পাকে কোনওমতে ফোনে ধরতে পেরেছিলেন। বাপ্পা জানিয়েছিল, কলকাতা থেকে মোমের মা আর দাদা ফিরেছেন। রূপম কিছুতেই ফিরতে চাইছে না।

বিভাসবাবু আর কিছু শুনতে পাননি। টেনশনে বাড়ির সবাই টিভির ঘরে বসে ছিল সন্ধের পর থেকে। একমাত্র শ্রাবন্তী বাদ দিয়ে। শ্রাবন্তী দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। মিলি একবার দরজা ধাক্কিয়েছিল। শ্রাবন্তী ভিতর থেকে বলে দিয়েছিল এখন মাথা ধরেছে। কেউ যেন বিরক্ত না করে। সকাল থেকে কিচ্ছু খায়নিও। বাড়িতেও কারও কিছু খাওয়া হয়নি। রান্না হয়ে খাবার টেবিলে সাজানো আছে সব। বিভাসবাবু সুগারের পেশেন্ট বলে খালি পেটে থাকতে পারবেন না ভেবে গিন্নি রুটি দিতে গেছিলেন সন্ধের দিকে, বিভাসবাবু প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। রূপম যখন ফিরল তখন টিভি চলছিল। টিভিতে মোমের ধর্ষণকে কেন্দ্র করে হওয়া ঝামেলাটাই দেখাচ্ছিল। কলিংবেল বাজলে বিভাসবাবু সতর্কতা নিয়ে টিভিটা বন্ধ করে দিলেন।

রূপমের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। একদিনে যেন অনেকটা বয়স বাড়িয়ে ফেলেছে সে। মিলি আর রূপসী রূপম ফিরতেই তাকে ধরে সোফায় বসাল। বিভাসবাবুর অপরাধবোধটা ফিরে এল। রূপম প্রথম কথা বলল, "মা, খেতে দাও খিদে পেয়েছে।"

বিভাসবাবু গলা খাঁকরিয়ে বললেন, “বউমাকে একটু ডেকে নে, মিলি আর রূপসী ডেকেছিল, সেই সকাল থেকে ঘর বন্ধ করে বসে আছে। কিছুই তো সেরকম মুখে দেয়নি।”

রূপম বিভাসবাবুর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। কেউ কোনও কথা বলছিল না। এক অস্বস্তিকর নীরবতা ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করতে লাগল। একটা সময় রূপম উঠল, ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে রওনা হল।

মিলি ফিসফিস করে বলল, “বাবা দাদাকে জোর দাও, নইলে কিন্তু বউদিও খাবে না, দাদাও খাবে না। আরও সমস্যা হয়ে যাবে।”

বিভাসবাবু অসহায়ভাবে গিন্নির দিকে তাকালেন, বললেন, “তুমি একবার বলে দ্যাখো না।”

সবাই সবার দিকে তাকাল। কেউ কিছু বলল না। বিভাসবাবু বললেন, “চলো খেয়ে নি।”

টেবিলের দিকে তারা এগোতে তাদের সবাইকে অবাক করেই রূপম আর শ্রাবন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে চুপচাপ খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। রূপমের মা তাড়াহুড়ো করে খাবার টেবিলের দিকে ছুটলেন। মিলি রূপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল। রূপসী চোখ দিয়ে মিলিকে বকে দিল। মিলি হাসিটা সাথে সাথে গিলে ফেলল।

সবাই চুপচাপ খেয়ে গেল। কেউ কোনও কথা বলল না।

খেয়েদেয়ে ঘরে ঢুকতেই শ্রাবন্তী দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বলল, “মেয়েটা কে ছিল? এক্স?”

রূপম শান্ত স্বরে বলল, “স্নান করব। দরজা খোলো।”

শ্রাবন্তী দরজা খুলল না। বলল, “আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। কে মেয়েটা? এক্স?”

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। শ্রাবন্তীকে আজকে অন্যরকম লাগছে? কেন জানে না, তার বারবার মনে হচ্ছিল শ্রাবন্তী ধীরে ধীরে মোমের মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে। মোমের শরীরটা তো সে কোনওদিন দেখেনি, আজকে দেখেছে, থ্যাঁতলানো শরীরটা অনেক জায়গাতেই অক্ষত ছিল। শ্রাবন্তীর শরীরের কথা তখন মনে আসেনি। তাহলে এখন মোমের শরীরটার কথা মনে আসছে কেন?

শ্রাবন্তী খাটে বসল। দৃঢ় গলায় বলল, “আমি কালকে বাড়ি যাব। তুমি যেতে চাইলে যেতে পারো। না যেতে চাইলে যেয়ো না। আমি যেন যাই সে ব্যবস্থা করে দিয়ো।”

রূপম কিছু বলল না। শ্রাবন্তীর অস্থির লাগছিল রূপমের এই নীরবতা। কেন জানে না, তাকে লুকিয়ে অন্য কোনও মেয়ের সাথে শুয়ে এসেছে রূপম এটাই বারবার মনে হচ্ছিল শ্রাবন্তীর। আজকের আগে মেয়েটার নামই শোনেনি শ্রাবন্তী, অথচ আজকের দিনটা তাকে পুরো নাড়িয়ে দিয়ে গেল।

রূপম বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে বলল, “মোমের কথা তোমাকে আমি কোনওদিন বলিনি, এটা সত্যি। মোমকে আমি মুছে দিয়েছিলাম জীবন থেকে, তাই বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি। কিন্তু আজকে ওরা যখন মোমের নগ্ন শরীরটা সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখছিল, আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। এখন আমি বুঝতে পারছি, মোমকে আসলে আমি মুছতে পারিনি। আমার মনে হল, কথাগুলি তোমাকে বলার আমি বললাম। তুমি কাল বাড়ি যেতে চাও আমি তার ব্যবস্থাও করে দেব। এবার তুমি ঠিক করো কী করবে।”

শ্রাবন্তী বলল, “তাই করো। আমার একটু একা থাকা দরকার।”

রূপম বলল, “এখন থেকে? তাহলে আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।”

শ্রাবন্তী রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, “সিন ক্রিয়েট আর করার প্রয়োজন নেই। কাল আমাকে বাড়ি দিয়ে এসো তাহলেই হবে।”

রূপম আর কিছু বলল না।

বিছানায় কাছে থেকেও যখন মানসিক দূরত্ব অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তখন ব্যাপারটা মোটেও সুখকর হয় না। রূপমের সাথে শ্রাবন্তীর যে এর আগে একেবারে কোনওরকম ঝগড়া হয়নি তা না, কিন্তু সে সবসময়েই বিছানায় এসে সব ঠিক হয়ে যেত। একজন না একজন নরম থাকলে, অপরজন যত জেদই করুক, সম্পর্কে সমস্যা হয় না সচরাচর। কিন্তু এবার শ্রাবন্তীকে শক্ত হতে দেখে রূপম নরম হল না। সবসময়ে নত হওয়া সম্ভব নয়। আর আজ তো সে প্রশ্নই ওঠে না। যে মেয়ে আর-একটা মেয়ের ধর্ষিত আর খুন হবার থেকে নিজের ইগোকে আগে রাখতে পারে, তার সঙ্গে তাকে বাকি জীবনটা একই খাট, একই ঘর, একই বাড়ি, গাড়ি, পরিবার শেয়ার করতে হবে ভেবে, মাথায় আগুন জ্বলে যাচ্ছিল তার। অবশ্য সেনসিটিভ হওয়া আশা করাও যায় না ওর থেকে। ছোটো পরিবারের শহুরে মেয়ে, কোনও কিছু কারও সাথে কোনওদিন শেয়ার পর্যন্ত করেনি, ওর থেকে এত কিছু আশা করাটাও হাস্যকর।

রাত দেড়টায় একই খাটে দুজন দুদিকে শুলেও রূপম বুঝতে পারল শ্রাবন্তী এখনও ঘুমোয়নি। চুপচাপ শুয়ে আছে। তার রাগ হচ্ছিল। অদ্ভুত মেয়ে সত্যি। আজকের দিনটায় শ্রাবন্তী যে এরকম করতে পারে ভাবতে পারেনি সে। যতবার সবকিছু মাথা থেকে বের করে চোখ বুজতে যাচ্ছে মোমের শরীরটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই শরীরটাকে সে কোনওদিন চায়নি সে বলতে পারবে না। কিন্তু সেটা যে এইভাবে তার সামনে আসবে, তাও ঠিক আজকের দিনে, এই আশঙ্কাটা তার কোনওদিন ছিল না। গুরগাঁওতে থাকাকালীন এই ঘটনাটা ঘটলে সে কী করত? কাউকে না জানিয়ে লং ড্রাইভে গিয়ে হয়তো কোনও ধাবায় সারাটা রাত মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ত হাইওয়ের ধারে। কিন্তু আজকের এই অস্বস্তিকর রাতটা শেষ হবে বলে মনে হচ্ছিল না তার। এ যেন শাস্তির রাত।

মোবাইলটা বের করল সে। ঘুম যখন আসছেই না, মোবাইলটাই দেখা যাক। আনলক করার পর মিসড কল দেখে অবাক হল সে। সবটাই মিলি বা রূপসীর ফোন থেকে গেছে। শ্রাবন্তীর ফোন থেকে একটা ফোনও নেই। চমৎকৃত হল সে। বিয়ের পরপর যে শরীরটা তাকে সবচেয়ে বেশি টানত, সেই শরীরটা পাশ ফিরে শুয়ে আছে, যেটা দেখে তার একফোঁটাও কাম জাগল না, পরিবর্তে মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। মোমকে পোড়ানো দেখতে পারবে না সে। মেয়ের বন্ধু হিসেবে মোমের মায়ের পাশে গিয়েও দাঁড়াতে পারেনি। প্রবল অপরাধবোধ নেমে আসছিল সেই সময়টা। বাবা যেদিন ভীষণ বকেছিল মোমকে নিয়ে কথা শোনার পরে, সেসময়টা সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। খারাপ লেগেছিল। কিন্তু মোমের সঙ্গেও সেই সময়টা সে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে। রাস্তায় একদিন মায়ের সাথে মোম যাচ্ছিল বাজারে, তাকে দেখে মোমের মা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন কেন সে হঠাৎ করে তাঁদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিল, প্রত্যুত্তরে রূপম উলটোদিকে হাঁটা দিয়েছিল হনহন করে। মোম পরে একবার বলেছিল সেদিন মা ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। তারপর মোমের মা-র মুখোমুখি সে কোনওদিন হতে পারেনি। পারবেও না হয়তো আর-কোনওদিন।

মোমের সাথে কাটানো সময়গুলি সারাদিন ধরে ফ্ল্যাশব্যাক হয়েছে তার মাথায়। চোখ বন্ধ হলেও সেসবই ভেসে আসছে। আজ হঠাৎ করেই তার মনে হচ্ছিল আসলেই কি সে শ্রাবন্তীকে কোনওদিন ভালোবেসেছিল? নাকি পুরোটাই শারীরিক আকর্ষণ ছিল? মোম যে এতদিন পরেও এতটা জুড়ে ছিল তাকে, সেটা আজকের দিনটা না গেলে সে জানতে পারত না হয়তো কোনওদিন। আর পাঁচটা লোকের মতোই সংসার করে জীবন চলে যেত।

একটা সময় বাড়ির ল্যান্ডফোন থেকে লুকিয়ে ফোন করত মোমকে। যেদিন পড়া থাকত না, সেদিন কখনও কখনও দিনে ওই এক-দেড় মিনিটের কথাই এক অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরিয়ে রাখত তাকে। মোম একবার বলেছিল বিয়ে হলে তারা ঘোর শ্রাবণে টিনের চালের তলায় বৃষ্টিতে ভিজবে। কথাটা মনে পড়তেই প্রবলভাবে সবকিছু নষ্ট করে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। একটা মেয়ের স্বপ্ন, ইচ্ছা, সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছে সে। ধর্ষক তো শরীরটা নিয়েছে, মোমের মনের ধর্ষণ তো সে-ই করেছিল আসলে। শুধু তার জন্য একটা

মেয়ে সারাজীবন বিয়ে করল না, এরকম পাগলের মতো রাস্তাঘাটে একা একা ঘুরে বেড়াত, বাইরেটা যতই ঠিক থাকুক, ভিতরটা তো সেই কবেই দুমড়ে মুচড়ে গেছিল শুধু তারই জন্য।

রূপম চেঁচাতে চাইছিল, পারল না। চুপচাপ দুজনে পাশাপাশি সারারাত জেগে থাকল। কেউ কারও সাথে একটা কথাও বলল না।

২৫
মিলি

আমি দেখলাম আমরা আসলে দুঃখকষ্টকে ভোলবার জন্য অনেক কিছু করতে পারি। আবার বাড়ি থমথমে হলেও যদি যার কারণে থমথমে সে না থাকে, বাড়ি তখন আবার চেষ্টা করে সবকিছু ভুলে নতুন করে বাঁচতে।

এই তো কাল এত কিছু হল, দাদা এত রাতে এল, চুপচাপ খেয়ে নিল, আমি আর দিদি রাত জেগে এত কাঁদলাম, এইসবই কিন্তু ম্যাজিকের মতো চেঞ্জ হয়ে গেল দাদা বউদিকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই। দাদা প্রথমে যেতে চাইছিল না, সকালে উঠে চুপচাপ বসে ছিল খাবার টেবিলে। আমি দাঁত মাজছিলাম। দাঁত মাজতে আমি অনেক সময় নি। অন্য দিন দাদা দেখলেই ধমক দিত, “আরে গাধা এত সময় ধরে কেউ দাঁত মাজে নাকি?” কিন্তু আজ দেখলই না আমার দিকে। আমি খানিকটা দাদাকে খ্যাপাতেই দাঁত বেশিক্ষণ ধরে মাজতাম, আজ ওর মেজাজ খারাপ দেখে মাজলাম না। মা দাদাকে জিজ্ঞেস করল, “কী রে আজ কলকাতা যাবি?”

দাদা তখন বলল, “না, ওকেই পাঠিয়ে দেব গাড়ি করে।”

মা শুনেই চেঁচামেচি শুরু করে দিল। বাড়ির বউ এতটা রাস্তা একটা অচেনা অজানা ড্রাইভারের সাথে যাবে এটা হয় নাকি তাও এইরকম একটা সময়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষমেশ দাদা দেখলাম তেতো মুখেই রাজি হয়ে গেল যেতে।

ব্রেকফাস্ট করে ওরা বেরিয়ে যেতেই সকালে অয়নদা এল। অয়নদার সাথে বাবা অনেকক্ষণ কলেজ নিয়ে কথা বলল। মা-ও এল। বেশ খানিকক্ষণ আড্ডা হতে দেখলাম বাড়ির পরিবেশ বেশ হালকা হতে শুরু করেছে। আমি যথারীতি যথাসম্ভব ঝাড়ি-টাড়ি মেরে নিলাম অয়নদাকে, তারপরে পড়তে গেলাম।

অবশ্য পড়তে গিয়ে একটু হলেও অবাক হলাম। এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু কারও মুখ দেখে সেটা বুঝলাম না। সেই হাসিঠাট্টা যেমন চলে সেরকমই চলছে। স্যার যথারীতি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি পড়ছ তো? নাকি সারাদিন মোবাইল ঘেঁটেই কেটে যায়?”

আমি স্যারের দিকে তাকাতে গিয়ে পার্থর দিকে তাকালাম। শয়তানটার নজর আবার দেখি মেয়েদের বুকের দিকে ঘুরঘুর করছে। ইচ্ছা হচ্ছিল খাতাটা ছুঁড়ে মারি। কিন্তু কিছু করলাম না। স্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম, “না স্যার, পড়া একদমই হচ্ছে না।”

স্যার ভেবেছিলেন আমি পড়ছি বললে চাটবেন। আমার না শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, “যাহ্, কেন? মোবাইল ঘাঁটছ?”

এটার উত্তর স্যার ভেবেছিলেন না বলব। আমি আবার উলটোটা করলাম। বললাম, “হ্যাঁ স্যার। খুব।”

শুনে সবাই হেসে উঠল। স্যার ধমক দেবার চেষ্টা করলেন, “হাসবে না। এখানে ইয়ার্কি হচ্ছে না। আমি এখানে গোরু চড়াতে আসিনি।”

মধুমিতাটা এমন বিচ্ছু, স্যারের কথাটা শেষ হতেই নিরীহ মুখে বলে উঠল, “স্যার যারা গোরু চড়ায় তারা কি খুব হাসাহাসি করে বুঝি?”

স্যার রেগে ব্যোম হয়ে গেলেন। মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। খুব রেগে গিয়ে বললেন, “ইয়ার্কি হচ্ছে? ইব্রাহিম লোদি আর বাবরের শাসনকালের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করো। এক্ষুনি বলো।”

স্যারের প্রশ্ন শুনেই সবাই খাতার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকাল। আমি অবাক হয়ে বললাম, "স্যার ইব্রাহিম লোদি আর বাবর? আপনার মাথা ঠিক আছে তো?"

আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠল। স্যার এবার রেগেমেগে বললেন, "তোমরা খুব বাড় বেড়েছ। পরের দিন সবাই গার্জিয়ান নিয়ে আসবে। নইলে আমি পড়াবই না একদম।"

আমি ভাবলাম এই মরেছে। চুপচাপ খাতা টেনে বসলাম। স্যার আবার নোটস দিতে শুরু করলেন। কিন্তু একবার যদি ব্যাচে হাসাহাসি শুরু হয় সেটাকে থামানো খুব কঠিন। কোত্থেকে একটা বদখৎ গন্ধ আসল হঠাৎ করে। একটা ছেলে হঠাৎ রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিতেই সবাই হো হো করে হেসে উঠল। স্যার বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করলেন গম্ভীর হয়ে থাকতে, তারপর নিজেও হেসে ফেললেন। আমার বেশ ভালো লাগছিল। একটা পরিবেশের পরিবর্তন যে মনকে কতটা পালটে দেয় সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। অবশ্য আমাদের এখানে সবকিছু আগের মতো নেই। রাস্তায় আসতে আসতে শুনলাম কাল আবার বন্ধ ডেকেছে। বেশ ঝামেলাও হয়েছে কালকে। থানার দিকে নাকি র‍্যাফ নেমেছে। কিছু একটা চলছে চারদিকে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

স্যার বেরোলে সবাই স্যারের সাথেই বেরিয়ে যায়। আজকে মধুমিতা আমাকে একটা চিমটি কেটে বলল, "থাকবি। একটু পরে যাবি।"

আমি অগত্যা বেরোলাম না। সবাই বেরোতে মধুমিতা বলল, "এই মিলি, মোমদির সাথে তোর দাদার প্রেম ছিল না?"

আমি মধুমিতার দিকে তাকালাম। মেয়েটা সরল কিন্তু লোকের কেচ্ছা ঘাঁটার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। অবশ্য সেটা আমিও করি না বলা ভুল। ওর কথা শুনে বললাম "হ্যাঁ। ছিল তো।"

মধুমিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "তোর দাদা কী বলল? কষ্ট পেয়েছে না?"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমার কাজ আছে। পরে কথা বলব।" বলেই জুতো পরতে ছুটলাম। ওর সাথে বেশিক্ষণ থাকলে পেট থেকে সব টেনে টেনে বের করে ফেলবে। তারপর ক্লাসে যখন ওর সাথে ঝগড়া হবে, অন্য গ্রুপের মেয়েদের আমার ফ্যামিলির কেচ্ছা নুন লংকা দিয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে বলবে।

পাতি কেটে পড়লাম।

২৬

গাড়ি বড়ো রাস্তায় উঠলে রূপম চোখ বুজল। রাজ্যের ক্লান্তি এসে চোখে নেমেছে তার। কাল সারারাত ঘুমোয়নি। সারাদিন এত পরিশ্রম।

কলকাতা তাদের অঞ্চল থেকে দুশো কিলোমিটার দূরত্বে। রাস্তা পাকা হলেও মাঝে মাঝে খারাপ রাস্তাও পড়ছে। কয়েক ঘণ্টা পরে রূপমের ঘুম ভাঙল মোবাইলের শব্দে। তার ফোন বাজছে। নম্বরটা দেখে একটু চমকাল সে। মোমদের বাড়ির ল্যান্ডলাইন নাম্বার। এই নাম্বারটা তার মুখস্থ ছিল। এখনও ভোলেনি। মাঝে মাঝেই ইচ্ছা হলে এই নাম্বারে ফোন করে মোম হ্যালো বললেই ফোন কেটে দিত সে।

ফোনটা ধরল সে। ওপাশ থেকে মোমের দাদার গলা ভেসে এল, "রূপম?"

-হ্যাঁ বলছি।

-তুই কি আছিস এখন?

-না, আমি কলকাতা যাচ্ছি একটু। ওকে দিয়ে আসতে।

-ওহ। না রে, তাহলে তুই কি ফিরবি আর, না ওখান থেকেই চলে যাবি?

রূপম বুঝল না কী ব্যাপার। জিজ্ঞেস করল, "কেন বলো তো?"

-আসলে বুঝতেই পারছিস, কাল থেকে মা কিছুই খায়নি প্রায়। কতবার যে বোঝানো হচ্ছে। কাঁদছে আর অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে শুধু। তুই যদি একবার এসে কথা বলতি...

রূপম আড়চোখে একবার শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। ঘুমোচ্ছে, কিন্তু চোখ বুজে থেকে তার দিকে কান দিয়ে সব শুনছে নাকি সেটা বুঝতে পারল না সে, সে উত্তর দিল, “হ্যাঁ, দেখি আমার ফেরার কথা আছে, আজ রাতেই কলকাতা থেকে ফিরে আসব। কাল সকালে নাহয়...”

-আচ্ছা তাহলেই হবে। ঠিক আছে এখন রাখছি রে।

ফোনটা কেটে গেল। রূপম জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে। শুধু ইট কাঠ বালি পাথর চলে আসছে লরিতে করে। কেউ বাড়ি করছে, কেউ দোকান করছে, সবকিছুই কংক্রিটের করে নিতে হবে। আগে তাদের মফস্সলে মাটির বাড়ি ছিল, এখন একদম গ্রামের দিক ছাড়া সেসব দেখাই যায় না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। এত ধর্ষণ, এত নির্যাতন তাদের ছোটোবেলায় তো এই বিপুল পরিমাণে ছিল না! তাহলে সবই কি নগরায়ণের সাইড এফেক্ট! ছোটো ছোটো ছেলেদের হাতে হাতে মোবাইল, তাতে অবাধ পর্ন, এই সমস্তই কি আসলে অনিবার্য ধর্ষণের দিকে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে না?

কিন্তু খটকা তার অন্য জায়গায় লাগছে। মোমকে যেভাবে খুন করেছে সেটা নিয়ে। কারও ওপর ব্যক্তিগত রাগ থাকলে লোকে এরকমভাবে খুন করে। অথচ সে ঘটনাস্থলেই শুনল যে লোকটা এসব করছে, আসলে প্রায় সব খুনই এই একই ভাবে করে গেছে। প্রচণ্ড বেশি জোরে শরীরে আঘাত দিয়েছে। এত রাগ কেন হবে মেয়েদের প্রতি তার? কারণটা কী হতে পারে? আচমকাই হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল তার। হাতের কাছে যদি কোনওদিন সে পায় এই খুনিকে, এক মুহূর্তের জন্যও বাঁচিয়ে রাখবে না সে।

গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে বিকট শব্দ করে পাংচার হয়ে গেল। শ্রাবন্তী ঘুম থেকে উঠল। বলল, “কী হল?”

রূপম বলল, “পাংচার।”

শ্রাবন্তী চোখ বন্ধ করল আবার। বলল, “তুমি আজকে কলকাতায় থাকবে না?”

রূপম বুঝল ফোনের কথোপকথন সবই শুনেছে শ্রাবন্তী। সে বলল, “নাহ। গাড়িটা ফিরবে তো। ওর সাথেই ফিরে আসব। নইলে খামোখা একদিন দু-দিন পরে যবেই আসি আবার বাড়তি খরচ।”

শ্রাবন্তী বলল “আর যদি প্রেগন্যান্ট হই?”

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে স্টেপনি বের করছে। তাদের কথা ওর শোনার কথা না। তবুও রূপম চোখ দিয়ে ড্রাইভারকে দেখাল।

শ্রাবন্তী বলল, “শুনতে পাবে না।”

রূপম বলল, “সেটা আমি কীভাবে বলব। সেটা তো তোমার ডিসিশন। আমার কথা তুমি শুনবে?”

শ্রাবন্তী বাইরের দিকে তাকাল। বলল, “কেন শুনব না। তোমার বাচ্চা যখন তোমার কথা না শোনার তো কিছু নেই।”

রূপম শ্রাবন্তীর চোখে চোখ রাখল, “আমি হলে তো বলব বাচ্চাটা নিতে। তুমি সেটা নেবে?”

শ্রাবন্তী তক্ষুনি কোনও উত্তর দিল না। একটু ভেবে বলল, “ভেবে দেখব। বাড়ি যাই। তারপর ডিসিশন নি।”

রূপম আর-কোনও কথা বলল না। শ্রাবন্তী এরকমই। প্রথমে বলবে রূপমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তারপর সেই নিজে যেটা বুঝবে সেটাই করবে।

চাকা লাগাতে বেশিক্ষণ লাগল না। গাড়ি রওনা দিল আবার। রূপম চোখ বুজতে গিয়েও খুলতে বাধ্য হল। আবার মোমের শরীরটা ভেসে আসছে চোখের সামনে।

২৭

একটা কচি মেয়ে আর একটা বয়স্ক মেয়ের গায়ে আসলে একই গন্ধ থাকে না। কচি অবস্থায় মেয়েটা যেরকম তাজা থাকে, বয়স বাড়তে বাড়তে মেয়েটার শরীরে অনেকরকম সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। পঁচিশের উপরে মেয়েদের মেরে খুব একটা মজা পাওয়া যায় না। বাচ্চা মেয়েগুলি হাত-পা ছোড়ে বেশি, তাই

ওদের মেরে মজা বেশি। এই মেয়েটাকে মেরে খুব একটা মজা পাওয়া যায়নি। মেয়েটা যেন মরেই ছিল। নারানের বিরক্ত লাগছিল। এই ঝামেলা না মেটা পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। অথচ খুন করেও সেই মজাটা পাওয়া গেল না, এই ফাঁকে তো কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে! ছ-মাস চুপ করে বসে থাকলে তবে চারদিকের নজর কমবে। তখন ধীরেসুস্থে আবার শিকারে নামতে পারা যাবে।

দোকানেই বসে ছিল সে, এমন সময় কচি মেয়েটাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখল নারান। দোকান ভর্তি লোক, ফাঁকা থাকলে একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিত। বাঘের শিকারের নিয়ম শুনেছিল সে একবার, সত্যি মিথ্যা যাচাই করে দেখা তার পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি। মিত্রবাবু বলেছিলেন একবার, বাঘ নাকি যখন শিকার করে তখন নাকি একবার শুধু টার্গেট ফিক্স করে নেয়। তারপরে আর কোনও দিকে তাকায় না। শিকারের পিছু পিছু যায়। নজর রাখে, তারপর সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারের ওপরে। এই ব্যাপারটা তার বেশ মনে ধরেছিল। তারপর থেকে সে এই নীতিটাই ফলো করে।

মেয়েটাকে দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখে নারান তাড়াহুড়ো করল না। শান্তভাবে ছেলেটাকে বলল, "একটু দোকানে থাক। আমি বাড়ি থেকে আসছি। একটা ওষুধ খেতে ভুলে গেছি।"

ছেলেটা চাপ নিল না। দোকানে আড্ডা মারা লোকেরাও সেটা দেখলই না। নারান চুপচাপ বেরোল। মেয়েটার সাথে অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে সাধারণ মানুষের মতই হাঁটতে লাগল। ভিড়ে সে যখন হাঁটে তখন কেউ বুঝতে পারে না। নারান ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগল। বাজারে এখনও সব দোকান খোলেনি। বন্ধের একটা রেশ চলছে। অনেক দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। মেয়েটার দিকে নারান একবারও সরাসরি তাকাচ্ছিল না। মেয়েটাকে দেখার এখন তার কোনও দরকার নেই। মেয়েটার রুটটা তার জানা দরকার। ইটভাঁটা অঞ্চলটা ছাড়াও এলাকায় আরও নির্জন এলাকা আছে যেখানে সচরাচর খুব বেশি লোক থাকে না।

নারানের হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল। প্রতিবারই এই সময়টা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে যায় তার পক্ষে। জোরে জোরে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিলে তারপরে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আসে। সে জানে, এই সময় কিছুতেই ভুল করতে নেই।

মেয়েটা অশ্বত্থতলার দিক দিয়ে ডানদিকে ঘুরল। নারান খুশি হল। যে রাস্তা দিয়ে মেয়েটা তার মানে বাড়ি ফেরে সেই রাস্তার মাঝখানে ভাঙা মন্দিরটা পড়ে। মন্দিরের পিছনে সুন্দর জায়গা আছে ঘাপটি মেরে থাকার। নারান এবার মেয়েটার দিকে তাকাল। রাস্তায় এখন ভালো লোকজন আছে। পরিচিত লোকেদের সাথেও তার দেখা হয়ে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। হাসিমুখে তাদের পার করে যাচ্ছিল সে। মেয়েটা মাঝে মাঝে মোবাইল বের করছে। খুটখুট করতে করতে হাঁটছে। এটাও একটা পজিটিভ ব্যাপার তার কাছে। এর মানে হল চলাফেরার সময় মেয়েটা একেবারেই সতর্ক থাকে না।

ফলো করার সময় মনে মনে প্ল্যানটা ভাজাও হয়ে যায় তার। পেছন থেকে গিয়ে মুখটা গামছায় জড়িয়ে কোনওভাবে ভাঙা প্রাচীরটার পিছনে নিয়ে যেতে পারলেই কেল্লা ফতে। নারান উত্তেজিত হতে লাগল। শুধু জানতে হবে বিকেল বা সন্ধের দিকে মেয়েটা এই রাস্তা দিয়ে কবে যায় বা আদৌ যায় কি না। মেয়েটার বাড়ি এসে পড়েছিল। চারদিক তাকাতে তাকাতে হেঁটে যেতে লাগল সে নির্বিকার মুখ করে।

কিন্তু এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। এই অঞ্চলে কোত্থেকে একটা পাগলের আবির্ভাব হয়েছে সে শুনেছিল বটে কিন্তু কোনওদিন চোখে দেখেনি। চুপচাপ হেঁটে জায়গাটা পার হবার সময়েই তার সামনে লাফ দিয়ে পাগলটা পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অকথ্য গালিগালাজ শুরু করল। নারান পাগলটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা যতই করে ততই পাগলটা তাকে ঘিরে ধরে গালিগালাজ করে যায়। বেগতিক দেখে নারান দৌড় মেরে ওই মেয়েটার বাড়িতেই ঢুকে পড়ল।

কোনও-কোনওদিন না বলে বৃষ্টি আসে। সকাল থেকে গরমে মাথা খারাপ করে দেবে। আর বিকেল নাগাদ এমন বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, যে আগে থেকে কিছু প্ল্যান হয়ে থাকলে সেসব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। কিন্তু সেসব ভেস্তে গেলেও খুব একটা খারাপ লাগে না। বরং বৃষ্টিটাই তখন ভালো লেগে যায়।

শ্রাবন্তীদের বাড়িতে আসার আগে অবধি রূপমের প্ল্যান ছিল শ্রাবন্তীকে নামিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যাবে। তিনটে নাগাদ পৌঁছে লাঞ্চ করে বেরোনো ঠিক ছিল তার। কিন্তু সেসবের কিছুই হল না। বিকেল চারটে নাগাদ বেরোতে যাবে আর সেসময় কালবৈশাখী শুরু হয়ে গেল। শ্রাবন্তীর মা-ই বললেন থেকে যেতে। দুর্যোগের মধ্যে বেরোলে বরং রাস্তায় সমস্যায় পড়ার ব্যাপার থেকে যায়। প্ল্যান ক্যান্সেল করতে হল তাকে।

অনেকদিন পরে বাড়িতে এসে শ্রাবন্তী অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। নিজের ঘর, নিজের সবকিছু নিয়ে বরাবরের মতোই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রূপম টিভি দেখতে চেষ্টা করছিল। মোমের খবরটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিউজ চ্যানেলগুলি দেখাচ্ছে দেখে টিভি বন্ধ রেখে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

ভিজছিল কিন্তু খেয়াল ছিল না। শ্রাবন্তী তাকে ভিজতে দেখে বলল, "ছাদে যাবে? ভিজবে?"

রূপম একটু চমকাল। শ্রাবন্তী হঠাৎ ভেজার কথা বলায় অবাক হল সে। এই মুড চেঞ্জ হওয়া যে বাড়ি ফেরার আনন্দের সাথে যুক্ত সেটা বুঝল। সে বলল, "নাহ, এখানেই ভিজি। যা গরম ছিল।" আসলে সে কথাটা বলল বটে কিন্তু সে যে ইচ্ছা করে ভিজছিল না সেটা আর বলল না।

শ্রাবন্তী জোর করল না। বলল, "স্নান করে নিয়ো। নইলে ঠান্ডা লেগে যাবে।"

রূপম একটা চেয়ার নিয়ে বসল। তাদের বাড়িতে থাকলে যেরকম বৃষ্টি উপভোগ করা যেত, এই জায়গাটা ঠিক সেরকম না। তবুও অনেককেই দেখা যাচ্ছে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে ভিজছে। অনেকদিন প্রচুর গরম পড়েছিল। বৃষ্টিটা হয়ে তাই আবেগের বিস্ফোরণ হয়েছে।

বাড়িতে ফোন করার কথা ভাবছিল সে। বাড়িতে খবর দেওয়াটা দরকার ছিল। মোবাইলটা ড্রয়িংরুমে রেখে এসেছে। মোমের দাদাকেও ফোন করে বলে দেওয়া দরকার ফিরবে না সে।

আসলে কি ভালোই হল ব্যাপারটা? যদি যেত, তাহলে ঠিক কী সান্ত্বনা দিত সে মোমের মাকে? বৃষ্টির মধ্যেও রূপমের চোখের সামনে মোমের শরীরটা ভেসে উঠতে লাগল বারবার।

সে কি কোনওদিন মোমের শরীর কল্পনা করেনি? করেছে তো। তারা যখন প্রেম করত, কল্পনায় অনেকবারই মোমকে নগ্ন ভেবেছে সে। প্রেমে তো অবধারিতভাবেই শরীর এসেছিল। মোমকে প্রথম চুমু খাওয়ার সময় শরীর জেগেছিল।

মোম তো তাকে দিয়েই দিয়েছিল নিজেকে। ভয় পেয়ে সে-ই সরে এসেছিল তখন। তারপরেই বাবার সেই ঝামেলা। অনেক চেষ্টা করেছিল সে মোমকে মুছে ফেলতে।

ধর্ষিত নগ্ন শরীরটা সেই ভুলে যাওয়াগুলিকে বারবার ফিরিয়ে আনছে কেন? তবে কি তারও মধ্যে একটা ধর্ষক লুকিয়ে আছে? আর ভাবতে পারল না রূপম। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

একটা শরীর তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে কাল থেকে। রূপম ঠিক করে উঠতে পারছে না আসলে মোম তাকে তাড়া করছে, না ওই নগ্ন শরীরটা। যে শরীরটা সে অনায়াসে কাছে পেতে পারত, একটা অচেনা অজানা ধর্ষক সেই শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করেছে, আঘাত করেছে বারবার। ছ-মাস সাতমাস পর পর এলাকায় একটার পর একটা ধর্ষণ করে যাচ্ছে লোকটা। কারও না কারও বাড়ির মেয়েকে পৈশাচিকভাবে মেরে চলেছে। রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে যা ইচ্ছা তাই করছে আর কেউ কিছু করতে পারছে না। রূপমের ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এই ধরনের লোকের বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। কুকুরের মতো টেনে হিঁচড়ে মেরে ফেলা উচিত এদের।

স্নান সেরে বেরিয়ে শ্রাবন্তীর ঘরে ঢুকল সে। এখানে এলে এই ঘরেই থাকে সে। চুল আঁচড়াতে যাবে হঠাৎ শ্রাবন্তী এল। বলল, "আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

রূপম বুঝল হোম অ্যাডভান্টেজ নেবার সময় এসে গেছে শ্রাবন্তীর। সে চুল আঁচড়ে খাটের ওপরেই বসল। বলল, "বল।"

শ্রাবন্তীও বসল। একটু দূরত্ব রেখে। তারপর বলল, "তুমি মেয়েটার কথা কোনওদিন বলোনি তো।"

রূপম শ্রাবন্তীর চোখে চোখ রাখল। বলল, "বলিনি কারণ ওই সম্পর্ক থেকে আমিই নিজে থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তারপরে কোনওরকম যোগাযোগ রাখিনি।"

-বেরিয়ে এসেছিলে কেন? কোনও ঝামেলা হয়েছিল?

-স্কুল লাইফ থেকে কলেজ লাইফে প্রেম ছিল। বাবা তারপরে জানতে পেরে খুব ঝামেলা করেছিল। আমি সেই সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আগে নিজের পায়ে দাঁড়াব তারপর এইসব সম্পর্কে জড়াব। সেসময়ে বেরিয়ে আসার পরে আর ওর সাথে সেরকম কোনও যোগাযোগ রাখিনি।

শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "তুমি তাহলে কাল সকালেই জানতে পারলে ওকে তুমি এখনও ভালোবাস?"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বাইরে বৃষ্টি কমছিল আর ঘরের ভিতর এক অস্বস্তিকর নীরবতা দুজনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করল।

২৯
মিলি

উফ, আজ পাগলটা যা কাণ্ড করল!!! এখনও ভাবতেই হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বাজারের মুদির দোকানের কাকুটা বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন সবে পড়ে ফিরেছি। হঠাৎ পাগলাটা কাকুকে তাড়া করেছিল। উনি একদৌড়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লেন। আর পাগলটা তখন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁত মুখ খিঁচাচ্ছে।

এত হাসি পেয়ে গেছিল ওনার রিঅ্যাকশান দেখে। কিন্তু হাসতেও পারছিলাম না। বাবা তো কাকুকে দেখে ঘরে বসাল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। আমি ঘরে এসে দিদিকে ব্যাপারটা বলে দুজনে মিলে খুব একচোট হাসলাম। পাগলটা আজকাল যা শুরু করেছে না! কোনদিন না পাবলিক পিটিয়েই দেয় ওকে। তবে ও কিন্তু আমাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করে এটা বলতেই হবে। মা দুপুরে ভাত দেয় রোজ। চুপচাপ খেয়ে নেয়। কোনও কথা বলে না। অন্য সময়টা পাড়ার কুকুরগুলোর সাথে সিভিল ওয়ারে নামে। এ ওকে তাড়া করছে তো ও তাকে তাড়া করছে।

দিদি একদিন ওকে লুচি খাইয়েছিল। চিনি দিয়ে। সে কী খুশি! অনেকক্ষণ লুচিটাকে দেখে তারপরে খেল।

মুদির দোকানের কাকুটা বাবার সাথে কথা বলতে বলতে প্রায়ই বাইরে তাকাচ্ছিল। শেষমেষ আমি বলেই দিলাম, "কাকু, ভয়ের কিছু নেই, পাগলটা আমাদের কথা শোনে, তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পারো।"

কাকুটা আমার কথায় বিশেষ ভরসা পেল বলে মনে হল না। শেষে আমিই বললাম, "আচ্ছা চলো, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দি।"

পাড়ার মোড় অবধি কাকুটাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। বেজায় হাসি পাচ্ছিল। ওদিকে যখন এগোচ্ছিলাম পাগলটাও আমাদের পিছু পিছু আসছিল। কাকু একবার সামনের দিকে হাঁটে, আর তারপরেই পিছন ফিরে দ্যাখে পাগলটা কামড়াতে আসছে নাকি।

মোড়ের দোকান থেকে পাগলটাকে একটা বিস্কুট কিনে দিলাম। পাগলটা বিস্কুটটা দেখে আমার সাথে ফিরতে লাগল।

বাড়ি ফিরে মা আবার বেজায় বকা দিল, "তুই পাগলটার কাছে যাস না বেশি। কখন কামড়ে-টামড়ে দেবে তখন বুঝবি কেমন লাগে। জলাতঙ্ক হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে শেষে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "কুকুরে কামড়ালে তো জলাতঙ্ক হয় জানতাম মা, পাগলে কামড়ালেও হয়?"

মা গজগজ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল, “রূপমকে একটা ফোন কর তো। ছেলেটা ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।”

আমি ফোন করলাম। বেশ কয়েকবার রিং হয়ে গেল। দাদা ফোনটা ধরল না। মাকে সেটা বলতেই মা গম্ভীর হয়ে বলল, “দেখ আবার কী পাগলামি শুরু করল, বউমার সাথে আবার ঝগড়া না করে। ছেলেটাকে নিয়ে আর পারি না।”

দিদি বলল, “আমার দাদা ওরকম না। খামোখা বউদির সাথে ঝগড়া করতে যাবেই বা কেন? বরং বউদিই তো বেশি খুঁতখুঁত করে দেখেছি।”

মা গোমড়া মুখে বলল, “ও তোরা বুঝবি না। বউকে তো ওকেই নিজের মতো করে নিতে হবে। মেয়েটা একটু রগচটা বটে কিন্তু বয়সটা তো কম। ও যেরকমই হোক, রূপমেরও ওকে সময় দেওয়া উচিত। কালকে ওর সাথে ওরকম না করলেই পারত ছেলেটা।”

দিদি বলল, “দাদা কী করবে? দাদার কি আর মাথা ঠিক ছিল কাল? আমারও তো ইচ্ছা করছিল একছুটে গিয়ে মোমদিকে দেখে আসি। আমি তো এখনও ভাবতে পারছি না...”

দিদির গলাটা ধরে এল। মা বলল, “আমি কি আর ভাবতে পারছি রে? কত ভালো মেয়ে ছিল একটা। লাখে একটা পাওয়া যায় এরকম মেয়ে। যেমন ভালো ব্যবহার, তেমন তার কথাবার্তা”, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মা।

আমার ফোনটা বেজে উঠল। দাদা। ফোন ধরতেই বলল, “কী রে ফোন করেছিলি?”

-হ্যাঁ। মা জিজ্ঞেস করছে তুই আজ ফিরছিস তো?

-না রে এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কাল যাওয়ার চেষ্টা করছি।

ফোনটা কেটে গেল। মা আর দিদি দেখি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। মাকে বললাম দাদা থেকে যাবে।

মা খুশি হল, “ভালো হয়েছে। থাকুক। ওর ওখানেই থাকা উচিত। আমি ভাবছিলাম বলি। তারপর দেখলাম ওতে যাও বা যাবার জন্য বলেছিলাম, পরে যদি ভেস্তে যায়, তাই আর বললাম না। থাক ওখানে। একসাথে থাক দুজনে।”

দিদি বলল, “মা কাল একটু বেরোব। টিউশনের নোটসের জন্য। অবশ্য অয়ন থাকবে সাথে।”

মা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, “অয়ন যেন বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে যায়। যা দিনকাল পড়েছে আজকাল।”

আমার খুব রাগ হল কথাটা শুনে। অয়নদার সাথে টিউশনের নাম করে লুকিয়ে লুকিয়ে অ্যাপো মারা হবে? দাঁড়া দেখছি তোকে।

ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললাম, “এক কাজ কর না দিদি, অয়নদাকে বল নোটসগুলি নিয়ে আসুক। যা দিনকাল পড়েছে। একা যাবি?”

দিদি রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে তাকাল। আগের দিন হলে নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেতাম। তারপর বলল, “অয়ন আমাদের চাকর না মিলি। এটা বোঝার চেষ্টা কর।”

আমি বললাম, “আর ওই সিনেমা পেন ড্রাইভে করে আনার দরকার হলে তখন অয়নদা আর চাকর থাকে না, না?”

দিদি রেগে আমার কানটা মুলে দিল, “বেশি পাকা হয়েছ না? চুপচাপ নিজের কাজ কর। পড়াশোনা করতে বস।”

আমিও দিদিকে চিমটি কেটে দিলাম। লেগে গেল দুজনে।

৩০

রূপমের শেষরাতে ঘুম এসেছিল। শ্রাবন্তী ঘুমিয়ে পড়েছিল আগেই। রাতে খিচুড়ি ডিমভাজা রাঁধল শ্রাবন্তী। নিজে থেকেই মা-র সঙ্গে রান্না করল। শ্রাবন্তীর বাবা অফিস থেকে ফেরার পর রূপমের সঙ্গে মোমকে নিয়েই

কথা বলে গেলেন। তিনি মোমকে চেনেন না। তাদের এলাকার ঘটনা টিভিতে বারবার দেখানো হচ্ছিল বলে সেটা নিয়েই কথা হচ্ছিল। রূপম বলল না মোমের ব্যাপারে কিছুই। গোটাটাই ওপর ওপর দিয়ে গেল।

রাতে সেই সমস্যাটা ফিরে এল। শুল কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শ্রাবন্তী শুয়ে পড়েছিল। বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে তারপরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল রূপম। অনেক ঘরেই এখনও লাইট জ্বলছে। নিশাচর হয়ে পড়ছে মানুষ। আগে তাড়াতাড়ি ঘুমাত, এখন ইন্টারনেট জাগিয়ে রাখে সারারাত। বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে ঠান্ডার আমেজটা ছিল। অবশ্য শ্রাবন্তীর ঘরে এসি আছে। রূপম রাত দুটো অবধি বারান্দায় বসল। তারপর এপাশ-ওপাশ করতে করতেই ঘুম এল।

সকাল আটটা নাগাদ শ্রাবন্তী ঘুম ভাঙাল তার। রূপম ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "এখন তুললে কেন? আর-একটু ঘুমিয়ে নিতাম।"

শ্রাবন্তী ভারী গলায় বলল, "ওঠো, কথা আছে।"

রূপম বুঝল না আবার কী হল। এই তো আগের দিনই ঠিকঠাক ছিল। সে উঠে বসল। বলল, "এবার বলো।"

শ্রাবন্তী বলল, "ডাক্তার আন্টির কাছে যেতে হবে। আজই।"

রূপম বুঝল না হঠাৎ ডাক্তার এল কোত্থেকে। সে বলল, "কী হল আবার? ডাক্তার কেন?"

শ্রাবন্তী ধরা গলাতেই উত্তর দিল, "আমি প্রেগন্যান্ট, টেস্ট পজিটিভ দেখছি।"

রূপম ভুলেই গেছিল আসলে এই কারণেই তারা শ্রাবন্তীর বাড়িতে এসেছে। কথাটা শুনে হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল তার। এই কথার প্রতিক্রিয়ায় সে খুশি হবে না দুঃখ পাবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

সে বলল, "ডাক্তার আন্টির কাছে কেন যাবে?"

শ্রাবন্তী গম্ভীর গলায় বলল, "বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট দিস চাইল্ড নাও। এখনও অনেক কিছু দেখার আছে আমার। এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যেতে পারে না। আমাদের অ্যাব্রোড ট্যুরটাই তো এখনও হল না। এভাবে সব শেষ হয়ে যাবে?"

রূপম চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "সে তুমি যা ভালো বোঝো করো, আমি আর কী বলব। আমি দাঁত মেজে নি।"

উঠল রূপম। সে ঠিক করল এই বিষয়ে শ্রাবন্তীকে আর একটা কথাও বলবে না। যা ইচ্ছা করুক। একটু পরে দাঁত মাজতে মাজতেই অবশ্য প্রশ্নটা মাথায় এল তার। বেরিয়ে বলল, "আচ্ছা তোমার যা দেখার আছে সেটা বাচ্চা হলে দেখা যাবে না কেন?"

শ্রাবন্তী বলল, "অত তোমাকে বোঝাতে পারব না। ওখানে একা একা থাকি। বাচ্চা হলে সামলাবে কে? নিজে তো সারাক্ষণ অফিসেই বসে থাকবে। এদিকে আমি রান্না করব না বাচ্চা সামলাব?"

রূপম ঠান্ডা গলায় বলল, "বাড়িতে থাকবে যখন বাচ্চা ছোটো থাকবে। আমার মা আছে, রূপসী আছে, মিলি আছে।"

শ্রাবন্তী জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে শ্লেষাত্মক গলায় বলল, "আর তুমি সেসময়টা গুরগাঁওতে লীলা করবে তাই তো?"

রূপম মাথা গরম করল না। সে জানে শ্রাবন্তী এই কথাগুলো বলছে তাকে রাগিয়ে দিতে। সে মুখ মুছল টাওয়েল দিয়ে। তারপর বলল, "সকালে লুচি হবে তো আজ?"

শ্রাবন্তী বলল, "আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও। আমি ওই ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে বাচ্চা নিয়ে পড়ে থাকব আর তুমি গুরগাঁওতে মজা মারবে?"

রূপম বলল, "তুমিই তো বলছ তোমার একা থাকা ওখানে সমস্যা। তাই বললাম। আর-একটা কাজও তো করতে পারো, তুমি এখানে থেকে যাও বাচ্চাটা যতক্ষণ ছোটো থাকবে। ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে তাহলে আর থাকতে হল না তোমায়। সেটা কেমন হয়?"

শ্রাবন্তী বলল, "আমি এখন নিতে চাই না।"
রূপম বলল, "কবে নিতে চাও। বলো।"
শ্রাবন্তী তার দিকে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "অন্তত তিন থেকে চার বছর পরে।"
রূপম কাঁধ ঝাঁকাল, "দ্যাখো, তুমিই সিদ্ধান্ত নাও। আমার তো কোনও সমস্যা নেই।"
শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ওই মেয়েটার সাথে তোমার ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল? কোনওদিন কিছু করেছ?"
রূপম বুঝছিল মাথার ভেতরের আগ্নেয়গিরিটা ধীরে ধীরে জাগছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাল সে, পরিষ্কার বুঝতে পারছিল মাঝে মাঝেই আজকাল এই টাইপের কথাবার্তা শুনতে হবে তাকে। কিছুই বোঝেনি এমন মুখ করে বলল, "কী করেছি? সেক্স?"
শ্রাবন্তী চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "হ্যাঁ। ফার্স্ট লাভ তো। নিশ্চয়ই করেছ তাই না?"
রূপম শ্রাবন্তীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "বিয়ের আগে তো আমি সোনাগাছিও গেছি। তোমায় বলিনি। এখন বললাম।"
শ্রাবন্তী বিস্ফারিত চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "আর ইউ সিরিয়াস?"
রূপম আবার আধশোয়া হল বিছানার ওপরে। তারপর বলল, "তুমি তো অনেকরকম থিয়োরি খাড়া করছ, এটা আমি আমার তরফ থেকে অ্যাড করে দিলাম। কেমন থিয়োরিটা? ভালো না? দ্যাখো না, এ তো হতেই পারে কলেজে পড়তে পড়তে বন্ধুদের সাথে গেলাম। হতে পারে না?"
শ্রাবন্তী বুঝতে পারছিল না রূপম ঠিক বলছে না তাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। সে বলল, "হতেই পারে। কে দেখতে যাচ্ছে?"
রূপম বলল, "তাহলে সেরকমই কিছু একটা ধরে নাও। কল্পনায় বিরিয়ানিই যখন রাঁধবে তখন ভালো করে মশলা দাও। আর শোন, অ্যাবরশন করাবে করাও, সেটা নিয়ে আমি একটা কথাও বলব না, কিন্তু দয়া করে এসব প্রশ্ন আর ভবিষ্যতে করবে না।"
শ্রাবন্তী তার দিকে জ্বলন্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বেশ শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৩১
মিলি

অয়নদা এলে আমি ওদের সামনে থেকে উঠি না। চুপচাপ বসে থাকি। কিছুতেই ফ্রি স্পেস দেওয়া যাবে না ওদের। ফ্রি স্পেস পেলেই আমার যেটুকু চান্স ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। অয়নদা আজ সকালেই এসেছে। দিদির কীসব নোট আছে সেগুলো নিয়ে।
আমি ভালো মেয়ের মতো চুপচাপ বইটা খুলে রাখলাম আর ওদের দিকে কান খাড়া করে রাখলাম। অয়নদা বলছিল, "মোমদির ব্যাপারটা এখনও ভাবতে পারছি না রে।"
দিদি বলল, "এসব কথা থাক এখন। ভালো লাগছে না।"
অয়নদা বলল, "পালিয়ে থেকে আসলে কি কিছু হয়? আমার তো মনে হয় না। আমার মতে এসব ব্যাপারকে সরাসরি সামনে থেকে দেখা উচিত। আমি তো রূপমদাকে সাপোর্ট করব। সারাদিন ওখানে থাকল। জাস্ট ভাবা যায় না।"
আমি টুক করে ফুট কাটলাম, "হুঁ, আর সব দেখে শুনে বউদি ফায়ার হয়ে গেছে।"
দিদি আগেকার দিনের মুনিঋষিরা যেমন ভস্ম করে দেবার চোখ করতেন সেরকম চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব পেকেছিস মিলি। বউদি ফায়ার হয়েছে না কী হয়েছে সব বলতে হবে?"
আমি যথাসম্ভব সরল মুখ করে বললাম, "কেন রে দিদি অয়নদা কি বাইরের কেউ?"

অয়নদা আমার কথা শুনে হেসে বলল, "মিলি এত পেকেছিস কেন রে?"

দিদি বলল, "দেখ না, সারাক্ষণ শুধু টুকটুক করে যত রাজ্যের ভাট বকে যাচ্ছে। নয়তো মোবাইলে খুটখুট করে যাচ্ছে।"

অয়নদা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। সেদিন ওটা কী মেসেজ পাঠালি রে, বুঝলাম না কিছু?"

কেলো করেছে। একটা প্রেম-প্রেম মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, অয়নদা সেটাই বলে দিয়েছে। এবার আমার হয়ে গেল। যে করে হোক ম্যানেজ দিতে হবে মুখ করলাম, "আরে আমিও তো ঠিক বুঝতে পারিনি আসলে। তোমাকে ফরোয়ার্ড করলাম যাতে তুমি বুঝিয়ে দাও।"

দিদি এবার আমাকে চেপে ধরার চেষ্টা শুরু করল, "কেন আমি তো বাড়িতে ছিলাম। অয়নকে পাঠাতে হল কেন? দেখা তো কী পাঠিয়েছে।"

অয়নদা বলল, "আরে সেসব কি রেখেছি নাকি? কখন ডিলিট করে দিয়েছি। আসলেই মিলি বোঝেনি ও কী পাঠাচ্ছে।"

আমার চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম হল। ওটা শুধু একমাত্র অয়নদার জন্যই পাঠিয়েছিলাম আর অয়নদা ডিলিট করে দিল? আর কিচ্ছু পাঠাব না দাঁড়াও। মুখটা অবশ্য হাসি হাসিই রাখতে হল, নইলে দিদি বুঝে গেলে বড়ো কেলো হয়ে যাবে।

দিদি বলল, "দাঁড়া দাদা আসুক, তোর মোবাইলের ব্যবস্থা হচ্ছে। খুব পেকেছিস তুই। মোবাইলটা যেন টুয়েলভ পাশ করার আগে তোকে না দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা করছি।"

অয়নদা হেসে ফেলল, "এ কি আর এভাবে আটকানো যায় নাকি? ও তো যা পাকার পেকেই গেছে।"

আমি অয়নদার এই কথাগুলোর জন্যই আরও বেশি করে ওর প্রেমে পড়ে যাই। কী সুন্দর করে কথাগুলো বলে। দিদি কিছুক্ষণ গজগজ করতে লাগল। তারপর বলল, "তুই জানিস না মিলি কতটা পেকেছে। সারাক্ষণ শুধু গিন্নি গিন্নি ভাব করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

অয়নদা বলল, "সেরকম থাকা ভালো। কিন্তু মিলি, তুই যে এগুলো পাঠাস সেগুলো কোত্থেকে পাস? তোকেও নিশ্চয় কেউ এগুলো ফরোয়ার্ড করে। উলটোপালটা ছেলেদের সাথে মিশিস না তো?"

ওহ... কত কেয়ার করে... আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছা করছিল। যথারীতি ক্যাবলার মতোই বললাম, "কেউ পাঠায় না অয়নদা। ফেসবুকের পেজগুলো থাকে না, ওখান থেকেই ডাউনলোড করে রাখি।"

অয়নদা বলল, "উফ এই এক হয়েছে। সারাক্ষণ ন্যাকা ন্যাকা পোস্টার। তুই চলে গেলি তাই আমি সর্দি ঝাড়া বন্ধ করে দিয়েছি। উফ। ডিসগাস্টিং।"

দিদি বলল, "তুই এসব পেজে কী করিস মিলি? তোর আবার এত প্রেম আসছে কোত্থেকে?"

আমি দিদির দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে বললাম, "তোকেই তো দেখলাম এই টাইপেরই কোনও একটা পোস্ট শেয়ার করলি একটু আগে, আবার আমাকে বলছিস কেন?"

দিদি রাগল, "আমি তোর থেকে বড়ো সেটা ভুলে গেলে হবে মা? তা ছাড়া তোর মতো এইসব পেজে আমি দিন রাত পড়ে থাকি না। আমার পড়াশোনা আছে, আরও অনেক কিছু আছে।"

অয়নদা হাত তুলল, "শান্তি শান্তি। গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিলি তো তোরা। এবার বন্ধ কর। তবে এটা ঠিক, মোবাইলের ব্যবহার আমাদের সবারই কমিয়ে দেওয়া উচিত। মিলিকে কালকে দেখলাম হোয়াটসঅ্যাপে লাস্ট সিন রাত দেড়টা। এত রাত অবধি কী করিস মিলি?"

কথাটা শুনে আমার দুরকম প্রতিক্রিয়া হল। যাকে বলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ভালো প্রতিক্রিয়াটা হল এই, তার মানে অয়নদা আমার লাস্ট সিনটা দ্যাখে। একটু হলেও চিন্তা করে আমার জন্য। আর খারাপটা হল এত রাত অবধি দেখে থাকলে খারাপ কিছু ভাবছে না তো? তাই আগেভাগেই কাঁদুনি গেয়ে রাখলাম, "এটা মোবাইলের প্রবলেম অয়নদা। মনে হয় ফোনে কোনও সমস্যা আছে।"

দিদি থামাল, “তুই চুপ কর। রাতে তো কোনওদিনও দুটোর আগে ঘুমাস না। ইয়ার্কি হচ্ছে এখন? ফোনে সমস্যা? যতসব!!!”

আমি কটমট করে দিদির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

৩২

কলকাতার সাথে রূপমের পরিচয় কম। মফস্সলে কিংবা কলেজে থাকা অবস্থাতেও তাই দেখে এসেছে। চাকরি পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে যাবার পর কলকাতা তো একেবারেই দূরে সরে গেছিল তার কাছে। শ্রাবন্তীর সঙ্গে বিয়ের আগে মাঝে মাঝে ঘুরেছে বেশ কিছু মলে। কিন্তু তাও ট্যাক্সি করে যাতায়াত হত। গন্তব্য বলে উঠে পড়ত, ফেরার সময়েও ট্যাক্সি। কলকাতার মধ্যে শ্রাবন্তীদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে টুরে যেতে হলে একটু অস্বস্তিই হয় তার।

শ্রাবন্তীর ডাক্তার আন্টি ফ্ল্যাটের কাছেই বসেন সেটা জেনে একটু স্বস্তি পেল সে। দুজনে মিলে যখন বেরোল তখন সন্ধে নেমেছে। শ্রাবন্তীদের ফ্ল্যাটের সামনে থেকে খানিকটা গেলেই একটা ওষুধের দোকান। সেখানেই বসেন উনি। পৌঁছে দেখা গেল বেশ ভিড় হয়েছে। নাম লেখানো ছিল না। শ্রাবন্তী আশ্বাস দিল তাকে দেখলেই নাকি উনি কাউকে দিয়ে ঠিক ডাকিয়ে নেবেন। তবু রূপম নাম লিখিয়ে নিল। বোঝা যাচ্ছিল ভদ্রমহিলা বেশ নামকরা গায়নোকলজিস্ট। রূপম চারদিক চোখ বোলাল। বেশ কয়েকজন সন্তানসম্ভবা। কেউ কেউ আগের জনকে নিয়েও এসেছে। স্বামী কাজে গেছেন হয়তো, বাড়ি ফাঁকা, কিছু করারও নেই।

শ্রাবন্তীকে বসিয়ে রূপম মোবাইলে ডেটা অন করল। কলিগদের গ্রুপে সানি লিওনই টপে যাচ্ছে এখন। যারা বেশি বয়স্ক তাদের মধ্যেই আবার এই ছবিগুলো বিতরণের প্রবণতা বেশি। প্রেম সিং বলে একজন সিনিয়র আছেন, সারাদিন এইসব পাঠিয়ে যাবেন। বলেন সানি লিওন নাকি পাঞ্জাবের গর্ব। ওদিকে ওঁর বাড়িতে উনি একজন গম্ভীর অভিভাবক। দুই ছেলেকে সকাল বিকেল শাসনে অতিষ্ঠ করে দিচ্ছেন। তবে ভাবিজি অসাধারণ রান্না করেন। প্রায়ই রূপম পঞ্জাবি খাবার খেতে চলে যায় প্রেম সিংয়ের ফ্ল্যাটে। বেশ দিলদরিয়া আমুদে লোক প্রেম সিং। গেলেই বোতল খুলে বসে পড়বেন। ছুতো পেলেই হল। শ্রাবন্তী রাগ করে দু-পেগের বেশি হয়ে গেলে। তবে ও অন্য ঘরে থাকে, ভাবিজির সাথে গল্প করে। ওই সময়ে রূপম দু-চার পেগ আরও চড়িয়ে নেয়। মিস্টার আইয়ার বলে আর-একজন সিনিয়র থাকেন। তিনিও খুব অতিথিপরায়ণ। তার বাড়িতে আবার শ্রাবন্তী বেশি যেতে চায়। সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারের ভীষণ ভক্ত ও। রূপমের সাউথ ইন্ডিয়ান পোষায় না। সম্বর মশলা খুব একটা ভালো লাগে না। রূপম ভাবছিল এরকম চাকরিই তার পক্ষে সব থেকে ভালো হয়েছে। গোটা দেশের লোকেদের সাথে কথাবার্তা হয়। পশ্চিমবঙ্গে থেকে যে মানসিক সংকীর্ণতা তৈরি হয় তার থেকে রাজ্যের বাইরে চাকরি করাটা অনেক ভালো হয়েছে। বাড়ি থেকে দূরে থাকাটা যদিও একটা সমস্যা তবু হোমসিকনেসটা কাটিয়ে ফেললে বাইরে থাকাটাই অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক তার কাছে।

সে ঠিক করল ডাক্তার দেখানো হয়ে গেলে শ্রাবন্তীকে নিয়ে কোনও সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় যাবে। গুমোট পরিস্থিতিটা একটু কাটানো দরকার।

শ্রাবন্তী ঠিকই বলেছিল, তিন-চারজনের পরেই ডাক এসে গেল। ডাক্তার আন্টি শ্রাবন্তীকে খুব আদর করলেন। তাকে মজা করে বেশ কড়া গলায় বললেন, “আমার মেয়েকে ভালোভাবে রাখছ তো?”

রূপম হেসে ফেলল।

শ্রাবন্তী একটু ইতস্তত করে বলল, “আন্টি, আমার টেস্ট পজিটিভ এসেছে। প্লিজ কিছু করো।”

আন্টি কিছুক্ষণ শ্রাবন্তীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, “পজিটিভ এসেছে মানে?”

শ্রাবন্তী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “আমি প্রেগন্যান্ট, আন্টি!”

আন্টি একবার রূপমের দিকে আর একবার শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাতে এত দুঃখিত হবার কী আছে?”

শ্রাবন্তী বলল, “আমি এখনই কিছু চাইছি না আসলে। কিছুই তো দেখলাম না জীবনে।”

আন্টি রূপমকে বললেন, “তোমারও কি তাই মত?”

শ্রাবন্তী রূপমের দিকে তাকাল। রূপম স্পষ্ট বলে দিল, “না। তবে যেহেতু পুরো প্রসেসটা ওর ওপর দিয়েই হবে তাই এই ডিসিশনটা আমি ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।”

আন্টি চেয়ারে হেলান দিলেন। একটু থেমে শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে কড়া ভাষায় বললেন, “আপাতত ব্লাড টেস্টটা করা। সেটা দেখ। ডিসিশন নে কী করবি। যদি নিস তাহলেই আসবি আমার কাছে। ঠিক আছে?”

শ্রাবন্তী ফ্যাকাশে হল খানিকটা। মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। আন্টি কিছু টেস্ট দিয়ে ছেড়ে দিলেন। টাকা নিলেন না।

রাস্তায় বেরোল তারা। হাওয়া দিচ্ছিল। শ্রাবন্তী বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, “তোমার ওরকমভাবে বলার কী দরকার ছিল? বলে দিলেই পারতে আমি এখন বাচ্চা চাইছি না।”

রূপম বলল, “আমি তো তোমাকে প্রথম থেকেই বলছি এসব ব্যাপারে আমার স্ট্যান্ড খুব ক্লিয়ার। অকারণ জটিলতা বাড়াব কেন? তা ছাড়া অ্যাবরশন করলে তো অনেকরকম কমপ্লিকেসি আসতে পারে। সেক্ষেত্রে কে সামলাবে?”

শ্রাবন্তী আবার চুপ মেরে গেল। হাঁটতে হাঁটতে তারা বাজারের কাছে চলে এসেছিল। সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁটা দেখা যাচ্ছিল। রূপম বলল, “চলো একটু ধোসা খাওয়া যাক।”

শ্রাবন্তী অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি তো ধোসা পছন্দ করো না!”

রূপম বলল, “তুমি তো করো। তুমি খাও, আমি ইডলি নি একটা।”

শ্রাবন্তী বলল, “থাক। ইচ্ছা করছে না খেতে।”

রূপম বলল, “চলো, খাও। তারপর কী করবে দেখা যাবে।”

অনেকক্ষণ বাদে শ্রাবন্তী হাসল। রূপমও।

৩৩
মিলি

মাঝে মাঝে পাগলের মতো কাজ করি। যে কাজটার জন্য অনেক ঝাড় খেতে হয় পরে। কিন্তু সেই পাগলামিটা করার জন্য কেন জানি না ভীষণ ইচ্ছা হয়।

রাতে শুয়েছি, দেখি দিদি মোবাইলে খুটখুট করে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল শিয়োর অয়নদাকেই মেসেজ করছে। আমিও আমার মোবাইল থেকে অয়নদাকে মেসেজ করে দিলাম, “কী করছ?”

মিনিট পাঁচেক কোনও রিপ্লাই এল না। দিদিকে দেখে বুঝলাম না অয়নদা ওকে এই নিয়ে কিছু বলেছে নাকি। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি অয়নদা রিপ্লাই করেছে, “পড়ছি।”

সাথে সাথে রিপ্লাই করলাম, “প্রেম করছ না?”

মেসেজটা পাঠিয়ে বুঝলাম বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সাথে সাথে একটা হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে যাওয়া স্মাইলি পাঠিয়ে দিলাম। অয়নদা রিপ্লাই করল, “প্রেম করব মানে? কী বলতে চাইছিস?”

আমি একটু ভাবলাম। তারপর লিখলাম, “প্রেম করবে মানে প্রেম করবে। তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে।”

রিপ্লাই এল, “আমার গার্লফ্রেন্ড? কে সে?”

আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। কী উত্তর দেব ভাবতে লাগলাম। তারপর উত্তর না দেওয়াই ঠিক করলাম।

দেখি আবার মেসেজ করেছে, “কী রে, কী বলছিস খুলে বল। কিছুই বুঝতে পারছি না তো! আমার গার্লফ্রেন্ড পেলি কোত্থেকে তুই?”

আমি বুঝে গেলাম নিজেই নিজের বাঁশ টেনে এনেছি। লিখলাম, “না তোমার তো গার্লফ্রেন্ড থাকবে এটাই তো ন্যাচারাল, না? তুমি এত হ্যান্ডু।” বলে আবার একটা স্মাইলি দিয়ে দিলাম, বেগুনিমুখো শয়তানওয়ালা।

অয়নদা দেখি টাইপ করছে। আমি এবার আড়চোখে দিদির দিকে তাকালাম। দিদিও টাইপ করছে।

হঠাৎ কেমন যেন একটা খটকা লাগল। দিদি অয়নদাকেই মেসেজ করছে তো? নাকি অন্য কাউকে? ব্যাটা বিরাট চাপা স্বভাবের মেয়ে। পেটে বোম মারলেও ওর পেট থেকে কিছু বের করা শিবেরও অসাধ্য।

মা প্রায়ই বলে রূপসী আর মিলি যে কী করে বোন হল কে জানে। একটা তো কিছু হলেই ঢাক ঢোল নিয়ে গোটা পাড়া রাষ্ট্র করতে বেরিয়ে যায়। আর-একটা আছে, কিছুতেই কিছু বলবে না।

আমি তখন দিদিকে খ্যাপাতে বলি, “মা দিদির নাম চাঁপা রাখতে পারতে।”

দিদি কটমট করে আমার দিকে তাকায়।

সেই দিদি এখন কাকে টাইপ করছে? অয়নদাকে? আমার নিজের মাথায় একটা গাঁট্টা মারতে ইচ্ছা হল। সেদিন যখন দিদির মোবাইল প্যাটার্ন লক ভেঙে দেখছিলাম, অন্য মেসেজগুলো একটাও দেখিনি। অয়নদার নামটা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটায় কী লেখা আছে সেটাই দেখছিলাম। আমার উচিত ছিল দিদির অন্য মেসেজগুলো পড়া।

সেদিনের পরে দিদি কিছু একটা সন্দেহ করেছিল। মোবাইলের প্যাটার্ন লক চেঞ্জ করে দিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি। জাসুসি করা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। ও যখন মোবাইল ঘাঁটে আমি শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। আনলক করার সময় খুব সতর্ক হয়ে যায় আজকাল। তবুও পালিয়ে যাবে কোথায়।

আমার হাত ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অত সোজা নাকি!

অয়নদার রিপ্লাই এল, “আমি হ্যান্ডু? কোত্থেকে এসব শিখছিস মিলি? গাঁট্টা খাবি?”

আমি ফিউজ হয়ে গেলাম। যাহ্‌বাবা, যার ওপর আমার ক্রাশ সে যদি বলে বসে গাঁট্টা মারবে, সেটা কেমন একটা ইয়ে ইয়ে ব্যাপার হয়ে যায়!

কিছু না লিখে আবার সেই হাসতে হাসতে চোখের জল বেরিয়ে যাওয়া স্মাইলিটা পাঠিয়ে দিলাম।

অয়নদা রিপ্লাই করল, “তুই কি আবার বয়ফ্রেন্ড জুটিয়ে ফেললি নাকি? বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে। পুঁচকি পুঁচকি মেয়েদেরও বয়ফ্রেন্ড দেখছি চারিদিকে।”

আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম, “আমি মোটেও পুঁচকি না অয়নদা। তা ছাড়া আমার বয়ফ্রেন্ড না থাকলেও আমার অনেক বন্ধুদেরই আছে। আর সেটা যথেষ্ট ম্যাচিওর রিলেশনশিপ। তোমার আর দিদির মতোই।”

এই সেই কেলো। মেসেজটা পাঠিয়েই বুঝলাম অতি উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হয়ে আসলে বিরাট বাঁশ নিজেকেই নিজে দিয়ে দিয়েছি।

অয়নদা কী রিপ্লাই করল সেটা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করলাম না। ফোনটা বন্ধ করে দিলাম।

অয়নদা দিদির সাথে আদৌ প্রেম করে কি না সেটা নিয়েই আমি কনফার্ম নই, এদিকে এটা লিখে দিলাম। যদি করেও থাকে, তাহলেও আমার ঝাড় খাবার সম্ভাবনা প্রবল, না করে থাকলে তো হয়েই গেল। পুরো শহিদ হয়ে গেলাম।

ফোনটা দূরে সরিয়ে রেখে ঠিক করলাম আগাম জামিন নিয়ে রাখি। দিদিকে জানিয়ে রাখতে হবে ঠারেঠোরে। নইলে আরও বড়ো কেচ্ছা অপেক্ষা করবে আমার জন্য।

বললাম, “এই দিদি।”

দিদি মোবাইলের দিকে চোখ রেখেই বলল, “বল।”

“বলছি, অয়নদা কি তোর বয়ফ্রেন্ড?” খুব নিরীহ গোবেচারা গলায় করলাম প্রশ্নটা।

দিদি এবার ফোনের থেকে মুখ সরাল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “মিলি... তুই কিন্তু এবার খুব পেকেছিস। এবার মার খাবি।”

আমি সেই গোবেচারা মুখেই বললাম, "আসলে অয়নদাকেও এখনই এই প্রশ্নটা করলাম তো।"

দিদি শুয়ে ছিল। উঠে বসে আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থাকল।

৩৪

এক-একটা সকাল সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। আগের রাতে ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার পর একটা ঝলমলে সকাল কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুঃখকষ্ট সব একদিকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

ভোর ছ-টাতেই ঘুম ভেঙে গেল রূপমের। আগের দিনের বৃষ্টি এখন আর নেই। সে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। সকাল ছ-টা মানে রীতিমতো সকাল। সবাই বেরিয়ে গেছে কাজে। গুরগাঁওতে থাকলে সেও উঠে পড়ে এই সময়টা। মাঝে মাঝে মর্নিং ওয়াকেও যায়। মোবাইলটা সুইচ অফ করে রাখা ছিল। এবার অন করল। বেশ কিছু মেসেজ এসেছে হোয়াটসঅ্যাপে। অফিস কলিগদের গ্রুপে ঢুঁ মারল না আর। এদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, সারাক্ষণ আদিরসাত্মক কথা বলে চলেছে।

হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্টসদের স্ট্যাটাসগুলো দেখছিল সে। এক-একজন বড়ো বড়ো কথা লিখে রেখেছে। বাণীগুলো দেখে হাসি পেয়ে গেল রূপমের। এত কথা বলার কি সত্যিই দরকার? সবকিছুই এত লোক দেখাবার জন্য কেন করা হয়? নিজেকে মাঝে মাঝে ব্যাকডেটেড মনে হয়।

বাপ্পার একটা মেসেজে চোখ পড়ল তার। একটা পেপার কাটিং পাঠিয়েছে। মোমের খবরটা করেছে এক কাগজ। এক পলক চোখ বুলিয়ে নিল সে। সবকিছুরই রাজনীতিকরণ করাটা এই দেশের বদভ্যাস হয়ে গেছে। কোথায় তদন্ত হবে তা না, রাজনীতিকরা থানায় ইট মারল, মন্ত্রী বলে দিল ওসি চেঞ্জ হবে, যেন ওসি চেঞ্জ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রূপমের মনটা আবার তেতো হয়ে গেল।

শ্রাবন্তী উঠে পড়েছিল। আর-একবার ইউরিন কালার টেস্টটা করবে বলছিল, সেটা করতেই ঢুকেছিল বাথরুমে। বেরিয়ে স্ট্রিপটা নিয়ে তার কাছে চলে এল। রূপম দেখল। আর-একবার রেজাল্ট পজিটিভ।

সে বলল, "তাহলে কনফার্ম?"

শ্রাবন্তী গম্ভীর মুখে বলল, "আর কী!"

রূপম বলল, "টেস্টগুলো তো বাড়িতেই এসে করে যাবে?"

শ্রাবন্তী বলল, "হ্যাঁ ওই ব্লাড নেবে।"

রূপম বলল, "তোমার মাকে বলেছ?"

শ্রাবন্তী বলল, "মাকে বললে তো হয়েই গেল। লাফাতে লাফাতে পাড়াময় রাষ্ট্র করতে শুরু করে দেবে। তার আগে তো আমাদের সিদ্ধান্তটা নিতে হবে তাই না?"

রূপম কাঁধ ঝাঁকাল, "আমার সিদ্ধান্ত তো বলেই দিয়েছি। নাও।"

তার কথা শুনে শ্রাবন্তী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "হ্যাঁ। তুমি তো তাই বলবে। আমার কথা আর ভাববে না।"

রূপম কিছু বলল না। শ্রাবন্তী অধৈর্য হল, "কী হল? কিছু তো বলো।"

রূপম বলল, "যা বলার বলে দিয়েছি। এবার তুমি বলো।"

শ্রাবন্তী চেয়ার টেনে বসল। তারপর বলল, "তুমি তো অফিসে চলে যাবে। তারপর সারাদিন বাচ্চা আমাকে দেখতে হবে। রান্না আছে তার ওপর। আমি পারব?"

রূপম বলল, "লোক রেখে দেওয়া যাবে। তা ছাড়া সবাই এভাবেই বাচ্চা নেয়। তুমি তো হাউসওয়াইফ। অফিস করেও কতজন বাচ্চা নিচ্ছে।"

শ্রাবন্তী বলল, "যারা নিচ্ছে তারা ঈশ্বর। আমি পারব না। তা ছাড়া কত কিছু করার ছিল আরও। এখন বাচ্চা হয়ে গেলে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। কোথাও তো ঘুরতেও যাওয়া হল না সেরকম। এখনই বাচ্চা?"

রূপম বলল, "বেশ তো। তুমিই ঠিক করো কী করবে। ঘুরবে বলে বাচ্চা নষ্ট করে দেবে? এরপরে যদি আর না হয় তখন কী করবে?"

শ্রাবন্তী হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বলল, "আমি এখন কিছু বললে তো আমিই খারাপ হয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার আন্টি, মা, তুমি, কেউ তো আমার কথা বুঝতে চাইছ না। আমি হাসপাতাল ভয় পাই। রক্ত... উফ... জাস্ট ভাবতে পারছি না।"

রূপম বলল, "তুমি যদি অ্যাবর্ট করো তাহলেও তো এই সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তোমাকে যেতে হবে, তাই না?"

শ্রাবন্তী আবার চুপ করল। তারপর বলল, "পারব? আমি? তোমার কী মনে হয়?"

রূপম হাসল, বলল, "এবার তোমার মা বাবাকে বলো।"

শ্রাবন্তী লজ্জা পেল, "মাকে বলতে পারব। বাবাকে বলা যাবে না।"

রূপম বলল, "আচ্ছা। তাই কোরো।"

শ্রাবন্তী উঠল। "আচ্ছা। যাই।"

হঠাৎ রূপমের ভালো লাগল খুব। অনেকক্ষণ পরে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

৩৫

সকাল থেকে তিনটে মশা কেটেছে। গোকুলবাবু একটু ভয়ে ভয়ে আছেন। পাগল সাজা সবাই যত সোজা মনে করে ব্যাপারটা মোটেও অতটা সোজা না। নেহাত পেটের দায়। নইলে চাদ্দিকে যা ডেঙ্গি চলছে কার দায় পড়েছিল এই ধ্যাদ্ধেরে মফস্সলে পাগল সেজে বসে থাকার!

খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে শুরু থেকেই। সামনের বাড়ির দয়ালু মেয়েটা গোকুলবাবুকে দুপুরে আর রাতে একটু খেতে দেয়। নইলে খাওয়াটা নিয়ে সত্যিই চাপ হয়ে যায়।

বাজারে সকালে একটা কচুরির দোকানের সামনে গিয়ে বসেন তিনি। চুপচাপ জুলজুল করে কচুরির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম দোকানদার তাড়িয়ে দিত। পরে দেখল এ পাগল নাছোড়বান্দা আছে। অগত্যা দুটো কচুরি আর একটু তরকারি শালপাতার বাটিতে করে দিত।

আপাতত এই ব্যবস্থাই আছে। দাড়ি বেশ বড়ো হয়েছে। বহুদিন স্নান করেন না তিনি। সে অভ্যাসও হয়ে গেছে। তবে মাঝে মাঝে বিরক্ত যে একেবারে লাগে না সে কথা বললে ভুল হবে। তখন মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যান।

চলেও যেতেন, কিন্তু ওই মেয়েটার জন্যই আটকে আছেন। আজকাল মনে হয় প্রেমেই পড়ে গেছেন মেয়েটার। অবশ্য মেয়েটার দিক দিয়ে এরকম কোনও সিগন্যাল আসা সম্ভব না। রাস্তার পাগলের সাথে কোনও মেয়ে প্রেমে পড়বে এটা কোনও সিনেমাতেও সম্ভব না।

গোকুলবাবু তবু মাঝে মাঝে ঝিমুনির ফাঁকে নিজের ছোটোখাটো সংসারের স্বপ্ন দেখেন। রূপসী থাকবে আর তিনি থাকবেন, একটা ছোটো মেয়ে থাকবে, বড়ো সাহেবকে পরিষ্কার বলা থাকবে পাগলের ডিউটি অনেক হয়েছে, এবার তিনি সিনিয়র হয়েছেন, দয়া করে রেহাই দেওয়ার কথা চিন্তা করা হোক।

ভোরের স্বপ্নটাও সেরকমই দেখছিলেন তিনি। বেশ একটা ঘোর ঘোর লেগেছিল। ফুটপাথে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে ভালোই লাগছিল তার। ঘুম থেকে উঠে পাড়ার কলে মুখ-টুখ ধুয়ে নিলেন। লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে পাগলে। এখন আর কেউ কিছু বলেও না। প্রথম প্রথম পাড়ার ছেলেরা ঢিলও ছুঁড়েছে। দু-চারটে ঢিল, চড়চাপড়, গণধোলাই খাওয়া, সমস্ত ট্রেনিংই থাকে তাঁদের। ধীরে ধীরে পাড়ার ছেলেপিলেও হাল ছেড়ে দিয়েছে। পাগল থিতু হয়ে গেছে পাড়ায়।

বাজার টহল দিতে বেরোলেন গোকুলবাবু। দু-দিন আগে রূপসীদের বাড়ির রাস্তায় বাজারের এক দোকানদারকে মিলিকে ফলো করতে দেখেছিলেন তিনি। ঠিক করলেন তার দোকানের সামনে গিয়েই

বসবেন। সিক্সথ সেন্স কিছু কিছু কথা বলে তাঁকে, গোকুলবাবু জানেন, এই কাজে সিক্সথ সেন্স প্রবল থাকা বড়োই জরুরি। ডিপার্টমেন্টের লোকেরা বলে গোকুলের সিক্সথ সেন্স প্রবল, কিন্তু এটা একটা লাইফ হল? গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাজারের দুটো কুকুর পিছু নিয়েছে তাঁর। গোকুলবাবু দৌড়োন না। দৌড়োলে কুকুর বুঝে যায় ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। তখন আরও বেশি করে তাড়া দেয়।

নারানের দোকানের সামনে গিয়ে চুপচাপ বসেন তিনি। ছ-মাসের না-কামানো দাড়ি, চুল, গায়ে একটা ছেঁড়া জামা, লুঙ্গি, স্নান-না-করা উশকোখুশকো চেহারার গোকুলবাবু চুপচাপ বসে থাকেন।

নারান দোকানে এসে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্মী আর গণেশ পুজো করে। পাগলটাকে বসতে দেখে বিরক্ত হল। কাল এই পাগলটাই তাকে তাড়া করেছিল, এখন আবার গন্ধে গন্ধে চলে এসেছে। দোকানের ছেলেটা আজ আসেনি। কোথায় গেছে দিদির বিয়ে ইত্যাদি বলে। প্রায়ই ছুটকোছাটকা ছুটি নিচ্ছে আজকে ছেলেটা ।

নারান পুজো দিতে দিতেই ভাবতে লাগল পাগলটার হাত থেকে কীভাবে বাঁচা যায়। তার চোয়াল শক্ত হওয়া শুরু করল, ধর্ষণ করে খুন করা একটা নেশার ব্যাপার কিন্তু স্বাদবদলের জন্য একটা পাগল খুন করতে কি খুব ঝামেলা হবার কথা?

৩৬
মিলি

ছেলেগুলো যে কবে কথা বলতে শিখবে!

এইজন্য আমার নিজের বয়সি ছেলে একদম পছন্দ হয় না। একটা ছেলে দেখলাম না যে অয়নদার মতো কথা বলতে পারে।

কোচিং থেকে ফিরছিলাম। সকালবেলা। তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেছিল বলে ভালোই লাগছিল। ক্লাসটেস্ট নেবেন, স্যার এইসব ভুজুংভাজুং দিয়ে ছেড়ে দিলেন। ফাঁকিবাজির মুডে ছিলেন। বাড়ি এসে টিভি দেখব বলে তাড়াতাড়ি আসছিলাম, এই সময়েই একটা ছেলে সাইকেল নিয়ে এসে হঠাৎ করে বলল, “এই তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?”

আমি বললাম। ছেলেটা তারপরে আর কথা খুঁজে পায় না। মানে বাড়ি থেকে মনে হয় একটা ডায়লগই মুখস্থ করে এসে বলে দিল।

আমি কোথাও গেলাম না। ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড ধরে আমতা আমতা করতে লাগল। আমি বললাম, “তুমি আর কিছু বলবে?”

ছেলেটা সাইকেলটা বাঁইবাঁই করে চালিয়ে চলে গেল। আমি একা ছিলাম। আমার খুব হাসি পেয়ে গেল।

বাড়িতে দিদিকে এসে বলতেই দিদি আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, “তুই কথা বলতে গেলি কেন?”

আমি বললাম, “কেন? কথা না বলার কী আছে? কথা বললে কি গায়ে ফোসকা পড়ে? তুইও তো অয়নদার সঙ্গে কথা বলিস, আমি কিছু বলতে গেছি?”

দিদি আমার দিকে কটমট করে খানিকক্ষণ চেয়ে বলল, “খুব বেড়েছিস তুই। দাঁড়া দাদা এবার ফিরুক, তোর মোবাইলটা যদি না নিয়েছি তোর কাছ থেকে।”

আমি বললাম, “এই তোর শুধু আমার মোবাইলটার দিকে নজর কেন রে? এর মধ্যে আমার মোবাইলটা এল কোত্থেকে?”

দিদি বলল, “এই মোবাইলের জন্যই তুই এত পাকা পাকা কথা বলছিস। তোকে না মা বারবার বলেছে রাস্তায় অজানা অচেনা ছেলেদের সঙ্গে একদম কথা বলবি না? খুব পেকেছিস তুই।”

আমি দিদিকে একটা ভেংচি কেটে ছাদে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি পাগলটা কোত্থেকে একটা মুরগির ঠ্যাং জোগাড় করেছে। আমাকে দেখে মিটমিট করে তাকাল আমার দিকে। তারপর ঠ্যাংটা দেখিয়ে দেখিয়ে খেতে

লাগল। আমি বেশ খানিকক্ষণ পাগলটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর আমিও পাগলটাকে একটা ভেংচি কাটলাম। সেটা দেখে পাগলটা খুব মজা পেয়ে গেল। আমি পাগলটাকে আবার ভেংচি কাটলাম। পাগলটা জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে ঠ্যাংটা এমনভাবে চিবোতে লাগল যেন ঠ্যাংটা ছিঁড়েই খেয়ে নেবে। আমি অনেকক্ষণ ধরে হাসলাম। পাগলটা তারপর আমাকে দেখে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলামি দেখছিলাম, হঠাৎ দেখি একটা পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। কয়েকজন পুলিশ নেমে আমাদের বাড়ির কলিংবেল টিপল।

আমি সেটা দেখে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। মা রান্নাঘরে ছিল। আমাকে দেখে ইশারায় সামনের ঘরে যেতে বারণ করল। আমি ছটফট করছিলাম। দিদিও রান্নাঘরেই ছিল। বুঝলাম বাবার সঙ্গে পুলিশেরা কথা বলছে।

মিনিট দশেক পরে ওরা চলে যেতেই আমরা সামনের ঘরে গিয়ে দেখি বাবা চুপ করে বসে আছে। মা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, "কী হল? পুলিশ এসেছিল কেন?"

বাবা একবার মা-র দিকে আর-একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "রূপমকে খুঁজতে। আমি যখন বললাম এখন কলকাতা গেছে, বলল ফিরলে থানায় গিয়ে যেন দেখা করে।"

দিদি বলল, "দাদাকে খুঁজতে কেন? দাদা কী করেছে?"

বাবা দিদির ওপর রাগত স্বরে বলল, "আমি কী করে জানব? আমাকে বলেছে?"

মা ভয় পেয়ে গেছিল, বলল, "ছেলেটা বাড়িতে এসেছে, এ আবার কী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল?"

বাবা বলল, "সেটাই তো বুঝছি না। কী করা যায় বলো তো? বাপ্পাকে বলব?"

মা বলল, "আগে রূপমকে ফোন করি দাঁড়াও।"

বাবা আমাকে বলল, "মিলি, তোর দাদাকে ফোন কর তো।"

আমার হাতে সবসময় ফোন থাকে। কথাটা শোনার পর থেকে আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করছিল। কোনওমতে আমি দাদাকে ফোন করলাম। দুটো রিং হতেই দাদা ফোন ধরল, বললাম, "এই দাদা তুই কোথায়?"

দাদা বলল, "এই তো একটু বাজারে এসেছি। কী হল আবার?"

বললাম, "পুলিশ এসেছিল, তোকে খুঁজতে।"

দাদা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "কী বলল?"

মা জোর করে আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে বলল, "তুই বাপ্পাকে ফোন কর তো। কী নিয়ে আবার ডাকছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

দাদা কিছু একটা বলে ফোনটা কেটে দিল। মা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "ছেলেটা এত জেদি! আর ভালো লাগে না কিছু আমার!"

৩৭

রূপম ফোনটা রাখার পর শ্রাবন্তী বলল, "কী হল? কে ফোন করেছে?"

রূপম বলল, "বাড়ি থেকে।"

শ্রাবন্তী বলল, "ওহ, কে মিলি?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ।"

শ্রাবন্তী বলল, "কী হয়েছে?"

রূপম শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু না। পুলিশ আমার খোঁজ করছিল।"

শ্রাবন্তী অবাক হয়ে বলল, "পুলিশ? খোঁজ করছিল? কেন?"

রূপম বলল, "আমি কী জানি? বলেছে বাড়ি ফিরলে থানায় যেতে।"

শ্রাবন্তী খানিকক্ষণ রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী করবে?"

রূপম বলল, "এখনই রওনা দেব। থানায় গিয়ে দেখা করব।"

শ্রাবন্তী বলল, "এত তাড়া?"

রূপম বলল, "আমি না থাকলে সেটা যে আরও সন্দেহের সৃষ্টি করে সেটা বোঝো?"

শ্রাবন্তী গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, "যত সব উটকো ঝামেলা সব আমার কপালেই জোটে। যে মেয়েটার কথা আমি কোনওদিন জানতেও পারিনি, কোত্থেকে উড়ে এসে সবকিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে।"

রূপম কয়েক সেকেন্ড শ্রাবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়েটা মারা গেছে শ্রাবন্তী।"

শ্রাবন্তী রূপমের চোখে আগুনে চোখ দিয়ে তাকাল। তারপর রেগেমেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। রূপম স্নান সেরে তৈরি হয়ে বেরোতে যাচ্ছিল এই সময়ে শ্রাবন্তীর মা-র সাথে দেখা হয়ে গেল। বললেন, "তুমি কোথায় যাচ্ছ হঠাৎ?"

রূপম বলল, "বাড়ি যাচ্ছি, একটা আর্জেন্ট কাজ পড়ে গেল।"

শ্রাবন্তীর মা তাকে একপ্রকার জোর করেই খাইয়ে দিলেন। রূপম বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে স্টেশনে পৌঁছোতে হবে।

***

-আপনি ভদ্রমহিলাকে কতদিন ধরে চেনেন?

ওসি মাইতিবাবুর সামনে বসে ছিল রূপম।

প্রশ্নটা শুনে বলল, "অনেকদিন থেকেই। একসাথে পড়তাম আমরা।"

-হুঁ। রিলেশন-টিলেশন ছিল?

-কেন বলুন তো?

-তদন্তের স্বার্থে। জানাটা প্রয়োজন।

রূপম বেশ কিছুক্ষণ মাইতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কি মনে হয়, এটা আমি করেছি?"

মাইতিবাবু রূপমের দিকে তাকালেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, "শুনুন রূপমবাবু, আপনার বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম। তবু আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। এই যে আমরা পুলিশে কাজ করি, আমাদের নামে অনেক অভিযোগ আছে, কেউ বলে ঘুষখোর, কেউ বলে চরিত্রহীন, কেউ বলে রাজনৈতিক ছাতা ধরে চলি, কেউ বলে মেরুদণ্ডহীন... এইসব অভিযোগের অনেক কিছুই সত্যি। কিন্তু একটা কথা বলি, পুলিশের সামনে যখন বসে আছেন, তখন এত অ্যাগ্রেসিভ হবেন না।"

রূপম বলল, "একটা নিরপরাধ লোককে ডেকে জেরা করতে শুরু করেছেন, অ্যাগ্রেসিভ হব না তো কী করব একটু বলবেন?"

মাইতিবাবু বললেন, "আপনি নিরপরাধ সেটা কে ঠিক করবে? আমরাই তো, না?"

রূপম বলল, "এই অঞ্চলে একটার পর একটা রেপ, মার্ডার হয়ে চলেছে, তার প্যাটার্নও এক, আপনার কথা অনুযায়ী আমি চাকরিবাকরি ছেড়ে এসে এসব করে আবার চলে যাচ্ছি?"

মাইতিবাবু হাসলেন, "এরকমও তো হতে পারে রূপমবাবু, আপনি আগের খুনগুলোর প্যাটার্ন দেখে, আপনার বান্ধবীর সঙ্গে পুরোনো কোনও স্কোর সেটল করার জন্য ব্যাপারটা করে মার্কেট গরম করার জন্য সেদিন হম্বিতম্বি করে বেরিয়েছেন?"

রূপম খানিকক্ষণ স্থির চোখে মাইতিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনারাও খুব ভালোভাবে জানেন, আমি এখানে ইনভলভড নই, এই অকারণ হ্যারাসমেন্টের কারণটা অনুগ্রহ করে বলবেন?"

মাইতিবাবু বললেন, "ফিজিক্যাল রিলেশনশিপ ছিল নাকি আপনার রিলেশনশিপে? আপনি তো বিবাহিত, বউকে লুকিয়ে মেলামেশা করতেন? অনেকরকম প্রোবাবিলিটি আছে জানেন তো? বডির মোবাইল ফোনের

কল ডিটেলস দেখা হচ্ছে আপনাকে বলে রাখি, কোনওরকম সন্দেহজনক কিছু পেলে কিন্তু আপনি রেহাই পাবেন না।”

রূপম বলল, “দেখুন, আপনারা যতরকম তদন্ত করার করতে পারেন, কিন্তু রিলেশনশিপ অকারণে টানাহ্যাঁচড়া করবেন না অনুগ্রহ করে। আমার ফ্যামিলির যথেষ্ট সম্মান আছে এই এলাকায়। অকারণ কাদা ছোঁড়াছুড়ি করবেন না আশা করি।”

মাইতিবাবু বললেন, “আপাতত একমাস স্টেশন লিভ করবেন না।”

রূপম চমকাল, “মানেটা কী? আমার অফিস আছে। চাকরি চলে যাবে তো!”

মাইতিবাবু বললেন, “সেটা আপনি বুঝবেন কী করবেন। আপাতত যা বললাম তাই করুন।”

রূপম একটু চুপ থেকে বলল, “বেশ, এবার কি আমি যেতে পারি?”

মাইতিবাবু বললেন, “পারেন। তবে তদন্তের স্বার্থে যে-কোনও সময় ডাকতে হতে পারে।”

রূপম উঠল, বলল, “ডাকবেন, আসব, তবে বৃথা হ্যারাসমেন্ট হলে আমিও কিন্তু ছাড়ব না।”

রূপম বেরিয়ে যাওয়ার পর মাইতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ছেলের তেজ আছে।”

৩৮

“আরে গুরু, তোকে নাকি থানায় ডেকেছিল?”

এক শাগরেদকে নিয়ে বাপ্পা বাইকে করে যাচ্ছিল।

রূপমকে দেখে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

রূপম বলল, “হ্যাঁ। ওখান থেকেই আসছি।”

বাপ্পা বলল, “কী বলছে?”

রূপম বলল, “স্টেশন লিভ করা যাবে না। একমাস। নিজেরা ওখানে বসে বসে ছিঁড়বে আর আমাকে স্টেশন লিভ করতে দেবে না।”

বাপ্পা পেছনের ছেলেটাকে বলল, “তুই বেরিয়ে যা। কাজ আছে এখন।”

ছেলেটা বেরিয়ে যেতে বাপ্পা বলল, “তুই বাইকে ওঠ।”

রূপম বলল, “কোথায় যাবি?”

বাপ্পা বলল, “থানায় চ। মাইতিবাবু আমার চেনাজানা। তুই চ।”

রূপম আপত্তি করল, “আরে ছাড় না। আপাতত যা বলছে তাই শুনি। দেখি, তদন্তটা আমাকে ভিক্টিম করেই বা কীভাবে করে।”

বাপ্পা বলল, “তুই অফিস না গিয়ে এখানে পড়ে থাকবি? তোর কথা ভেবেই তো বলছি রে।”

রূপম একটু ভাবল। তারপর বলল, “আচ্ছা। চ, দেখি তোর রিকোয়েস্ট শোনে।”

বাপ্পা খুশি হল, “তবে? চ ওঠ।”

রূপম বাপ্পার বাইকে উঠে পড়ল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তারা আবার থানায় প্রবেশ করল।

মাইতিবাবু কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন, রূপমকে বাপ্পার সঙ্গে ঢুকতে দেখে ফোনটা রেখে খানিকটা বাঁকা সুরে বললেন, “কী ব্যাপার রূপমবাবু, আবার পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স করার ইচ্ছা হল নাকি?”

বাপ্পা বলল, “এরকম করে বলছেন কেন স্যার। আমরা ছোটোবেলার বন্ধু। ওর প্রয়োজনে তো আসতে হতেই পারে।”

মাইতিবাবু বললেন, “হ্যাঁ বলুন কী বলবেন?”

বাপ্পা বলল “দেখুন স্যার, ও তো প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে, ওর এতদিন ঘরে বসে থাকলে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আমি তো ওর গ্যারান্টি নিচ্ছি। ওকে পারমিশন দিয়ে দিন স্যার স্টেশন লিভ করার।”

মাইতিবাবু কয়েক সেকেন্ড বাপ্পার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি জানেন তো আপনি কী বলছেন?”

বাপ্পা বলল, “কেন জানব না? দাদার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব আপনাকে?”

মাইতিবাবু হাসলেন, “বলান। নিন থানার ফোন থেকেই ফোন করুন।”

বাপ্পা একবার রূপমের দিকে তাকিয়ে থানার ফোন থেকে ফোন করল। একটা রিং হতেই ওপাশ থেকে দাদার গলা ভেসে এল, “মাইতিবাবু?”

বাপ্পা বলল, “না দাদা, আমি বাপ্পা বলছি।”

“তুই থানায় কী করতে গেলি আবার? কোনও মাতালকে ধরে নিয়ে গেছে নাকি বড়োবাবু? আমাকে ফোন করছিস কেন তার জন্য? নিজেই বলে দে।”

“না দাদা, ওইজন্য না।”

“তবে?”

“আরে এই রেপ কেসটায় আমার বন্ধুকে বড়োবাবু থানায় ডেকে এনে বলে দিয়েছেন একমাস স্টেশন লিভ করতে পারবে না, নিরীহ নির্বিরোধী ছেলে একটা। প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। ওর তো চাকরিই চলে যাবে। তুমি একটু বলে দাও না।”

“তুই কি গান্ডু?”

বুঝল না বাপ্পা। দাদা হঠাৎ রেগে গেল কেন। বলল, “মানে?”

“মানে বোঝো না? এলাকাটা কয়েক মাস ধরে উত্তপ্ত হয়ে আছে, একটা রেজাল্ট নেই কিছু নেই, সবাই আমাদের উপর খেপে বোম হয়ে আছে, আর তুই বলছিস সাসপেক্টকে ছেড়ে দিতে?”

“সাসপেক্ট? কী বলছ? ও সাসপেক্ট হতে যাবে কেন?”

“তুই কে বাঁড়া? তুই কি গোয়েন্দা গিন্নি? নাকি সিআইডি? বাল সুরকি বালি সাপ্লাই করে আর আমাদের দল করে নিজেকে বড়ো হনু ভেবে ফেলেছিস? পুলিশ কীভাবে তদন্ত করবে তুই ঠিক করে দিবি?”

“মানে দাদা।”

“রাখ শুয়োরের বাচ্চা।”

ফোনটা কেটে গেল। বাপ্পা একবার রূপমের দিকে তাকাল। রূপমের মুখটা থমথমে। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথোপকথনের খানিকটা ও আঁচ করতে পেরেছে। মাইতিবাবু হাসলেন, “কী হল? খুশি কথা বলে?”

বাপ্পা পানসে হাসি দিয়ে বলল, “আসছি স্যার।”

মাইতিবাবু বললেন, “দেখুন রূপমবাবু, অধৈর্য হবেন না। আইনকে আইনের পথে চলতে দিন। আপনি যে এই পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে গেলেন, এটা কিন্তু আপনার এগেইনস্টেই যাবে। আশা করি আপনি খানিকটা বুঝতে পেরেছেন বাপ্পাবাবু?”

রূপম কিছু না বলে বেরিয়ে এল। পিছন পিছন বাপ্পা।

থানা থেকে বেরিয়ে দুজনেই কোনও কথা বলল না। বাপ্পার বাইকের পিছনে রূপম খানিকটা গিয়ে বলল, “এক কাজ কর, আমাকে মোমের বাড়িতে নামিয়ে দে।”

বাপ্পা বলল, “কেন খামোখা জড়াতে চাইছিস বল তো? বাড়ি যা।”

রূপম ক্লান্ত গলায় বলল, “জড়াতে আর পারলাম কই।”

৩৯

মিলি

আমাদের বাড়িটা একেবারে সাধারণ একটা বাড়ি। অনেক মানুষ থাকে যারা চুরি করে, খুন করে, জেলে যায়, আদালতে যায়। আমাদের বাড়িতে কাউকে যে কোনওদিন থানায় যেতে হতে পারে সেটা আমাদের কারও ধারণাতেই ছিল না।

পুলিশের গাড়িটা চলে যাবার পর পাড়াপ্রতিবেশীরা ভিড় করে আমাদের বাড়ি আসা শুরু করল। মজা দেখতেই। মানুষ গুজব ভালোবাসে। অনেকেই উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চেয়েছে দাদা গ্রেফতার হয়েছে নাকি।

দাদা ভালো ছাত্র ছিল, ভালো চাকরি করে। কলকাতার মেয়ে বিয়ে করেছে। পাড়ার অনেকেরই চোখ টাটায় স্বাভাবিকভাবেই। লোকের ভালো দেখতে পায় না কেউ। আমাদের মতো বাড়িতে যে পুলিশ এসেছে সেটা অনেকেরই খুশির কারণ হয়ে গেল।

প্রথমেই এল পাল কাকিমা আর দাস কাকিমা। এসে মা-র কাছে উদ্বিগ্ন গলায়, "ও বউদি, কী হয়েছে গো?"

মার মেজাজ ঠিক ছিল না। তবু যতটা পারে স্বাভাবিকভাবেই বলার চেষ্টা করল, "কই কিছু না তো!"

পাল কাকিমা বলল, "পুলিশ এসেছিল কেন গো?"

মা বলল, "ওই রূপমের সঙ্গে কী একটা দরকার ছিল ওইজন্যই হয়তো।"

মার কথা শুনে দুই কাকিমা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, "পুলিশের সাথে আবার রূপমের কী দরকার গো বউদি?"

মা বলল, "আমি কী জানি।"

পাল কাকিমা মাকে বলল, "ওই যে মেয়েটা মরল, ওকে নিয়ে নাকি গো? ওই মেয়েটা তো খুব আসত তোমাদের বাড়িতে। আহা গো, চাঁদপানা চেহারা।"

আমার মাথা গরম হচ্ছিল। মা না থাকলে শিয়োর গালাগালি দিয়ে দিতাম।

দাস কাকিমা গলা নামিয়ে গলাটাকে নাটকীয়ভাবে কাঁদো কাঁদো করে বলল, "মেয়েটাকে রূপমের সঙ্গে বড়ো মানাত গো!"

মা এবার রাগল। বলল, "রূপমের সঙ্গে মানাত না মানাত সেসব কথা এখন বলার কি কোনও দরকার আছে? কেন এসব কথা বলছ এখন?"

দুই কাকিমা চুপ করে গেল। তারা যেতে এল রায় কাকিমা। রায় কাকিমা বরাবরই সব কথাকে রহস্যের মোড়কে বলতে ভালোবাসে। ঘরে ঢুকেই মা-র কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। মা বলল, "কী বলছেন?"

রায় কাকিমা এবার গলার স্বর তুলে বলল, "রূপমকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে?"

মা রেগে গেল এবার, "কীসব অলুক্ষুণে কথা বলছেন দিদি। রূপমকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে কেন? রূপম কি সে ধরনের ছেলে?"

রায় কাকিমা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "সে কী! মিনু যে বলল পুলিশ এসে রূপমকে ধরে নিয়ে চলে গেছে।"

আমি বুঝলাম মার প্রেশার বাড়ছে। বললাম, "না কাকিমা, কোনও ভয় নেই। দাদাকে ধরতে আসেনি। তা ছাড়া দাদা ছিলও না বাড়িতে। এত চিন্তা কোরো না গো, প্রেশার উঠে যাবে, সুগারও ধরতে পারে। তোমার যা চেহারা আরও অনেক কিছুই হতে পারে। ইবোলা, থাইরয়েড, এমনকি ফটোসিন্থেসিস এইচআইভি-ও হতে পারে।"

রায় কাকিমা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো কী রে মিলি? রোগ?"

দিদি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিল। আমার পেট ফেটে হাসি আসছিল। সেটাকে ম্যানেজ করতে করতে বললাম, "হ্যাঁ কাকিমা, ফটোসিন্থেসিস এইচআইভি মারাত্মক রোগ। আফ্রিকার গাছেদের থেকে হয়। যাদের নিজেদের থেকে পরের সমস্যায় বেশি চুলকোয় তাদের ফটোসিন্থেসিস এইচআইভি হয়।"

বলেই হেসে ফেললাম ফিক করে। মা একটা ধমক দিল, "এই মিলি, এগুলো কী ভাষা? বড়োদের সঙ্গে এই ভাষায় কথা বলে বুঝি?"

আমি সড়াৎ করে সরে গেলাম। রায় কাকিমার মুখটা কেমন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছিল আমার কথা শুনে, ভেবে বেশ খানিকক্ষণ হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলাম। দাদা কলকাতা থেকে আসবে ভেবে ভীষণ টেনশন হওয়া শুরু হল। বাবা তখন থেকে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। নিজেই বলল বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা। পুলিশ যদি মনে করে অকারণ কেস দিয়ে ফাঁসিয়ে দেবে তাহলে অনেক কিছু হতে পারে। আজকালকার যা সমাজ তাতে অপরাধী দোষী না নির্দোষ সেটুকু পর্যন্ত কেউ ভেবে দ্যাখে না। সবাই শুধু লোকের গায়ে কাদা ছেটাতে ব্যস্ত।

***

দাদা যখন এল তখন রাত দশটা। বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের ঘরে বসে ছিলাম। দাদার সঙ্গে বাপ্পাদাও এল। ঘরে ঢুকে দাদা বসল ড্রয়িংরুমের টেবিলে। মা বলল, "কী রে, তুই কখন এলি?"

দাদা বলল, "ওই তো, থানায় গেছিলাম। তারপর মোমের বাড়িও।"

বাবা বলল, "থানায় কী বলল?"

দাদা গম্ভীর হল। বাপ্পাদা বলল, "কী বলবে, একমাস স্টেশন লিভ করতে পারবে না। এখানেই থাকতে হবে।"

বাপ্পাদার কথা শুনে মা মুখে আঁচল দিল। বাবা কেমন পাথর পাথর মুখ করে বসে থাকল।

আমার বাবা আর দাদার মুখটা দেখে বুকটা কেমন করে উঠল। ভালোমানুষদের সঙ্গেই কি সবসময় এরকম হতে হয়?

মা বলল, "পুলিশ কি রূপমকে সন্দেহ করছে?"

দাদা রেগে বলল, "থামো না, আমার আর এসব কথা ভালো লাগছে না।"

মা চুপ করে গেল।

বাপ্পাদা বলল, "চিন্তা করবেন না কাকিমা, আমি দেখছি, বুঝতেই পারছেন পলিটিক্যাল অনেক কিছু সমস্যার জন্য নির্দোষ লোকেদের নিয়েও টানাটানি হয়। তবে আমি বেঁচে থাকতে রূপমের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না কেউ।"

বাপ্পাদার কথায় অন্যান্য দিন হাসি পায়। বাপ্পাদা এভাবেই কথা বলে। কিন্তু এ কথাটা শুনে বোঝা গেল বাপ্পাদা ফালতু ফালতু কথাটা বলল না। খুব সিরিয়াস হয়েই কথাটা বলল।

বাপ্পাদা যে দাদাকে কতটা ভালোবাসে এই কথাটা শুনে বুঝতে পারলাম।

কেন জানি না, খানিকটা সাহসও এল।

৪০

"পুলিশ নাকি বিভাসবাবুর ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছিল?"

ভটচাজবাবুর কথাটা শুনে নারাণের কান খাড়া হল। অবশ্য মুখটা নির্বিকার থাকল। সান্যালবাবু ভটচাজবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমিও শুনেছি। ছেলেটা তো পড়াশোনায় বেশ ভালো। তা ছাড়া এলাকায় থাকেও না। ওকে খামোখা ফাঁসানো হচ্ছে যা বুঝতে পারছি।"

ভটচাজবাবু বললেন, "কার মনে কী আছে তুমি করে বুঝবে সান্যাল? তুমি জানো কত ছেলে কী থেকে কী হয়ে যায়? সামনে দেখলে বুঝতে পারবে না ভিতরে ভিতরে কী যন্তর চিজ আছে। ওই তো কিছুদিন আগেই পড়লাম না কোন বাঙালির ছেলে আইসিসে যোগ দিয়েছে? কেউ ভাবতেও পেরেছিল? সবকিছু অত সহজ ভাব নাকি হে।"

দাসবাবু ভটচাজের কথাটা শুনে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "কথাটা মন্দ বলোনি। তা ছাড়া..." একটা গলা খাঁকারি দিলেন দাসবাবু।

সান্যাল সহ বাকিরা উদগ্রীব হয়ে দাসবাবুর দিকে তাকালেন, "কী ব্যাপার হে? কী বলতে গিয়ে চেপে যাচ্ছ?"

দাসবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “ও ছেলের সঙ্গে এককালে মেয়েটার সম্পর্ক ছিল হে। কী ছিল মনে আমরা কী জানি?”

সান্যালবাবু জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলেন, “তোমরা কিছুতেই বুঝতে পারছ না। এ খেলা অন্য খেলা। মেয়েটাকে কীভাবে মেরেছে দ্যাখো! হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে, কোনও স্বাভাবিক পাবলিক এসব পারে নাকি? খুব নিম্নমানের জন্তু প্রকৃতির লোকের কাজ। যারা আগের রেপগুলো করেছে এগুলো তাদেরই কাজ।”

একটা হিসাবের খাতা আছে নারানের। সেটায় দোকানের হিসেব লিখছিল। সান্যালবাবুর কথাটা শুনে পেনটায় একটু জোর দিয়ে ফেলল সে। সামান্য কাটাকুটি হল খাতায়।

দাসবাবু বললেন, “জন্তু প্রকৃতির লোক, সে ব্যাপারে তো কোনও সন্দেহ নেই। এ কাজগুলো তো মেইনলি সাইকোরা করে। এদের মাথা খুব ঠান্ডা হয়, প্ল্যানিং করে কাজগুলো করে। তবে কী জানো তো, যেদিন ধরা পড়বে না, গণধোলাই খেয়ে যাবে।”

নারান উদাস চোখে বাজারের দিকে তাকাল। শান্ত স্বাভাবিক বাজার। অন্যান্যদিনের মতোই।

ভটচাজবাবু বললেন, “বিভাসবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে হত। টেনশনে আছেন হয়তো।”

সান্যাল বললেন, “তা যাওয়া যেতেই পারে। বিকেলে যাবে নাকি?”

সবাই মতৈক্যে আসতে বেশি সময় নিলেন না। নারান বোকাসোকা মুখ করে ওঁদের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, “বিভাসবাবুর ছেলেকে কি ধরেছে পুলিশ?”

সান্যালবাবু মাথা নাড়লেন, “না বোধহয়। তবে এইসব কেসে সাসপেক্টকে চোখে চোখে রাখাটাই নিয়ম।”

নারান যেন খুব বুঝেছে এরকম মাথা নেড়ে মন দিয়ে হিসাব করতে লাগল।

তার যোগের হাত খুব ভালো। ক্যালকুলেটর ছাড়াই সে বড়ো বড়ো যোগ করে দিতে পারে। কালকে অনেক কিছু বিক্রি হয়েছিল, কী একটা পুজো ছিল, সে মন দিয়ে তার হিসেব মেলাতে লাগল।

তিনশো তেত্রিশ আর সাতশো আটাত্তর মেলাতে যাচ্ছিল এমন সময় নজর পড়ল মেয়েটা পড়া থেকে ফিরছে। দূর থেকেই নারান সেই গন্ধটা পেল।

নারানের পেনটা থমকে গেল। কয়েক সেকেন্ড মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। সান্যালবাবু বলছিলেন, “আজকাল এমন সময় এসেছে, আত্মীয়স্বজনকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেও লজ্জা লাগে। জায়গাটা কুখ্যাত হয়ে গেল ক-দিনের মধ্যেই।”

দাসবাবু বললেন, “সেই তো, বাপু, রেপ করছিস কর, জামাকাপড়টা তো পরিয়ে দে, ওভাবে সবকিছু ...।”

নারান পরিষ্কার বুঝতে পারল খানিকক্ষণ আগে বড়ো বড়ো কথা বলা দাসবাবুর চোখটা একটু জ্বলে উঠে নিভে গেল।

সে দোকানের ছেলেটাকে বলল, “একটা ছোটো হাতুড়ি কিনে আনিস তো। দোকানের হাতুড়িটা পাচ্ছি না ক-দিন ধরে।”

ছেলেটা বিরক্ত গলায় বলল, “আরও কিছু টাকা দেবেন, পেরেক নিয়ে আসব। ঠাকুরের আসনটা আলগা হয়ে আছে। ঠিক করতে হবে।”

নারান বলল, “আলগা হয়ে গেছে সেটা আগে দেখবি না? যা যা, নিয়ে আয়।”

ক্যাশ থেকে বের করে ছেলেটাকে টাকা দিল নারান।

মেয়েটা একটা দোকান থেকে কিছু একটা কিনছে। নারান খানিকক্ষণ আড়চোখে তাকাল।

তার মাথায় অবশ্য আর-একটা কথাও ঘুরছিল। পুলিশ বিভাসবাবুর ছেলেকে ডেকেছে। তার মানে এখন বিভিন্ন নির্দোষ লোককে কেস দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা থাকবে পুলিশের মধ্যে।

এখন ক-দিন চুপচাপ থাকলে খেলাটা জমে যাবে।

কিন্তু মেয়েটার দিকে চোখ চলে যেতেই তার মনটা বাঁধ মানছে না। নব অঙ্কুরিত শরীরের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। মেয়েটার চোখদুটো ডাগর। সবে যৌবন আসছে। গলা টিপে ধরলে চোখদুটো যখন তাকে চিনতে পারবে সেটা ভেবে দোকানের মধ্যে সে অতি কষ্টে মনটা শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

রক্ত জাগতে শুরু করছে আবার।

নিজের ওপরেই বিরক্ত লাগছিল তার। এরকম তো কখনও হয় না। কচি মেয়ের অভিজ্ঞতা তো আগেও হয়েছিল।

তাহলে এর আকর্ষণী শক্তি এত প্রবল মনে হচ্ছে কেন?

৪১

"ঘুমিয়ে পড়েছিস?"

বিভাসবাবু কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পারেনি রূপম। সে শুয়ে শুয়ে মোবাইল ঘাঁটছিল। বাবার গলা শুনে উঠে বসল, "না না, এসো।"

বিভাসবাবু ইতস্তত করছিলেন। রূপম লাইট জ্বালাল। বলল, "বসো খাটেই বসো।"

বিভাসবাবু বসলেন, "বউমাকে জানিয়েছিস?"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। জানিয়েছি।"

বিভাসবাবু বললেন, "খুব রাগারাগি করছে নাকি?"

রূপম কিছু বলল না। বাড়িতে কিছুই বলা হয়নি এখনও শ্রাবন্তীর ব্যাপারে। বলবে নাকি ভাবছিল।

বিভাসবাবু বললেন, "তুই কলকাতা যেতে পারবি, না তাও পারবি না?"

রূপম বাবার দিকে তাকাল। বাবার বয়স হচ্ছে। অথচ এই বাবাই তাকে নিয়ে একসময় কত ঘুরত সাইকেলে করে। সময় কীভাবে কেটে যায়। দূরত্ব তৈরি হয়েছে ধীরে ধীরে।

সে বলল, "থানায় কথা বলতে হবে। দেখি। ও যদি আসতে চায় তাহলে নিয়ে আসব।"

বিভাসবাবু বললেন, "বউমা যা চায় তাই কর। এখানে কমফর্টেবল নাও হতে পারে।"

রূপম বলল, "হ্যাঁ। সেটা ভেবেছি।"

বিভাসবাবু বললেন, "তুই চিন্তা করিস না। পুলিশ নিরপরাধকে অপরাধী করে দেয়। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে পলিটিক্যাল কারণে হেনস্থা করার চেষ্টা করছে তোকে। তোর মা আমাকে বলছিল পলিটিক্যাল লোকজনদের কাছে যেতে, আমি বারণ করেছি। সৎ লোকেদের কারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তুই দেখিস। ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না।"

রূপম কিছু বলল না। আজ কি তার বা মোমের এই অবস্থার জন্য বাবাকে দায়ী করা যায়? কোনওভাবেই না। বাবা মা-রা কখনও খারাপ চাইতে পারে না। আজ যেটুকু সে হতে পেরেছে বাবার জন্যই তো! তখন মোমের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ালে কি সে এই জায়গায় যেতে পারত? তারও তো সন্তান আসছে। বাবার মতন বাবা কি সে হতে পারবে? একসময় কত কষ্ট করেছে তারা, অথচ শত কষ্টেও বাড়ির সবথেকে ভালো জামাটা তার জন্য নিয়ে এসেছে বাবা।

বিভাসবাবু বললেন, "অফিসে জানিয়েছিস?"

রূপম বলল, "না। এখনও বুঝে উঠতে পারছি না কী বলব।"

বিভাসবাবু বললেন, "জানিয়ে দে। কোনও কিছু ঢাকতে হবে না। মিথ্যা কথা বা অর্ধসত্য বলার দরকার নেই।"

রূপম বলল, "ওরা দোষী প্রমাণিত করলে আমার চাকরি পর্যন্ত চলে যেতে পারে বাবা। তখন আমরা কী খাব? দুটো বোনের বিয়ে বাকি আছে এখনও।"

বিভাসবাবু বললেন, “এই কথাগুলো তোর মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন? তোর মনে আছে ক্লাস টেনে যখন পড়তি তখন টেস্টে স্কুলের বাগচীবাবুর কাছে প্রাইভেট টিউশন নিতি না বলে ফেল করিয়ে দিয়েছিলেন? আমারও ধারণা হয়ে গিয়েছিল তুই বোধহয় মাধ্যমিক ফেল করে যাবি। সেই টেস্টের সেকেন্ড লিস্টে তুই পাশ করেছিলি। আর মাধ্যমিকে এলাকার মধ্যে সবথেকে বেশি নাম্বার পেয়েছিলি। ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়তি তোকে কত হাতখরচা দিতে পারতাম আমি? নিজেই তো পড়েছিস। টিউশনি করেছিস, স্কলারশিপ পেয়েছিস, সব নিজের জেদে। এত কিছুর একটা লড়াই, সামান্য একটা পলিটিক্যাল কন্সপিরেসিতে শেষ হয়ে যায় নাকি? ভাবলি কী করে?”

রূপম বাবার দিকে তাকাল। বাবা সব মনে রেখেছে। তাকে নিয়ে বাবার সবথেকে বেশি গর্ব। সে অনেকক্ষণ পরে হাসল। তারপর বলল, “চাকরি চলে গেলে কী করব এই রেজাল্ট দিয়ে সেটা তো বলো!”

বিভাসবাবু বললেন, “তুই আরও চাকরি পাবি। নইলে দেখা যাবে। তোর বয়স কত? এই বয়সে এত চিন্তা করতে হবে না। কষ্ট করে সৎভাবে যারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে তাদের কিচ্ছু হয় না। এই লড়াইটা তো তোর একার না, আমাদের গোটা পরিবারের, টিকে থাকার লড়াই। অনেক রাত হল। তুই ঘুমিয়ে পড় এবার।”

বিভাসবাবু হঠাৎ করে কথাটা শেষ করে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন। রূপম একটু অবাক হল। বাবা কেমন চুপচাপ থাকে অন্যান্য সময়। এখন হঠাৎ করে এত স্পষ্টবক্তা হয়ে তাকে এভাবে আশ্বাস দিয়ে গেল!

সময় মানুষকে কখনও ভেঙে দেয়, কখনও শক্ত করে তোলে। বাবার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা হয়েছে।

ভালো লাগছিল রূপমের। এখনই ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি তাহলে!

***

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে ভেবে যখন ঘুম চলে আসছিল তখনই জানলায় ঠকঠক শব্দ হতে শুরু করল। সে অবাক হল। রাত সাড়ে বারোটা বাজে প্রায়। এত রাতে জানলায় নক করছে কে? প্রথমে ভাবল বাড়ির সবাইকে ডাকবে। তারপর মনে হল পরিচিত কেউ এসেছে।

সে গলার আওয়াজ যতটা সম্ভব কম করে বলল, “কে ওখানে?”

জানলার ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, “ছাদে আসুন, কথা আছে।”

রূপম অবাক হল। গলার স্বর অপরিচিত। সে বলল, “আপনি কীভাবে আসবেন?”

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, “আহ, আপনি আসুন না। তারপর দেখবেন নাহয়।”

রূপম বেরোল ঘর থেকে। ছাদে যাওয়ার সিঁড়িতে নিচে তালা নেই। উপরে ছিটকিনি দেওয়া। রূপসী আর মিলিরা জেগে আছে।

সে ধীর পায়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠল। ছিটকিনি খুলে দেখল পাগলটা দাঁড়িয়ে আছে।

৪২

-সিগারেট আছে মশাই?

পাগলটার কথা শুনে চমকাল রূপম। এ তো রীতিমতো সুস্থ মানুষের গলা!

সে বলল, “আপনি...?”

“পাগল না মশাই, আইবি-র লোক। তবে বেশিদিন এই ভূমিকায় থাকতে থাকতে ওই ধারেকাছেই চলে গেছি বলতে পারেন।”

রূপম বলল, “ওহ। আমার কাছে তো এখন সিগারেট নেই।”

পাগলটা বিরক্তির ভাব করল।

রূপম বলল, “পাগল সেজে ঘুরছেন কেন? ইনভেস্টিগেশনের কাজ?”

পাগলটা বলল, "আর কী হতে পারে? যেমন জায়গা আপনাদের! আমার মতো ঘুঘু লোকেরও জিনা হারাম করে দিচ্ছে মশাই! একই পদ্ধতিতে খুন আর রেপ করে চলে যাচ্ছে অথচ কেউ ধরতেও পারছে না!"

"পারছে তো, আপনাদের পুলিশ পারছে, আমার স্টেশন লিভ একমাস পিছিয়ে দিল সাফল্যের সঙ্গে।" তিক্ত গলায় বলল রূপম।

পাগলটা খানিকক্ষণ দাড়ি চুলকে বলল, "ওটা তো আমিই বলে করিয়েছি।"

রূপম অবাক হল, "মানে?"

পাগলটা ছাদের উপরেই বসে পড়ল, "সীমান্তে সৈনিকরা গুলি খেয়ে মরছে আর আপনি দেশের জন্য এইটুকু করতে পারবেন না মশাই? একটা মারাত্মক খুনি, সাইকো দ্য রেপিস্ট বুক বাজিয়ে সমাজের বুকে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরতে হবে না? আপনাকে আটকানো হয়েছে শুনে সে তো দিব্যি খুশি হয়ে গেছে এতক্ষণে। পরের টার্গেটও ঠিক করে নিয়েছে নির্ঘাত। এইটুকু স্পেস তো তাকে দিতেই হত। আপনি সেটা দিলেন নিজে শহিদ হয়ে। ভয় পাবেন না। পরে আপনার যা যা ডকুমেন্ট লাগবে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি সাপ্লাই দিয়ে দেব।"

রূপমও বসল। খানিকক্ষণ চুপ করে বলল, "তা আপনি এখন কেন এলেন?"

পাগলটা বলল, "এই যে খ্যাপাচোদার মতো আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটা উলটে আমাদের ইনভেস্টিগেশনেই প্রবলেম করে দিতে পারে সেটা বুঝছেন না বলে একান্ত নিরুপায় হয়ে আপনাকে দর্শন দিতে আসতে হল। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন।"

রূপম বলল, "আমি তো এমন কিছু বিহেভিয়ার করিনি যাতে আপনাদের এটা মনে হতে পারে!"

পাগলটা বলল, "করেছেন। আপনি আপনার রাজনীতি করা আর-এক গান্ডু বন্ধুকে নিয়ে দ্বিতীয়বার থানায় গেছেন। থানার বড়োবাবুকে তো আর আমি বলিনি, অন্যভাবে বলানো হয়েছে। তার আলাদা সেটিং করতে হয়েছে। আপনার বন্ধু তার রাজনৈতিক দাদাকে ফোন করেছে। কপাল ভালো তিনি খিস্তি মেরে দিয়েছেন আপনার বন্ধুকে। নইলে আর-এক কেলোর কীর্তি হত।"

রূপম বলল, "ওই নেতা আপনাদের নেটওয়ার্কে নেই?"

"খেপেছেন আপনি? উনি থাকলে আর দেখতে হত না। ইনভেস্টিগেশন গাধার ইয়েতে ঢুকে যেত। ওনাকে শুধু আরও ওপর থেকে হালকা টাচ করে রাখা আছে এই এলাকায় যাকেই ঢোকানো হবে তাকে যেন ছাড়ানোর জন্য কেউ থানায় না যায়। উনি সেটা শুনেছেন সেটা আমার বাপের ভাগ্য ভালো।"

রূপম বলল, "তাহলে আমি এখন এই একমাস এখানেই বসে থাকব বলছেন?"

পাগলটা রূপমের কথার উত্তর না দিয়ে নিজের ঝুলি খুঁজতে শুরু করল। একটু পর একটা ঠোঙা বের করে বলল, "ইউরেকা।" তারপর তার থেকে একটা আধখাওয়া মুরগির ঠ্যাং বের করে চিবোতে চিবোতে বলল, "থাকবেন। কী সমস্যা? বাড়িতে থাকবেন, বাপ-মা-বোনদের সাথে বন্ডিং শক্ত করবেন। আজকাল তো বাঙালি ফ্যামিলি নিয়ে থাকা ভুলে গেছে। আপনিও তো বউ নিয়ে আলাদা থাকবেন। এখন থাকুন, ভালো থাকবেন।"

রূপম খানিকক্ষণ পাগলটার ঠ্যাং চিবোনো দেখে বলল, "এটা আপনি খেতে পারছেন?"

পাগলটা বলল, "কেন? খেতে পারব না কেন?"

রূপম বলল, "এটা খেলে তো কলেরা, আমাশা, জন্ডিস সব হতে পারে!"

রাস্তার ভেপারের আলো পাগলটার চুলের ওপর পড়ে একটা হলুদ আভা তৈরি করছিল। পাগলটা ঠ্যাংটা ঠোঙায় রেখে রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের দেশে কত শতাংশ মানুষ পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকে এ সম্পর্কে ডু ইউ হ্যাভ এনি ফাকিং আইডিয়া? কত শতাংশ শিশু রাস্তায় ফুটপাথে শুয়ে থেকে প্রতি

রাতে হারিয়ে যায় আপনি জানেন? কোনওদিন সুযোগ পেলে আমি আপনাকে দেখাব। আমি কেন তবে তাদের মতো জীবন কাটাতে পারব না বলতে পারেন?”

রূপম বলল, “আপনার নাম জানতে পারি?”

পাগলটা বলল, “ডিপার্টমেন্টে সবাই গোকুল বলে ডাকে। আপনিও ওই নামটা ধরে আমাকে ডাকতে পারেন। তবে না ডাকাই ভালো। আমার কথা নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না।”

রূপম বলল, “তা বলব না। তবে আপনার আসল নামটা কী?”

পাগলটা বলল, “বাপের দেওয়া নাম, দাঁড়ান মনে করি।”

তারপর বেশ খানিকক্ষণ দাড়ি চুলকে বলল, “ভুলে গেছি মশাই। মনে পড়ছে না। আচ্ছা। আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। আমিও জায়গায় যাই। গুডনাইট।”

বলে পাগলটা রূপমের উত্তরের অপেক্ষা না করেই ছাদ থেকে পাইপ বেয়ে নিচে নেমে গেল। রূপম বেশ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

৪৩

মধুমিতার একটা বয়ফ্রেন্ড হয়েছে।

তাও ফেসবুকে।

পড়া থেকে বেরিয়েই ফোন কানে দিয়ে “সোনু, জানু” করে ন্যাকামি করে আমায় জ্বালিয়ে খাচ্ছে।

প্রথম প্রথম মজা পাচ্ছিলাম, এখন বিরক্তি ধরে গেছে।

ধরাটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ করে গলার টোন চেঞ্জ করে অনেকদিনের চেনা বন্ধু কাউকে যদি ফোন করে বলে “জানু আই অ্যাম মিসিং ইউ” তাহলে বিরক্তি ধরাটাই স্বাভাবিক। ছেলেটা দিনে একটা করে ফটো আপলোড করে আর দুনিয়াসুদ্ধ মেয়েকে ট্যাগ করে।

সে নাকি মধুমিতার বয়ফ্রেন্ড।

কাল পড়া থেকে ফিরছি, আর মধুমিতা যথারীতি ফোনে ন্যাকামি সেরে আমায় গর্ব গর্ব গলা করে বলেছে, “জানিস ও যে জিমটায় যায় সেটায় দেবও আসে জিম করতে।”

আমি একটা আইসক্রিম খাচ্ছিলাম।

ওর কথায় বিষম-টিষম খেয়ে অস্থির হয়ে গেছি। আর আমার হাসি দেখে ওর কী রাগ! বলে, “তুই হিংসা করছিস এখন। নিজের তো কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই, তাই আমাকে হ্যাটা দিচ্ছিস, আমি বুঝি না ভেবেছিস?”

আমি তাতে আরও হাসা শুরু করি। আর ও আরও রাগে।

ছেলেটা ওকে বলেছে ও নাকি একটা কী হারলে ডেভিসন কোম্পানির একটা বাইক পনেরো লাখ টাকা দিয়ে কিনবে। আমি সেটা শুনে বলেছি বাইকটা মাটিতে চলবে তো রে? নাকি আকাশেও চলবে?

শুনে আরও রেগেছে।

আমি একবার ছেলেটার প্রোফাইল দেখেছি। কেমন পান্তাভাত পঞ্চু মার্কা চেহারা। বোঝাই যাচ্ছে মধুমিতাকে ভাট মারছে। আর ও সেটাকে খেয়ে যাচ্ছে।

আমি দেখেছি এটাই হয়। ভাট কেসগুলোর কপালে ভাট কেসগুলোই জোটে। কয়েকটা এক্সসেপশন থাকে, যেমন অয়নদার সাথে যদি আমার...

এই যে, আবার অয়নদার লাইনে চলে যাচ্ছি।

আগে মধুমিতার কথা বলে নি।

মধুমিতার খুব ইচ্ছা একদিন কলকাতা গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে। আমি ওকে বলেছি তুই কেন কলকাতা যাবি। ছেলেটা যদি তোকে সত্যিকারের ভালোবাসে তাহলে ছেলেটাকেই এখানে আসতে বল। তাতে মধুমিতা আমাকে কটমট করে দেখে বলেছে, “যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে একদম কথা বলবি না। তুই

জানিস ও কত ব্যস্ত একজন ছেলে? ইচ্ছা করলে বাইক নিয়েই ও চলে আসতে পারে। কিন্তু এখন ওর জিম আছে, ডান্স আছে। ও কিছুতেই আসবে না।”

আমি অবাক হয়ে বলেছি, “ও ডান্সও করে?”

মধুমিতা গম্ভীর হয়ে বলল, “করে তো। ও খুব ভালো পাগলু ডান্স নাচতে পারে। দেখবি একটা ভিডিয়ো আপলোড করেছিল। আমার তো দেবের থেকেও ওর পাগলু ডান্স বেশি ভালো লাগে।”

শুনে আমি হাসব না কাঁদব কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, “তুইও শিখে নে। বিয়ের পর বর বউ লে পাগলু ডান্স ডান্স ডান্স ডান্স বলে নাচতে থাকবি।”

মধুমিতা বলল, “তুই কি ইয়ার্কি মারছিস আমার সাথে?”

আমি সিরিয়াস মুখ করে বললাম, “ইয়ার্কি মারব কেন? এতে ইয়ার্কি মারার কী আছে? তুইও তো নাচ জানিস। জানিস না?”

মধুমিতা আমার সিরিয়াস মুখ দেখে সিরিয়াস হয়ে বলল, “আরে আমাদের স্যার পাগলু শেখায় না। সেই শ্যামলসুন্দর পাঁচ বছর ধরে শিখিয়ে যাচ্ছে। ওই পাড়ার টিঙ্কুদা আছে, টলিউড আর বলিউড শেখায়। আমি ঠিক করেছি বাবাকে বলে ওখানে শিখতে যাব। এইসব রবীন্দ্রনৃত্য আজকাল চলে বল? ওকে যখন বলেছি তখন কী হাসি, জানিস? বলে ওইসব ওল্ড হয়ে গেছে।”

আমি বড়ো বড়ো চোখ করে বললাম, “তাই? রবীন্দ্রনৃত্য ওল্ড হয়ে গেছে বলেছে?”

মধুমিতা জোর পেয়ে বলল, “বলেছে তো! এখন তো এসবেরই যুগ বল?”

আমি অনেক কষ্টে জিভ কামড়ে হাসি সামলাতে সামলাতে বললাম, “হ্যাঁ তো। স্টেজের একদিক থেকে তুই দৌড়ে আসবি আর একদিক থেকে তোর পঞ্চু হিরো দৌড়ে এসে পাগলু ডান্স ডান্স ডান্স করবে, জমে যাবে কিন্তু, তুই এখনই ভরতি হ।”

এইটুকু বলে আর পারলাম না। হিহি করে হেসে দিলাম। তারপর থেকে মধুমিতা আমার উপর হেবি খচে আছে। দেখলেই গম্ভীর হয়ে যায়। পড়ার পরে ছুতোনাতায় একা একা বেরিয়ে যায় আমাকে না নিয়েই।

বাড়ির গল্প আবার আরও সরেস। বউদি ফিরেছে।

সবাই দুপুরে ঘুমোচ্ছিলাম।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলে দেখি বউদি দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে বললাম, “তুমি?”

বউদি আমার দিকে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে বলল, “কেন আসতে বারণ নাকি? তোমার দাদা কোথায়?”

আমি বললাম, “ঘরে।”

বউদি গটগট করে ঢুকে ওদের ঘরের দরজায় নক করল। দাদা দরজা খুলে দেখল বউদি দাঁড়িয়ে আছে।

আমার হেবি হাসি পাচ্ছিল। দাদার মুখটা বউদিকে দেখে কেমন পেটো পাঁচুর মতো হয়ে গেল।

বেচারা ভালোই ছিল বাড়িতে।

বউদি যে বিনা নোটিসে চলে আসবে বুঝতে পারেনি।

দাদা বলল, “তুমি?”

বউদি বলল, “সবাই মিলে তুমি তুমি করছ কেন? হ্যাঁ আমি। এলাম।”

দাদা বলল, “তুমি একা একা চলে এলে?”

বউদি বলল, “কেন একা আসতে পারি না?”

দাদা বলল, “জানাতে পারতে তো একবার।”

বউদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “মিলি, যা খাবার আছে বের করে দাও তো। আমার দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি।”

দাদা কেমন ক্যাবলা ক্যাবলা মুখ করে বউদির দিকে তাকিয়ে থাকল। আমি হাসি চাপতে চাপতে ফ্রিজের দিকে ছুটলাম।

দুপুরে চারাপোনা হয়েছিল।

বউদি আবার ছোটোমাছ খেতে পারে না।

৪৪

শিয়ালদা স্টেশনে নারান যখন নামল তখন দুপুর বারোটা। দোকানের মাল নিতে প্রতি মাসেই কলকাতা আসতে হয়। অন্যান্যবার দোকানের ছেলেটাকেই পাঠায়, শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেই আসে। ছেলেটাও খুশি হয়। অনেক মাল বইতে হয়। নারান গেলে ট্রান্সপোর্টে নিয়ে আসে। ছেলেটা গেলে ওর ঘাড় দিয়েই সব যায়।

বিপিনের হোলসেলারের ব্যবসা বড়োবাজারে। নারান যেতেই বিপিন খুব খুশি হল। নারানের মতো শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাবের লোককে বিপিন বড়ো পছন্দ করে। নিজেই বলে সারাক্ষণ খিট খিট করতে করতে আর দাম নিয়ে ঝগড়া করতে করতে জীবন চলে গেল। নারানের সঙ্গে কথা বলে তার মাথা ঠান্ডা হয়।

“বসো বসো, শরবত খাবে তো?” দোকানের একটা ছেলে চেয়ার এগিয়ে দিল।

নারান বসল।

বিপিন বলল, “কী খবর তোমাদের ওদিকে? প্রায়ই তো খবরে দেখাচ্ছে কীসব রেপ-টেপ হচ্ছে? খুব বাজে অবস্থা তো!”

নারান বলল, “হ্যাঁ খুব বাজে অবস্থাই বটে।”

“পুলিশ কী করছে? কাউকে ধরতে পারল?”

নারান না-সূচক মাথা নাড়ল।

বিপিন বলল, “এখন চারদিকে এই একই অবস্থা চলছে। তুমি দেখবে, নিশ্চয়ই কোনও কমবয়সি ছোঁড়াদের কাজ। এই মোবাইল হল যত অনিষ্টের মূল। হাতে হাতে মোবাইল। সবাই ব্লু-ফিল্ম দেখে, আর এইসব করে বেড়ায়।”

নারান কথাটা শুনে মৃদু হেসে বলল, “তা যা বলেছ। এই বাজারে ছেলেমেয়ে হওয়াও চিন্তার কারণ।”

বিপিন চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, “আমার বড়ো ছেলে। বিয়ে-থা দিয়েছি, থাক আনন্দে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে, তা না। ওই নেশা ধরে গেছে। ব্যবসা আলাদা করেও শান্তি নেই বুঝেছ? সব টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে মাগিবাজি করে। যুগের ধর্ম বুঝলে কি না? ছোটোটার আবার ব্যবসা পছন্দ না। পার্টি মিছিল মিটিং করে বেড়ায়। আমার হয়েছে জ্বালা। ভগবান দুটো ছেলে দিয়েছে তারা যদি এরকম হয় তবে কেমন লাগে বলো দিকি? বউটা আবার বড়ো ছেলেকে কিছু বললেই তেড়ে আসবে। পুরুষমানুষ নাকি! তা বাপু পুরুষমানুষ বলে কোথায় লেখা আছে খারাপ পাড়ায় মেয়েছেলে নিয়ে শুয়ে থাকবে।”

নারান বলল, “এটা নিয়ে তো তুমি অভিযোগ করতে পারো না। এসব রোগ তো চিরকালই ছিল।”

বিপিন নারানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “তা জানি, আদিম রোগ, তা বলে আমার ঘরেই হতে হল? এর থেকে টাকাপয়সা থাকত না, বেঁচে যেতুম। তবু ভালো এখনও অবধি মেয়েছেলে নিয়ে বাড়িতে এসে ওঠেনি। শেষ বয়সটা নিয়ে বড়ো চিন্তা হয়ে গেল হে।”

নারান বলল, “চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা তোমার পেমেন্ট কত বাকি আছে একটু হিসাব করে বলবে? আমি হাজার পঞ্চাশেক টাকা এনেছি আজকে।”

বিপিন খুশি হল। টাকার গন্ধ তার বড়ো প্রিয়। সে ক্যাশিয়ার চট্টরাজকে নির্দেশ দিল নারানের হিসেব বের করে দিতে।

তারপর বলল, “অবশ্য এককালে ইয়ের নেশা আমার যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। তবে খারাপ পাড়ায় যেতে হয়নি কোনওদিন।”

নারান অবাক হল, "তাহলে?"
বিপিন বলল, "ছিল ছিল। সে অনেক কেচ্ছা। তা ছাড়া এখানে বলাও যাবে না। তোমার মতো ভদ্রলোকেদের অবিশ্যি এসব কথা কানে শোনাও পাপ।"
নারান হাসল, "তা বটে। সে সাহসই করে উঠতে পারলাম না সারাজীবনে। নিজের বউকেই..."
বিপিন গলা খাঁকরাল, আর-এক কাস্টমার এসে গেছিল। নারান উঠে বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি।"
বিপিন অবাক হল, "কোথায় যাবে?"
নারান বলল, "আসছি, হিসাবটা চট্টরাজবাবু করে নিন, আমি এসে টাকা মিটিয়ে দেব।"
বিপিন বলল, "আচ্ছা ঘুরে আস।"
নারান বেরোল। অনেকরকম দোকান বড়োবাজারে। সে একটা ইমিটেশনের দোকানে গিয়ে বউয়ের জন্য চুড়ি কিনল। দোকান থেকে টাকা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ তার মনে হল সবকিছু করার পরে মৃত নগ্ন শরীরটাতে যদি গয়না পরানো যায় কেমন হবে? ভিড় বাজারের মধ্যেই ছবিটা কল্পনা করল সে চোখ বন্ধ করে। উত্তেজনাটা ফিরে আসছে।
কলকাতাকে সে ভয় পায়। এত লোক, এই ভিড়ে থাকলে কি তার ইচ্ছা পূর্ণতা পেত?
ইমিটেশনের দোকানে ফিরে গেল সে। পছন্দ করে গয়না কিনল কয়েকটা। গয়নাগুলো রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।
হঠাৎ মনে পড়ল, হাতুড়ি কিনতে হবে একটা। হাতুড়ির কথা তার মনে ছিল না কেন?
বিপিন দোকানেই ছিল। দোকান ফাঁকা। নারানের হাতে ব্যাগগুলো দেখে বিপিন বলল, "কী কিনলে হে?"
নারান মাথা চুলকে বলল, "এই ঘরের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস।"
বিপিন বলল, "আচ্ছা আচ্ছা। আমি তোমার কথা ভাবি মাঝে মাঝে। নিরীহ নির্ভেজাল লোক। কোনও দোষ নেই, নেশা নেই, আচ্ছা থাকো কী করে বলো তো?"
নারান অমায়িক হাসি হাসল, "ওই চলে যায় আর কি।"
বিপিন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সবাই যদি তোমার মতো হতে পারত। আজকাল ভালো লোকের বড়ো অভাব।"
নারান হাসি হাসি মুখ করে বসে থাকল।

৪৫

পাড়ার ক্লাবে ক্যারাম খেলা হচ্ছিল। রূপম খেলছিল।
বাপ্পা এসে ডাকল সিরিয়াস মুখে, "গুরু, এদিকে শুনে যা।"
রূপম বেরোল। ক্লাবের বাইরে একটা ছাতিমগাছের তলায় বেঞ্চি আছে। তারা সেখানে গিয়ে বসল। বাপ্পা বলল, "থানায় গেছিলাম।"
রূপম বলল, "কী করতে?"
বাপ্পা বলল, "এই একটু খোঁজখবর নিতে। তোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম।"
রূপম বলল, "কী বলল?"
বাপ্পা বলল, "বড়োবাবু মুডে ছিলেন আজ। বলে দিলেন একমাস পরে স্টেশন লিভ করতে পারবি। নো প্রবলেম।"
রূপম বলল, "এখন করতেই বা কী সমস্যা?"
বাপ্পা বলল, "সে কীসব আছে, আমি অত বুঝি না। একটু কষ্ট করে থেকেই যা, কী করবি।"
রূপম মনে মনে হাসল। মুখে বলল, "যাক। অনেকটা করলি আমার জন্য। থ্যাংকস।"
বাপ্পা বলল, "কী করলাম বল? তোর চাকরি নিয়ে সমস্যা না হয়। একমাস থাকা মানে অনেকটা।"

রূপম বাপ্পার দিকে তাকাল। রাজনীতি, স্বার্থপরতা, সবকিছুর পরেও মানুষের মধ্যে এখনও মানুষের কথা ভাবার জন্য একটা মন আছে তাহলে? সে বলল, "তুই চিন্তা করিস না। কিছু একটা ম্যানেজ হয়ে যাবে। অনেকদিন পরে মনে হল তুই খুব একটা চেঞ্জ হোসনি। সেই আগের মতোই আছিস।"

বাপ্পা বলল, "দেখ ভাই, বেঁচে থাকার জন্য যেরকম যেরকম করতে হয় সেরকমটাই করি। তোর মতো তো আর ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলাম না। চাকরি করে খাবার ক্ষমতা আমার কোনও কালেই ছিল না সেটা আমার থেকে ভালো আর কে জানবে! এবার এসবের জন্য কারও কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস কর, কারও ক্ষতি হোক চাই না কোনওদিন। কী করব, আমাদের সমাজটাই এরকম হয়ে গেছে। টাকা ছাড়া এখন একটা পাতাও নড়ে না। তুই বেঁচে গেছিস এসবের থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিস।"

রূপম বলল, "স্বাভাবিক, মানুষ তো পরিবর্তিত হয় সমাজের চাহিদা মেনেই। যেমন সমাজ, মানুষ তেমনই হবে। তুই অত ভাবিস না, শুধু দেখিস, কোনও নিরীহ মানুষের যেন কোনওদিন ক্ষতি না হয়।"

বাপ্পা হাসল, "গুরু এটা একটু বেশি হেবি কথা বলে দিলে তুমি। আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম না, কী যেন ইংরেজিটা?"

রূপম বলল, "সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট?"

বাপ্পা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা নিরীহ লোক না খেলে কী করে হবে গুরু?"

রূপম বলল, "বেঁচে থাকার জন্য লড়াইটা কি চিরকালই হবে নাকি? একটা কোথাও গিয়ে তো আমরা থিতু হব নাকি? ধর না দেশভাগের সময়টা। কত লোক ওপার থেকে এপারে চলে এলেন। সেসময়টা তো স্ট্রাগল ছিলই। স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স যাকে বলে। কিন্তু ধীরে ধীরে কলোনি হল, তার বাসস্থানের সুরাহা হল, জল এল, ইলেক্ট্রিসিটি এল, যে মানুষটা খেতে পেত না সে খেতে পেল। ধীরে ধীরে একটা স্থিতাবস্থা এল। এরপর তো স্বাভাবিকভাবেই লড়াই করার ব্যাপারটা কমে এল। কিন্তু এখন যে সময়টা এসেছে সেটা অন্য সময়। আমরা নিজেরাই এই স্থিতাবস্থাকে নষ্ট করে দিতে শুরু করেছি। যে কারণেই আবার স্ট্রাগলের কথাটা আসছে। আজ দেখ না, স্বাধীনতার এত বছর পরেও তোকে চিন্তা করতে হচ্ছে কোন টেন্ডারটা পাবার জন্য তোকে কোন কোন জায়গায় খুশি রাখতে হবে। আমাকে একটা অন্যায় কেসে ফাঁসিয়েছে বলে সেই তোকেই তো অন্য রূপে দেখলাম। আমরা সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি এক্সপ্লয়েট করে ফেললাম বোধহয়।"

বাপ্পা খানিকক্ষণ রূপমের দিকে তাকিয়ে বলল, "গুরু অনেকদিন পরে তোর সাথে কথা বলে ভালো লাগল। তুই তো কোনওদিনও আর পাঁচটা ভালো ছেলের মতো আমাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতিস না। তুই আমাদের সঙ্গে চিরকালই মিশেছিস। কাকিমা কাকাবাবুরাও কোনওদিন বারণ করেননি আমাদের সঙ্গে মিশতে। ভালো লাগে তোর সঙ্গে কথা বলতে। তুই পালটে যাস না কিন্তু কোনওদিন।"

রূপম হেসে ফেলল, "আর পালটাব কবে? যা-তা বলছিস তো। আচ্ছা শোন আমি বাড়ি যাই এবার। রাতে আসব, আড্ডা হবে।"

বাপ্পা গলা নামিয়ে বলল, "গুরু বিয়ার খাবে নাকি?"

রূপম বলল, "না, সেই তো বাড়িতে ফিরতে হবে। বাড়িটা এখনও আমার কাছে একটু আলাদা জায়গা রে। বাবা তো। যতদিন বেঁচে আছে, সম্মানটা প্রাপ্য লোকটার, তাই না?"

বাপ্পা বলল, "উফ গুরু, সেন্টু দিয়ে দিচ্ছ পুরো। আচ্ছা, যা, বিকেলে আসিস নাহয়।"

***

রূপম বাড়িতে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে একটা ধাক্কা খেল। বেশ খানিকক্ষণ মনে হল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

শ্রাবন্তী রান্নাঘরে মার কাছে চাপ নিয়ে রান্না শিখছে। মিলি আর রূপসীও আছে।

একটা নর্দমার পাশে মোমের নগ্ন শরীরটা পড়ে আছে। শরীর থেকে রক্ত ভেসে নর্দমায় পড়ছে।

মোমের মুখের কাছে ভনভন করছে মশা।

অজস্র লাল পিঁপড়ে শরীর জুড়ে একটু একটু করে বাসা বাধছে। একটা সময় ধীরে ধীরে মোম উঠে দাঁড়াল। তারপর শহরে হাঁটতে বেরোল। শহরের সব লোক মোমের নগ্ন শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে। মোমের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিশ্চিন্তে সে হেঁটে চলেছে রাস্তা জুড়ে। একটা সময় মোম রূপমের সামনে এসে দাঁড়াল। রূপমকে বলল, "ভালো আছ?"

রূপম কী বলবে বুঝতে পারছে না, মোমের চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। আবার মাথা নীচু করলে চোখ চলে যাচ্ছে মোমের নগ্ন শরীরের দিকে। রূপম কথা বলতে চাইছে, বলতে পারছে না, তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছে...

রূপম ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘড়িটা নাইটবাল্বের পাশেই। দেখল রাত আড়াইটা বাজে। পাশে শ্রাবন্তী ঘুমোচ্ছে। সে খানিকক্ষণ চুপচাপ খাটে বসে রইল। দিনে ভুলে গেলেও স্বপ্নে অবধারিতভাবে মোম চলে আসছে।

সে খাট থেকে নামল। টেবিলে বোতল রাখা আছে। বেশ খানিকটা জল খেয়ে সোফায় বসল।

মিনিট দশেক পর উঠে দরজা খুলে ছাদে গেল। গোটা পাড়া ঘুমোচ্ছে।

গোকুলবাবুও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

রূপম বেশ খানিকক্ষণ গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা এভাবে থাকে কী করে? অবশ্য কাশ্মীরে সে দেখেছে সেনারা মাঠেঘাটেই সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকে। এভাবে ডিউটি করেই এঁরা অভ্যস্ত।

মোবাইলটা নিয়ে এসেছিল সে। অনেকদিন পরে হোয়াটসঅ্যাপ খুলল। অফিসের বিভিন্ন কলিগ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইছে সব ঠিক আছে কি না। রূপম সবাইকে নিশ্চিন্ত করল। ছাদে হাওয়া দিচ্ছে খুব হালকা। রূপম ছাদের মেঝেতেই চুপচাপ বসে রইল। পাড়াটা দিন দিন কেমন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়ির সামনে আগে মাঠ ছিল। এখন বাড়ি হয়ে গেছে। পাড়ায় কোথাও খালি জমি পড়ে নেই। এই মফস্সলেই জমির দাম হুহু করে বাড়ছে। মানুষের সব জায়গাতেই বাড়ি করতে হবে। গাছ কাটা হচ্ছে। মানুষে মানুষে হানাহানি বাড়ছে।

রূপম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ছোটোবেলাটাই ভালো ছিল। এত কিছু মাথায় আসত না তখন। আজকাল ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো কেমন উত্তেজিত করে দিচ্ছে।

"কতদিনের রিলেশন ছিলে মেয়েটির সঙ্গে আপনার?"

রূপম চমকে তাকাল। গোকুলবাবু কখন নিঃশব্দে ছাদে চলে এসেছেন।

সে বলল, "আপনি তো খুব সুইফট।"

গোকুলবাবু একটু দূরত্ব রেখে বসলেন। বললেন, "আজ বিড়িও আছে, লাইটারও আছে। আপনার কাছে আর হাত পাততে হবে না। দাঁড়ান, একটা সুখটান দিয়ে নি।"

বিড়ি জ্বালিয়ে একটা টান দিয়ে গোকুল বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কতদিনের রিলেশন ছিল?"

রূপম বলল, "বেশ কিছুদিন, স্টেডি রিলেশন ছিল বলতে পারেন। তবে এইসব কথা না বললে ভালো হত।"

গোকুল বললেন, "এই যে আপনি ছাদে চলে আসছেন মাঝরাতে, এইসবই হল আপনার পুরোনো প্রেম চেগে ওঠার কনসিকোয়েন্স। আপনি এসব যত ভাববেন, তত আপনি নিজের মাথা খারাপ করবেন।"

রূপম বলল, "আমি তো সচেতন অবস্থায় ভাবিনি। স্বপ্নে এলে কী করব?"

গোকুল বললেন, "সবই তো অবচেতন মনে জমিয়ে রেখেছেন। আপনার চেঞ্জে যাওয়া দরকার এখন।"

রূপম বলল, "সে তো আপনারাই আটকে রেখে দিলেন। এখান থেকে বেরিয়ে গুরগাঁও গিয়ে অফিস জয়েন করতে পারলে ভালো হত।"

"গুরগাঁও? সেও তো ডেঞ্জার জায়গা শুনেছি। ওই খাপ পঞ্চায়েত-টেত আছে না কাছেপিঠে?"

রূপম হাসল, "এখন তো গোটা দেশ জুড়েই খাপ পঞ্চায়েত বসছে যত দিন যাচ্ছে। অত চিন্তা করে কী হবে আর?"

গোকুলবাবু মাথা নাড়লেন, "খুব একটা ভুল বলেননি। ক্রাইমের রেশিও আমাদের এখানেও হুহু করে বাড়ছে। রেপের প্রবণতা, ইভটিজিং কোনও কিছুই কন্ট্রোলের মধ্যে নেই। ক-দিন পরে হয়তো আপনাদের আশেপাশের শহরগুলোতেও এখানকার রেপিস্টের দেখাদেখি রেপ শুরু হবে। মানুষ তো খারাপটাকে আইডল বানিয়ে ফেলে তাড়াতাড়ি। নইলে আইএসআইএসে এত লোক ভরতি হয়?"

রূপম বলল, "আপনি রেপিস্টটাকে ধরতে পারবেন? যদি ধরতে পারেন, আমার হাতে একবার দিতে পারবেন? খুব বেশি সময়ের জন্য দরকার নেই। মিনিট পাঁচেক?"

গোকুলবাবু বললেন, "হিন্দি সিনেমা পেয়েছেন নাকি মশাই? ঢিসুম ঢিসুম করবেন?"

রূপম বলল, "এই লোকটার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।"

গোকুলবাবু বললেন, "এটা কোনও কথা না, আমাদের কারও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমরা যে হারে পলিউশন করি, গাছ কাটি, নিজের অজান্তেই আমরা এক-একজন বড়ো বড়ো খুনি।"

রূপম বলল, "আপনার এত সহানুভূতি আসে?"

গোকুলবাবু বললেন, "অপরাধকে ঘৃণা করো, অপরাধীকে নয়। অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। মেনে চলুন। ভালো থাকবেন।"

রূপম বলল, "কোনও ক্লু পেয়েছেন?"

গোকুলবাবুর বিড়িটা শেষ হয়ে গেছিল, হাত বাড়িয়ে ছাদ বাড়িয়ে বিড়ির ধ্বংসাবশেষটা ছাদ থেকে ফেলতে ফেলতে বললেন, "ছাই পেয়েছি।"

রূপম হতাশ হল, "এতদিনে কিছুই পেলেন না?"

গোকুলবাবু মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, "আপনি না একজন স্কলার? ছাইতেও অমূল্যরতন থাকতে পারে, কবি বলেছেন, ভুলে গেলেন?"

৪৭

মাঝরাতে ঘুম ভেঙেছে অনেকবার।

ভোররাতের দিকে আর শুয়ে থাকতে পারল না নারান। দিন যত এগিয়ে আসে উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে। আর আজ তো সেই দিন।

ঘড়ির দিকে তাকাল সে।

পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। উঠে আয়নার কাছে গেল।

নিজের মুখটা অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

দাড়ি কাটা হচ্ছে না দু-দিন ধরে। মেয়েটা যখন তার মুখ দেখবে, হঠাৎ বিস্ময় আর আতঙ্কমিশ্রিত ভয় নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাবে, তখন দাড়ি থাকলে দেখতে ভালো লাগবে না। নারান দাড়ি কাটতে বসল।

অনেকক্ষণ ধরে গালে ক্রিম মাখাল সে।

তারপর ক্ষুর দিয়ে একটু একটু করে মন দিয়ে দাড়িটা কাটল। দাড়ি কাটা শেষ হলে আফটারশেভ লোশন দিল মুখে। ক্ষুরটা মগে বসানো ছিল।

অনেকক্ষণ ধরে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। এটাও তো একটা চমৎকার অস্ত্র। ওখানে চালাতে পারলে...

ভাবতেই শরীরটা উত্তেজিত হতে শুরু করল তার।

উঠল সে।

খাটের তলায় স্যুটকেসটা আছে।

সেটা বের করে বড়োবাজার থেকে কেনা ইমিটেশনগুলো বের করল।

একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে সেগুলো ভরে নিজের ঘরের দরজা সন্তর্পণে বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করল। ভোরবেলা। খুব বেশি লোক রাস্তায় বেরোয়নি। নারান মাঝে মাঝেই সকালে হাঁটে। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। সে নিরীহ মুখ করে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। পরিত্যক্ত ইটভাঁটার কাছে এসে গাছের ঝোপের ভিতরে গয়নার ব্যাগটা নামাল।

তারপর হাঁটু গেড়ে বসল সে।

দোকানের সামনে বুড়োদের আলোচনায় সে শুনেছিল প্রতিটা ম্যাচের শুরুর আগে পিচের কাছে গিয়ে সচিন চোখ বন্ধ করে ভাবত কীভাবে বোলার বল করবে আর কীভাবে সে খেলবে।

সে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করে নিচ্ছিল পুরোটা। প্রথমে আধলা মেরে মাথা ফাটানো, তারপরই টার্গেট পড়ে যেতেই বেশি নাড়াচাড়া করলে মাথায় হাতুড়ি চালানো, বডি নিস্তেজ হয়ে এলে ক্ষুর? নারান খানিকক্ষণ ভাবল। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। ঠিক করল পরিস্থিতির উপরে ছেড়ে দেবে। সবকিছু হয়ে গেলে ইমিটেশনের গয়নাগুলো পরিয়ে দিলেই হবে।

মনে মনে ভাবছিল, আজ দুপুরে যখন কাণ্ডটা হবে আর বিকেলে গোটা প্রতাপনগরের লোক দেখবে নগ্ন মেয়েটাকে গয়না পরিয়ে গেছে সে, তখন কেমন প্রতিক্রিয়া হবে।

বাবা দিয়েছিল হাতঘড়িটা। দম দিয়ে চালাতে হয়। নারান সময় দেখল। পৌনে সাতটা বাজে। এবার আর দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। পা চালাল সে। রাস্তায় দু-শালিকও দেখে নিল। মন দিয়ে প্রণাম করল। খুশি হল। দু-শালিক মানে আবার ছক্কা হাঁকাবে আজ।

আজ মনঃসংযোগের দিন। অন্য কোনও দিকে তাকালে হবে না। প্রথমে দোকানে যাবে। দোকান খুলে বসতে হবে। ছেলেটাকে দোকানে বসিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এক ঘণ্টার ছোট্ট অপারেশন।

নারান বাড়ি এল। বউ উঠে পড়েছে। গোটা বাড়িটা জল দিয়ে ধোয়া চলছে এখন। সে ঢুকল না। দাঁড়িয়ে থাকল। জল দিয়ে ধোয়ার সময় ঘরে ঢুকলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলবে শুচিবাই মহিলা।

নারান বাইরের বেঞ্চিতে বসল। রোদ উঠছে, গরম পড়বে আজ।

যত রোদ ওঠে, তত মানুষ বাড়ির বাইরে কম বেরোয়, ইটভাঁটার সামনে দিয়ে মানুষের যাতায়াতের সম্ভাবনা আরও কমে যাবে। সে খুশি হল।

বউ বাইরে এল। এখন বাড়ির সামনেটা ধোয়া হবে।

“ঘরে ঢোকার সময় জুতো বাইরে রেখে ঢুকো দয়া করে।”

নারান কথাটা শুনল, কিছু বলল না।

লোকের চোখে পড়ে যাবে নেহাত, নইলে এই মহিলাকে প্রায়ই কুপিয়ে পিস পিস করে মাংস্টা কুকুরকে খাইয়ে দিতে ইচ্ছা করে। দিন দিন একটা মাংসপিণ্ড আর শুচিবায়ুর শোকেসে পরিণত হচ্ছে। শেষ কবে তারা একসাথে শুয়েছে মনে করতে পারে না নারান।

জুতো খুলে ঘরে ঢুকে চা বানিয়ে খেল সে।

সকালের টিফিনটা বাড়ির ভরসায় রেখে দিলে এগারোটা বাজবে। তৈরি হয়ে বেরোল ।

সকালে লোকে বাজার করতে যাচ্ছে। নারান বাজারে ঢুকে ধীরেসুস্থে সুবলের দোকানে বসল।

সুবল লুচি ঘুগনি বানায় চমৎকার। ঘুগনির উপরে কুচি কুচি পেঁয়াজ ছড়িয়ে দেয়, স্বর্গীয় খেতে লাগে। নারান প্রথমে চারটে লুচি নিল। তারপর দুটো লুচি নিতে আরও ঘুগনি দিল তাকে। খাওয়া শেষে চা নিয়ে বসল কিছুক্ষণ।

নারান মনে মনে একটা হিসেব করল। সব রেখে থুয়েও সুবল কম করে দিনে পাঁচহাজার টাকা বিক্রি করে। প্রতাপনগরে সুবলের একচেটিয়া ব্যবসা। শুধু টিফিন বেচে আর সন্ধ্যায় চপ বেচেই দোতলা বাড়ি করে ফেলেছে।

দোকানটা কিন্তু ঝুপড়িই রেখেছে। নারান মনে মনে হাসল। এটা খুব ভালো বিজনেস প্ল্যান। ঝুপড়ি দোকানে ভালো রান্না হলে সবাই আসে। দোকান ধোপদুরস্ত হলে নিম্নমধ্যবিত্তরা আসে না। ভাবে দাম বেশি। সুবল খুব ভালো বোঝে ব্যবসাটা।

টাকা দিয়ে বেরিয়ে সে নিজের দোকান খুলল। ছেলেটা ঘুম ঘুম চোখে এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটাকে দিয়ে দোকান ঝাড় দিয়ে সে ক্যাশে বসল, এমন সময় একজন এসে বলল, "আচ্ছা দাদা, এখানে সিনেমা হলটা কোথায় বলতে পারেন?"

নারান লোকটাকে চিনতে পারল না। এলাকার না হয়তো।

সে সিনেমা হলের দিকনির্দেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

এবার মনঃসংযোগের সময়।

৪৮

মধুমিতার বয়ফ্রেন্ড নাকি কোন এক অ্যাঞ্জেল প্রিয়ার ছবিতে লাইক করেছে। মধুমিতার তাই মনখারাপ।

স্যার আসতে একটু দেরি করছিলেন। মধুমিতা কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে ওর দুঃখের কথা জানাচ্ছিল। স্যার দুটো উইক সকালে পড়াবেন বলেছেন। বিকেলে নাকি কোথায় যাবার কথা আছে।

স্কুল বন্ধ এখন। কীসব কাজ চলছে স্কুলে।

দিনটা ভালোই কাটছে আজকাল। দাদা বলেছে বিকেলবেলায় সিনেমা দেখতে নিয়ে যাবে।

আমাদের এখানে কোনও মাল্টিপ্লেক্স নেই।

একটাই সিনেমা হল। তার আবার গালভরা নাম রত্নবীণা। আমি দাদাকে বললাম রত্নবীণাতে তো এসি নেই। বউদি দেখতে পারবে?

দাদা বলে দিয়েছে সেটা শুরুতেই বউদিকে বলার দরকার নেই। তাহলে আর বউদি যাবে না।

আমার খুব মজা লেগেছে। বউদি যদি হলে ঢুকে বোঝে এসি নেই তাহলে কী করবে? উঠে চলে যাবে? দিদিও যাবে সিনেমা দেখতে। আমি দিদিকে আলগোছে জিজ্ঞেস করেছি, "হ্যাঁ রে, অয়নদাকে নিয়ে যাবি নাকি?"

দিদি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছে, "অয়ন কেন যাবে? ও কি আমাদের ফ্যামিলির লোক?"

আমি মনে মনে বলেছি "হ্যাঁ বাড়ির জামাই হয় তো", আর মুখে বলেছি, "না, কী হয় গেলে? সবাই মিলে গেলে মজা হবে বেশ।"

দিদি বলেছে, "তুই এক কাজ কর না, দাদাকে বল গিয়ে।"

আমি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলেছি, "আমি কেন বলতে যাব? তুই-ই বল। তোর বন্ধু।"

দিদি বলেছে, "মিলি, তুই কিন্তু ভীষণ পেকেছিস। আমি দাদাকে সব বলব তুই কী কী করছিস আজকাল।"

আমি ওই একইরকম মুখ করে ছিলাম, বললাম, "কী করছি রে দিদি? বটগাছের তলায় দেখা করছি কারও সাথে?"

দিদি বড়ো বড়ো চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা আবার কী?"

আমি বুঝেছি কেলো করে ফেলছি। চুপচাপ সে জায়গা থেকে সরে বাবার পাশে গিয়ে বসেছি। বাবার কাছে থাকলে দিদি বেশি খাপ খুলতে পারে না। শুধু দূর থেকে আগুনে দৃষ্টি দিয়ে আমাকে ভস্ম করে দেবার বৃথা চেষ্টা করবে।

আজ স্যার পড়ানো শুরু করতেই মধুমিতা বলল, “স্যার আপনি একটু সেলিম আর আনারকলির পার্টটা পড়াবেন?”

স্যার অবাক হয়ে বললেন, “সেলিম আর আনারকলির পার্ট মানে?”

মধুমিতা বলল, “স্যার কালকে একটা সিনেমা দেখলাম। আকবরের ছেলে নাকি একজনের সাথে প্রেম করেছিল। তার নাম আনারকলি। আকবর তাকে ব্লক করে দিয়েছিল। মানে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল। সেই পার্টটা পড়ান না স্যার।”

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

স্যার কয়েক সেকেন্ড মধুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?”

মধুমিতা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “না স্যার, ইয়ার্কি কেন হবে? সেলিম আর আনারকলির গল্প আমাদের পড়াবেন না?”

স্যার রেগেমেগে বললেন, “এরপর যদি দেখেছি এইসব বলছ একদম সরাসরি বাড়িতে জানিয়ে দেব। নাও লেখো যা বলছ।”

ধমকধামক দিয়ে স্যার নোটস দেওয়া শুরু করলেন।

আমার একটা সমস্যা আছে। সেটা হল আমি কিছুতেই হাসি চাপতে পারি না। স্যার এদিকে আকবরের ধর্মনীতি নিয়ে নোটস দেওয়া শুরু করলেন আর আমার থেকে থেকে হাসি পেতে লাগল। হাসিটাকে অনেক কষ্টে চেপে রাখছিলাম। কিন্তু যেই একবার মধুমিতা আমাকে জোরে চিমটি কাটল আমি জোরে জোরে হেসে দিলাম।

স্যার নোটস দেওয়া থামিয়ে আমাকে বললেন, “কী হল তোমার? এত হাসি আসছে কোত্থেকে? বাড়িতে বলব?”

আমি বললাম, “না স্যার, পুরোনো একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই হাসি এল।” বলে আবার হাসতে শুরু করলাম।

স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, “তোমাদের ব্যাচের মতো বাজে ব্যাচ আমি আর দেখিনি। এত ফাজিল হলে হয় নাকি? শুধু ঠাট্টা ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু করো না। দাঁড়াও তোমাদের একটা টেস্ট নেব নেক্সট উইকে। যার রেজাল্ট খারাপ হবে তার গার্জিয়ানদের ডেকে আমি নিজে কথা বলব। হচ্ছে তোমাদের, দাঁড়াও।”

মধুমিতা ফস করে বলে বসল, “স্যার আমার বাবা মা তো বেড়াতে গেছে। আমি গার্জিয়ান কোত্থেকে পাব?”

স্যার বললেন, “ফিরুন ওনারা। তোমার আর মিলির ব্যাপারে আলাদা করে কথা বলব। তোমরা ভীষণ বাড় বেড়েছ।”

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। স্যার নোটস দেওয়া শুরু করলেন। আমি জিভ কামড়ে অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখলাম।

পড়া শেষ হলে বেরিয়ে মধুমিতা বলল, “স্যার একদম চাপ খেয়ে গেছিল সেলিম আর আনারকলির নামে।”

আমি হাসলাম। অনেকক্ষণ ধরে।

মধুমিতা বলল, “জানিস মা কী বলে? মেয়েদের বেশি হাসতে নেই। যত হাসে তত কান্না, বলে গেছে কপিল শর্মা।”

আমার আরও হাসি পেয়ে গেল। বললাম, “এসব সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা যত্তসব।”

মধুমিতা বলল, “আজ আমার মনটা ভালো নেই রে। স্যারের ওখানে হাসলাম বটে কিন্তু ও সেই অ্যাঞ্জেল প্রিয়ার ছবিতে লাইক করেছে ভাবতেই আমার কেমন রাগ রাগ ফিলিং আসছে।”

আমি বললাম, "তুই এক কাজ কর। সব ছেলেদের ছবিতে লাইক কর আর বেশি বেশি করে কমেন্ট কর।"

মধুমিতা উত্তেজনায় আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, "ঠিক বলেছিস। দারুণ আইডিয়া। আর জানিস তো, মোবাইল থেকে ঠিক গুছিয়ে সব করা যায় না। কম্পিউটারে বসতে পারলে ভালো হয়। শোন না, আমার সঙ্গে চ।"

আমি বললাম, "কোথায়?"

মধুমিতা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "সাইবার কাফেতে। বসে বসে ব্যাটার পিন্ডি চটকাই।"

আমি বললাম, "না না, তুই যা, আমার আজ সিনেমা দেখতে যাবার কথা সবাই মিলে। অনেক কাজ পড়ে আছে বাড়িতে।"

মধুমিতা ঠোঁট উলটাল, "ও, তোর তো এখন ব্যাপারই আলাদা। ঘ্যামই আলাদা। দাদা বউদি এসেছে। অনেক কাজ তো হবেই। আচ্ছা, যা তাহলে, আমি সাইবার কাফে চললাম।"

মধুমিতা অন্য রাস্তায় চলে গেল।

আমি পা চালালাম। ওর ভরসায় থাকলে আর বাড়ি যাওয়া হবে না। রোজ রোজ ওর এক-না-এক বাহানা থাকে বাড়ি না ফেরার।

বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে হবে।

৪৯

শিকার ধরার সময় বাঘ কী করে? প্রথমে শিকারকে অনুসরণ করে, শিকারের ওপরে সব মনঃসংযোগ দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অপেক্ষা করে থাকে।

এই সময়টা বড়ো ভালো লাগে নারানের। অপেক্ষা করে থাকা।

কোনও বড়ো অনুষ্ঠানের আগে গায়ক যখন অপেক্ষা করে থাকে, কিংবা একটা উইকেট পড়ার পর দেশের সেরা ব্যাটসম্যান যখন ব্যাট করতে নামে, তখন কেমন লাগে তার? হৃৎস্পন্দন বাড়তে থাকে, নিজের সেরাটা দেবার জন্য ছটফট করতে থাকে সে।

বেশ ভালো গরম পড়েছে। রোদের তাপে সাধারণ মানুষের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব না। নারানের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। সে মাথায় একটা ভেজা গামছা জড়িয়ে ঠান্ডা মাথায় বসে আছে।

মাথাটা গরম হচ্ছে। ঠান্ডা করা প্রয়োজন।

ঘড়ি বলছে দশটা পঁয়তাল্লিশ। সময় হয়ে গেছে। যে-কোনও সময় কচি মেয়েটা...

নারাণ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ইটের গাদার পিছনে শরীরটাকে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর...

এবার আর ছ-মাস অপেক্ষা করা গেল না। যত দিন যাচ্ছে, শরীরটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না। একটা ঘটনা ঘটাবার এত তাড়াতাড়ি পরবর্তী ঘটনা ঘটানো হচ্ছে, কী-ই বা হবে? সে মনকে প্রবোধ দিল। শরীর যখন অবাধ্য হয়ে যায় তখন আর-কোনও বাধানিষেধ মানা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

একটা সাইকেল আসছে। নারান জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে।

তারপর হতাশ হয়। একটা লোক। বাজার থেকে ফিরছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকে নারান।

লোকটা শর্টকাট করছে। এই রাস্তাটা দিয়ে খুব কম লোকই যাতায়াত করে।

তবু সাবধানের মার নেই। মেয়েটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখ চাপা দিয়ে পিছনের ইটের গাদার দিকে নিয়ে গেলে রাস্তা থেকে কারও দেখার সম্ভাবনা নেই।

লোকটা চলে গেলে নারান আবার বেরোল। হাতে আধলা।

খসখস একটা শব্দ হচ্ছে। নারান চুপ করে দেখল।

সেই সাপটা।

একটা ইটের গাদার থেকে জঙ্গলের দিকে চুপচাপ চলে গেল। মিশমিশে কালো সাপ।

ফণা আছে।

নারান হাসল।

তার থেকে বিষাক্ত আর কে আছে! এলাকায় লোকে তাকে দেখলে কত ভালো ব্যবহার করে। কারও বাড়ির সামনে দেখলে হাসিমুখে ঘরে নিয়ে মিষ্টি খাওয়ায়।

কারও বাড়ির সামনে সাপ বেরোলে লোকে ভয়ে আতঙ্কেই অস্থির হয়ে পড়ে। অথচ সাপ কারও ক্ষতি করে না যতক্ষণ না নিজের কোনও ক্ষতি হচ্ছে।

কী হতে পারে এই সাপটা? কেউটে? না গোখরো? বাজারের আশিসখুড়ো খুব ভালো সাপ ধরতে পারে। এককালে এলাকায় সাপ বেরোলে আশিস খুড়োর ডাক পড়ত। খুড়ো চোখ বন্ধ করে সাপ খুঁজে সেটাকে মারত। তারপর একদিন খুড়োর বৈরাগ্য এল।

সবাই যখন খুড়োকে সাপ মারতে নিয়ে যেত খুড়ো প্রথমেই শর্ত দিয়ে দিত, "দ্যাখো বাপু, সাপ মারতে পারব না। আমি কিন্তু ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দেব।"

তাতেই সবাই রাজি হয়ে গেল।

সেটা এক দেখার মতো জিনিস হত। এলাকার লোক অবাক হয়ে দেখত খুড়ো পরম যত্নে বিষধর সাপগুলোকে কী এক কায়দায় ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিচ্ছে।

লোকটা সাপের কামড়েই মরল। কিন্তু মরার সময়েও কী পরম প্রশান্তি চোখে মুখে। বলেছিল, "পাপের শাস্তি দিল ঈশ্বর আমাকে, কত সাপ মেরেছি। আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা কোরো না তোমরা। ও জাতসাপ, এ বিষ ছাড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই।"

নারান নিজের দু-গালে জোরে জোরে দুটো চড় মারল, এখন অন্য কিছু ভাবার সময় না, কম সময়ে, কাজ হাসিল করার সময়।

কান খাড়া করল সে, আসছে মনে হচ্ছে!

হ্যাঁ... মেয়েটা আসছে।

প্রথম লাইটপোস্টটা পেরোচ্ছে, সে আধলাটা শক্ত হাতে ধরল, এবার তাক করার সময়।

দ্বিতীয় লাইটপোস্টের কাছে এলেই ছুড়তে হবে আধলাটা। মিস হলে দৌড়ে গিয়ে গলাটা ধরতে হবে। নারান জঙ্গল ছেড়ে বেরোল, মেয়েটার সঙ্গে দূরত্ব কমাতে হবে আধলাটা ছোড়ার আগে।

মেয়েটা বেশ জোরে হাঁটছে, এই সেই মেয়েটা, যার বাড়ির সামনে পাগলটা তাড়া করেছিল তাকে, এসে পড়েছে মেয়েটা, এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, নারান আধলাটা ছুড়তে গেল।

আর ঠিক সেই সময়েই তার মাথায় একটা ইট এসে পড়ল।

চারদিক কালো হয়ে এল, তার হাত থেকে আধলাটা পড়ে গেল।

নারান অবিশ্বাসীর মতো কোনওভাবে পিছনে তাকিয়ে দেখল পাগলটা লাফাতে লাফাতে বলছে, "আউট আউট আউট আউট।" মেয়েটা হতভম্ব হয়ে তাকে দেখছে।

নারান আর চোখ খুলে রাখতে পারল না।

পড়ে গেল।

৫০

রূপসী থরথর করে কাঁপছিল।

গোকুলবাবু এগিয়ে এসে নারানের মাথায় হাত দিলেন। হাতে গামছা চুঁইয়ে খানিকটা রক্ত এসে লাগল। তাঁর পরনে একটা ছেঁড়া জামা, আর লুঙ্গি। জামার ভিতরের পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে বললেন, "ফোর্স পাঠান। অপারেশন সাক্সেসফুল।"

নারানের নাকের কাছে আঙুল নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "হ্যাঁ, ফাঁসির দড়ি পরার জন্য এখনও বেঁচে থাকতে হবে বাছাধনকে।" তারপর রূপসীকে বললেন, "বুড়োশিবতলার বটগাছে তেনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে আপনাকে এই রুটটাই নিতে হয়? মিনিমাম সেন্সটুকু নেই আপনার?"

রূপসী কোনওভাবে কথা বলতে পারল, "আপনি পাগল নন?"

গোকুলবাবু মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "আপনার মাথায় উকুন আছে?"

রূপসী অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

গোকুলবাবু বললেন, "মানে আবার কী, উকুন থাকলেই তো অ্যান্টি-উকুন শ্যাম্পু থাকার চান্স থাকে, তাই না? তা আপনার বাড়িতে আছে সে শ্যাম্পু?"

রূপসী মাথা নাড়ল, "না আমার আর আমার বোনের কারও মাথায় উকুন নেই।"

"তা শ্যাম্পু আছে তো?"

রূপসী বলল, "হ্যাঁ তা আছে।"

গোকুলবাবু বললেন, "আচ্ছা। আজ একটু মন দিয়ে শ্যাম্পু করতে হবে। আর আপনাদের বাড়িতে তো আজ মাংস হচ্ছে।"

রূপসী অবাক হয়ে বলল, "আপনি কী করে জানলেন?"

গোকুলবাবু বললেন, "সেসব থার্ড আই থাকে আমাদের, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর লোক কী সাধে হলাম মশাই? এই যে, যে ছেলেটা আপনাদের বাড়ি এসে দেখা করত, তাকেই আপনি মিট করতে রাধার অভিসারের মতো এই দুর্গম পথ দিয়ে যান সেটাও তো আমিই বের করেছিলাম। হ্যাঁ, আর ইনিও করেছিলেন অবশ্য। আপনার বোনকে ফলো করতে করতে ইনি, মানে এই যে, দেখুন তো এনাকে চিনতে পারেন নাকি?"

গোকুলবাবু নারানের মাথা থেকে গামছাটা সরালেন। "এ কী!!!এ তো বাজারের দোকানদার! কী যেন নাম!!!"

গোকুলবাবু জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "নারান। আপনাকে ওই বাকি মেয়েগুলোর মতো অবস্থা করার জন্য তাক করে বসে ছিল।"

রূপসী বসে পড়ল রাস্তাতেই। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, "আপনি না এলে আজ কী হত?"

গোকুলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কী হত, আপনি তো আবার বুড়োশিবতলায় দেখা করতে চলেই গেলেন। আমার আর কী হবে?"

রূপসী বুঝল না, "মানে?"

গোকুলবাবু বললেন, "আর মানে শুনে কাজ নেই। শুনুন। আপনি পুলিশ এলে তো বলতে পারবেন না বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন! তাহলে কী বলবেন?"

রূপসী বিহ্বল চোখে গোকুলবাবুর দিকে তাকাল, "কী বলব?"

গোকুলবাবু বললেন, "যাই বলবেন, ভেবে রাখুন। আর নইলে সত্যিটাই বলুন। সত্যি বললে চাপ কম থাকে।"

রূপসী মাথা নেড়ে বলল, "বাড়িতে তো সঞ্চারীদের বাড়ি যাবার নাম করে বেরোই, বোনেরও এই সময় পড়া থাকে, দাদা বউদি আছে বাড়িতে, সত্যি কথা বললে আমি মিথ্যেবাদী হয়ে যাব তো।"

গোকুলবাবু কয়েক সেকেন্ড মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি এক কাজ করুন, বাড়ি চলে যান। আপনাকে উইটনেস হতে হবে না। আমি সামলে নেব।"

রূপসী শূন্য চোখে গোকুলবাবুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে বলল, "এই লোকটাই মোমদিকে...?"

গোকুলবাবু মাথা উপর নীচ করলেন।

বিস্ময়, আতঙ্ক আর ঘেন্নামেশানো মুখে রূপসী খানিকক্ষণ পড়ে থাকা নারানের বডিটার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, "আমি উইটনেস হব। সত্যি কথাটাই নাহয় বলব।"

গোকুলবাবু কয়েক সেকেন্ড রূপসীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহ। আগুন আছে। এই তো চাই। তবে আপনি এখন যান। আমি বুঝে নেব। যেতে পারবেন? ভয় পাবেন না তো?"

রূপসী উঠে দাঁড়াল। বলল, "না। আমি অপেক্ষা করছি। আমি যাব না।"

গোকুলবাবু কাঁধ ঝাঁকালেন, "অ্যাজ ইউ উইশ।"

তারপর নারানের দিকে ঝুঁকে বসলেন, মুখে চুকচুক শব্দ করতে করতে নারানকে বললেন, "বস ইউ আর টু গুড। মানতেই হচ্ছে। আমার মতো ঘুঘুকেও এতদিন উকুন সহ্য করতে হল। শুধু একটু অধৈর্য না হলে কার বাপের সাধ্যি ছিল আপনাকে ধরে। আপনার জন্য আমি ফিল করি, বিশ্বাস করুন।"

রূপসী অবাক হয়ে বলল, "মানে? একটা রেপিস্ট মার্ডারের জন্য আপনি ফিল করেন?"

গোকুলবাবু বললেন, "করব না? আপনাদের এই মফস্সলে এত বড়ো একটা শিল্পী ছিল, আপনারা জানতেই পারেননি! এইসব লোককে ধরতে তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আসবে। আ হা হা, কী শিল্প, জাস্ট ভাবুন, কাজ সেরে আবার চুপটি করে দোকানে বসে পড়ছে। নিরীহ নির্বিরোধী লোক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্দেহ হতও না আমার, শুধু যেদিন আপনার বোনকে ফলো করেছিল, সেদিন একটু ভুল করে ফেলেছিল। কোইনসিডেন্স বলতে পারেন। আমার চোখেই এর চোখটা পড়ে গেছিল। প্রাইমারি টার্গেট আপনার বোনই ছিল সম্ভবত, পরে কেস স্টাডি করতে গিয়ে বুঝেছিল এই রুট দিয়ে এই সময়ে আপনি যান, আর আপনার বোন আজকাল বাজার হয়ে ফেরে। তাই টার্গেট চেঞ্জ করে ফেলেছিল। আমি বুঝেছিলাম আগেই।"

রূপসী বলল, "তাহলে আমাকে সতর্ক করে দেননি কেন?"

গোকুলবাবু রক্তমাখা হাতটা ঘাসে খানিকক্ষণ ঘষে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে বললেন, "আপনাকে সতর্ক করলে আপনি আর এই রুটে আসতেন? তাহলে ধরা পড়ত কী করে?"

রূপসী খানিকক্ষণ গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যিই পাগল। অভিনয়টা তাই সহজে করতে পারেন।"

গোকুলবাবু দাঁত বের করলেন। "তা যা বলেছেন। নইলে ফ্যামিলি ছেড়ে কেউ মশার কামড় খায় রাস্তায় শুয়ে, বলুন? বাই দ্য ওয়ে, আপনি আমাকে রেগুলার ভাত দিতেন। একটা পাগলের জন্য আপনি ফিল করেন। এইজন্য, ধুস... কীসব বলে ফেলছি, আপনি তো আবার বুড়োশিবতলার বটগাছের ওখানে..."

থানার গাড়ি চলে এসেছিল। মাইতিবাবু নেমে অবাক চোখে গোকুলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনিই মুখার্জি সাহেব?"

গোকুলবাবু বিড়ি টানতে টানতে বললেন, "ওইসব পিরিতের গল্প পরে করবেন, আগে এই মালটাকে জ্ঞান ফিরিয়ে গ্যারেজ করুন। খুনি ধরলে তো হবে না, আসল কাজ তো প্রমাণ করা। তারপর আবার মানবাধিক... ধুস..."

৫১

অন্যান্য দিনের মতোই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল রূপমের। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, "এরপরেও?"

ঘড়িটা নাইটবাল্বের পাশেই। দেখল রাত আড়াইটা বাজে। কী অদ্ভুত! রোজ ঠিক এই সময়েই তার ঘুম ভাঙছে।

শ্রাবন্তী ঘুমোচ্ছে। সে খানিকক্ষণ চুপচাপ খাটে বসে রইল।

তারপর খাট থেকে নামল। টেবিলে বোতল রাখা আছে। বেশ খানিকটা জল খেয়ে সোফায় বসল।

"কী হল তোমার?"

রূপম দেখল শ্রাবন্তী উঠে বসেছে।

রূপম বলল, "কিছু না, তুমি ঘুমোও।"

শ্রাবন্তী বলল, "মোমের কথা মনে পড়ছে?"

এই প্রথম শ্রাবন্তীর মুখে মোমের নাম শুনল রূপম। সে একটু থমকে বলল, "হ্যাঁ।"

শ্রাবন্তী খাট থেকে নামল। লাইট জ্বালাল। তার পাশে এসে বসল। বলল, "ঘুমোনোর চেষ্টা করো।"

রূপম ভেবেছিল শ্রাবন্তী রেগে যাবে, কথা শোনাবে। হঠাৎ করে এরকম কথায় সে অবাকই হল খানিকটা। মুখে কিছু বলল না।

শ্রাবন্তী বলল, "ঘুমোতে চেষ্টা না করলে তো দুঃস্বপ্নটাই বারবার দেখবে। আমিও জেগে যাব। আমার ভেতরে যে আছে, সেও জেগে যাবে।"

রূপম শ্রাবন্তীর কথা শুনে ওর দিকে তাকাল। এই ক-দিনের দৌড়াদৌড়িতে সে তবে আসল কথাটাই ভুলে যেতে বসেছিল!

সে বলল, "তুমি ডিসিশন নিয়েছ?"

শ্রাবন্তী বলল, "হ্যাঁ। আমি ডিসিশন নিয়েছি। আমি প্রস্তুত।"

রূপম অনেকদিন পরে শ্রাবন্তীর দিকে তাকাল। শ্রাবন্তী যে কথাটা বলল সেটাই কি পৃথিবীতে তার কানে শোনা এখন পর্যন্ত সবথেকে মিষ্টি কথা?

শ্রাবন্তী বলল, "তুমি কিছু বলবে না?"

রূপম অস্ফুটে বলল, "থ্যাংকস।"

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

শ্রাবন্তী বলল, "উফ, একটু বৃষ্টি হলে বাঁচি। হাওয়া দিচ্ছে বোধহয়, না? জানলাটা খুলে দাও তো।"

রূপম উঠে জানলাটা খুলল। প্রবল বেগে হাওয়া বইছে।

শ্রাবন্তী বলল, "এই, ছাদে যাবে?"

রূপম অবাক হল। শ্রাবন্তী এত চেঞ্জ হয়ে গেল কী করে?

সে বলল, "এত রাতে ছাদে যাবে? পাগল নাকি? তোমার কী হয়েছে বলো তো? রাগি রাগি ছিলে, সেটাই তো ভালো ছিল। হঠাৎ করে চেঞ্জ হয়ে গেলে আমারই তো ভয় লেগে যাচ্ছে।"

শ্রাবন্তী হাসল। বলল, "আমি তো ঠিকই করে নিয়েছিলাম অ্যাবর্ট করব। কারও কথাই শুনব না। তুমি অফিস চলে যাবে। একা একা আমি বাচ্চা সামলাব? তুমি যেদিন চলে এলে, আমি রাতে শুয়ে আছি। আগে তো একাই শুতাম, কিন্তু তুমি যাবার পরে কেন জানি না ভয় ভয় লাগছিল। হঠাৎ করেই সেদিন আমার মনে হল, আমি তো একা নেই। আমার সাথে আরও একজন আছে। আমার ভিতরে সে বাড়ছে ধীরে ধীরে। কোত্থেকে যেন সাহস চলে এল। নিশ্চিন্তে ঘুমোলাম জানো। সকালে উঠে ডাক্তার আন্টির কাছে গিয়ে বীরের মতো বললাম, আমার বাচ্চার জন্য কী কী করতে হবে বলে ফ্যালো। ডাক্তার আন্টি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, এই মেয়েটা নির্ঘাত পাগল আছে। আমার ভিতরের জনই বোধহয় আমাকে পালটে ফেলছে। তোমার জন্য ভাবাচ্ছে। তোমাদের সবার জন্য ভাবাচ্ছে।"

রূপমের মনে হচ্ছিল না কথাগুলো শ্রাবন্তী বলছে। সে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল।

শ্রাবন্তী তার হাত ধরে টানল, "ছাদে চলো তো।"

রূপম চুপচাপ শ্রাবন্তীর হাত ধরে ছাদে উঠল।

গোকুলবাবু সব মিটিয়ে দুপুরে তাদের বাড়ি এসেছিলেন। চুল দাড়ি কেটে ধোপদুরস্ত হয়ে। তাদের বাথরুমেই স্নান করলেন। রূপমকে বললেন, "বন্ধুর বাড়ি ব্যবহার করলাম, রাগ করলেন না তো?"

রূপম কৃতজ্ঞতায় কিছু বলতে পারেনি। একটা সময় গোকুলবাবু আলাদা করে ডেকে নিয়ে তাকে বললেন, "আপনার বোন সাক্ষী দেবেন। পাশে থাকবেন। খুব বেশি চাপ হবে না অবশ্য। ব্যাটা কনফেস করে গেছে। তবু, আর সবকিছুতে পাশে থাকবেন ওর। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা একটা পাগলকে সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। পরম মমতায় কেউ ভাত দেয় না।"

রূপম গোকুলবাবুর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল।

মনে পড়ে গেল ছোটোবেলায় রূপসী কেমন তার ন্যাওটা ছিল। আজ যদি ওর কিছু হত, কী হত তাদের পরিবারের?

রূপম ছাদ থেকে অভ্যাসবশত গোকুলবাবুর বসার জায়গাটার দিকে তাকাল। কেউ বসে নেই। ভদ্রলোক এতদিন পর হয়তো বাড়িতে নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। রূপম মনে মনে বলল, "ধন্যবাদ আপনাকে।"

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল। রূপম শ্রাবন্তীকে বলল, "ভিজে যাব। চলো।"

শ্রাবন্তী চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "একদম না। ভিজব আজ। যা হয় হবে।"

বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দুজনের কেউই কোনও কথা বলছিল না। শুধু ভিজে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ পর শ্রাবন্তী রূপমের বুকে মাথা রেখে ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি, আমার মেয়ে হবে। ওর নাম দেব মোম, কেমন?"

রূপম কথা বলতে পারল না...

৫২
মিলি

আমার আসলে হেব্বি রাগ করা উচিত। কিংবা কারও সঙ্গে কথা বলা উচিত না। কিংবা দিদির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া উচিত।

সমস্যা হল সেটা করতে পারছি না। দিদিকে দেখলেই কেমন যেন জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে।

যখনই মনে আসছে আমার দিদিটাকে ওই ভয়ংকর লোকটা... ততবার শিউরে উঠছি। আমার তো এখনও বিশ্বাস হয় না। কতবার ওই দোকানে গেছি। ছেলেদের চোখ দেখলে মেয়েরা বুঝতে পারে। লোকটার তো সেরকমও কিছু ছিল না। সেই যেবার পাগলের তাড়া খেয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল সেবার নাকি আমাকে ফলো করে এসেছিল। তবে লোকটা ধরা পড়ার পর একটা উপকার হয়েছে।

আজকাল রাতে আর ওই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নটা দেখি না। তবে যতবার মনে পড়ে পাগলটা আসলে গোয়েন্দা ছিল ততবার লজ্জা লাগে। ইশ, কত ভ্যাংচাতাম।

লোকটা অবশ্য বেশ ভালো। আমার জন্য একটা ইয়াব্বড়ো চকোলেট নিয়ে এসেছিল। তারপর কানে কানে বলেছে, "আর-একবার ভ্যাংচাবে নাকি? তুমি কিন্তু ভ্যাংচ্যানোতে বেশ ভালো। মানে অলিম্পিকে যদি ভ্যাংচানোর কোনও ইভেন্ট হত তাহলে নির্ঘাত তুমি ফার্স্ট প্রাইজ পেতে, বিশ্বাস করো।"

আমি লোকটাকে ভেংচে দিয়ে পালিয়েছি।

অয়নদার কথাটা জানার পর থেকে বেশ খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসেছিলাম। দিদিকে একটা রামচিমটিও দিয়েছি। তারপর ভেবে দেখেছি দুটোতে খারাপ মানাবে না। আর জাম্বুকে একটু-আধটু ঝাড়ি মারা তো আইনের বইতে লেখাই আছে। সুতরাং চাপ নিয়ে কী হবে বস!

দিদির কানে কানে বলেছি, "শেষ পর্যন্ত সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার করলি?"

দিদি আমার কান মুলে দিয়ে বলেছে, "বেশ করেছি।"

ওহ আসল কথাই তো বলা হয়নি। বউদি এখন আমাদের বাড়িতেই আছে। ভাইপো বা ভাইঝি হবার পরে যাবে। কিন্তু কথা সেটা না। কথাটা হল বউদি পুরো চেঞ্জ। সকালবেলা উঠে নিজের হাতে রান্না করবে।

দুপুরে আমাদের সঙ্গে লুডো খেলবে। কে চোট্টা করল তাই নিয়ে তুমুল ঝামেলা করবে। আমার কাজ হয়েছে এখন বউদির জন্য তেঁতুল জোগাড় করে আনা। বাবাও আজকাল বউদিকে ভয় পাচ্ছে না। দিব্যি খেলার চ্যানেল দেখছে বউদি সামনে থাকলেও।

আমি পড়ার ব্যাচে আজকাল বেশ ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছি। ইতিহাস স্যার পর্যন্ত আমার ফাজলামিতে বিরক্ত হয়ে গার্জিয়ান কলের হুমকি দিচ্ছেন না।

দুঃখের খবর একটাই। মধুমিতার হিরো হীরালাল আর ওকে পাত্তা দিচ্ছে না। তাতে অবশ্য ওর খুব একটা যায় আসে না। ইদানীং কোথাকার এক মাসল পঞ্চুর সঙ্গে খুব চ্যাট করছে। ছেলেটা নাকি দু-হাত ছেড়ে বাইক চালাতে পারে। ডান্সও করে।

একটা ডান্সের ভিডিয়ো আপলোড করেছে ফেসবুকে। সেটা দেখিয়ে মধুমিতা আমায় বলেছিল, “দারুণ না?”

আমি মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, “পুরো হিরো আলম।”

তারপর থেকে মধুমিতা আর আমার সঙ্গে কথা বলছে না...

বিজন ঘরে

১

অফিসে সেমিনার হচ্ছে। দীপের এই ধরনের সেমিনারে ভীষণ ঘুম পায়। অতি কষ্টে হাই চেপে বসে থাকতে হয়।

দিল্লি থেকে একজন বস মিস্টার মেহতা এসেছেন। আগামী পাঁচ বছর কীভাবে তাদের কোম্পানি মাটি থেকে আকাশে পৌঁছে যাবে সে বিষয়ক গুরুগম্ভীর বক্তৃতা দিচ্ছেন।

দীপ অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে বুঝল আর খানিকক্ষণ বসলে সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়বে।

সে উঠে ওয়াশরুমের উদ্দেশে রওনা দিল।

অনেকক্ষণ মোবাইল চেক করা হয়নি, ওয়াশরুমে পৌঁছে সে মোবাইল বের করল। ফোন সাইলেন্টে ছিল। একটা আননোন নাম্বার থেকে দুবার মিসড কল এসেছে। দীপ চাপ নিল না। নির্ঘাত কেউ গাড়ি বা ক্রেডিট কার্ড গছাতে ফোন করেছিল। সে হিসেব করে দেখেছে এই টাইপের লোকগুলো বেছে বেছে দুপুরের সময়েই ফোন করবে।

খানিকক্ষণ মোবাইলে সেনসেক্সের হালচাল দেখে-টেখে আবার সেমিনার হলে ঢুকতে যাবে, এই সময় চোখে পড়ল মোবাইলে রিং হচ্ছে। সেই একই আননোন নাম্বার। ধরবে না ধরবে না করেও সে ফোনটা রিসিভ করল, "হ্যালো।"

"দীপ গাঙ্গুলি বলছেন?"

ওপাশের নারী কণ্ঠস্বর চিনতে পারল না দীপ। বলল, "হ্যাঁ বলছি।"

"কেমন আছেন আপনি?" ওপাশের মেয়েটার গলায় কৌতুকের ছোঁয়া।

দীপ অবাক হল, তবে কি চেনা কেউ? সে বলল, "কে বলছেন বলুন তো?"

"আপনি আমাকে চিনতে পারছেন নাকি বলুন তো?"

দীপ অনেক ভেবেও গলাটা চিনতে পারল না। ঈষৎ রেগে বলল, "ফাজলামি না করে নামটা বলুন। আমি মাছ ধরতে আসিনি। ইম্পর্ট্যান্ট অফিস মিটিংয়ে আছি।"

"ওকে ওকে। তাহলে মিটিংয়ের পরেই ফোন করছি।"

"না না, বলুন কে বলছেন।"

ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল। দীপ অবাক হল। সে ওই নাম্বারে কলব্যাক করল।

ও প্রান্ত থেকে কেউ ফোন রিসিভ করল না।

দীপ নাম্বারটা সেভ করে চেষ্টা করল নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপে আছে নাকি দেখতে।

কিছুই দেখতে পেল না। নাম্বারটায় আরও দু-তিনবার ফোন করল। সুইচড অফ বলছে।

এক সিনিয়র সমীর রায় সেমিনার হল থেকে বেরোচ্ছিলেন। তাকে দেখে বললেন, "আরে গাঙ্গুলি, বাইরে কী করছ?"

দীপ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "টয়লেটে গেছিলাম স্যার। বেরিয়ে এসে দেখলাম বাড়ি থেকে ইম্পর্ট্যান্ট একটা কল এসেছে।"

সমীর বললেন, "ওকে, ওকে। এখন চলে যাও।"

দীপ বলল, "শিওর স্যার।"

হলে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে দীপ বুঝল, সে এতটা সময় বাইরে ছিল, কিন্তু বক্তৃতা ওই একই জায়গায় ঘুরঘুর করছে। তার পাশে কলিগ রাম শুক্লা বসে ছিল। তার হাতে একটা চিমটি কাটল রাম। দীপ রামের দিকে তাকালে রাম ঘুম পাওয়ার ইঙ্গিত করল।

দীপ আড়চোখে দেখে নিল কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে নাকি। দেখল সমীর তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। সে তাড়াতাড়ি ভালো মানুষের মতো মুখ করে মিস্টার মেহতার দিকে তাকাল।

সেমিনার শেষ হল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। রাম অফিস থেকে বেরিয়ে তাকে বলল, "পুরা মাথা চেটে রেখে দিল ইয়ার। চ একটু ফুঁকে নি।"

দীপ বলল, "তুই ফোঁক। আমি বাড়ি যাই।"

রাম বলল, "আবে বাড়ি গিয়ে কী করিস তুই? বিয়ে-থাও তো করিসনি যে বউয়ের পিছন পিছন ছুটবি?"

দীপ বলল, "ল্যাদ খাব ভাই। ল্যাদ খাব। ল্যাদ বুঝিস ব্যাটা অবাঙালি?"

রাম বলল, "তোর থেকে আমি বেশি বাঙালি শালা। চ ভাই আজ ফ্রাইডে আছে, একটু ওপিয়াম ঘুরে যাই।"

দীপ বলল, "টাকা নেই। তুই একা একা খা গিয়ে।"

রাম বলল, "আবে তুই স্যালারির সব কি এসআইপি ফান্ডে ভরে দিস নাকি? মাল-টাল খাবার জন্য কিছু তো রাখতে পারিস?"

দীপ গম্ভীর গলায় বলল, "কাল চাকরি চলে গেলে কী করবি?"

রাম বলল, "তুই কী করবি? তুই তো এখনই কোটিপতি! কত টাকা সেভিংসে রেখেছিস কে জানে।"

দীপ রামের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞামিশ্রিত একটা হাসি হেসে বলল, "সেভিংসে রেখেছি বলেই তোদের মান্থ এন্ডগুলো আমি বাঁচাই। সেটা ভুলে গেলে হবে মামা?"

রাম দীপের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "চল না ভাই একটু ওপিয়ামে। বেশি না, দু পেগ করে বিপি মেরে বাড়ি যাব। মাইরি বলছি।"

দীপ ব্যাজার মুখে বলল, "চল। এগুলো কিন্তু খুব বাজে খরচ ভাই।"

রাম বলল, "তাহলে একটা নিব কিনে নি? তোর গাড়িতে বসে মেরে দেব?"

দীপ বলল, "না, আমার মা কাল সকালে আমার সঙ্গে মাসির বাড়ি যাবে। গাড়িতে গন্ধ পেলে আমার গুষ্টির মা মাটি মানুষ করে দেবে। চ। ওপিয়ামেই চ।"

দুজনে ওপিয়ামে গিয়ে বসল। উইকেন্ডের বার এক্কেবারে গিজগিজ করছে। অতি কষ্টে দুজনে বসার জায়গা পেল।

দীপের ফোনের কথা খেয়াল হল। ফোনটা পকেট থেকে বের করতেই দেখতে পেল ফোনটা বাজছে।

বারে মিউজিকের শব্দ খুব বেশি জোরে হচ্ছে না। দীপ ফোনটা ধরল। ও প্রান্ত থেকে সেই অজানা নারী স্বর, "এবার ফ্রি তো?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ। এবার কে বলছেন বলে আমায় কৃতার্থ করুন।"

"আপনার মেমোরি খুব খারাপ কিন্তু।"

দীপ অবাক হল, "কেন বলুন তো?"

"তিনদিন আগের বিয়েবাড়ির কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন?"

দীপ হাঁ করে কয়েক সেকেন্ড ভাবল। তারপর বলল, "ওহ... বুঝেছি বুঝেছি... দেবুদার জুতো আটকে রেখেছিলেন... কী যেন নামটা?"

"ভুলে মেরে দিলেন এর মধ্যে?"

ও প্রান্তে ছদ্ম হতাশা।

দীপ বলল, "খুব কেমন কেমন নাম যেন একটা... কী যেন?"

“এমন কিছুই আনকমন নাম না, মনে করে দেখুন।”

বারটেন্ডার এসে দাঁড়িয়েছে। রাম তার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, “কে বে?”

দীপ ফোনের স্পিকারটা চেপে বলল, “আর্জেন্ট ফোন, তুই বিপি বলে দে। এক প্লেট ফিশ ফিঙ্গার বলে দে।”

দীপ স্পিকারটা থেকে আঙুল সরিয়ে বলল, “আপনার নাম তো আমি দেবসেনা রেখেছিলাম। ওই নামটাই ভালো।”

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল, “হ্যাঁ, ওটাই ভালো। তবে আপনি কিন্তু একেবারেই বাহুবলী নন। ভল্লালদেবও নন। তবে টাকমাথা হলে কাটাপ্পার ধারে কাছে দেখতে হতে পারেন।”

দীপ বলল, “আপনি কি আমার ঠ্যাং টানাটানির জন্য ফোন করেছেন?”

ওপাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এল, “আমি তো ভাবলাম আপনি যেভাবে আয়োজন করে, ছলছল চোখ করে আমার নাম্বার নিলেন, তাতে বিয়েবাড়ি থেকে গিয়েই আমাকে ফোন করবেন। বাস্তবে দেখা গেল আপনি সব ভুলেই মেরে দিয়েছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে তাই আমিই ফোন করলাম। দুপুরেও আপনি আমাকে একটু ঝাঁঝি মেরে দিলেন, তারপরেও আমিই আপনাকে ফোন করলাম। এত কিছুর পরে অবশ্য আপনার আমাকে নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে মনেই হতে পারে, তাতে অবশ্য আমার কোনও যায় আসে না। আমি এরকমই।”

দীপ বলল, “আচ্ছা, নামটা বলুন না। কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।”

“চিত্রলেখা। নামটা কঠিনই বটে। প্রাচীনও।”

বিপি চলে এসেছিল। রাম সোডা মিশিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, “ফোনটা রাখো বাল।”

দীপ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রামকে ইশারা করে ফোনে বলল, “ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের যুগের নাম। ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে। তবে আপনি দেবসেনা হলেও মন্দ হত না। যেভাবে জুতো নিয়ে ফাইট দিলেন।”

“আপনি কি বাড়ি গেছেন?”

“না। জাস্ট অফিস থেকে বেরোলাম। বাড়ি যেতে যেতে আটটা-নটা হবে। কেন বলুন তো?”

“কাল কী করছেন?”

দীপ একটু সময় নিয়ে ভেবে বলল, “কাল অনেক কাজ। মাকে নিয়ে মাসির বাড়ি যাব, তারপর অফিসের কিছু কাজ আছে, সেগুলো নিয়ে বসব।”

“আপনি উইকেন্ডেও অফিসের কাজ করেন?”

“সব সময় করি না, কাজ থাকলে করতে হয়।”

“ওহ। তাহলে ঠিক আছে।”

“কেন, আপনি দেখা করতেন?”

“নাহ। আমি এমনি জিজ্ঞেস করলাম।”

“ও। দেখা করলে বলতে পারেন। লজ্জা পাবেন না।”

“লজ্জা পেলে তো ফোনই করতাম না। তা ছাড়া আমি শনিবার কারও সঙ্গে দেখা করি না।”

“ওরে বাবা, আপনি এসব বার-টার মেনে চলেন?” গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল দীপ।

চিত্রলেখা বলল, “আমি না মানলেও মানতে হয় মার জ্বালাতনে। নিরামিষ খাইয়ে রেখে দেবে গোটা দিনটায়।”

“মার জ্বালায়? নিজের ইচ্ছাতে না বলছেন?”

“একেবারেই না।”

“তাহলে তো কালই মিট করতে হচ্ছে আপনার সঙ্গে। এবং অবশ্যই ননভেজ রেস্তোরাঁয়। করবেন?”

“ও বাবা। আপনি বিদ্রোহী প্রকৃতির পাবলিক দেখে তো মনে হয় না।”

"কী মনে হয় তবে? পেটরোগা বাঙালি?"

"হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই।"

রাম রাগ রাগ চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। দীপ বুঝল এবার ফোনটা না রাখলে খিস্তি খাবার সমূহ চান্স আছে। সে বলল, "তাহলে কী করবেন? কাল দেখা করবেন এবং আমিষ খাবেন? প্রথম দেখাটাই কমফোর্ট জোনের বাইরে করে দেখুন না।"

চিত্রলেখা একটু ভেবে বলল, "তাই হোক। কোথায় কখন মিট করবেন এসএমএস করে জানান। আমি হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক কোনোটাই ইউজ করি না।"

দীপ চোখ কপালে তুলে বলল, "ওরে বাবা, আপনিই তো সেই আদর্শ নারী যাকে কট্টরবাদী মেল শভিনিস্টরা পুজো করে।"

চিত্রলেখা বলল, "সেসব না, অ্যাকচুয়ালি আমার লাস্ট ব্রেকআপের পরে আমি এসব থেকে বিদায় নিয়েছি।"

দীপ একটু নিভে গিয়ে বলল, "ও। আপনার প্রেমও ছিল?"

চিত্রলেখা বলল, "ছিল। কেন আপনার ছিল না?"

দীপ বলল, "সব কথা আজকেই বলবেন?"

চিত্রলেখা বলল, "ভ্যালিড পয়েন্ট। ওকে, আপনি আমাকে এসএমএস করুন। গুড নাইট।"

দীপ গুড নাইট বলে ফোন রাখল।

রাম বলল, "কার শ্রাদ্ধ করছিলি ভাই?"

দীপ বলল, "তোর গুষ্টির। শোন, আমি আজ মানিব্যাগ আনিনি। বিল তুই দিচ্ছিস।"

রাম কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "জীবনে প্রথম একটা পাবলিক দেখলাম যে মানিব্যাগ ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোয়। তোরই হবে ভাই।"

দীপ রামের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

২

সন্ধে ছটার সময় ডেস্ক থেকে যখন ব্যাগ নিয়ে বেরোনোর জন্য মানালি উঠল, ঠিক তখনই ইন্টারকমের ফোনটা বেজে উঠল। মানালি বিড়বিড় করে বলল, "আই নিউ ইট।"

ফোনটা ধরতে এডিটর বিশ্বরূপদার গলা ভেসে এল "আর্জেন্ট, শিগগিরি আয়।"

মানালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যাগটা ডেস্কে রেখে বিশ্বরূপদার চেম্বারে ঢুকল। বিশ্বরূপদা বসে বসে সামনে রাখা ডায়েরিতে কিছু একটা লিখছিল। তাকে দেখে বলল, "একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিক এত তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলে হবে?"

মানালি বুঝল তার বেরোনোটা বিশ্বরূপদা দেখে নিয়েছে। বলল, "আজ কাজ ছিল। যাক গে, বলো তোমার কী দাবি।"

বিশ্বরূপদা পেনটা ডায়েরির ওপর রেখে ডায়েরিটা বন্ধ করে বলল, "তোর তো সামনে প্রচুর কাজ।"

মানালি চোখ ছোটো ছোটো করে বলল, "সে তো বুঝতেই পারছি, ভালো সাইজের একটা বাঁশ তৈরি করেছ আমার জন্য। বলে ফ্যালো।"

বিশ্বরূপদা বলল, "ছজন বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়া নিতে হবে।"

মানালি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "ওকে। কী বিষয়ে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু।"

মানালি বলল, "কবের মধ্যে লাগবে?"

বিশ্বরূপদা তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, “ক্যালেন্ডার নয়, ঘড়ি ব্যবহার করতে হবে। সাড়ে সাতটার মধ্যে আই নিড অল রিঅ্যাকশানস।”

মানালি হাঁ করে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমার কি দয়া মায়া নাই গো?”

বিশ্বরূপদা বলল, “আর্জেন্ট মা। দেরি করিস না। যত তাড়াতাড়ি দিবি, তত তাড়াতাড়ি ছুটি।”

মানালি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল, “ঠিক আছে। তারপরে যেন আবার কোনও কাজ গছিয়ে দিয়ো না।”

বিশ্বরূপদা হেসে বলল, “একদম না, ডিল ইজ ডিল।”

মানালি বলল, “কোনও প্রেফারেন্স আছে বুদ্ধিজীবীদের?”

বিশ্বরূপদা বলল, “না। তবে অন্তত দুজন গ্রেড এ ক্যাটাগরির লাগবে।”

মানালি বলল, “ওকে, ট্রায়িং।”

বিশ্বরূপদার ঘর থেকে বেরিয়ে ডেস্কে এসে বসল মানালি। পাশের ডেস্কে ঋভু আর বিতস্তা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে কপি লিখে যাচ্ছে। ওদের দিকে কিছুক্ষণ দেখে মানালি ডায়েরি খুলল।

বিশ্বরূপদা বুদ্ধিজীবীদের একটা গ্রেড বানিয়ে দিয়েছে। টিভি চ্যানেলে অ্যাপিয়ারেন্স ফি এবং তাদের প্রতিবাদের রেটের ওপর নির্ভর করে তিনটে গ্রেড বানানো।

চার্টটা দেখে প্রথমে কবি অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করল মানালি। অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেড এ বুদ্ধিজীবী কবি। ফেসবুক করেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে অরুণাচল সমস্ত ব্যাপারেই কবিতা লিখে থাকেন।

অনুপবাবু সাধারণ মানুষের ফোন ধরেন না। আননোন নাম্বার থেকে ফোনও ধরেন না। তবে তাদের অফিসের ফোন নাম্বার অনুপবাবুর ফোনে সেভ করা আছে। তিনটে রিং হতেই পরিশীলিত কণ্ঠে ফোন ধরে বললেন, “বলুন।”

মানালি বলল, “হ্যাঁ দাদা, আমি মানালি বলছি সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে।”

“হ্যাঁ বলো।”

“বলছি দাদা, একটা ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানার ছিল।”

অনুপ একটু কেশে বললেন, “কী বিষয়ে?”

মানালি বলল, “নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু দাদা।”

অনুপ খুব জোরে কাশতে লাগলেন। বেশ কয়েক মিনিট পরে বললেন, “আমার একটু কাশি হয়েছে বুঝলে, তা ছাড়া নিশ্চিন্তিপুরে আমি কোনও দিন যাইনি...”

মানালি হতাশ স্বরে বলল, “কিছু একটা বলুন দাদা।”

অনুপ সতর্ক গলায় বললেন, “না গো, যেখানে যাইনি, তা নিয়ে কিছু বলাটা ঠিক হবে না।”

মানালি একটু রেগে বলল, “আপনি তো দণ্ডকারণ্যেও কোনও দিন যাননি দাদা। ওটা নিয়ে একটা গোটা কবিতার বই আছে আপনার।”

অনুপ ফোনটা কেটে দিলেন।

মানালি ফোনটা রেখে একটা গালাগাল দিল।

সে লিস্টটায় চোখ রাখল আবার। বিদ্রোহী গায়ক টিংকু বড়াল আছেন লিস্টে।

মানালি ফোন করল, ফোনটা ধরলেন টিংকুবাবুর সেক্রেটারি। মানালি বলল, “টিংকুবাবুকে ফোনটা দেওয়া যাবে?”

সেক্রেটারি জানালেন টিংকুবাবু বলেছেন অ্যাপিয়ারেন্স ফি না দিলে ইদানীং উনি সব ব্যাপারে বিদ্রোহ জানানো বন্ধ রেখেছেন।

মানালি শ্বাস ছেড়ে নিজের হাতের তাস খেলল। দুজন প্রবীণ অভিনেত্রী। ইদানীং তাঁরা বসে আছেন। ফোন করলে ফোন ছাড়তে চান না। দুজনেই গ্রেড বি লিস্টে আছেন। কুড়ি মিনিট নিজেরা যখন মা ছিলেন তখন

কীভাবে অভিনয় সামলে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন ইত্যাদি বকলেন।

একটু ভেবে মানালি একজন চিত্রকর এবং একজন ভাস্করকে ফোন করল। দুজন ভদ্রলোক ভালোভাবেই প্রতিক্রিয়া দিলেন।

মানালি দেখল ঘড়ির কাঁটা আটটা ছুঁই ছুঁই। ফোন ধরে সে বিড়বিড় করে বলল, "স্টিল টু রিমেইনিং। মিস মানালি রয়, আজ তো তু গয়া।"

বিশ্বরূপদা চেম্বার থেকে বেরিয়ে তার ডেস্কে এসে বলল, "কি রে, আর কটা?"

মানালি হতাশ গলায় বলল, "গ্রেড এ দুটোই বাকি এখনও।"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "গ্রেড এ-দের পাবি কী করে? সবাই এখন কমিটি হেড।"

মানালি বলল, "তাহলে কী করব?"

বিশ্বরূপদা একটু ভেবে বলল, "কল ধ্রুব বাগচী।"

মানালি চোখ মুখ শক্ত করে বলল, "না। আটটা বাজে। লোকটা শিওর মাল খাওয়া শুরু করে দিয়েছে।"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "ওইজন্যই তো তোকে ফোন করতে বলছি। সুস্থ অবস্থায় থাকলে প্রতিক্রিয়া দিত নাকি?"

মানালি বলল, "উনি খুব উলটোপালটা কথা বলেন।"

বিশ্বরূপদা বলল, "তাতে কী? তোর গায়ে ফোসকা পড়বে?"

মানালি বলল, "হ্যাঁ পড়ে। তুমি করো।"

বিশ্বরূপদা বলল, "সব সময় আমি থাকব না মা। আজ থেকে একমাস পরেই হয়তো পারব না। তখন কী করবি?"

মানালি অবাক গলায় বলল, "এক মাস পরে কোথায় থাকবে তুমি?"

পাশের ডেস্ক থেকে বিতস্তা বলল, "শুনিসনি? রিউমার তো হাওয়ায় ঘুরছে।"

মানালি হাঁ হয়ে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী রিউমার?"

বিশ্বরূপদা বলল, "দ্যাটস নট ইম্পর্ট্যান্ট মা। কল ধ্রুব। তারপর কাকে করবি বলে দিচ্ছি।"

বিতস্তা ফুট কাটল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্বরূপদা তো কাটাতেই চাইবে।"

বিশ্বরূপদা বিতস্তার দিকে কড়া চোখে তাকাল। বিতস্তা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল।

অগত্যা মানালি ধ্রুব বাগচীর নাম্বার ডায়াল করল, দুটো রিং হতেই ধরলেন ধ্রুব, "কে?"

"স্যার, আমি সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে বলছি।"

"ওহ, দ্যাট শিট পেপার? ওটা তো আমি টয়লেট পেপার হিসেবে ইউজ করি। সুন্দর পেছন মোছা যায়।" জড়ানো গলায় কাটা কাটা কথাগুলো তিরের মতো ভেসে এল।

মানালির মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে বিশ্বরূপদার দিকে তাকাল। বিশ্বরূপদা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে।

মানালি অনেক কষ্টে মাথা ঠান্ডা করে বলল, "স্যার, আমি নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া পাবার জন্য ফোন করেছি।"

"আমি কটা কমিটির মাথায় এই মুহূর্তে আছি জানো মামণি?"

"না স্যার।"

"তবে? তুমি কি চাও আমার আমার মাসোহারাগুলো বন্ধ হয়ে যাক? হলে খুশি হবে?"

"না স্যার। জাস্ট কিছু একটা প্রতিক্রিয়া দিলেই হবে স্যার।"

"কিছু একটা?" ধ্রুব বাগচী চেঁচিয়ে উঠলেন ওদিক থেকে, "শিশুমৃত্যু তোমাদের কাছে ইয়ার্কির জিনিস বলে মনে হয়? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া ওইটুকু বাচ্চাগুলো যারা জন্মানোর পর কেন মারা যাচ্ছে? তোমাদের লজ্জা লাগে না? একটা ফিল্মস্টারের বাচ্চা হবে বলে তোমরা ধেই ধেই করে চিয়ারলিডারদের

মতো নাঙ্গা নাচ নেচে বেড়াচ্ছ, আর গরিব মানুষগুলোর সন্তান মারা যায়, তোমাদের একটা বালও ছেঁড়া যায় না? তোমরা সকালে উঠে আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে চমকে ওঠো না?"

এতগুলো কথা হঠাৎ করে শুনে মানালি কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "স্যার আপনি এই নিয়ে গভর্নমেন্টকে কিছু বলেছেন?"

"আমি?" ধ্রুব বাগচী হো হো করে হাসতে শুরু করলেন, "আমি কেন বলতে যাব? আমার বুদ্ধি আছে বলেই তো আমি বুদ্ধিজীবী। ইউ নো হোয়াট, সব বুদ্ধিজীবীদেরই বুদ্ধি আছে। তারা সিলেক্টিভ বিষয় ছাড়া, নিজেদের সব দিক থেকে নিরাপদ না দেখে মুখ খুলবে না। আমিও খুলব না।"

"স্যার আপনি তো অনেকটাই বললেন।"

"আমি কিছু বলিনি। একটা মাতাল যেরকম বলে আমি সেরকম বলেছি। রাখো এবার। এরপরে আবার কবে কোন শিল্পপতি বা চিটফান্ডপতি যখন ঠিক করে দেবেন কোন প্রতিবাদ তাঁরা ফান্ডিং করবেন, তখন আমি পথে নামব। মনে রাখবে আমি চাকরি করি না, আমার ফিক্সড ইনকাম নেই। নাও গো টু হেল।"

ফোনটা কেটে গেল।

মানালি বড়ো করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "বাবা! পুরো আগুন।"

বিশ্বরূপদা বলল, "যাহ্, তোর ছুটি। আর-একজন আমি করে নেব।"

মানালি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "হঠাৎ এত উদারতা?"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "আমি তো ধ্রুব বাগচীর রিঅ্যাকশানটাই চাইছিলাম। আমি ফোন করলে আরও খিস্তি খেতাম। আগের উইকেই ওঁর একটা সিনেমাকে আমরা ওয়ান স্টার দিয়েছিলাম, ভুলে গেলি?"

মানালি বিশ্বরূপদার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "খুন করে ফেলব তোমায় বিশ্বাস করো।"

বিতস্তা পাশ থেকে বলল, "আমিও।"

৩

দীপের ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে সাতটায়।

উঠেই শুনতে পেল বাইরের ঘরে বাবা কাগজের লোকটাকে তুমুল ঝাড়ছে। ঘরে বসেই শোনা যাচ্ছে বাবা বলছে, "কাগজগুলো একটু সকালে দেওয়া যায় না? এতক্ষণ ধরে কী করা হয় শুনি? আমাদের আশেপাশে ডাইনে বাঁয়ে সব বাড়ি কাগজ পেয়ে যায় সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে, আর তুমি এতক্ষণ ধরে কোথায় গাব জাল দাও হে? আমি তো ওদের থেকেই কাগজ নিতে পারি, তোমার থেকে কেন নেব শুনি?"

লোকটা মিনমিন করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু বাবা শুনল না।

বেশ রাগি গলায় চ্যাঁচামেচি চলতে লাগল।

দীপ উঠে ড্রয়িং রুমে এল।

মা তৈরি হয়ে গেছিল। তাকে দেখে ব্যস্ত গলায় বলল, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে, আমরা এখনই বেরোব।"

দীপ হাই তুলতে তুলতে বলল, "আমাকে ডাকোনি কেন?"

মা বলল, "তোর আর কতক্ষণ লাগে? যা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। ভালো পাঞ্জাবিটা পরবি।"

দীপ অবাক গলায় বলল, "ভালো পাঞ্জাবি পরার কী আছে? একটা পরলেই হল।"

মা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না, না, ওখানে তোর মেসোর গুরুভাইরা অনেকে আসবে। ছেঁড়া জামা-টামা পরবি না একদম। আগে থেকে বলে রাখলাম।"

দীপ বিরক্ত মুখে কমোডে গিয়ে বসল। বাইরে বাবার চ্যাঁচ্যামেচি এবার কমেছে। মা বাবাকে ঝাড়তে শুরু করেছে জায়গার জিনিস কেন জায়গায় নেই তা নিয়ে।

মিনিট পনেরো পর সে মাকে নিয়ে বেরোল। মা গাড়িতে উঠে বলল, "মিনুর ওখানে একটু থাকবি। আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে আসবি না।"

দীপ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, "কেন, কী ব্যাপার আবার?"

মা বলল, "আমার একটা মান সম্মান নেই নাকি? নামিয়ে দিয়ে চলে আসবি, সবাই কী ভাববে?"

শনিবার হলেও সকালে কলকাতার রাস্তায় যথেষ্ট জ্যাম আছে। দীপ সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, "কী আর ভাববে, সবাই কি আর পর নাকি? নিজের মাসি নিজের মেসো, চিন্তার কী আছে?"

মা বলল, "সেসব বুঝতে গেলে তোকে বড়ো হতে হবে। এখনও তো ছোটোই থেকে গেলি।"

দীপ কিছু না বলে এফএমটা চালিয়ে দিল। কথায় কথা বাড়বে। ঠিক করল খানিকক্ষণ বসে কেটে পড়বে। মেসো এখন এক নতুন গুরুর দীক্ষা নিয়েছে। মেসোর কাছে বসলেই বিভিন্ন নীতিকথা শুনতে হয়। সেসময় দীপের কান মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করে। ওখান থেকে পালানোও যায় না, আবার বকবকগুলো শুনেও যেতে হয়।

নটা পনেরো নাগাদ মাসির বাড়ি পৌঁছোল তারা।

মা বলল, "আমি কিন্তু আবার বলছি, আগে আগে কোথাও যাবি না।"

দীপ বলল, "ঠিক আছে।"

মেসো দরজা খুলল। তাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, "আরে, দীপ যে, আয় আয়, ভালো সময়েই এসেছিস। মানালিও এখনই এল জাস্ট।"

দীপ অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল। মা বলল, "ভিতরে চ।"

দীপ বলল, "এই সকালে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এলে নাকি?"

মা বলল, "বললাম তো ভিতরে চ, বলছি।"

দীপের রাগ হচ্ছিল। এরকম জানলে সে কিছুতেই আসত না। ইদানীং তাদের বাড়ি থেকে তার বিয়ে নিয়ে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই প্ল্যানে যে মাসিকেও মা ইনক্লুড করে নিয়েছে সেটা খেয়াল ছিল না।

মাসিদের ড্রয়িংরুমে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। দীপ চিনল না।

মেসো পরিচয় করিয়ে দিল, "মিসেস রায়।"

মিসেস রায় উঠে হাত জোড় করলেন। মা বসতে বসতে বলল, "আমাদের ফোনে কথা হয়েছে।" মিসেস রায় হেসে বললেন, "হ্যাঁ।" মা তার সঙ্গে মিসেস রায়ের পরিচয় করিয়ে দিল। দীপ দাঁত বের করে বন্ধ করল।

মা মেসোর দিকে তাকাল, "মিনু কোথায়?"

মেসো বলল, "মানালিকে নিয়ে ছাদে বাগান দেখাতে গেছে। দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।"

মেসো বেরিয়ে যেতে মিসেস রায় বললেন, "মানালি জানতে পারলে একটু রাগারাগি করতে পারে।"

মা বলল, "করলে করুক। সব বাড়িতে বাড়িতে এখন এই সমস্যা বুঝলেন? বিয়ের কথা বললেই ঠিক কিছু না কিছু ছুতো করে ঠিক পালিয়ে যাবে।"

মিসেস রায় অবাক হয়ে দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও জানে তো?"

মা হাসতে হাসতে বলল, "না।"

দীপের রাগ হচ্ছিল। সে কিছু বলল না।

মিসেস রায় বললেন, "ওর বাবা নাগপুরে গেছে অফিসের কাজে। আপনাদের প্ল্যানটা শুনে বেশ এক্সাইটেড। এমনিতে তো মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তা করতে হয় আজকাল। খবরের কাগজের কাজ, বুঝতেই পারেন।"

মা বলল, "আমার ছেলের কি কম? সেই যে সকালে বেরোয়, অফিস থেকে কখন ফিরবে তার কোনও ঠিক নেই।"

মিসেস রায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মাসি মানালিকে নিয়ে ঢুকল। তাকে দেখে বলল, "এই তো, দীপু এসে গেছে। মানালি, এই দেখ দীপু।"

মানালি কিছু না বুঝে তার দিকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল।

দীপ কী বলবে বুঝতে না পেরে ক্যাবলার মতো হাসল।

মানালি তার মার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি এখানে আমাকে সম্বন্ধ দেখাতে নিয়ে এসেছ?"

মিসেস রায় হেসে বললেন, "না, না, ওসব কিছু না। বস না।"

মানালি গম্ভীর হয়ে বসে বলল, "দেখুন, প্রথমেই বলে দি আমার কিন্তু বয়ফ্রেন্ড আছে।"

দীপের হাসি পেল। সে বলল, "হ্যাঁ, আমারও গার্লফ্রেন্ড আছে।"

মা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, "তোর গার্লফ্রেন্ড আছে? এই যে তোকে রোজ রোজ এত করে জিজ্ঞেস করি, কোনও দিনও তো বললি না?"

দীপ বলল, "এতদিন ছিল না। এখন আছে।"

মা মুখ কালো করে বসে থাকল। মিসেস রায় রেগেমেগে বললেন, "মানালির বয়ফ্রেন্ড নেই। থাকতেই পারে না। বয়ফ্রেন্ড থাকলে আমি ঠিক জানতে পারতাম।"

মানালি বলল, "কী আশ্চর্য, বাড়িতে জানিয়ে কেউ প্রেম করে নাকি?"

মেসো এসে গেছিল। একটা বই নিয়ে এসে গম্ভীর মুখে পড়তে লাগল, "শোনো তোমরা, আমার গুরুদেব শ্রী শ্রী একশো আট চাঁদবদন মহারাজ বলেছেন, এখন ঘোর কলি উপস্থিত। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এখন বাবা-মাকে লুকিয়ে প্রেম করা শিখেছে। ইহা পাপের পথ। পুণ্যের পথ হল প্রেম না করা। বাবা-মার দেখানো পথে বিবাহ করা।"

এতটা পড়ে মেসো গোঁফে তা দিয়ে বলল, "কী বুঝলে?"

মানালি হেসে ফেলল। দীপও।

মা রাগি গলায় বলল, "গোটা প্ল্যানটাই মাঠে মারা গেল।"

মিসেস রায় হতাশ গলায় বললেন, "সত্যিই ঘোর কলি।"

মাসি ব্যাজার গলায় বলল, "আমি কড়াইশুঁটির কচুরি বানিয়েছিলাম। দীপুর মতো ক্যাবলারও যে গার্লফ্রেন্ড থাকবে তা কী করে জানব?"

মা বলল, "আমি আর এসবে নেই। যা করবে নিজে নিজে করুক।"

দীপ বলল, "মাসি, কচুরিটা দাও। খেয়ে আমি যাই। মা থাকুক।"

মা গম্ভীর হয়ে বসে রইল। মেসো ধর্মের বাণী পড়ে যেতে লাগল। দীপ মোবাইল ঘাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে দীপ বলল, "আমি যাই।"

মানালি সবাইকে চমকে দিয়ে তাকে বলল, "আপনি কি রুবি হয়ে যাবেন?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ।"

মানালি বলল, "আমাকে একটু ড্রপ করে দেবেন?"

দীপ বলল, "শিওর। চলুন।"

সবার হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে গেল।

গাড়ি স্টার্ট হলে মানালি বলল, "আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল আজ কিছু একটা এরকম ঝামেলা হবে। নইলে মিনু আন্টি এরকম সকাল সকাল ডাকে না কোনও দিন।"

দীপ বলল, "আমি বুঝিনি। ভেবেছিলাম মা দীক্ষা-টিক্ষা নেবে। ইদানীং ধর্মে মতি হয়েছে।"

মানালি বলল, "উফ। আমার মাও। এইসব জায়গা থেকেই এঁদের মাথায় এসব বুদ্ধি আসে বোঝা যায়।"

বাইপাসে হালকা জ্যাম আছে। দীপ বলল, "আপনি রিপোর্টার?"

মানালি হাসল, "হ্যাঁ, এই তো সবে ছ-মাস হল জয়েন করেছি।"

দীপ বলল, “কোন মিডিয়া?”
মানালি বলল, “সময়ের কণ্ঠস্বর।”
দীপ বলল, “আপনার বয়ফ্রেন্ডও সাংবাদিক?”
মানালি হাসতে হাসতে বলল, “আমার বয়ফ্রেন্ড নেই।”
দীপও হেসে ফেলল, “আপনার মা তাহলে ঠিকই ধরেছিলেন। উনি যদি প্রমাণ চান তাহলে কী করবেন?”
মানালি বলল, “চাইবে না। চাইলে দেখা যাবে।”
দীপ বলল, “সকাল থেকে এত ভয়ংকরভাবে দিনটা শুরু হল। বাকি দিনটা কেমন যাবে কে জানে।”
মানালি বলল, “সিরিয়াসলি। এমনিতেই অফিস যাওয়া আর ল্যান্ডমাইনের ওপর হাঁটা এখন এক হয়ে গেছে। তার ওপর এসব। কোন শ্বশুরবাড়ি মানবে বলুন তো বউমা রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরবে? সবাই বলবে চাকরি ছাড়তে। আর আমি একেবারেই তার জন্য প্রস্তুত নই।”
দীপ বলল, “চাকরি ছাড়তে যাবেন কেন? যারা ছাড়তে বলবেন, তাদের ছেড়ে দেবেন বরং।”
মানালি বলল, “একজ্যাক্টলি। আমারও তাই মত। বাই দ্য ওয়ে, আপনার গার্লফ্রেন্ড কী করেন সেটা জানা হল না। নাকি তিনিও আমার জনের মতোই অস্তিত্বহীন?”
দীপ বলল, “না না, অস্তিত্ব আছে। ইনফ্যাক্ট আজকে আমরা প্রথম মিট করব। তবে কী করে-টরে অত কিছুই জানি না। সেসব জানতেই মিট করব আজকে।”
মানালি বলল, “বাহ। অভিনব ব্যাপার তো! তার মানে আপনি এখন ভিত গড়ছেন।”
দীপ হেসে বলল, “একেবারেই।”
মানালি বলল, “বেস্ট অফ লাক।”
দীপ বলল, “থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।”
রুবি এসে গেছিল। দীপ বলল, “এখানে নামাব?”
মানালি বলল, “হ্যাঁ। বাঁদিকের বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিন। আপনাকে অনেকগুলো থ্যাংকস।”
দীপ হাসল। মানালিকে নামিয়ে খানিকটা এগিয়ে গাড়িটা রাস্তার বাঁদিকে দাঁড় করাল।
চিত্রলেখাকে ফোন করতে হবে।

৪

ধ্রুব বাগচী বিরক্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। মানালির অস্বস্তি হচ্ছিল। দুপুর আড়াইটে বাজে। লোকটা কি এখনও ঘুমাচ্ছিল? চোখ মুখ দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে অনেকটা। একটা মাঝারি মাপের টু বিএইচকে ফ্ল্যাট। চারদিকে অগোছালো। দেওয়ালে বড়ো বড়ো কয়েকটা সিনেমার পোস্টার। জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের একটা বড়ো পোর্ট্রেট। অভিমানের অমিতাভ-জয়ার পোস্টার। ধ্রুব বাগচীর সিনেমার কয়েকটা পোস্টার।
মানালি অফিস থেকে ফোন করেই এসেছিল। তবু কলিং বেল বাজানোর পরে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হল। ধ্রুব দরজা খুলে ঘুম জড়ানো চোখে প্রথমেই বলেছেন, “কাজ-টাজ নেই এখন মা, পরে এসো।” মানালি পরিচয় দিতে দরজা খুলেছেন। ফটোগ্রাফার ঋপণ এসেছে তার সঙ্গে।
বসার ঘরে বসিয়ে দশ মিনিট পরে একটা পাঞ্জাবি পরে সোফায় ঘুম ঘুম চোখে বসেছেন। মনে হচ্ছে যে-কোনো সময় ঘুমিয়ে পড়বেন। মধ্য চল্লিশ বয়স ভদ্রলোকের। শ্যামবর্ণ। ক্লিনশেভড। মাথায় কাঁচাপাকা চুল।
মানালি একটু গলা খাঁকরিয়ে বলল, “স্যার, আধঘণ্টায় হয়ে যাবে।”
ধ্রুব বললেন, “কী হবে আধঘণ্টায়? এ কি ইন্টারকোর্স পেয়েছেন নাকি? সেটার জন্য অবশ্য আধঘণ্টা আবার বেশি টাইম।”
মানালির কান মাথা লাল হয়ে গেল। ঋপণের দিকে তাকাল সে। ঋপণ অনেক কষ্টে হাসি চাপছে।

সে বলল, “শুরু করি স্যার?”

ধ্রুব অন্যমনস্কভাবে বললেন, “করুন।”

মানালি মোবাইল রেকর্ডার অন করল, “স্যার, ‘ডার্ক লাভ’ সিনেমাটা তো একেবারেই ফ্লপ করে গেল। এখন কি নতুন কোনও প্রোজেক্টে কাজ করছেন?”

ধ্রুব বললেন, “ফ্লপ করল? কে বলেছে আপনাকে?”

মানালি আমতা আমতা করে বলল, “মানে স্যার বক্স অফিস তো তাই বলছে। ইনফ্যাক্ট আমিও নন্দনে একদিন দেখতে গেছিলাম। সেরকম লোক ছিল না।”

ধ্রুব জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “আমার কাছে ফ্লপ না। আমার কাছে ডার্ক লাভ ইজ আ বিগ হিট।”

ধ্রুব একটা সিগারেট ধরালেন।

মানালি বলল, “বক্স অফিসকে আপনি অস্বীকার করছেন তার মানে? কিংবা প্রোডিউসার যে আপনার প্রোজেক্টে ইনভেস্ট করছেন, তিনি রিটার্ন পাবেন না, এইসব ব্যাপার আপনাকে বদার করে না বলতে চাইছেন?”

ধ্রুব জোরে জোরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, “কতগুলো পাবলিক সিনেমা বুঝবে না, তার দায় আমি নিই না।”

মানালি বলল, “কিন্তু স্যার, আপনার ফার্স্ট মুভি রেনেসাঁ তো দারুণ হিট ছিল। সেকেন্ডটাও...”

ধ্রুব হাত নাড়তে নাড়তে বললেন, “ওসব ফ্লুক। ফ্লুক এক্কেবারে। তখন তো সবে সিনেমা বানানো শিখছিলাম। এখন যতবার দেখতে বসি রোজ নতুন নতুন ভুল পাই। তার তুলনায় ডার্ক লাভ অনেক পরিণত। আপনি তো দেখেছেন, আপনিই বলুন কেমন হয়েছে?”

মানালি ইতস্তত করে বলল, “ভালোই লেগেছে স্যার।”

ধ্রুব অবাক গলায় বললেন, “ভালোই লেগেছে? মানে নিতান্ত অনিচ্ছায় বলছেন আর কি! তা বলুন শুনি কোন জায়গাটা ভালোই লেগেছে।”

মানালি প্রমাদ গুনল, সিনেমাটা এত বোরিং ছিল যে সে ইন্টারভ্যালের আগেই বেরিয়ে গেছিল। সে ঠিক করল সত্যিটাই বলবে। মরিয়া হয়ে বলল, “স্যার, সত্যি কথা বলতে কী আমি কিছু বুঝিইনি সিনেমাটা।”

ধ্রুব খুশি হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, “গুড। আপনার ভালো লাগলে নিজের সিনেমা বানানোর প্রতিভাটাকেই সন্দেহ করতে শুরু করতাম আমি।”

মানালি বলল, “মানে?”

ধ্রুব বললেন, “মানে বুঝে কাজ নেই। নেক্সট কোয়েশ্চেন।”

মানালির অপমানিত লাগছিল। সে নোটপ্যাড দেখে পরের প্রশ্নটা করল, “অ্যাকট্রেসরা বলেন আপনি দুর্মুখ।”

ধ্রুব বললেন, “শুই না বলে। দামি দামি নেকলেস কিনে দিই না বলে।”

মানালি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “এটা অন রেকর্ড বললেন?”

ধ্রুব বললেন, “অফকোর্স, নেক্সট।” ধ্রুব ধোঁয়ার রিং করতে শুরু করলেন।

ঋপণ বলল, “স্যার, কয়েকটা ফটো তুলব আপনার?”

ধ্রুব বললেন, “তোলো। তোমাদেরও তো চাকরি করতে হবে।”

মানালি বলল, “আপনি কাজ না পেলে যদি প্রোডিউসার বলেন রিমেক বানাতে, আপনি বানাবেন?”

ধ্রুব বললেন, “তার থেকে ব্যান্ডেল লোকালে কন্ডোম বেচব।”

ঋপণ ভয়ে ভয়ে বলল, “স্যার, লোকাল ট্রেনে কেউ কন্ডোম বেচে না।”

ধ্রুব বললেন, "সেইজন্যই তো দেশটায় এইচআইভি বেড়ে যাচ্ছে। বয়ঃসন্ধির সময় ছেলেকে সেক্স এডুকেশন দেবে না, ছেলে পর্ন দেখে মাস্টারবেট করবে, তারপরে খারাপ পাড়ায় গিয়ে জীবনটা বরবাদ করবে। এ দেশের ওপর আমি আর কোনও আশা করি না।"

মানালি বলল, "স্যার আপনার বয়ঃসন্ধি কীভাবে কেটেছে?"

ধ্রুব বললেন, "নর্থ বেঙ্গলে। বাবা মারা গেছিলেন ছোটোবেলাতেই। ওই সময়টা আর পাঁচটা বাঙালি ছেলেদের মতো কেটেছে। তবে কপাল ভালো সেই সময় মোবাইল ছিল না।"

মানালি বলল, "আপনি কি মোবাইলের বিরোধী?"

ধ্রুব বললেন, "মোবাইলের ওপর রাগার সংগত কারণ আছে। টরেন্টের ওপরেও। একটা ইউনিটের এত এত পরিশ্রম, এত ইনভেস্টমেন্ট একটা ইল্লিগাল টরেন্ট মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। পাঁচ ইঞ্চি স্ক্রিনে সিনেমা ঢুকে যাচ্ছে। সেই নাইন্টিজেও ক্যাসেটের রমরমা ছিল। তারপরে ঢুকে গেল এমপি থ্রি। লোকের অ্যালবাম বেরোচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে তা সিডিতে পাইরেসি হয়ে যাচ্ছে। আগে একটা লোকের দুটো গান থাকত একটা অ্যালবামে। তার পরিবর্তে একটা সিডিতে ছশোটা গান ধরে গেল। এবং সবটাই পাইরেটেড। বাজারটা, এত লোকের এত এফোর্ট, এত প্রতিভা চোখের সামনে ওই একটা চাকতি নষ্ট করে ফেলল। টেকনোলজি ইজ আ বিচ।"

মানালি বলল, "স্যার, টেকনোলজি ছিল বলেই তো আপনারা এত ভালো ভালো ক্যামেরা পাচ্ছেন।"

ধ্রুব বললেন, "তখন সিনেমা ভালো হত, না এখন? আপনার কী মনে হয়?"

মানালি উত্তর দিতে পারল না।

ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে মানালি বলল, "স্যার, আপনাকে কাল আমি ফোন করেছিলাম। নিশ্চিন্তিপুরের শিশুমৃত্যু..."

ধ্রুব বললেন, "পড়েছি রিপোর্টটা।"

মানালি বলল, "স্যার, আপনার ব্যাপারটা সেলফ কনফ্লিকটিং লাগে না? একদিকে আপনিই সরকারি কমিটিতে আছেন, অন্যদিকে আপনিই এত কিছু বলে দিচ্ছেন।"

ধ্রুবর সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। তিনি আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন, "নো কমেন্টস।"

মানালি হাসল, "রাত আটটার পরে ফোন করলে এই ব্যাপারে কমেন্ট পাওয়া যাবে?"

ধ্রুব কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন, "নো কমেন্টস।"

মানালি বলল, "আপনার হাতে এই মুহূর্তে কোনও কাজ নেই। একজন পরিচালক হিসেবে আপনার ব্যর্থতার দিন শুরু হয়েছে। মানুষ আপনার নামে ফেসবুকে ট্রল বানাচ্ছে, আপনাকে নিয়ে যা নয় তাই লিখছে, আপনাকে ট্যুইট করে এত কিছু বলছে, আপনার কি শেষের দিন এসে গেল মিস্টার বাগচী?"

ধ্রুব নতুন ধরানো সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। বললেন, "এই ফ্ল্যাটটা নিজের টাকায় কেনা। নিচে গ্যারেজে রাখা গাড়িটাও। কোনও বিখ্যাত বাপের ছেলে নই। বিখ্যাত বাপের রয়্যালটি পেয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হয় না..."

মানালি বাধা দিয়ে বলল, "সে তো স্যার ম্যাক্সিমাম পরিচালকই তাই, আপনি একজনকে উদ্দেশ্য করেই বলে যাচ্ছেন কেন?"

ধ্রুব বললেন, "বলছি কারণ আমার মা, বাবা, মাসি, পিসি, কোনও দিন কেউ ছিল না। নিজের জোরে আমি এই জায়গায় এসেছি। ভিটেমাটি ছেড়ে ও দেশ থেকে ঠাকুরদা এসেছিল। বাবা লড়েছে, আমিও লড়ব। আমাকে হারানো এত সহজ না।"

মানালি বলল, "এখন আপনি কী করছেন?"

ধ্রুব বললেন, "লিখছি। লিখছি, কাটছি, আবার লিখছি।"

মানালি বলল, “আপনার গল্প যদি প্রোডিউসার পছন্দ না করেন? যদি তাঁরা মনে করেন আপনাকে নিয়ে ভবিষ্যতে আর কিছু হবে না? সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন?”

ধ্রুব উত্তর দিলেন না। সামনে রাখা টেবিলে রিমোটটা নিয়ে টিভিটা চালিয়ে একটা সিরিয়ালের চ্যানেল চালিয়ে বললেন, “আপনি সিরিয়াল দেখেন?”

মানালি বলল, “না। আমার মা দ্যাখে।”

ধ্রুব ঋপণের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি দেখেন?”

ঋপণ মাথা নাড়ল, “না স্যার, বাড়িতে বাবা মা দুজনেই দ্যাখে।”

ধ্রুব হাসলেন, “প্রতি পরিবার পিছু কেউ না কেউ সিরিয়াল দ্যাখে। গড্ডল প্রবাহে গা ভাসাব!”

মানালি বলল, “সেটা সম্ভব হবে? বড়ো পর্দার সফল পরিচালক শেষমেশ সিরিয়াল বানাবেন?”

ধ্রুব বললেন, “সাবিত্রীদি, মাধবীদিরা অভিনয় করলে আপনারা সেটা নিয়ে নাক সিঁটকেছেন? আমার ঘরে হাঁড়ি না চড়লে আমি কী করব সেটা তো আমাকেই ঠিক করতে হবে, তাই না?”

মানালি বলল, “আপনার সিনেমা চলে না, আপনাকে সরকারি পদে রাখা হয়েছে বলে একটা গ্রেড এ ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে ট্রিটমেন্ট পান, আপনার নিজেকে ওভাররেটেড বলে মনে হয় না?”

ধ্রুব বললেন, “আপনার স্যালারি কত?”

মানালি বলল, “সেটা স্যার কী করে বলি?”

ধ্রুব ঋপণের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি ফ্রিল্যান্সার? না মাইনে করা?”

ঋপণ বলল, “স্যালারি পাই।”

ধ্রুব টেবিলে পা তুলে বললেন, “আপনারা মাইনে পান। আপনাদের কোম্পানি আপনাদের মাইনে দেয়। আপনাদের সময়ের দাম আছে। দুটোকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ইয়ার্কি মারতে পাঠানো হয়নি। তাহলে আমি ওভাররেটেড কী করে হই?”

মানালি মরিয়া হল, “সেটা তো আপনি গরম গরম স্কুপ দেন, সেগুলোর জন্য।”

ধ্রুব হাসতে হাসতে বললেন, “সেটাও তো কোয়ালিটি। সেটার ভ্যালু নিশ্চয়ই আছে বলেই আপনাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। রাস্তার নসু ঘোষ কী বলল, আর ধ্রুব বাগচী কী বলল, দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই ডিফারেন্স আছে।”

মানালি রেকর্ডার অফ করে বলল, “থ্যাংক ইউ স্যার।”

ধ্রুব বাগচী বললেন, “শিক্ষানবিশ। তবে লেগে থাকুন। আপনার উন্নতি ঠেকায় কে?”

মানালি বলল, “কেন? আমার মধ্যে কী এমন দেখলেন?”

ধ্রুব বাগচী টিভিতে সিরিয়াল দেখতে দেখতে বললেন, “আপনি মেয়ে। সুন্দরী। একটা কারণই উন্নতি ঘটানোর জন্য যথেষ্ট।”

মানালির রাগ হচ্ছিল। সে সোফা থেকে উঠে বলল, “বাই স্যার।”

ধ্রুব বাগচী বললেন, “অফিসে বলে দেবেন আমার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে। আমার সময়ের দাম আছে।”

মানালি বলল, “ওকে স্যার।” ঋপণকে বলল, “চল।”

ধ্রুব বাগচী সিগারেট ধরিয়ে রিমোটটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, “মধ্যমেধাই সর্বনাশ করল দেশটার।”

মানালি বলল, “আমায় কিছু বললেন, স্যার?”

ধ্রুব বাগচী বললেন, “না না। যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে যাবেন।”

***

ধ্রুব বাগচীর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে মানালি ঋপণকে বলল, "আমাকে যদি আবার এই জঘন্য লোকটার ইন্টারভিউ নিতে পাঠানো হয়, তবে আমি বিশ্বরূপদাকে জাস্ট খুন করে ফেলব।"

ঋপণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, "তুই এত রিঅ্যাক্ট করে ফেলিস কেন? লোকটাকে খেলিয়ে আরও অনেক কিছু বের করতে পারা যেত। বিশ্বরূপদা ইচ্ছা করেই তোকে পাঠিয়েছে। আমার মনে হয় তোর ধৈর্য টেস্ট করছে।"

মানালি গজগজ করতে করতে যাচ্ছিল। মোবাইলটা রিং হচ্ছিল তার। জিন্সের পকেট থেকে বের করে দেখল মা ফোন করছে। সে ফোনটা ঋপণকে দিয়ে বলল, "মাকে বলে দে তো আমি হারিয়ে গেছি। টিভিতে অ্যাড দিয়ে দিক! সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবে। যত্তসব!"

৫

দীপ পৌঁছে দেখল চিত্রলেখা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল, "এক্সট্রিমলি সরি। লেট করে ফেললাম।"

চিত্রলেখা বলল, "ঠিক আছে। আমিও মিনিট তিনেক আগেই এলাম।"

দীপ বলল, "চলুন।"

চিত্রলেখা বলল, "আপনি কি খুব ব্যস্ত ছিলেন আজকে? ঘেমে আছেন দেখছি।"

দীপ বলল, "জ্যাম ছিল খানিকটা চিংড়িহাটার দিকে। আপনার বাড়ি এখান থেকে কতদূর?"

চিত্রলেখা বলল, "দুটো স্টপেজ।"

দুপুর দেড়টা বাজে। ভিড় হতে শুরু করেছে। টেবিল খালি হতে একটু দাঁড়াতে হল দুজনকে। মিনিট পাঁচেক পরে বসল তারা।

দীপ বলল, "আপনার ননভেজ ভোজন বাড়িতে জানলে অশান্তি হবে না?"

চিত্রলেখা হেসে বলল, "বাড়িতে সব কথা বললে চলে মিস্টার গাঙ্গুলি? আপনি বলেন?"

দীপ বলল, "না। ভারতবর্ষ সেন্সর বোর্ডের দেশ। সিনেমা থেকে নিজের কথা, সবখানে সেন্সর না থাকলেই বরং সমস্যায় পড়তে হয়।"

চিত্রলেখা মাথা নেড়ে বলল, "এই তো। বুদ্ধিমান।"

দীপ বলল, "কী খাবেন?"

চিত্রলেখা বলল, "আপনি বলুন কী খাবেন। আপনাকে দেখে বেশ খানেওয়ালা বলেই মনে হয়। বিয়েবাড়িতেও তেরো পিস খাসির নিচে নামলেন না।"

দীপ অবাক হয়ে বলল, "আপনি পিস গুনেছেন?"

চিত্রলেখা বলল, "কথার কথা। গুনলে হয়তো আরও বেশিই হত। কী বলেন?"

দীপ বলল, "মাংস দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।"

চিত্রলেখা বলল, "রসগোল্লাও তো মন্দ টানলেন না।"

দীপ বলল, "সে তো চারটে খেয়েছি মাত্র। ওটা কোনও সংখ্যা হল? আপনাকে দেখে অবশ্য ডায়েট পার্টি বোঝা যায়। তবে প্লিজ ঘাস পাতা অর্ডার করবেন না।"

চিত্রলেখা আবার হেসে বলল, "ঘাস পাতা কেন অর্ডার করব! মিক্সড ফ্রায়েড রাইস আর প্রনের কোনও প্রিপারেশন খাওয়া যেতে পারে।"

ওয়েটার এসে গেছিল। দীপ অর্ডার দিয়ে দিল।

তারপর চিত্রলেখার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার হাসিটা ভারী সুন্দর। বিয়েবাড়িতে এটা দেখেই ক্লিন বোল্ড হয়ে গিয়েছিলাম বুঝতে পারলাম।"

চিত্রলেখা বলল, "থামুন। এমন বোল্ড হয়ে গেছিলেন, অফিস করতে গিয়ে আমাকে ভুলেই মেরে দিলেন।"

দীপ বলল, "সে তো সেনসেক্সটা হঠাৎ পাগলামি করতে শুরু করেছিল বলে। সেনসেক্স একটু এদিক ওদিক হলেই আমার মাথার প্রসেসর গুবলেট হয়ে যায়।"

চিত্রলেখা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "আপনি শেয়ার বাজার পাবলিক?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ, কেন?"

চিত্রলেখা মাথায় হাত দিয়ে বলল, "হয়ে গেল।"

দীপ অবাক হল, "কী হয়ে গেল?"

চিত্রলেখা হতাশ স্বরে বলল, "আমার ছোটো মামা। সারাক্ষণ এই করে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক বিয়েও করলেন না এই চক্করে। আপনারও সেরকম প্ল্যান আছে নাকি?"

দীপ বলল, "বিয়ে করাই যায়। অতটাও কিছু না। তবে শেয়ার বাজারকে অবজ্ঞা করবেন না। চমৎকার জিনিস। একটু বোঝাই?"

দীপ একটা ন্যাপকিন নিয়ে পকেট থেকে পেন বের করল।

চিত্রলেখা হাত জোড় করে বলল, "রক্ষে করো। আপনি কি চান আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে যাই?"

দীপ পেনটা দিয়ে ন্যাপকিনে বাড়ি ঘর আঁকতে আঁকতে বলল, "ওকে। তাহলে থাক। এই দেখুন আমি কী সুন্দর ছবি আঁকি।"

চিত্রলেখা বলল, "বাহ, আপনি এক্কেবারে শেয়ার থেকে ছবি আঁকায় চলে এলেন দেখছি।"

দীপ বলল, "আপনার ইন্টারেস্ট নেই দেখে শিফট করে গেলাম। ছবি আঁকায় আমি অসাধারণ ট্যালেন্ট বুঝলেন? এই বাড়ি, নারকেল গাছ আর পাহাড়ের আড়াল দিয়ে সূর্য ছাড়া কিছু আঁকতে পারি না।"

চিত্রলেখা বলল, "ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র আঁকতে পারেন তো?"

দীপ সভয়ে বলল, "ওরে বাবা, সে তো আমার কাছে ভয়ানক ব্যাপার। বায়োলজি শুনলেই আমি পালাতাম।"

চিত্রলেখা বলল, "তাহলে আপনার আর আমার কোনও মিল নেই। আমার বায়োলজিতেই অনার্স। আচ্ছা, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে সেসব আঁকা শিখিয়ে দেব।"

দীপ চিত্রলেখার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "যেখানে বাঘের ভয় ইত্যাদি ইত্যাদি।"

চিত্রলেখা বলল, "আপনার জীবনে প্রেম নেই বলছেন?"

দীপ বলল, "আছে তো। ইকোনমিক টাইমস, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, সিএনবিসি, আর সেনসেক্স। এইসব নিয়েই আছি।"

চিত্রলেখা বলল, "কী ভয়ানক! আমার এক্স-এর ব্যাপারে জানতে চান?"

দীপ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "সে জেনে কী হবে? হিংসে করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই। আমি কি আর টাইম মেশিনে গিয়ে আপনার পাস্ট বদলে দিতে পারব?"

চিত্রলেখা বলল, "না না, শুনে নিন। আপনার এক্স নেই বলে, থাকলে বুঝতেন, এক্সকে খিস্তি মারলে শরীর ঠান্ডা হয়, মাথা ঠান্ডা হয়, এক অদ্ভুত ভালো লাগা তৈরি হয় সারা শরীরে। সে অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না।"

দীপ ম্লান মুখে বলল, "আচ্ছা বলুন।"

চিত্রলেখা বলল, "আমার সঙ্গে ছেলেটির আলাপ আমার এইচএসের পরে। এইচএসের পরেই আমি ফেসবুক করা শুরু করি। তো, সেই সময় ছেলেটির সঙ্গে সারাদিন ধরে চ্যাট করে যেতাম। একসময় ফোন নাম্বার এক্সচেঞ্জ হল। মানে আজকালকার প্রেম-ট্রেম যে রুটে হয় সেরকমই আর কি।"

দীপ বলল, “সত্যি লোকের কত সময়।”
চিত্রলেখা বলল, “আপনার জ্বলছে? গুড।”
দীপ বলল, “বলুন বলুন। আমি শুনছি।”
চিত্রলেখা বলল, “ছেলেটি প্রথম প্রথম পজেসিভনেস দেখাত। আমি ভাবতাম ঠিক আছে। খুশিও হতাম। ভাবতাম ভালোবাসে বলেই পজেসিভ। কিন্তু একটা সময়ের পরে ছেলেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। ধরুন কোনও স্যারের কাছে পড়বে না, ম্যাডামের কাছে পড়তে হবে। এই টাইপ দাবি শুরু হল।”
দীপ বলল, “সুতরাং আপনি কাটিয়ে দিলেন।”
চিত্রলেখা বলল, “না। কাটাইনি। আমি ধৈর্য ধরে শুনতাম। ও যা বলত, তাই মেনে চলতাম। এক স্যার, বেশ ভালো পড়াতেন, তাঁর কাছে না পড়ে অপেক্ষাকৃত কম ভালো পড়ান এমন একজন ম্যাডামের কাছে পড়া শুরু করলাম। ম্যাডাম যেভাবে পড়াতেন, আমার মাথায় না ঢুকলেও আমি সেটাও কম্প্রোমাইজ করতে শুরু করলাম।”
দীপ বলল, “তাহলে কাটালেন কখন?”
চিত্রলেখা বলল, “ব্রেকআপ করব ভাবা যতটা সোজা, করা ততটাই কঠিন। এত কিছু সত্ত্বেও আমার প্রেমটা ছ মাস সাত মাস টিকেছিল। তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন। ও কীভাবে যেন আমার বাড়ির ল্যান্ডলাইন নাম্বারটা আমার থেকে নিয়েছিল। একদিন তুমুল ঝগড়া হয়েছে। আমি ফোন-টোন অফ করে রেখে দিয়েছিলাম। তিনি করলেন কী, আমার ল্যান্ডলাইনে ফোন করলেন। এবং আমার বাবাকে যা নয় তাই বলে দিলেন।”
দীপ অবাক হয়ে বলল, “সর্বনাশ।”
চিত্রলেখা বলল, “সর্বনাশ বলে সর্বনাশ। বাবাকে কৈফিয়ত, মাকে কৈফিয়ত, সে এক ভয়াবহ সময়। বাবা তো এত রেগে গেল যে আমার বিয়েই দিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে, হাতে পায়ে ধরে সেসব ঠেকানো গেল। আমি ঠিক করলাম কিছুতেই আর এই সম্পর্কে আমি নেই। ছেলেটা বহু অনুনয় করল। কিন্তু আমি আর সে পথে যাইনি।”
দীপ বলল, “সে ভালো করেছেন। এই তো খাবার এসে গেল।”
ওয়েটার খাবার সার্ভ করে দিল। দীপ বলল, “আমারও আজ একটা সম্বন্ধ এসেছিল।”
চিত্রলেখা বলল, “তাই? মেয়ে দেখা শুরু হয়েছে? কেমন দেখতে? কী করে?”
দীপ বলল, “জার্নালিস্ট।”
চিত্রলেখা বলল, “বেশ তো। আপনার সঙ্গে জার্নালিস্ট খারাপ মানাবে না।”
দীপ চামচ দিয়ে ফ্রায়েড রাইস কায়দা করতে করতে বলল, “জেলাসিতে আপনিও কম যান না কিন্তু।”
চিত্রলেখা বলল, “আমার এক্স নিয়ে আপনার কোনও আপত্তি নেই তবে?”
দীপ চামচটা প্লেটে রেখে একটু ভেবে বলল, “দেখুন, প্রথমত ওই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে বকবক করাটা আমার দ্বারা জাস্ট হবে না। আমার রিলেশনশিপে যেতে ভয় পাওয়ার অন্যতম কারণ হল এই ফোন। কানের কাছে ফোন নিয়ে ফিসফিস করে, বিড়বিড় করে আমার সোনু খেয়েছে, আমার মনু হেগেছে করতে পারব না জাস্ট। তার জন্য প্রেম থাকুক না থাকুক আমার কিচ্ছু যায় আসে না। দ্বিতীয়ত, আপনার এক্স আপনার পাস্ট। আমি বায়োলজিতে খারাপ ছিলাম। একইসঙ্গে ইতিহাসেও। তাই আপনার ইতিহাস নিয়ে আমার বিশেষ চিন্তা নেই।”
চিত্রলেখা বলল, “তাও ভালো। আমার সঙ্গে এক ছেলে ছকাতে এসেছিল। আমার এক্সের কথা শুনে ইনিয়েবিনিয়ে কেটে পড়েছে। মেয়েমানুষ আর মোবাইলের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ তফাত দ্যাখে না। সেকেন্ডহ্যান্ড হলেই অচ্ছুৎ।”

দীপ খেতে খেতে বলল, "ওয়েভলেন্থ ম্যাচ করলেই হল। আপনি আমাকে স্বাধীনভাবে ইকোনমিক টাইমস পড়তে দেবেন, আমি আপনাকে ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র আঁকতে দেব। তাহলেই হবে।"

চিত্রলেখা হেসে ফেলল। বলল, "বিল কিন্তু সমান ভাগে ভাগ করবেন।"

দীপ বলল, "আজ আমি খাওয়াব। এমনিতে আমি হাড় কেপ্পন, তবু আমি খাওয়াব।"

চিত্রলেখা অবাক হয়ে বলল, "এমনিতে আপনি হাড় কেপ্পন, তবু খাওয়াবেন কেন?"

দীপ বলল, "জীবনে প্রথম কোনও মেয়েকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় এসেছি। সেলিব্রেশন তো বনতা হ্যায় বস।"

চিত্রলেখা নাক সিঁটকিয়ে বলল, "উফ, কী জঘন্য আপনার সেন্স অফ হিউমার।"

দীপ বলল, "আচ্ছা, আপনি কি আজ থেকে আমার অফিশিয়াল গার্লফ্রেন্ড? ফেসবুকে ট্যাগ করতে পারি?"

চিত্রলেখা বলল, "ফেসবুকে আগে বন্ধু হোন। তারপর তো সেসব করবেন।"

দীপ বলল, "কী জ্বালা। আচ্ছা। সেসব করা যাবে। আগে খেয়ে নি।"

চিত্রলেখা বলল, "আইসক্রিম স্কুপ আর গুলাবজামুনটা আমি খাওয়াব। আশা করব তাতে আপনার আপত্তি নেই?"

দীপ বলল, "ওকে ম্যাম। বেশি আপত্তি করলে যদি ধুতরো ফুল আঁকতে দিয়ে দেন তাহলেই চিত্তির।"

চিত্রলেখা বলল, "থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।"

৬

ডেস্কে বসে মানালি পেন্টে ছবি আঁকছিল। বিতস্তা তাকে একটা চুইংগাম দিয়ে বলল, "কি রে, ধ্রুব বাগচীকে কেমন লাগল?"

মানালি বিতস্তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, "কেমন লাগতে পারে? তোর কেমন এক্সপেক্টেশন ছিল শুনি?"

বিতস্তা একটা শয়তানি হাসি হেসে বলল, "চেটে দিয়েছে?"

মানালি উত্তর না দিয়ে মন দিয়ে মাউস দিয়ে ভেড়া আঁকতে লাগল।

বিতস্তা বলল, "বিশ্বরূপদা কিন্তু যে-কোনো সময় উঁকি মারতে পারে।"

মানালি মুখ ব্যাজার করে বলল, "তাতে আমার ছেঁড়া গেল। পৃথিবীর যত জঘন্য অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমার জন্য দেবে, তার ওপর আবার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? আসুক আজকে, আমি বুঝে নেব।"

বিতস্তা বলল, "তোর মুড এত অফ কেন মা? কাজে এক-আধ দিন খারাপ যেতেই পারে। জার্নালিজমের পাবলিকদের এত মুডি হলে চলে?"

মানালি বলল, "শুধু কাজে? তুই জানিস আজ কী ভয়াবহ কাণ্ড হয়ে গেছে?"

বিতস্তা অবাক হয়ে বলল, "কী কাণ্ড?"

মানালি বলল, "সকালে মা বলল, মার এক গুরুভাইয়ের বাড়ি যাবে। কী সব নাকি ঠাকুর দেবতার নাম-টাম করবে, আমাকেও যেতে হবে, একদিন গেলেই হবে। আমি ভাবলাম ঘরে বসে একা একা কী করব, চলেই যাই। গিয়ে দেখি কোত্থেকে একটা ছেলে জোগাড় করে ফেলেছে। সম্বন্ধ!!! ভাবতে পারছিস?"

বিতস্তা চোখ কপালে তুলে বলল, "ও মাই গড!!! তারপর? ইনিয়েবিনিয়ে কথা বললি? বললি না, আপনি কোন কালারের আন্ডারওয়্যার ভালোবাসেন?"

মানালি পেপারওয়েটটা তুলে বিতস্তার দিকে ছোড়ার অভিনয় করে বলল, "সবাইকে নিজের মতো ভাবিস না। আমি ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি আমার বয়ফ্রেন্ড আছে।"

বিতস্তা চোখ নাচাল, "কে তোর বয়ফ্রেন্ড? বিশ্বরূপদা?"

মানালি কয়েক সেকেন্ড বিতস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সকালে ক্লিয়ার হয়নি তোর? বিশ্বরূপদার সঙ্গে আমার এজ ডিফারেন্সটা জানিস?"

বিতস্তা বলল, “মেয়েরা তো একটু বেশি বয়সের পুরুষই পছন্দ করে। সেদিন তুই-ই তো বলছিলি!”

মানালি বলল, “তা বলে বিশ্বরূপদা?”

বিতস্তা বলল, “তাহলে কে? চাওয়ালা ন্যাপলা?”

মানালি বলল, “আমাকে খেপিয়ে লাভ নেই। এমনিতেই প্রচুর খেপে আছি আজ। স্যাচুরেশন লেভেলে চলে গেছি। একদিকে ধ্রুব বাগচী, একদিকে সম্বন্ধ... উফ।”

বিতস্তা বলল, “ছেলেটা কেমন ছিল?”

মানালি বলল, “লাভ নেই। ছেলেটার গার্লফ্রেন্ড আছে।”

বিতস্তা বলল, “তাতে কী? তোর যদি ছেলেটাকে পছন্দ থাকে তাহলে তোর মায়াজাল ইন্দ্রজাল আরও কী সব আছে সেসব ছড়িয়ে ছেলেটাকে জিতে নিবি। সিম্পল।”

মানালি চোখ ছোটো ছোটো করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, “তোর অবস্থা খুব খারাপ। বোঝাই যাচ্ছে আজকাল কেউ দিচ্ছে না তোকে।”

বিতস্তা চোখ মারল, “না না, সৌরভ ভালোই দিচ্ছে।”

মানালি বলল, “প্রেগন্যান্ট হয়ে যাস না দেখিস। হাজার ঝামেলা কিন্তু।”

বিতস্তা বলল, “হয়ে গেলে হয়ে যাব। সৌরভ ডিনাই করলে একা একা বাচ্চা মানুষ করব। কী চাপ?”

মানালি অবাক হল, “তুই সিরিয়াস?”

বিতস্তা বলল, “হ্যাঁ। হান্ড্রেড পারসেন্ট!”

মানালি বলল, “এরকম কিছু ঘটিয়ে ফেলেছিস নাকি অলরেডি?”

বিতস্তা হেসে ফেলল, “ধ্যাত। জাস্ট কথার কথা বলছি।”

মানালি বলল, “দেখিস বাপু। যা করবি ভেবেচিন্তে করবি।”

বিতস্তা বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ। অত চিন্তা করিস না। যুদ্ধে নামিবার পূর্বে সকলরকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়াই যুদ্ধে নামা হয়। তুই একটা প্রেম কর না জমিয়ে। এই অ্যাডভেঞ্চারগুলো খারাপ লাগবে না। লাস্ট মান্থেই তো সৌরভের ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেল টিপেছি, আর ঠিক সেই সময় ওর পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক দরজা খুলে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। আমি ওঁকে দেখেই বললাম চন্দনের গন্ধওয়ালা ধূপকাঠি নেবেন দাদা? একটা কিনলে একটা ফ্রি। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিলেন।”

মানালি হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল, “সিরিয়াসলি? মানে এটা তুই করতে পারলি? তোর মাথায় এল? যদি সত্যিই ধূপকাঠি চাইত তাহলে কী করতি?”

বিতস্তা বলল, “ধূপকাঠি ছিল তো। কিছুক্ষণ আগেই কিনেছিলাম বাস থেকে নেমে। সেইজন্যই তো মাথায় এসে গেছিল। বেচে দিতাম।”

মানালি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, “তুই শিওর কেস খাবি।”

বিতস্তা বলল, “কেস খাবার কিছু নেই। দুজন অ্যাডাল্ট পাবলিক কী করবে না করবে, সেটা পাশের ফ্ল্যাটের লোকজন ঠিক করে দেবে নাকি?”

মানালি বলল, “সৌরভ কী বলে?”

বিতস্তা বলে, “ও তো আরও কুল। বলে, অত কিছু করার কী দরকার ছিল? পাত্তাই দিতে না। কী এমন হত?”

মানালি বলল, “বিয়ের কথা ভাবছিস না তোরা?”

বিতস্তা বলল, “নাহ। এখন কী?”

মানালি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বিশ্বরূপদা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে বলল, “মানালি, শুনে যা তো একবার।”

বিতস্তা বলল, “নাও। হয়ে গেল।”

মানালি বলল, "হ্যাঁ রে, কাল বলছিলি বিশ্বরূপদার নামে কী সব রিউমার ছড়িয়েছে?"

বিতস্তা বলল, "হুঁ, রেজিগনেশন দেবে শুনছি শিগগিরি। অলমোস্ট দেড়গুণ বেশি সিটিসি পাবে সিগ্নি মিডিয়ায়।"

মানালি বলল, "যাহ্! তাহলে আমাদের কী হবে?"

বিতস্তা বলল, "আসবে আর-একটা ঝাঁটু কেউ।"

মানালি বলল, "ঠিক আছে। শুনে আসি কী বলছে। আজ বেশি কিছু বললে জাস্ট খুন করে ফেলব। আমি বাড়ি যাব তাড়াতাড়ি।"

বিতস্তা বলল, "আবার সম্বন্ধ দেখতে আসবে নাকি তোর?"

মানালি মাথা চাপড়ে বলল, "উফ! ঠিকই বলেছিস। আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়েও শান্তি নেই। মার ইমোশনাল অত্যাচারের পাল্লায় পড়তে হবে।"

বিতস্তা হাসল, "যা যা, দেখ বিশ্বরূপদা কী বলছে।"

বিশ্বরূপদা ল্যাপটপ নিয়ে বসেছিল। মানালিকে দেখে বলল, "অফিসে এত গ্যাজালে চাকরি থাকবে না কিন্তু।"

মানালি বলল, "কী করব? দুজনে একটু হালকা ছিলাম।"

বিশ্বরূপদা বলল, "ধ্রুব বাগচীর ইন্টারভিউটা লেখা হয়ে গেছে?"

মানালি ঠোঁট কামড়াল, "না।"

বিশ্বরূপদা বলল, "তাহলে হালকা ছিলি কী করে?"

মানালি বলল, "আমি কাল লিখব। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব।"

বিশ্বরূপদা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। এবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "চাকরিটাকে টেকেন ফর গ্র্যান্টেড ভাবাটা বন্ধ কর।"

মানালি বুঝল বিশ্বরূপদা রেগে গেছে। সে কিছু বলল না। মাথা নিচু করে নিজের জুতো দেখতে লাগল।

বিশ্বরূপদা বলল, "অডিও ক্লিপটা শুনলাম। তোর প্রবলেমটা কী, সেটা তুই ধরতে পারিস?"

মানালি বলল, "কী?"

বিশ্বরূপদা বলল, "তুই যে প্রশ্নগুলো করবি বলে প্রিপেয়ার হয়ে গেছিস, তার বাইরে আর বেরোতে পারিস না। তুই ভাবছিস কতগুলো প্রশ্ন তৈরি করে গেছিস, সেগুলো বলে ফেললেই হয়ে যাবে। তোকে আমি আগেও বলেছি, যে ওপেনিংগুলো পাবি, তাতে ঢুকে যা। ধ্রুব বাগচী তোকে বেশ কয়েকটা ভালো সিটার দিয়েছিল, তুই মিস করে গেলি।"

মানালি বলল, "ওকে। পরের বার ট্রাই করব। কিন্তু এই লোকটা ভীষণ অসভ্য। শুরুতেই ইন্টারকোর্স ইত্যাদি বলে আমার ফোকাসটাই নাড়িয়ে দিয়েছিল।"

বিশ্বরূপদা বলল, "সেটাই তো করবে। ধ্রুব বাগচী তো শুধু মুখে বলে, কেউ কেউ আছে যারা চোখে বলে। তাদের ক্ষেত্রে তুই কী করবি?"

মানালি বলল, "চড় মেরে দেব।"

বিশ্বরূপদা হেসে বলল, "না। চোখে বলার মতো জায়গায় যেন না যায়, সেই পারসোনালিটিটাও তোকে তৈরি করতে হবে। ক্যাজুয়ালি একটা ট্রেনি মেয়ের মতো গেলে এসব লোক এভাবেই তোকে চেটে রেখে দেবে। ধ্রুব বাগচীর একটা ভালো ব্যাপার আছে যদিও।"

মানালি বলল, "কী ভালো ব্যাপার আছে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "লোকটার মুখ খারাপ। কিন্তু রেকর্ড ভালো। মেয়েদের সঙ্গে পাঁচ পেগ গিলেও পার্টিতে কোনও রকম অসভ্যতা করবে না। এটা সবার থেকে পাওয়া যায় না।"

মানালি ঠোঁট বাঁকাল, “আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ধ্রুব বাগচী মদ খাবে আর আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকব।”

বিশ্বরূপদা বলল, “যে-কোনো সময় যে-কোনো সিচুয়েশন আসতে পারে। তোকে তার জন্য প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। এখন কটা বাজে?”

মানালি ঘড়ি দেখে বলল, “পাঁচটা।”

বিশ্বরূপদা বলল, “ওকে। তুই যেতে পারিস। কিন্তু কাল এসে দু ঘণ্টার মধ্যে গোটা রিপোর্টটা তৈরি করে দিবি আমায়। ডান?”

মানালি বলল, “ডান।”

বিশ্বরূপদা বলল, “ধ্রুব বাগচী আমায় ফোন করেছিল।”

মানালি অবাক হল, “কেন?”

বিশ্বরূপদা বলল, “তোর প্রশংসা করল। বলল, ডিপার্টমেন্টে ভালো ভালো জার্নালিস্ট এসেছে। ভালো করে গ্রুম করো।”

মানালি বলল, “ধ্যাত। হতেই পারে না। ইয়ার্কি মেরো না তো।”

বিশ্বরূপদা বলল, “ইয়ার্কি মারতে যাব কেন? সিরিয়াসলিই বলেছে।”

মানালির মনে পড়ল, “ওহ, লোকটা টাকা চাইছিল ইন্টারভিউর জন্য।”

বিশ্বরূপদা হাসল, “ওটা তোকে চমকানোর জন্য বলেছিল। ভদ্রলোক নিজের ইমেজ ইচ্ছা করেই খারাপ করে রাখেন। যতটা খারাপ দেখান ততটা নন। বিশেষ করে এখনকার ইন্টেলেকচুয়ালদের মতো তো একেবারেই নন। বাই দ্য ওয়ে, আমি ইচ্ছা করেই আজ তোকে ধ্রুব বাগচীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। তুই কতটা ঘাবড়াস দেখার জন্য। ধরে নে এটা পার্ট অফ ইওর ট্রেনিং। নইলে কাল অবধি ইন্দ্রর যাওয়াই ঠিক ছিল। ডিসিশনটা আজই সকালের।”

মানালি অবাক হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। বিশ্বরূপদা বলল, “কী হল?”

মানালি বলল, “তোমার খুরে খুরে প্রণাম।”

৭

রবিবারের সকাল। দীপের ঘুম ভাঙল নটায়। উঠতে ইচ্ছা করছিল না তার। ফোনটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল।

উঠে সেটা নিয়ে আবার কম্বলের তলায় সেঁধিয়ে গেল সে।

হোয়াটসঅ্যাপে চিত্রলেখা মেসেজ করেছে, “ঘুম ভাঙল?”

দীপ দেখল সকাল আটটায় মেসেজটা এসেছে।

সে লিখল, “না। এখনও ঘুমাচ্ছি।”

চিত্রলেখা অনলাইনই ছিল। লিখল, “ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কীভাবে টাইপ করছেন?”

দীপ লিখল, “সুপার পাওয়ার।”

চিত্রলেখা হাসির স্মাইলি দিল।

দীপ লিখল, “এবার কী বলবেন? আমার বাবু খেয়েছে?”

চিত্রলেখা আবার একগাদা হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখল, “না না। আচ্ছা, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন বোধহয়। ওকে। পরে কথা বলছি।”

দীপ বলল, “ওকে।”

চিত্রলেখা মেসেজটা সিন করল। কিছু লিখল না।

দীপের মনে হল সে কি খানিকটা রূঢ় হল? একটু ভাবল। তবে সেও কিছু লিখল না আর। সকাল সকাল এত টাইপ করতে ইচ্ছা করছিল না।

বাইরের ঘর থেকে জোরে জোরে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। দীপ বুঝতে পারল মা পুজো শুরু করেছে। ফোনটা রেখে বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকল সে। রবিবার শেয়ার বাজার বন্ধ থাকে। বেশ কিছু পড়াশোনা করতে হয় তাকে। সোমবার বাজার খুলতেই কোন কোন শেয়ারের ওপর কড়া নজর থাকবে, কোন কোন শেয়ারে একটু হলেও ফাটকা খেলতে হবে, এ সব কিছুর হোমওয়ার্ক রবিবার করে রাখতে হয়। সপ্তাহের বাকি দিনগুলো এত সময় দেয় না।

দীপ বেশ খানিকক্ষণ কম্বলে শুয়ে উঠল। বাথরুমে মিনিট পনেরো কাটিয়ে বসার ঘরে গিয়ে দেখল বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছে। সে বলল, "কী হল? রেগে আছ কেন?"

বাবা গলায় একরাশ বিরক্তি এনে বলল, "তোর মা বলছে এখন থেকে বাড়িতে আমিষ ঢুকবে না।"

দীপ অবাক গলায় বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "এ আবার কী হল? এ তো ভয়ংকর ব্যাপার।"

বাবা বলল, "তোর কী মত এই ব্যাপারে?"

দীপ বলল, "বাইরে খেয়ে নেব।"

বাবা বলল, "ইডিয়ট তৈরি হচ্ছিস যত দিন যাচ্ছে। রোজ রোজ বাইরে খেলে পেট ঠিক থাকবে? তা ছাড়া তোর মার হাতের চিংড়ির মালাইকারি, চিতল মাছের মুইঠ্যা, কুচো চিংড়ি দিয়ে মোচার তরকারি মার্কেটে পাবি?"

দীপ বলল, "তাহলে কী চাইছ? বিদ্রোহ করি?"

বাবা সোফায় একটা চাপড় মেরে বলল, "অফকোর্স। এটা নিয়ে তোর মনে কোনও সংশয় আছে নাকি? তোর মা ওই কী সব গুরুদেবের পাল্লায় পড়ল ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম একটা অ্যাসোসিয়েশন দরকার, মেনেও নিয়েছিলাম। কিন্তু এভাবে হেঁশেল এবং পেটের অন্দরমহলে সার্জিকাল স্ট্রাইক হলে আমি মেনে নেব না। এটা তোকে আগে থেকেই বলে দিলাম দীপু।"

দীপ বলল, "তাই করো। তুমি বিদ্রোহ করো।"

বাবা কিছুক্ষণ নিজের মনে গজগজ করতে করতে কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলল, "এই মরেছে, তোকে কী একটা কথা বলার ছিল।"

দীপ বলল, "কী?"

বাবা খানিকক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "কিছুতেই মনে পড়ছে না। আচ্ছা দাঁড়া, তোর মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।"

বাবা তড়িঘড়ি ঠাকুরঘরের দিকে ছুটল।

দীপ কাগজটা খুলল। প্রথম পাতাতেই খবরের পরিবর্তে পাতা ভর্তি বিজ্ঞাপন। দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার।

বাবা ইকোনমিক টাইমস পড়ে না। ফলে কাগজটা ঝকঝকেই থাকে। সে ইকোনমিক টাইমসটা নিয়ে নিজের ঘরে যাবার জন্য সোফা থেকে উঠল, এমন সময় বাবা এসে বলল, "বস বস। তোর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।"

দীপ বলল, "মার সঙ্গে কথা হল তবে?"

বাবা বলল, "হ্যাঁ।"

দীপ বলল, "বলো। কালকের কথা বলবে নিশ্চয়ই?"

বাবা চশমাটা কপালের উপর তুলে বলল, "হ্যাঁ। তুই কী করে জানলি?"

দীপ বলল, "গুরুত্বপূর্ণ কথা বললে যখন তখন ওটাই দাঁড়ায়। আমি তো ভাবলাম কালকেই বলবে।"

বাবা বলল, "কালকে জানলে তো বলব? কাল তো তোর মার মেজাজ একদম তুঙ্গে ছিল। যাই জিজ্ঞেস করি, রেগে যাচ্ছিল। আজ সকালে শেষমেশ বলল, কী হয়েছিল। যাক গে, আসল কথায় আসি, তুই নাকি প্রেম করছিস?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ।"
বাবা বলল, "বিয়ে করবি কবে?"
দীপ বলল, "সবে তো প্রেম শুরু হল। এখনই বিয়ে নিয়ে টানাটানি শুরু করছ কেন?"
বাবা বেশ খানিকক্ষণ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোর মতো বিচক্ষণ যদি আমি হতে পারতাম! সবে শুরু হল বলছিস?"
দীপ বলল, "হ্যাঁ।"
বাবা বলল, "কী করে? কোথায় থাকে?"
দীপ বলল, "ভয়াবহ ব্যাপার বাবা। মেয়ে ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র পুরো আঁকতে পারে। তোমার মনে আছে, একবার ওটা তোমাকে আঁকতে বলেছিলাম? আর তুমি সারাদিন ধস্তাধস্তি করে রাতে বলেছিলে এসব মানুষের কম্মো নয়?"
বাবা বলল, "বলিস কী! এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড! তাহলে তো দারুণ মেয়ে বলতে হয়! একদিন বাড়িতে নিয়ে আয়।"
দীপ বলল, "সেটা দেখা যাবে।"
বাবা বলল, "ম্যাপ পয়েন্টিং সব পারে কি না জিজ্ঞেস করেছিস? ছোটোনাগপুর মালভূমি, বিন্ধ্য পর্বত, লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চল, কচ্ছের রন কোথায় আছে ঠিকঠাক পারবে?"
দীপ মাথা চুলকে বলল, "সেটা জিজ্ঞেস করিনি।"
বাবা গম্ভীর হয়ে বলল, "জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আর শোন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর শাসনকাল, অশোকের ধর্মনীতি, শেরশাহের শাসনকাল, আকবর আর জাহাঙ্গীরের শাসনকালের তুলনামূলক আলোচনা নিয়েও জিজ্ঞেস করে নিবি। এক্কেবারে ঠিকঠাক যাচাই করে নেওয়াটাও দরকার।"
দীপ বলল, "ঠিক আছে।"
বাবা বলল, "দেখা করেছিস মেয়েটার সঙ্গে?"
দীপ মাথা নাড়ল, "কালকেই। মিক্সড ফ্রায়েড রাইস খেলাম। সঙ্গে চিংড়ি।"
বাবা রেগে গেল, "আসার সময় আমার জন্য একটু প্যাক করে নিয়ে আসতে কী হয়েছিল হারামজাদা?"
দীপ বলল, "মা এমনিতেই রেগে ছিল। আনলে আরও রেগে যেত।"
বাবা বলল, "তোর মা তো কী একটা সাইন্টিস্ট মেয়ে পছন্দ করেছিল নাকি! কী সাংঘাতিক। দেখা গেল বাড়িতে এসে বাড়ির জি(g)-এর মান কমিয়ে দিল। আমরা হাওয়ায় ভাসতে শুরু করলাম। তুই একদম ভালো করেছিস মেয়েটাকে বিয়ে করবি না বলে।"
দীপ হাসতে হাসতে বলল, "সাইন্টিস্ট না বাবা। জার্নালিস্ট।"
বাবা বলল, "জার্নালিস্ট?"
দীপ বলল, "হ্যাঁ। খবরের কাগজের।"
বাবা বলল, "মেয়েটি কী বলেছে? সেও প্রেম করে?"
দীপ বলল, "হ্যাঁ।"
বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় মা ঘরে এসে ঘরে ঠাকুরের ফটোতে ধূপকাঠি দিতে দিতে তাদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। এখন প্রণামের সময় তাই বেশি কথা বলা যাবে না বলে মা কিছু বলতেও পারছিল না। মা অন্য ঘরে গেল।
বাবা ফিসফিস করে বলল, "তোর মার রাগ এখনও পড়েনি। আমাকে বলেছিল তোকে ঝাড়তে, এখন তোর সঙ্গে আলোচনা করছি দেখে ভদ্রমহিলা আরও রেগে গেলেন।"
দীপ বলল, "তুমি একটু চিৎকার করো। আমাকে ঝাড়ো।"

বাবা একটু গলা খাঁকরিয়ে উঁচু গলায় চ্যাঁচ্যাতে শুরু করল, "আমি এইসব প্রেম একদম বরদাস্ত করব না দীপু। ম্যাপ পয়েন্টিং করতে পারে নাকি না দেখে কোনও মেয়ে পছন্দ করা আমি একদম বরদাস্ত করব না। আগে আমি নিজের হাতে পরীক্ষা নেব, তারপর ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেব। তা ছাড়া অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের টীকা ছবি সহ ঠিকমতো লিখতে পারছে নাকি সেটাও দেখতে হবে। শুধু ব্যাঙের পৌষ্টিকতন্ত্র গাঙ্গুলিবাড়ির বউমা হয়ে আসার জন্য ইজ নট সাফিশিয়েন্ট।"

দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সে শুনতে পেল তার ঘর থেকে ফোনটা সশব্দে বাজছে। সে তড়িঘড়ি নিজের ঘরের দিকে ধাবমান হয়ে ফোনটা ধরল, চিত্রলেখা ফোন করছে।

দীপ বলল, "হ্যালো।"

ওপাশে বেশ কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। দীপ জোরে জোরে বলল, "হ্যালো হ্যালো।"

তার ঘরে মা ঢুকে পড়েছে। ক্যালেন্ডারে ক্যালেন্ডারে ধূপকাঠি ধরে প্রণাম করছে।

দীপ বলল, "কেটে গেল মনে হচ্ছে।"

ওপাশ থেকে চাপা গলায় চিত্রলেখা বলে উঠল, "আপনার বোধহয় কাল আমায় পছন্দ হয়নি, তাই না?"

দীপ আকাশ থেকে পড়ল, "কেন বলুন তো? হঠাৎ কী হল?"

দীপ বুঝতে পারল এক-একটা ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়ানোর অ্যাভারেজ টাইমিং মা বাড়িয়ে দিয়েছে। কে ফোন করেছে এটা জানার জন্যই হয়তো।

চিত্রলেখা বলল, "আপনাকে আমি সকালে বিরক্ত করলাম। তার জন্য সরি।"

ফোনটা কেটে গেল।

দীপ বেশ কয়েক সেকেন্ড ফোনটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে মনে মনে বলল, "এ আবার কী রে বাবা!"

মা তড়িঘড়ি ধূপকাঠি রেখে ঠাকুর প্রণাম সেরে তাকে বলল, "কে ফোন করেছে?"

দীপ বলল, "শেয়ার মার্কেট থেকে।"

মা গজগজ করতে করতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দীপ কলব্যাক করল। দুটো রিং হতেই চিত্রলেখা ধরল, "বলুন।"

দীপ বলল, "কী হল আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

চিত্রলেখা বলল, "আপনার বোধহয় আমাকে পছন্দ নয়, না?"

দীপ বলল, "কে বলল, পছন্দ না? একশো বার পছন্দ।"

চিত্রলেখা বলল, "কী দেখে পছন্দ হল? কী আছে আমার যা আর পাঁচটা মেয়ের মধ্যে নেই!"

দীপ বলল, "এ আবার কেমন প্রশ্ন?"

চিত্রলেখা বলল, "নাকি আমার এক্স আছে বলে আপনার পছন্দ না?"

দীপ বলল, "কই সেরকম কিছু না তো!"

চিত্রলেখা বলল, "তাহলে তখন হোয়াটসঅ্যাপের রিপ্লাই দিলেন না কেন?"

দীপ কী কেন বুঝে উঠতে উঠতেই ফোন কেটে গেল।

ফোনটা কান থেকে নামাতে নামাতে সে হতাশ গলায় বলল, "এখন আবার ফোন করে জানু মনু করে ঢপবাজি করতে হবে? হয়ে গেল আজ শেয়ার বাজারের একশো আট।"

ঘরের দরজায় কেউ নক করছে। দীপ দেখল বাবা। সে বলল, "কিছু বলবে?"

বাবা বলল, "সময় করে একবার ইতিহাস বইটা নামাস তো। বাবরের বাবার নামটা ভুলে গেছি মনে হচ্ছে।"

৮

"এই শহরটা দেখছিস না, এখানে চার রকমের মানুষ থাকে।"

ড্রাইভ করতে করতে কথাগুলো বলল বিশ্বরূপদা। গাড়িটা ফ্লাইওভারে ওঠার আগের সিগন্যালে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটা বাচ্চা গোলাপফুল বিক্রি করছে। মানালি একটা গোলাপ কিনল। গাড়ি দাঁড়ানোর কাউন্টডাউন একশো কুড়ি থেকে শুরু হয়েছে।

বিশ্বরূপদা বলল, "কার জন্য কিনলি?"

মানালি ফুলটা খোঁপায় গুঁজে বলল, "নিজের জন্য। নিজেকে গিফট দেবার মজাটাই আলাদা। যাক গে, বলো কোন চার রকমের মানুষ থাকে এই শহরে?"

বিশ্বরূপদা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, "এক, যারা ঘেমে নেয়ে ভিড়ে মারপিট করতে করতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যায়। এদের মধ্যে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, পরিবেশ সচেতন এবং কিছু টিপিক্যাল কিপটে শ্রেণির পাবলিক থাকে। এদের কারও কারও ট্যাক্সিতে ওঠার সামর্থ্যটুকুও নেই। রুটের বাসের গড্ডল প্রবাহে গা ভাসিয়ে বাসে উঠে পড়েছে। লোকের ঘেমো জামা, টিশার্ট থেকে শুরু করে মোজা, সব কিছুর গন্ধ সত্ত্বেও এরা নির্বিকার। এদের মধ্যে অবশ্য ছাত্রছাত্রীরাও পড়ে।"

মানালি বলল, "পরিবেশ সচেতন লোক যারা বাসে চড়ে, এরকম ধরনের লোক কলকাতায় আছে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "অফকোর্স। আমার নিজের চেনাই দুজন আছেন। তাঁরা যথেষ্ট সচ্ছল। কিন্তু খুব তাড়া না থাকলে তাঁরা কিছুতেই গাড়িতে চড়বেন না। এটা নিয়ে একটা স্টোরি করাই যায়।"

মানালি বলল, "তা তুমি পরিবেশ সচেতন নও কেন?"

বিশ্বরূপদা বলল, "দু নম্বর।"

সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছিল। বিশ্বরূপদা গাড়ি স্টার্ট করে বলল, "আমার মতো পাবলিক, যারা সুখী মানুষ। ইএমআই-ও দিয়ে দেবে দরকার হলে, কিন্তু গাড়ি ছাড়া চড়বে না। ইএমআই দাতা থেকে আম্বানি, এই গোত্রে পড়ে।"

মানালি বলল, "তিন নম্বর?"

গাড়িটা ফ্লাইওভারে উঠল। বিশ্বরূপদা বলল, "ক্যাব পাবলিক। এরাও ল্যাদ। যেমন তুই।"

মানালি বলল, "মোটেও না। আমি সব সময় ক্যাবে চড়ি না। বললে হবে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "তাহলে লিফট নেওয়া পাবলিক।"

মানালি রেগে গেল, "আমি নেমে যাব চাইছ গাড়ি থেকে?"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "এখানে নামলে আর দেখতে হবে না। জার্নালিস্ট নিজেই খবর হয়ে যাবে।"

মানালি বলল, "হুঁ। চার নম্বর?"

বিশ্বরূপদা বলল, "ডব্লু টি পাবলিক। টিকেট কাটবে না। এদের মধ্যেও কেপ্পন শ্রেণি আছে অবশ্য। চান্স ফ্যাক্টর খেলবে। যদি ধরা না পড়ে। এই কেপ্পন তথা নিকিরি শ্রেণির লোকগুলো খুব ডেঞ্জার হয়।"

মানালি বলল, "তুমি কিন্তু একটু নিকিরি টাইপ আছ।"

বিশ্বরূপদা বলল, "কেন?"

মানালি বলল, "এই যে, দাতা কর্ণ হয়ে লিফটও দাও, আবার কথা শোনাতেও ছাড়ো না।"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "এটা খারাপ বলিসনি।"

মানালি বলল, "আচ্ছা, ধ্রুব বাগচী বিয়ে করেনি? ওঁকে নিয়ে তো তেমন গসিপ ছড়ায় না। বরং সবাই ওঁর বদমেজাজ নিয়েই যাচ্ছেতাই বলে দেখেছি।"

বিশ্বরূপদা বলল, "হুঁ। ধ্রুব বাগচী বিয়ে করেছিল তো।"

মানালি চমকে উঠে বলল, "এটা তো জানতাম না।"

বিশ্বরূপদা বলল, "জানার কথাও না। অনেকেই জানে না।"

মানালি বলল, "কী করেন ওঁর এক্স?"

বিশ্বরূপদা মানালির কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "ভালো সাংবাদিক মানেই ব্যোমকেশ বক্সী, জানিস তো?"

মানালি অবাক হয়ে বলল, "মানে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "মানে সত্যান্বেষী। একটা ক্লু দিলাম তো। এবার বাকিটা খুঁজে নে।"

মানালি বিরক্ত হল, "এ আবার কী! এ কী এমন বিরাট ব্যাপার যে খুঁজে দেখতে হবে?"

মানালির পাড়ার গলি চলে এসেছিল। বিশ্বরূপদা গাড়িটা বাঁদিকে রাখতে রাখতে বলল, "এসব ফিল্ডে তোকে কেউ চামচ দিয়ে খাইয়ে দেবে না মা। হতে পারে স্টোরিটা দারুণ ইন্টারেস্টিং। হতে পারে নেহাতই ম্যাড়ম্যাড়ে। কিন্তু তোকে নিজেকেই স্টোরিটা খুঁজতে হবে। আমি আর কিচ্ছু বলব না।"

মানালি দরজা খুলে নামতে নামতে বলল, "অ্যাজ এক্সপেক্টেড।"

বিশ্বরূপদা গাড়ি স্টার্ট দিল, "নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট এটাই। আর হ্যাঁ, এবারে প্রশ্নগুলো যন্ত্রের মতো করে উত্তর নিয়ে এলে চলবে না। গভীরে যেতে হবে। মাইন্ড ইট।"

মানালিকে আর দ্বিতীয় কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। মানালি হাঁ করে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বাড়ির রাস্তা ধরল।

পাড়ার মোড়ে চপ ভাজা হচ্ছে। মানালি ঠোঁট কামড়ে একটু দাঁড়াল। ডায়েটিং চলছে আজকাল। তেল বারণ। বেগুনির গন্ধ অগ্রাহ্য করে খানিকটা হেঁটে আবার ফেরত এল। মনে মনে বলল, "আজই শেষ। প্রমিস প্রমিস প্রমিস। আর একটাও না কাল থেকে।"

কাগজের তিনকোনা ঠোঙায় বেগুনি দিয়ে তার ওপর দিয়ে একটু বিটনুন ছড়িয়ে দিয়েছে। মুখে দিতে জিভ পুড়ে যাবার জোগাড় এত গরম। মানালি কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে বেগুনির গন্ধ নিল। চোখ খুলে দেখল রকের তিন-চারটে ছেলে আড্ডা থামিয়ে তাকে দেখছে।

মানালি হাসি হাসি মুখে ছেলেগুলোর দিকে তাকাল। ছেলেগুলো ঘাবড়ে গিয়ে ভারতের জিডিপি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে দিল। বেগুনিতে কামড় দিতে দিতে মানালি বাড়ি ঢুকল।

মা গম্ভীর মুখে দরজা খুলে তাকে দেখে গজগজ করতে করতে বলল, "আরও খা। খেয়ে মোটা হ। আর বিয়ে-টিয়ে দিতে হবে না আমায়। অবশ্য কোনটাকে কোন মুল্লুকে জুটিয়েছিস কে জানে! আমি আর কিছু বলব না।"

মানালি বলল, "না বলাই ভালো। সংকীর্তন করো, যেমন করছিলে, তাতেই ভালো।"

মা বলল, "হ্যাঁ রে, ছেলেটার সঙ্গে গাড়িতে কী কথা বললি?"

মানালি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, "ছেলে আর মেয়ের নাম ঠিক করছিলাম।"

মা রেগে গেল, "সব সময় ইয়ার্কি।"

মানালি বলল, "তা তুমি কী দাবি করো মা? ছেলেটা আমাকে লিফট দেবে আর আমি ছেলেটার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে যাব?"

মা বলল, "যা পারিস কর। আমি আর কিছু বলব না। এক ছাতার চাকরি জুটেছে, আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেল!"

মানালি বলল, "আমিও তো তাই চাই মা, তুমি আর কিছু বলবে না।"

মা গজগজ করতে করতে ঠাকুরঘরে চলে গেল।

মানালি ফ্রেশ হয়ে ঘরে গিয়ে ল্যাপটপ অন করল।

ওয়ার্ড খুলে বড়ো বড়ো করে লিখল, "ধ্রুব বাগচীর এক্স।"

কয়েক সেকেন্ড অন্যমনস্কভাবে বসে লেখাটার ফন্ট সাইজ বাড়াতে লাগল। ল্যাপটপের ঘড়ি জানান দিচ্ছে সাতটা পঞ্চান্ন।

বেশ কয়েকটা ইমেল এসেছে। মানালি বসে বসে চেক করল। মন বসছে না কাজে। ধ্রুব বাগচী লোকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। উন্নাসিক, উদ্ধত। ইউটিউবে ধ্রুবর প্রথম সিনেমাটা দেখতে শুরু করল সে। বেশ সাবলীল গল্প বলা। ঝকঝকে সিনেমা। মানালি ফরোয়ার্ড করতে করতে গোটাটা দেখল। নিঃসন্দেহে বিগত কয়েক বছরের অন্যতম সেরা কাজ। লোকটা ট্যালেন্টেড সন্দেহ নেই।

ডার্ক লাভ ইউটিউবে এসে গেছে। মানালি হেডফোন কানে গুঁজে সিনেমাটা দেখতে বসল আবার। অবাক হয়ে সে নিজেই লক্ষ করল সিনেমাটা এবার দেখতে ভালো লাগছে। একটা বেশ অন্যরকমের কনসেপ্টে সিনেমাটা তৈরি করা। গতি একটু ধীর, কিন্তু গল্প বলার কায়দাটা অদ্ভুত সুন্দর। একটু মনখারাপ হল তার। হলে তিন-চারটে লোক পেছন থেকে "চলবে না চলবে না" শুরু থেকেই বলে যাচ্ছিল। শুধু ওইটুকু কথায় তখন প্রভাবিত হয়ে গেছিল।

একটানা দেখছিল সিনেমাটা। হেডফোনটা কান থেকে নামিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে রইল সে। এগারোটা বাজে। ডাইনিং টেবিল থেকে বেশ জোরে জোরে থালা বাসন ব্যবহার করার শব্দ আসছে। মানালি বুঝল মা ভীষণ রেগে আছে। সে চুপচাপ গিয়ে টেবিলে বসে পড়ল।

মা বলল, "বাহ, আমার কী সৌভাগ্য! এবার খেয়ে আমায় উদ্ধার করো।"

মানালি বলল, "বাবা কবে ফিরছে?"

মা বলল, "নিজে ফোন করে খবর নাও। আমি তোমার রিপোর্টার নই। বুঝেছ?"

মানালি বুঝল মা তুমুল রেগে গেছে। তুইটা থেকে তুমিতে কনভার্ট হলেই মানালি বুঝে যায় ঈশান কোণে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

সে চুপচাপ দুটো রুটি খেয়ে বেসিনে প্লেট রেখে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

মার সঙ্গে এখন বেশি কথা বলতে গেলেই ঝাড় অনিবার্য।

খাটে কয়েক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকল সে। সাড়ে এগারোটা বাজছে।

মানালি হঠাৎ ফোনটা বের করে ধ্রুব বাগচীকে ফোন করল।

দুটো রিং হতেই ফোন তুলে জড়ানো গলায় ভদ্রলোক বললেন, "ইয়েস।"

মানালি বলল, "স্যার, সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে বলছি।"

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল। বেশ কিছুক্ষণ হেসে ধ্রুব বাগচী বললেন, "বলুন, আবার কী দাবি আপনার?"

মানালি বলল, "স্যার, একটা ইনফরমেশন জানার ছিল। আপনার ওয়াইফ, মানে যাঁকে ডিভোর্স দিয়েছেন..."

এই অবধিই বলতে পারল মানালি। ওপাশ থেকে অকথ্য ভাষায় কয়েকটা গালাগালি ভেসে এল।

মানালি চুপচাপ কয়েক সেকেন্ড ফোনটা দূরে রেখে দিল। খানিক পরে ফোনটা কানে দিল। ধ্রুব বাগচী প্রবল উৎসাহে তিন অক্ষর থেকে চারের ঘরে ঢুকে পড়েছেন সসম্মানে।

একটু ধরার পরে মানালি ফোনটা কেটে দিল।

ধ্রুব বাগচীর পেছনে সময় নষ্ট করার থেকে ল্যাপটপে তাস খেলা ভালো।

৯

লাঞ্চ ব্রেকে দীপ অফিস ক্যান্টিনে খাবার অর্ডার করে মোবাইলে বাজারের হাল দেখছিল।

রাম তার কাঁধে একটা টোকা দিয়ে তার পাশের চেয়ারে বসে বলল, "কী বে, তোর হল কী?"

দীপ অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

রাম বলল, "তুই আজ আমার পরে অফিস এসেছিস। ইনফ্যাক্ট সবার পরে। এবং এটা তোর অফিস লাইফে ফার্স্ট হল।"

দীপ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে বলল, "হতে পারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। লেট তো হইনি।"

রাম বলল, "সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তুই তো প্রতিদিনই বিফোর টাইমে ঢুকে যাস।"

দীপ হাসল, "এভ্রিথিং চেঞ্জেস মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। আমি তো তুচ্ছ।"

রাম বলল, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বিয়ে করার প্ল্যান করছিস নাকি?"

দীপ বলল, "তোর আর কোনও কাজ নেই? র‍্যাপিড ফায়ার শুরু করেছিস কেন? ওপিয়ামের বিলটা হিসেব করেছিস?"

রাম বলল, "ওটা আমি দিয়ে দেব। আজ তুই খাইয়ে দিস।"

দীপ বলল, "আজ খাব না। তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।"

রাম বলল, "কোথায় যাবি?"

দীপ বলল, "কাজ আছে। রাধিকার মানভঞ্জন বোঝো মামা?"

রাম চোখ কপালে তুলে বলল, "রাধিকা? মানে তুই সিরিয়াসলি প্রেম করছিস?"

দীপ বলল, "ক্যাজুয়ালি তো আমি কোনও কাজই করি না। প্রেমটা কীভাবে করব তবে?"

রাম কপালে হাত দিয়ে বলল, "হয়ে গেল। আর-একজন শহিদ হল।"

দীপ বলল, "তোকে আর-একটা ফ্যাক্ট বলি। কাল রাত দেড়টা অবধি আমি ফোনে কথা বলেছি।"

রাম কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে দীপের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "খাটিয়া অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি। আর কোনও আশা নেই। তেরা রাম নাম সত্য হো গয়া ভাই।"

দীপের খাবার এসে গেছিল। দীপ কাঁটা চামচ দিয়ে চাউ ম্যানেজ করতে করতে বলল, "সেটা ঠিকই বলেছিস। রাত দেড়টা অবধি আমি স্কুল কলেজ লাইফেও জেগে থাকতাম না। ফোন রাখার পর দেখলাম ঘুমও আসছে না। শেষতক ঘুম আসতে আসতে তিনতে বেজে গেল।"

রাম মৃদু স্বরে বলল, "তিনটে না, তোর বারোটা বেজে গেছে। মেয়ে কী করে?"

দীপ বলল, "আগে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করত না, এখন করে।"

রাম বলল, "আহ, সেটা বলছি না। কী করে মানে, জব করে?"

দীপ বলল, "না, স্টিল স্টাডিয়িং।"

রাম বলল, "ভালোই তো। প্রবলেম কোথায়?"

দীপ বলল, "কোনও প্রবলেম নেই। শুধু রাত দুটো অবধি রোজ কথা বলতে হলে কী হবে সেটা নিয়ে আমি একটু চিন্তিত।"

রাম বলল, "অতক্ষণ কী কথা বললি?"

দীপ চাউ চিবোতে চিবোতে বলল, "তাকে আমি কী দেখে পছন্দ করলাম।"

রাম বলল, "এ কি আমাদের কোম্পানির এইচ আর নাকি বে? এই কোম্পানিতে কেন জয়েন করতে চাও জিজ্ঞেস করে! তুই কী বললি?"

দীপ বলল, "ভাট বকে গেলাম। আর কী বলার আছে? অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস বুঝলাম। সব রিলেশনশিপেই পাবলিক খুব ইনসিকিউরিটিতে ভোগে। সেজন্যই ফোনে সব সময় অন্যজনকে ধরে রাখতে চায়। ভাবে এই বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল।"

রাম বলল, "এর মধ্যে ইনসিকিউরিটিও চলে এল? তোর সঙ্গে তো ফ্রাইডে মাল খেলাম। এই দুদিনে স্টোরি এতটা এগিয়ে গেল বলছিস?"

দীপ হাসল, "আমিও তো তাই দেখছি। বেসিক্যালি আই অ্যাম স্টিল কনফিউজড। প্রেমটা অ্যাসেট না লায়াবিলিটি! শুরুতে সব কিছু খুব ইন্টেলেকচুয়াল মেটিরিয়াল মনে হয়, ব্যাপারটা একটু এগোলেই বোঝা যায়, ছোটো ছোটো ন্যাকামিগুলো জুড়তে জুড়তে ব্যাপারটা আসলে একটা বড়োসড়ো ক্যাচাল ছাড়া আর কিছুই না।"

রাম মুখ বাঁকাল, "তোর কাছে লায়াবিলিটিই হবে। এখন থেকেই যা বিরক্তি দেখাচ্ছিস, বোঝাই যাচ্ছে এ জিনিসের বেশিদিন ভ্যালিডিটি নেই।"

দীপ বলল, "আই অ্যাম কনফিউজড। রিয়েলি। এসব আসলে বোঝা। তুই চিন্তা না করতে চাইলেও এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে, লটস অফ ইমোশনস আর ইনভলভড। সব মিলিয়ে..."

রাম বলল, "সব মিলিয়ে?"

দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় সমীর স্যার ক্যান্টিনে ঢুকে দীপকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, "আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম। কাল ভুবনেশ্বর যেতে হবে গাঙ্গুলি। এস টি ইনফোটেকে। একটা আর্জেন্ট কল আছে। কোনও প্রবলেম আছে নাকি? যেতে পারবে তো?"

দীপ বলল, "ওকে স্যার। চলে যাব।"

সমীর বললেন, "কাল ভোরের ফ্লাইটের টিকিট কাটতে বলে দিচ্ছি তবে। সন্ধেয় যাতে ফিরে আসতে পারো দেখছি। নইলে পরশু চলে আসবে।"

দীপ বলল, "ওকে স্যার।"

সমীর যেতে রাম বলল, "শালা! এর মধ্যে ট্যুর দিয়ে দিল!"

দীপ বলল, "ভালোই তো। সব সময় কলকাতা পোষায় তোর?"

রাম বলল, "দেখ কী করবি! তোর লায়াবিলিটিকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিস তো যাবি নাকি।"

দীপ কাঁধ ঝাঁকাল "অফিসের ব্যাপারে কেন জিজ্ঞেস করতে যাব।"

রাম বলল, "ওরম মনে হয়। দুদিন পরে সব ব্যাপারেই এক্সপ্ল্যানেশন চাইবে। তখন বুঝবি।"

দীপ বলল, "বাল। অত কে বলতে যাবে।"

দীপের ফোন বাজছিল।

রাম বলল, "সে?"

দীপ দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। তার চাউটা পোষাচ্ছিল না। খানিকটা বাকি ছিল তখনও। উঠে বেসিনে মুখ ধুয়ে এসে চিত্রলেখাকে কল ব্যাক করল। রিংও হতে পারল না, তার আগেই চিত্রলেখা ধরে বলল, "লাঞ্চ হল?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ।"

রাম হতাশ মুখ করে উঠে খাবার অর্ডার করতে গেল।

চিত্রলেখা বলল, "কী খেলে?"

দীপ বলল, "টেস্টলেস চাউ।"

চিত্রলেখা বলল, "তুমি বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাও না?"

দীপ বলল, "নাহ। দুপুরে অফিসের ভরসাতেই চলে যায়।"

চিত্রলেখা বলল, "আমি ডিস্টার্ব করছি না তো?"

দীপ বলল, "না না ঠিক আছে।"

চিত্রলেখা বলল, "বলছিলাম আজ সন্ধের মিটটা কাল করা যেতে পারে? আজ একটা প্রবলেম হচ্ছে।"

দীপ বলল, "কাল আমি কলকাতায় থাকছি না।"

চিত্রলেখা অবাক গলায় বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

দীপ বলল, "ভুবনেশ্বর। অফিসের কাজে।"

চিত্রলেখা বলল, "ওহ। তাহলে ঠিক আছে। এসে দেখা হবে তবে।"

ফোনটা কেটে গেল।

দীপ অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রাম এসে বসেছে তার সামনে। বলল, "কী রে? কী হল?"

দীপ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ফুল মারা গেল।"
রাম বলল, "কার?"
দীপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার। আর কার?"

১০

মানালি অফিসে ঢুকে ডেস্কে বসেই পেপারওয়েট চাপা চিরকুটটা দেখতে পেল।
"চেম্বারে আয় আগে।"
বিশ্বরূপদার হাতের লেখা।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বিশ্বরূপদার চেম্বারে নক করল।
"আসব?"
"আয়।" বিশ্বরূপদা গম্ভীর হয়ে কিছু একটা লেখালেখি করছিল।
মানালি বলল, "কী ব্যাপার? জরুরি তলব?"
বিশ্বরূপদা চশমার ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকাল, "তুই কি গাম্ভু?"
মানালি আকাশ থেকে পড়ল, "কেন? কী হল? সকাল সকাল গালাগাল করছ কেন?"
বিশ্বরূপদা বলল, "পুজো করব?"
মানালি বলল, "কী হয়েছে সেটা তো বলো!"
বিশ্বরূপদা বলল, "তোকে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করতে বললাম আর তুই ধ্রুব বাগচীকেই ডাইরেক্ট জিজ্ঞেস করে বসলি ওঁর বউয়ের ব্যাপারে?"
মানালির মনে পড়ল। সে বলল, "আমি ভুলেই গেছিলাম। কাল রাতে ধ্রুব বাগচীকে ফোন করে ফেলেছিলাম ওঁর সিনেমা দুটো দেখে। মনে হল জিজ্ঞেস করে ফেলি, কিছু বলে নাকি! তোমায় কখন বলল?"
বিশ্বরূপদা বলল, "কাল রাতেই।"
মানালি বলল, "ওহ।"
বিশ্বরূপদা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ভেবেছিলাম তোর হেড অফিসে কিছু গ্রে ম্যাটারস আছে। দেখছি ব্যাপারটা ফুল ব্ল্যাক হোল।"
মানালি বলল, "এই শোনো, তোমার এভাবে রিঅ্যাক্ট করার কিচ্ছু হয়নি। তুমি আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছ। আমার মনে হয়েছিল ধ্রুব বাগচীকেই জিজ্ঞেস করে যদি কোনও শর্টকাট ওয়ে পাওয়া যায়, সিম্পল!"
বিশ্বরূপদা বলল, "ঝাড় তো খেয়ে গেলি, এবারে কী করবি?"
মানালি ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, "আবার অ্যাপ্রোচ করা যায়।"
বিশ্বরূপদা বলল, "বোঝা যাচ্ছে চাকরিটা তোর না করলেও হয়, তাই না?"
মানালি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "আমার কথা শুনে কি তোমার তাই মনে হচ্ছে?"
বিশ্বরূপদা বলল, "তোকে আর কত শেখাতে হবে বল তো মানালি? তোকে আমি একটা ক্লু দিলাম। তুই সেই ক্লুটা নিয়ে একটু ভাবলি না, তোর একবারও মনে হল না ধ্রুবর যেসব বন্ধু বা কাছের মানুষ আছে, তাদের মধ্যে সেফ কাউকে টার্গেট করে কিছু জানার চেষ্টা করার কথা, তুই শুরুতেই ওকে ফোন করে দিলি, মানে হচ্ছেটা কী? এভাবে করবি তুই তোর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং?"
মানালি বুঝল বিশ্বরূপদা ভীষণ রেগে আছে। বলল, "ঠিক আছে আমি দেখছি কী করতে পারি। দয়া করে এত রেগো না। এমনিতেই বাড়িতে একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্যে থাকতে হয়, এরপরে যদি অফিসে তুমিও এত রেগে রেগে থাকো, তাহলে আমায় সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে।"
বিশ্বরূপদা কয়েক সেকেন্ড গজগজ করে বলল, "ধ্রুবকে ফোন করে সরি বলে দে।"

মানালি অবাক হল, “কেন?”

বিশ্বরূপদা বলল, “কেন বোঝো না? ছাত্রবন্ধু দিতে হবে? নাকি ডিকশনারি! মানে বুঝতে কোনটা চাই তোর?”

মানালি বলল, “ওকে ওকে। আবার রেগে যাচ্ছ। ঠিক আছে, আমি ডেস্কে গিয়ে এখনই ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।”

বিশ্বরূপদা বিরক্ত মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “নাও লিভ।”

মানালি বিশ্বরূপদাকে আর ঘাঁটাল না। চুপচাপ নিজের ডেস্কে এসে বসে হাঁফ ছাড়ল।

বিতস্তা এসেছে। তাকে দেখে বলল, “কী হল, সকাল সকাল অ্যাসাইনমেন্ট পেলি নাকি?”

মানালি বিতস্তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “একটা ফোন করে নি দাঁড়া।”

ডেস্কের ফোন থেকে সে ধ্রুব বাগচীর মোবাইলে ফোন করল। দুবার পুরো রিং হয়ে গেল। কেউ ফোন তুলল না।

বিতস্তা বলল, “কাকে ফোন করছিস?”

মানালি বলল, “আর কে! এক শনি জুটেছে মাথায়। লাইফ হেল হয়ে গেল।”

বিতস্তা অবাক গলায় বলল, “ধ্রুব বাগচী! আবার? কেন!”

মানালি বলল, “আর কেন! দাঁড়া লাস্ট ট্রাই করে নি।”

তৃতীয়বার রিং হবার পর ঘুমচোখে ধ্রুব ফোন ধরলেন, “হ্যালো, কে রে ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে?”

মানালি বলল, “স্যার আমি। সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে বলছি। আপনাকে সরি বলার জন্য ফোন করেছি।”

ধ্রুব একটু চুপ করে গেলেন। সম্ভবত মনে করার চেষ্টা করলেন কী হয়েছে। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, “এই এক নতুন চুতিয়াপা শুরু হয়েছে। সরি বলে দিলেই যেন সাতখুন মাফ।”

মানালি বলল, “স্যার আমি সত্যি সরি।”

ধ্রুব বলল, “আপনি কেন সরি? এক্সপ্লেইন।”

মানালি দেখল বিতস্তা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সে একটু ভেবে বলল, “স্যার আপনাকে মাঝরাতে ফোন করে বিরক্ত করার জন্য।”

ধ্রুব বলল, “না। আপনাদের এটাই সমস্যা বুঝেছেন? ঠিক কোন জায়গাটায় অপরাধ করেছেন সেটাই বুঝতে পারেন না। আপনাদের মতো পাবলিকের জন্যই রিমেকের এত রমরমা বাজার। আসল ট্যালেন্টগুলো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।”

মানালি অবাক হয়ে বলল, “এর মধ্যে রিমেক এল কোত্থেকে স্যার? তা ছাড়া আমি বাংলা সিনেমা দেখিও না খুব বেশি।”

ধ্রুব ফুঁসে উঠলেন, “খুব গর্ব হয় বলুন? আমি বাংলা সিনেমা দেখি না বলতে?”

মানালি একটু আক্রমণাত্মক হল, “গর্বের কী আছে স্যার? একটা সিনেমায় দেখলাম তামিলনাড়ুতে যেরকম বাড়ি সে সিনেমার সেটটাও সেরকম হয়েছে। এরকম বাড়ি বাংলায় কোথায় আছে?”

ধ্রুব বললেন, “তবু তো লোকে টিকিট কেটে দেখতে যাচ্ছে? কেন?”

মানালি বলল, “কারণ মানুষকে সেটাই খাওয়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। একটা শ্রেণির লোক সেটাই খেতে চাইছে তাই।”

ধ্রুব বললেন, “কারণ এই ইন্ডাস্ট্রি দেউলিয়া ঘোষণা করে দিয়েছে নিজেদেরকে। যেভাবে কোনও কোম্পানি নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে, সেভাবেই ঘোষণা করে দিয়েছে। বাংলায় কথা বললে এখন ব্যাকডেটেড, বাংলা সিনেমা দেখা আউটডেটেড, বাংলা সিনেমার গল্প বলে তামিলের লোক, নাচ শেখায় অন্ধ্রের লোক, ক্যারাটে শেখায় মহারাষ্ট্রের লোক, বাঙালির নিজস্বতা বলেই কিছু নেই আর। যাক গে, ঘুম থেকে উঠে দাঁত না মেজে এসব ভাট বকতে ভালো লাগছে না। আসল কথায় আসি, শুনুন, প্রাইভেসি

শব্দটা মিডিয়া ডিকশনারিতে কোনও কালেই ছিল না। পারলে তারা ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন কোন ব্র্যান্ডের কন্ডোম ইউজ করে সেটাও ব্রেকিং নিউজ করিয়ে দেয়, কিন্তু বস, একটা কথা বুঝে নিন। আমার প্রাইভেট লাইফ সম্পর্কে আমাকে ঝাঁকিয়ে লাভ নেই। আমি এ সম্পর্কে একটা শব্দও বলব না।”

মানালি বলল, “ওকে স্যার, আমি আপনাকে আর ডিস্টার্ব করব না।”

ধ্রুব বাগচী ফোনটা কেটে দিলেন।

মানালি সশব্দে ফোনটা রেখে বিড়বিড় করে বলল, “অসভ্য আনকালচারড লোক একটা।”

বিতস্তা বলল, “ঠিক আছে সব?”

মানালি বলল, “হুঁ।”

ইন্টারকমের ফোনে বিশ্বরূপদাকে ফোন করল সে, বিশ্বরূপদা ধরতে বলল, “বলে দিয়েছি সরি।”

বিশ্বরূপদা কেজো গলায় বলল, “ওকে।”

মানালি বলল, “তবে কি এই অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে আপাতত আর না এগোলেও হবে?”

বিশ্বরূপদা বলল, “কোন অ্যাসাইনমেন্ট?”

মানালি বলল, “ধ্রুব বাগচীর বউ খোঁজার অ্যাসাইনমেন্ট! আর কী?”

“সাত দিনের মধ্যে স্টোরি করে ফেল। বেশি সময় নেই।”

বলেই ফোনটা কেটে দিল বিশ্বরূপদা।

বিতস্তা বলল, “মিটল?”

মানালি বলল, “এত সহজে মেটে? চাকরি করা যাবে না মনে হচ্ছে আর! ফাউ লোকের চাট খাবার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে ফেলেছে। ওই তো সিনেমা, গোটা হলে দশটা লোক। তার মধ্যে হল স্টাফ থাকে পাঁচটা।”

বিতস্তা বলল, “অ্যাই! আমি কি একটু ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোটা জানতে পারি? সব কিছু কেমন হেঁয়ালি হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।”

মানালি সংক্ষেপে সবটা বলে বলল, “শ্রীপর্ণা ঘোষালের সঙ্গে ধ্রুব বাগচীর রিলেশন কেমন জানিস?”

বিতস্তা বলল, “আমি কী করে জানব বল তো?”

মানালি বলল, “আমি কী জানি তুই কী করে জানবি? আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সাতদিনে কীভাবে সব কিছু আমি সামলাব বুঝতে পারছি না।”

মানালির গলাটা না চাইতেও কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

বিতস্তা বলল, “সবই তো বুঝলাম, কিন্তু ধ্রুব বাগচীর এক্স কী এমন হাতি ঘোড়া যে বিশ্বরূপদা এমন ডেসপারেট হয়ে গেল স্টোরিটার জন্য?”

মানালি হাঁ করে বিতস্তার দিকে তাকিয়ে রইল।

এই কথাটা সেভাবে তার মাথায় আগে আসেনি কেন?

১১

সন্ধে সাতটা নাগাদ ভুবনেশ্বরের হোটেলের ঘরে ফিরল দীপ। ইচ্ছা করলে রাতের ফ্লাইটে কলকাতা ফেরা যেত, কিন্তু সে নিজেই থেকে গেল। অনেক রাত হয়ে যেত বাড়ি ফিরতে ফিরতে।

হোটেলের ঘরে এসে ফ্রেশ হয়ে টিভিটা চালিয়েছে, এমন সময় দেখল ফোনটা বাজছে। সে দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। ধরল, “হ্যাঁ বলো।”

“তোমার কি সারাদিনে একবারও আমার কথা মনে পড়ল না?” ওপাশের গলা থমথমে।

দীপ বলল, “প্রচুর বিজি ছিলাম তো। ক্লায়েন্ট মিট ছিল, দুপুরে ভালো করে খেতেও পারিনি।”

“ওহ্‌। আচ্ছা। এখন খেয়েছ?”

“হ্যাঁ, বিকেলে খেলাম।”
“ওঃ, তার মানে বিকেলে ফ্রি হয়েছিলে?”
“হ্যাঁ। ওই একটু ফাঁক পেলাম, ওই সময়টাতেই খেয়ে নিলাম আর কি।”
“আচ্ছা।”
“তোমার কী খবর?”
“আমার? আমার ঠিকঠাক। ভাবছিলাম ফেসবুক আবার ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেব।”
“সে কী কেন? কী হয়েছে?”
“তেমন কিছুই না। ভালো লাগছে না। আচ্ছা তুমি আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে খুশি তো?”
দীপ কপালে হাত দিল। সেই একই প্রশ্ন। সে বলল, “অবশ্যই খুশি। কেন খুশি হব না বলতে পারো?”
চিত্রলেখা বলল, “না, আসলে একটা মেয়ে একটা ছেলের থেকে নিরাপত্তা চায়। আমার আজকাল মনে হয় তুমি বোধহয় একটু পজেসিভ হলে, আমাকে একটু সন্দেহ করলে আমি বেশি খুশি হতাম। আমার মনে হয় সব সময় তুমি আমাকে ছেড়ে ছেড়ে রাখছ, উপেক্ষা করছ।”
দীপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “একটা পরিণত সম্পর্কে ছেড়ে রাখাটাই স্বাভাবিক নয় কি? তোমার তো নিজেরও একটা স্পেস দরকার আছে, তাই না? দ্যাখো, আমরা কেউ তো আর ছোটোবেলার মতো প্রেম করি না, আমাদের একটা লাইফ আছে, দুজনে নিজের নিজের লাইফটা ঠিকভাবে কাটাতে পারলেই বোধহয় বেশি খুশি হতাম। আমাদের শুরুটাও তো এরকম ভেবেই হয়েছিল। তুমি বিরক্ত ছিলে তোমার এক্সের ওপর, যে অত্যধিক পজেসিভ ছিল, তো এখন হঠাৎ কী হল তোমার?”
চিত্রলেখা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, “আমি আজকাল খুব ইনসিকিউরিটিতে ভুগছি।”
দীপ একটু রাগল, “কীভাবে তোমাকে সিকিউরিটি দিতে পারি? ফিজিক্যাল রিলেশন চাও?”
চিত্রলেখা বলল, “ধ্যাত। ওভাবে সিকিউরিটি আসে নাকি?”
দীপ বলল, “কীভাবে আসে? সারাক্ষণ কানে ফোন গুঁজে রাখলে আসে?”
চিত্রলেখা বলল, “জানি না। আমার মনে হয় আমাদের ফ্রিকোয়েন্টলি মিট করা দরকার। এভাবে দূরে দূরে থাকলেই আমার নিরাপত্তাহীনতাটা তৈরি হয়।”
দীপ বলল, “বেশ তো, আমি কলকাতা গিয়েই তোমাকে মিট করব, তাহলে খুশি তো?”
চিত্রলেখা বলল, “কোথায় মিট করব?”
দীপ বলল, “তুমিই বলো।”
চিত্রলেখা বলল, “সেই তো রেস্তোরাঁতেই করতে হবে। আর কোথায় মিট করবে?”
দীপ বলল, “তবে কোথায় করতে চাও, তুমিই বলো?”
চিত্রলেখা বলল, “জানি না। তুমি বোলো কোথায় কীভাবে দেখা করতে হবে, আমি চলে যাব।”
দীপ বলল, “ভেবে বলি?”
চিত্রলেখা বলল, “আচ্ছা।”
দীপ ফোন রেখে অন্যমনস্ক ভাবে খানিকক্ষণ টিভি দেখল। হোটেলটা বেশ ভালো। সংলগ্ন বারও আছে। সে রুম সার্ভিসে ফোন করে একটা হুইস্কি আনিয়ে নিল। একা একা বসে থাকলে ইদানীং তার মদ খেতে ইচ্ছা করে। সোডা মিশিয়ে এক চুমুক সবে দিয়েছে, এই সময়ে আবার সশব্দে ফোনটা বেজে উঠল। দীপ দেখল চিত্রলেখা আবার ফোন করছে, কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা ধরল, “বলো।”
“তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। যতক্ষণ না বলছি, আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে।” চিত্রলেখা যেন খানিকটা হাঁফাচ্ছিল।
দীপ অবাক গলায় বলল, “কী কথা? খুব জরুরি কিছু?”

চিত্রলেখা বলল, "আমার মনের মধ্যে বারবার এই কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু বলব বলব করেও বলা হয়ে উঠছে না।"

দীপ বলল, "বলো।"

চিত্রলেখা একটু থেমে বলল, "আমার যে এক্স ছিল, একটা সময় খুব খেপে উঠেছিল।"

দীপ বলল, "কী নিয়ে?"

চিত্রলেখা বলল, "ফিজিক্যাল রিলেশন নিয়ে।"

দীপ বাধা দিল, "এই ব্যাপারটা নিয়ে বোধহয় ডিসকাস না করলেই ভালো হয়। ইনফ্যাক্ট এসব আমাকে না বললেও চলবে।"

"না, প্লিজ শোনো। বলতে দাও। আসলে আমাদের মধ্যে একটা সময় এমন হয়ে গেছিল, কথা হলেই শুধু আমাকে কৈফিয়ত দিয়ে যেতে হত। এখানে গেছি কেন, এর সঙ্গে কথা বলেছি কেন, কেন বাজারে একা একা গেছি... মানে আমি পাগল হয়ে যেতাম।"

দীপ বলল, "হ্যাঁ, এই কথাটা তো তুমি আমাকে বলেছ।"

চিত্রলেখা বলল, "বলেছি। আরও কিছু বলিনি।"

দীপ বলল, "সেগুলো এখনই ফোনে বলতে হবে?"

চিত্রলেখা বলল, "হ্যাঁ, ফোনেই বলতে হবে। শুনে যাও শুধু। ওকে এই কৈফিয়ত দিয়ে যাচ্ছি, রোজ রোজ কিছু না কিছু নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়ে যায়, ঠিক এমন পরিস্থিতিতে একদিন আমাকে বলে বসল ওর কোন বন্ধুর ফ্ল্যাট ফাঁকা, আমাকে নিয়ে যেতে চায়।"

দীপ উত্তর দিল না। চিত্রলেখা বলল, "হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ, বলো।"

চিত্রলেখা বলল, "ওর ধারণা হয়েছিল ফিজিক্যাল রিলেশন একবার হয়ে গেলে আমি ওকে আর ছাড়তে পারব না। আমি কিছুতেই রাজি হইনি ওর প্রস্তাবে, যার ফলে ও আমার উপর ভীষণ রেগে গেল। যত রকম অসভ্যতা সম্ভব হয়, সব করতে লাগল।"

দীপ বলল, "এটুকুই বলতে?"

চিত্রলেখা বলল, "হ্যাঁ। তোমার মনে হতেই পারে আদৌ আমি ভার্জিন কি না, সেটা আমি তোমায় ক্লিয়ার করে দিলাম।"

দীপ বলল, "দ্যাখো, আমি তোমাকে বারবার বলেছি তোমার পাস্ট নিয়ে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তবু তুমি অনেক কিছু আমায় বলে যাচ্ছ। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা ভয় পাচ্ছ, ঠিক কী ব্যাপারে সেটা পাচ্ছ আমাকে কি একটু খোলসা করে বলা যায়?"

চিত্রলেখা একটু ইতস্তত করে বলল, "ছেলেটা একটু একরোখা। ভাংচি দেওয়া স্বভাব আছে। কিছুদিন আগে আমার একটা সম্বন্ধ এসেছিল, কোত্থেকে জেনেশুনে ওদের বাড়িতে ফোন করে আমার নামে যা নয় তাই বলেছে। স্বাভাবিকভাবেই বিয়েটা ভেঙে যায়। আমার ভয় হচ্ছে তোমায় যদি আবার ফোন করে..."

দীপ বলল, "বেশ তো, তুমি আমাকে ছেলেটার ফোন নাম্বার দাও, আমি এখন থেকেই ছেলেটার নাম্বার ব্লক করে রেখে দিচ্ছি।"

চিত্রলেখা বলল, "ব্লক করে দেবে?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ, ও আমাকে ফোনে পাবেই না। ফোন একবার জাস্ট রিং হয়ে অটোমেটিক ডিসকানেক্ট হয়ে বিজি টোন শুনিয়ে দেবে। দাও নাম্বারটা।"

চিত্রলেখা বলল, "সেটা দিচ্ছি, কিন্তু যদি অন্য নাম্বার থেকে ফোন করে?"

দীপ বলল, "ফোন কেটে দেব। এত চিন্তা করার তো কিছু নেই।"

চিত্রলেখা বলল, "আমি ওর দুটো নাম্বারই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছি। তাহলে তাই করো।"

দীপ ফোনটা রাখল। একা একা বসে মদ খেতে লাগল।

চিত্রলেখা নাম্বার দুটো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে। দীপ কয়েক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে কোনও কিছু না ভেবেই একটা নাম্বারে ফোন করে দিল। কয়েকটা রিং হতেই ওপাশ থেকে একজন বলে উঠল, "হ্যালো।"

দীপ বলল, "কে বলছেন?"

"আপনিই তো ফোন করলেন? জানেন না কে বলছি?"

দীপ বলল, "আপনি চিত্রলেখার এক্স?"

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধতা। তারপর খানিকটা সতর্ক গলা, "আপনি কে?"

দীপ বলল, "আমি ওর বন্ধু।"

"বন্ধু? ওর ছেলে বন্ধু কোনও কালেই ছিল না। ইদানীং উন্নতি হয়েছে দেখছি।"

দীপ বলল, "তা হয়েছে। কয়েক দিন পরে তো চিত্রলেখার বিয়ে। জানেন তো?"

"বিয়ে? ওহ, ওর আবার বিয়ে হয়েছে? তা যা হবার হোক, আমার যা করার আমি তো করে নিয়েছি।"

"কী করেছেন?" দীপের মাথায় একটু একটু করে আগুন জ্বলছিল।

"যা করে। একটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে একসঙ্গে একটা ফ্ল্যাটে থাকলে যা করে। আপনি তো ওর বন্ধু, আপনাকে বলেনি কিছু ওকে কতটা আনন্দ দিয়েছি?"

দীপ আর নিতে পারল না। ফোনটা কেটে দিল।

১২

টালিগঞ্জ মেট্রোতে নেমে মানালির খেয়াল হল লাঞ্চ করা হয়নি। রাস্তা পেরিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে রুটি পনির খাচ্ছিল। ঋপণ মাটন দিয়ে পরোটা খেতে খেতে বলল, "কী করে পারিস তুই জানিস।"

মানালি বলল, "কী পারি?"

ঋপণ বলল, "এই যে মাটন চিকেন ছেড়ে পনির খাচ্ছিস। এককালে মুনি ঋষিরা যে লেভেলের কন্ট্রোল করতেন, তোর মধ্যে তার ছায়া দেখতে পাচ্ছি।"

মানালি খেতে খেতে বলল, "দয়া করে মনে করিয়ে দিস না। বহু কষ্টে কন্ট্রোল করছি।"

ঋপণ বলল, "শ্রীপর্ণা ঘোষালের ইন্টারভিউ আগে করেছিস?"

মানালি মাথা নাড়ল, "না। খুব মুডি ভদ্রমহিলা শুনেছি। হুটহাট বসের কাছে কমপ্লেইন করে দেন জার্নালিস্টদের নামে।"

ঋপণ বলল, "যৌবনোত্তীর্ণা নায়িকাদের সবার একই অবস্থা। এককালে লোকজন পাগলের মতো পিছনে দৌড়োত, এখন পাত্তাও দেয় না। কিছুদিন আগে একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় দেখা। কেউ চেনে না। নিজেই অকারণ চ্যাঁচামেচি করে লোক ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন। তাতেও কেউ দ্যাখে না। মুড অফ করে বেরিয়ে গেলেন। বুঝতেই পারছিস তুই ওঁর কাছে ধ্রুব বাগচীকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছিস, ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তোর খবর আছে।"

মানালি স্যালাডের প্লেট থেকে শসা নিয়ে মুখে দিয়ে বলল, "বুঝতে পারছি। এও বুঝতে পারছি এই চাকরিটা খুব শিগগিরি ভোগে যাবে। কিন্তু কী আর করা, চেষ্টাটা করে যাই।"

ঋপণ বলল, "চাকরি গেলে কী করবি?"

মানালি বলল, "এন আর আই ধরব। আমেরিকায় গিয়ে গুলাবজামুন বানিয়ে তোকে ফেসবুকে ট্যাগ করে দেব। হবে না?"

ঋপণ হাসতে হাসতে বলল, "তুই পারবি না। আমি শিওর তুই পারবি না।"

মানালি বলল, "আমিও শিওর আমি পারব না। কিন্তু ভালো ইংরেজি বলতে পারি, স্মার্ট, আমার মার ওপর আমার পূর্ণ ভরসা আছে। নিশ্চয়ই একটা এন আর আই ধরতে পারবে।"

ঋপণ বলল, "এন আর আই নিয়ে পড়লি কেন হঠাৎ?"
মানালি বলল, "শুধু এন আর আই কেন? বিয়েতেই আমার আপত্তি আছে। আমি কি কোনও বোঝা নাকি বল তো? কোনও ভাবে পার করে দিতে পারলেই হল? কেন, আমি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াই সিঙ্গল থেকে, সমস্যাটা কোথায়?"
ঋপণ চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, "ওরে বাবা, আবার সেই সব কঠিন কঠিন ব্যাপার। আমি ভাই গরিব ফটোগ্রাফার, আমার এসব বুঝে কাজ নেই।"
মানালির খাওয়া হয়ে গেছিল। উঠে মুখ ধুয়ে ঋপণকে বলল, "খেয়ে চলে আয়। আমি বাইরে ওয়েট করছি।"
ঋপণ বলল, "আমারও হয়ে এসেছে। আসছি আসছি। যাবি কীসে স্টুডিও?"
মানালি হাসল, "হাঁটব। অনেকদিন হাঁটা হয় না।"
ঋপণ বলল, "অনেকটা কিন্তু। পরে পালটি খেলে চলবে না।"
মানালি বলল, "অনেকটা আমি জানি তো। নো চাপ।"
দুজনে যখন স্টুডিও পৌঁছোল, তখন তিনটে বাজে। মানালির আগে থেকে ফোন করা ছিল। মেকআপ রুম থেকে বেরিয়ে শ্রীপর্ণা খানিকটা আলাদা হয়ে তাদের নিয়ে বসলেন বাইরেই।
মানালি ভালো করে শ্রীপর্ণাকে দেখছিল। ধ্রুবর বয়সিই হবেন। তবে বয়সের ছাপ যেন আরও বেশি পড়ে গেছে ভদ্রমহিলার ওপরে। ইদানীং সিরিয়ালে মা মাসি পিসির রোল করেন।
শ্রীপর্ণা বললেন, "আমাকে ফোন করতে পারতে সকালে। বাড়িতেই দিব্যি হয়ে যেত।"
মানালি ভেবেই এসেছিল কী বলবে। সে অসহায়ের মতো মুখ করে বলল, "একটু আর্জেন্ট ব্যাপার ছিল ম্যাম। আমাদের শনিবারের সিনেমার পেজটার অ্যাসাইনমেন্টটা জাস্ট সকালেই ঠিক হয়েছে। কয়েকটা ব্যাপার একটু ক্ল্যাশ করে গেল।"
শ্রীপর্ণা বললেন, "ওহ, ঠিক আছে। শুরু করতে পারো। তুমি কি ফটো তুলবে?"
ঋপণের দিকে তাকালেন শ্রীপর্ণা।
মানালি বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম, ইন্টারভিউয়ের পরে। মানে আপনি যদি পারমিশন দেন।"
শ্রীপর্ণা খুশি হয়ে বললেন, "নো প্রবলেম। আচ্ছা, ইউ মে স্টার্ট ইওর ইন্টারভিউ।"
মানালি নোটপ্যাড খুলল। সে শুরুটা সাধারণ প্রশ্ন দিয়েই করল, "ম্যাম, আপনি শুনলাম ছোটো পর্দাকেই ঘর বানিয়ে ফেলছেন। বড়ো পর্দার ওপর কি ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলছেন?" মানালি খুব ভালো করেই জানত ব্যাপারটা আসলে উলটো।
শ্রীপর্ণা প্রশ্নটা লুফে নিয়ে বললেন, "একেবারেই তাই। এখন ছোটো পর্দা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং।"
মানালি মনে মনে বলল, কোথায় চ্যালেঞ্জিং! এখানে মা মাসির রোল করছিলেন, সিনেমাতেও তো তাই করতেন! সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আপনার লাস্ট বড়ো পর্দায় অভিনয় ধ্রুব বাগচীর ডার্ক লাভ। ক্রিটিক থেকে দর্শক, সিনেমাটা খুব একটা কেউই ঠিকঠাক নিতে পারেননি। আপনার কি মনে হয় সিনেমাটা করা আপনার একটা ভুল ছিল?"
শ্রীপর্ণা একজন স্পটবয়কে ডেকে জলের বোতল আনালেন। এক ঢোক জল খেয়ে বললেন, "দ্যাখো, ধ্রুবর সিনেমাটা কিন্তু বেশ কয়েকটা ফেস্টিভ্যালে বেশ ভালো রেসপন্স পেয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা ভুল যে সিনেমাটা করা ভুল ছিল। ধ্রুবর সঙ্গে সিনেমা করলে বেশ কিছু নতুন নতুন জিনিস শেখা যায়।"
মানালি সন্তর্পণে বাতাসে ভাসিয়ে দিল পরবর্তী প্রশ্ন, "ম্যাম, একটা গুজব প্রায়ই ভাসে, আপনার সঙ্গে ধ্রুব..."
শ্রীপর্ণা রাগলেন না, বললেন, "আমি প্রিপেয়ারড ছিলাম এই বাউন্সারটার জন্য। কিন্তু আমি এটাকে ডাক করাটাই প্রেফার করব। নো পার্সোনাল কোয়েশ্চেন প্লিজ।"

মানালি বুঝতে পারছিল সে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বলল, “শিওর ম্যাম। বুঝতেই পারেন কৌতূহল আটকে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার।”

শ্রীপর্ণা বললেন, “তোমাদের সাংবাদিকদের সঙ্গে ইয়ং ছেলেমেয়েদের মিল হল, তোমরা একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বললে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারো না আদতে তারা বন্ধু হলেও হতে পারো। একেবারে গুজবটাকে বেডরুম পর্যন্ত না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা শান্তি পাও না। শোনো মেয়ে, ধ্রুব আর আমাদের ফ্যামিলি অনেক দিন ধরে ক্লোজ ফ্রেন্ড। আমরা একে অপরের ফেলিওরে পরস্পরকে সান্ত্বনা দি। সাকসেস সেলিব্রেট করি। আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ির কমপ্লেক্সে ধ্রুবও একটা ফ্ল্যাট কিনবে ঠিক করেছিল। পরে পিছিয়ে আসে। ধ্রুবর ধারণা ছিল ডার্ক লাভ হিট করে যাবে। সিনেমাটা যে বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়বে, সেটা ধ্রুব কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ওই সময়টা ও ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। দিন রাত ড্রিংক করে দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। আমি ওকে সাপোর্ট দিয়েছি। এতে তোমরা যদি কিছু খুঁজে পাও তো ভালোই, আমার আর কিছু বলার নেই।”

মানালি এবার তার আসল প্রশ্নটা করে ফেলল, “ধ্রুববাবুর স্ত্রী সে সময়টা ওঁর পাশে ছিলেন না?”

শ্রীপর্ণা কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, “ধ্রুবর স্ত্রীর ব্যাপারে তুমি কী করে জানলে?”

মানালি সত্যিটা বলে দিল, “আমার মনে হয় অনেকেই জানেন ম্যাম, ইনফ্যাক্ট ওঁর ব্যাপারে আমার বসই বলেছেন।”

শ্রীপর্ণা মাথা নাড়লেন, “আমার মনে হয় না আমার ইন্টারভিউর সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক আছে। তোমার আর কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো।”

মানালি মরিয়া হল, “সম্পর্ক আছে ম্যাম, মার্কেটে অনেক গসিপ রটেছিল আপনাদের ব্যাপারে। আপনি বলতেই পারেন ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু আপনার ফ্যামিলিতেও কি কোনও দিন ধ্রুবকে নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি?”

শ্রীপর্ণা তীক্ষ্ণ চোখে মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, “একটা ইন্টারভিউ এত পার্সোনাল জায়গায় যাচ্ছে কেন? সময়ের কণ্ঠস্বরের কি এত খারাপ অবস্থা যে শেষতক লোকের কেচ্ছা খুঁড়ে বের করতে হচ্ছে?”

মানালি দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, “এক্সট্রিমলি সরি ম্যাম। স্বাভাবিক কৌতূহল এগুলো বুঝতেই পারছেন।”

শ্রীপর্ণা বললেন, “শোনো মেয়ে, খুব ভালোভাবে শুনে নাও। আমার ফ্যামিলি আছে, আমার হাজব্যান্ড আছেন, আমার একটা ক্লাস থ্রিতে পড়া মেয়ে আছে। আমি এঁদের ছাড়ার কথা কোনও দিনই ভাবতে পারব না। সুতরাং ধ্রুব বাগচী আর আমাকে নিয়ে যা যা গুজব শুনেছ তার গোটাটাই কল্পনার বালির বাঁধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা।”

মানালি অন্ধকারে ঢিল ছুড়ল, “অনেকের ধারণা যে ধ্রুব বাগচীর ডিভোর্সের জন্য আপনি অনেকাংশে দায়ী।”

শ্রীপর্ণা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “কার ধারণা? এক-এক করে নাম বলো।”

মানালি ঠোঁট কামড়ে বলল, “সেটা তো সিক্রেট ম্যাম। আমি সোর্স ডিসক্লোজ করতে পারব না।”

শ্রীপর্ণা রাগি গলায় বললেন, “আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার কাজ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করতে এসেছেন। আপনার প্রশ্নগুলো খুব মিসলিডিং সেটা বুঝতে পারছেন তো? আশা করি আপনার নামে আপনার অফিসে আমি কোনও রকম কমপ্লেইন করি সেটা আপনি চাইবেন না।”

মানালি রেকর্ডার অফ করল, “একটা শেষ প্রশ্ন ম্যাম।”

শ্রীপর্ণা অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, “বলো।”

মানালি বলল, “ধ্রুব বাগচীর বউয়ের বর্তমান ফোন নম্বরটা দেওয়া যাবে?”

শ্রীপর্ণা উঠলেন, “এলাম। শট রেডি হয়ে গেছে।”

মানালি মাথা নিচু করে বসে থাকল। সে স্পষ্টতই বুঝতে পারল সন্ধেয় আবার ঝাড় খেতে চলেছে সে।

শ্রীপর্ণা অনেকটা চলে গেছিলেন।

হেঁটে ফিরে এসে আবার মানালির সামনের চেয়ারে বসে বললেন, "ধ্রুব বাগচী লোকটাকে রিড করা অত সহজ নয়। যত পাঁকই ঘেঁটে ফ্যালো, কিছুই বের করতে পারবে না।"

মানালি বলল, "ওঁর স্ত্রীর খোঁজ করা কি পাঁক ঘাটার সমান বলতে চাইছেন ম্যাম?"

শ্রীপর্ণা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ফোন নাম্বারটা নাও।"

১৩

টেক অফের সময় দীপ অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করে। প্রথমে কিছু হয় না। এয়ারহোস্টেসরা যখন বোঝায় আপতকালীন সময়ে কী করতে হবে, সেই সময়ে ধীরে ধীরে তার ভয় হতে শুরু করে।

দীপ জানলার ধারে বসেছে। মাঝে বছর পঞ্চাশের এক বাঙালি ভদ্রলোক বসেছেন। ভদ্রলোকের ভুঁড়িটা নজর কাড়ার মতো। অপর কোনায় ভদ্রলোকের স্ত্রী। দুজনের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে ওঁরা পুরী গেছিলেন পুজো দিতে। প্লেন রানওয়ে দিয়ে দৌড় শুরু করতে না করতেই দুজনে ফিসফিস করে "জয় জগন্নাথ" বলতে শুরু করলেন। প্লেনটা যখন আকাশ অভিমুখে যাত্রা শুরু করল, দীপ কয়েক সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করল। তার হঠাৎ মনে হল, আজ মরে গেলে কি খুব কষ্ট হবে কারও? পরমুহূর্তে বাবা-মার মুখটা মনে পড়ে গেল। খানিকটা দুর্বল হল সে। মরে যাবার জন্য বয়সটা খুব অল্প এখনও। আরও কয়েকটা বছর বাঁচলে খারাপ হত না। টেক অফ ঠিকঠাক হবার পরে প্লেনে এয়ারহোস্টেসরা ফেরিওয়ালাগিরি শুরু করে দিল। পাশের ভদ্রলোক বললেন, "সকালে ভালো করে কিছু খাওয়া হল না, একখান স্যান্ডউইচ খাই? কী বলো?"

ভদ্রমহিলা চাপা গলায় বললেন, "পনেরোটা কচুরি খেয়েছ। ওটা যদি খাওয়া না হয় তবে কোনটা খাওয়া?"

ভদ্রলোক নিচু স্বরে প্রতিবাদ করলেন, "প্লেন মাঝ আকাশে থাকলে সব হজম হয়ে যায়, জানো না?"

ভদ্রমহিলা কটমট করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধাইকিড়িকিড়ি, আরও কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "তোমাকে না বলেছি অকারণে ধাইকিড়িকিড়ি বলবে না! আজব লোক একটা, যে জায়গায় যাবে, সেখানকার কিছু না কিছু একটা মুদ্রাদোষে পরিণত না করলে শান্তি নেই।"

ভদ্রলোক সুবিধে করতে না পেরে তার দিকে তাকালেন, "আপনি বাঙালি?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক বললেন, "কলকাতায় বাড়ি?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক বললেন, "গুড। বিয়ে করেছেন?"

দীপ বলল, "না।"

ভদ্রলোক বললেন, "ভেরি গুড। এক্কেবারে করবেন না। ভয়ংকর ব্যাপার। আপনি কি পুরী গেছিলেন?"

দীপ বলল, "না, ভুবনেশ্বর, অফিসের কাজে।"

ভদ্রলোক বললেন, "ওহ। তা ঠিক। একা একা পুরী গিয়ে করবেনই বা কী?"

দীপ কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "সেই।"

ভদ্রলোক বললেন, "পুরীতে খুব খিদে পায়। আমার সমুদ্রের হাওয়া লাগলেই খিদে পায়।"

দীপ বলল, "ও।"

ভদ্রলোক বললেন, "তবে বাড়ির খাবার ব্যাপারই আলাদা। এই যে নেমে বাড়ি গিয়ে..."

দীপ পরিষ্কার দেখতে পেল ভদ্রলোকের পায়ে ভদ্রমহিলা একটা চিমটি কাটলেন। ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার বাড়ি কোথায়?"

দীপ বলল। ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, "ওহ, সাউথ! আমরাও তো ওদিকেই থাকি।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না ভাই, ও খুব খেতে পছন্দ করে।"

দীপ বলল, "তা আমিও।"

ভদ্রলোক খুশি হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সবাই তো আর তোমার মতো পেটরুগি না। হুহ। খাবার কথা বললেই ওনার যত কথা!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "তা তো বলবই। মাঝরাতে উঠে যখন বলো, ওগো আমার শরীর খারাপ লাগছে, তখন তো আমাকেই সামাল দিতে হয়।"

দুজনের প্রেমালাপের শব্দ একটু বেড়ে গেছিল। দীপ দেখল আশেপাশের সিট থেকে সবাই কৌতুকচিত্তে তাদের সিটের দিকেই তাকিয়ে আছে।

ভদ্রলোক দমবার পাত্র নন, বললেন, "গ্যাস জিনিসটাই এমন। রিলিজ হয়ে গেলেই তো সব ঠিক হয়ে যায়। তুমি একটু বেশিই চিন্তা করো।"

ভদ্রমহিলা গজগজ করতে করতে চুপ করলেন। এয়ারহোস্টেসদের চলন্ত টেবিল তাদের সিটের কাছে চলে এসেছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, "নাও, যা পারো খাও।"

ভদ্রলোক প্রবল উৎসাহে তিনটে স্যান্ডউইচ অর্ডার করলেন। দীপকে একটা এগিয়ে দিলেন। দীপ আঁতকে উঠে বলল, "না না, আমি খাব না।"

ভদ্রলোক খেতে শুরু করে দিয়েছিলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, "ওরম বলে না। খেয়ে নিন ভাই, না খেলে জগন্নাথ পাপ দেবে।"

অগত্যা দীপ স্যান্ডউইচে কামড় দিল। তার মজা লাগছিল। এ ধরনের পাবলিক ট্রেনে প্রচুর দেখা যায়। প্লেনে উঠলে লোকে অনেক ধরনের কায়দা করার চেষ্টা করে। ভদ্রলোকের সেসব বালাই নেই।

ভদ্রলোক খেতে খেতে বললেন, "ফেলু মোদকের মোহিনী খেয়েছ ভাই? আমি তুমি বলছি। বেশিক্ষণ আপনি বললে আমার অ্যাসিডিটি হয়। তা ছাড়া তুমি আমার থেকে অনেক ছোটোও বটে।"

দীপ মাথা নাড়ল, "একেবারেই কোনও সমস্যা নেই। মোহিনীটা কী বস্তু?"

ভদ্রলোক বললেন, "দেবভোগ্য জিনিস। স্বয়ং স্বর্গের দেবদেবীরা খান। এখন খানিকটা আমাদের জন্য প্রসাদ পাঠাচ্ছেন। কুড়ি টাকা দাম। এই ছোট্ট মিষ্টি। ঠিক হাফটুকু নিয়ে মুখে পুরবে। দেখবে গোটা মুখে নতুন গুড় ফুল ফোটাচ্ছে। বুঝছ কী বলছি?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ। মিষ্টি তার মানে?"

ভদ্রলোক বললেন, "শুধু মিষ্টি না। এ অন্য লেভেলের জিনিস। বাড়ি গিয়েই বেরোতে হবে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "কোথাও বেরোবে না, আগে ব্লাড সুগার টেস্ট করাবে কাল, কতটা নেমেছে দেখব, তারপরে দেখা যাবে।"

ভদ্রলোক মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, "ওই শুরু হল খাদ্যপুলিশের উৎপাত। এদের জ্বালায় যদি কিছু শান্তিমতো করা যায়। এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এটা খেয়ো না, ওটা খেয়ো না, মহা জ্বালা হয়েছে।"

দীপ ঘড়ির দিকে তাকাল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতা পৌঁছে যাবে। এয়ারপোর্ট থেকে নেমে একটা ক্যাব নিয়ে অফিস রওনা দিতে হবে। ভদ্রলোককে মন্দ লাগছিল না। বেশ মজাদার কথাবার্তা।

ভদ্রলোক বললেন, "তুমি কোন অফিসে চাকরি করো ভাই?"

দীপ তাদের কোম্পানির নাম বলল। ভদ্রলোক বললেন, "আইটি। ওরে বাবা। ভয়ানক ব্যাপার। ছেলেপিলে খাবে কখন, ঘুমাবে কখন? সারাক্ষণ কাজ কাজ আর কাজ।"

দীপ হাসল, "সবটা তাই না। আমরা খাওয়াদাওয়ার সময়টা পাই ঠিকই, তবে বাকিদের তুলনায় কম এই আর কি!"

ভদ্রলোক বললেন, "জানি জানি, আমার মেয়েও তো একই কেস। ছুটি পর্যন্ত পেল না জানো, একটু ঠাকুরের দর্শনটা হয়ে যেত। এই তো তোমাদের ওদিকেই ওর অফিস। এন কে জি টেকে আছে।"

দীপ বলল, "ওহ। হ্যাঁ, ছুটিছাটা হঠাৎ করে নেবার ক্ষেত্রে একটু চাপ তো থেকেই যায়।"

ভদ্রলোক বকবক করতে লাগলেন। দীপ চোখ বন্ধ করে বসল। গোটা রাস্তায় প্লেন খুব একটা এয়ারপকেটে পড়ে অসভ্যতা করেনি। ঠিকঠাকই ছিল জার্নিটা।

কিছুক্ষণ পরেই কলকাতা শহরটার আকাশে প্রবেশ করল তারা। ধীরে ধীরে ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সবাই। ভদ্রলোক কপালে হাত দিয়ে জয় জগন্নাথ বলে যাচ্ছিলেন। প্লেনের চাকা এয়ারপোর্টের মাটি স্পর্শ করার পর ভদ্রলোক কপালে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে বললেন, "আরও কিছুদিন ধরাধামে থাকব তাহলে। যাক!"

দীপ অনেকক্ষণ পরে হাসল। তারও ভালো লাগছিল। প্লেনের দরজা খুলতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সে ধীরে সুস্থে নামল। ফোন অফ ছিল, সেটাকে অন করল।

চিত্রলেখার একগাদা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ এসে জড়ো হয়েছে। সেসব দেখে তার হঠাৎই বিরক্তি শুরু হল।

সে লাগেজ নিতে লাগেজ বেল্টের কাছে পৌঁছে দেখল ভদ্রলোক হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে পৌঁছেছেন। তাকে দেখে বললেন, "আমাদের সঙ্গে চলো ভাই। ওদিকেই তো যাবে। গাড়ি আছে তো?"

দীপ মাথা নাড়ল, "আমাকে আসলে অফিসে যেতে হবে এখন। পরে নাহয় একদিন দেখা হবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "বেশ তো, যাবে সল্টলেক। আমার মেয়ে নিতে এসেছে আমাদের। ওকেও তো সল্টলেকেই ড্রপ করে দেব।"

দীপ আর কিছু বলল না। কিছু টাকা ক্যাব ফেয়ার বেচে গেলে মন্দ না। তার ব্যাগটা ফ্লোরে রাখল। ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করল ওঁদের ব্যাগগুলো ট্রলিতে রাখার জন্য। একজিট গেটে পৌঁছে দীপ শহরটা দেখে একটা জোরে শ্বাস নিল। এখনও ফিরতে ভালো লাগে তাহলে।

পরক্ষণেই যে মেয়েটা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দিকে দৌড়ে এল তাকে দেখে একটা হার্টবিট মিস করল সে। এই গোডাউনের এত হাইফাই প্রোডাক্ট আশাই করেনি যে!

১৪

বাসস্ট্যান্ডে নেমে টোটোয় উঠে কোয়ার্টারটা খুঁজতে খুব একটা সমস্যা হল না মানালির। ভোরবেলায় ব্ল্যাক ডায়মন্ড ধরে আসানসোলের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল তারা। আসানসোলে নেমে বাসে করে রূপনারায়ণপুর পৌঁছোল যখন, তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। রোদ থাকলেও মাঝে মাঝে এমন হাওয়া দিচ্ছে যে শরীর একেবারে শিরশির করে উঠছে। এক অদ্ভুত শুষ্ক শীতল হাওয়া বইছে।

রাস্তাঘাটের হাল খুব একটা ভালো না। মরে যাওয়া কারখানার আবাসনের একটা কোয়ার্টারে তারা পৌঁছোল বেলা বারোটা নাগাদ।

দরজা খুলে ঈপ্সিতা বললেন, "ভিতরে আসুন।"

ঋপণ জুতো পরেই ভিতরে চলে যাচ্ছিল, মানালি ঋপণের হাতে একটা চিমটি কাটল। ঋপণ জিভ কেটে জুতো খুলল।

নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘর। দেওয়ালে একটা সৌরভ আর দ্রাবিড়ের পোস্টার বেখাপ্পাভাবে আটকানো। দেখে বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন আগের। তারপরে দেওয়ালটার দিকে কারও বিশেষ নজর পড়েনি।

ঈপ্সিতা বললেন, "বসুন, আমাদের স্কুল নিয়ে স্টোরিটা করতে চেয়েছেন শুনে খুবই খুশি হয়েছি। দুঃখের বিষয় এখন ক্রিসমাসের ছুটি চলছে। নইলে আপনাকে স্কুল ঘুরে দেখাতে পারতাম।"

মানালি একটু ঢোক গিলল। শ্রীপর্ণার থেকেই শুনেছিল ঈপ্সিতা রূপনারায়ণপুরে এক স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। প্রথমে ভেবেছিল একবারে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবে। পরক্ষণে তার মনে পড়ে গেছিল বিশ্বরূপদার কথা। সত্যি কথা বলার পরে ভদ্রমহিলা যদি দেখা করতেই না চান তাহলে মহা সমস্যা হয়ে যাবে। আচমকাই তার মাথায় আসে তাদের কাগজের "স্কুল ক্যাম্পাস সরগরম" বিভাগের কথা। প্রথম দিকে সে এই বিভাগে কয়েকটা আর্টিকেলও লিখেছিল। আর বেশি ভাবেনি সে। ফোন করে প্রস্তাবটা দিতে ভদ্রমহিলা বেশ খুশিই হলেন। জানালেন তাদের স্কুল নিয়ে তাঁরা কয়েকজন শিক্ষিকা বেশ ভালোভাবেই লড়ে যাচ্ছেন। স্টোরিটা হলে বরং তাঁরা বেশ খুশিই হবেন।

মানালি বলল, "আপনাদের স্ট্রাগলের কথা বলুন ম্যাম, একটু শুনি।"

ঈপ্সিতা বললেন, "দেখুন, এই এলাকা মূলত গড়ে উঠেছিল কারখানার উপর ভিত্তি করে। একটা সময় এসে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। শুরু হল এলাকাভিত্তিক স্ট্রাগল, যে স্ট্রাগল ভয়াবহ। যাঁরা এই স্ট্রাগল করেননি, তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না, এককালীন লাভজনক একটা কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে, মাইনে অনিশ্চিত হয়ে গেলে সে এলাকার লোকজনের ওপর কী ভয়ংকর চাপ পড়ে যায়। আমাদের এই শিল্পাঞ্চলেই বহু কারখানা এভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে..."

ঈপ্সিতা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মানালি হঠাৎ অধৈর্য হয়ে বাধা দিল, "ম্যাম, আপনি কি এই অঞ্চলের?"

ঈপ্সিতা বোধহয় একটু বিরক্ত হলেন, কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে বললেন, "হ্যাঁ। আমার বাবা এখানে কাজ করতেন। হিসেবমতো আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু যাব যাব করেও থেকে গেলাম স্কুলটার জন্য।"

মানালি বলল, "আপনি বিয়ে করেছেন?"

ঈপ্সিতা অবাক হয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "হয়েছিল। পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।"

মানালি একটু অপ্রস্তুত হবার ভান করে বলল, "খুব দুঃখিত ম্যাডাম, কৌতূহলবশত সীমাটা পেরিয়ে ফেললাম, প্লিজ কিছু মনে করবেন না।"

ঈপ্সিতা বললেন, "আচ্ছা। ঠিক আছে।"

এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে এলেন, ঈপ্সিতা বললেন, "পরিচয় করিয়ে দি, আমার বাবা।"

মানালি হাত জোড় করল। ঈপ্সিতা বললেন, "বাবা তুমি একটু বিশ্রাম নাও। আমি ওঁদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি।"

ঈপ্সিতার বাবা কয়েক সেকেন্ড তাদের দেখে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

ঈপ্সিতা বললেন, "আমাদের স্কুলের ব্যাপারে আপনারা এতটা জানলেন কী করে জানতে পারি?"

মানালি হাসার চেষ্টা করল, "ম্যাম, আমাদের কাজ তো সেটাই। কোথাও ভালো কোনও কাজ হলে সেটা মিডিয়া জানবে না তা তো হয় না। আমাদের চিফ এডিটর বিশ্বরূপদা খুব জোর দেন এই ব্যাপারগুলোয়। বলেন শুধু কলকাতায় বসে থাকলে হবে না, জেলায় জেলায়... "

ঈপ্সিতা ভ্রূ কুঁচকে মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিশ্বরূপ... আপনাদের কাগজে..."

মানালি বুঝল ঈপ্সিতা বিশ্বরূপকে চেনেন। সে খানিকটা মরিয়া হল, "আপনি চেনেন বিশ্বরূপদাকে?"

ঈপ্সিতার মুখে একটা হাসি এসেই মিলিয়ে গেল, "না, সেরকম কিছু না। আচ্ছা আপনি কন্টিনিউ করুন।"

মানালি বলল, "বিশ্বরূপদা খুব ভালো মানুষ। শিল্প সাহিত্যের অনুরাগী। এই তো কদিন আগেই আমাদের সবাইকে ধ্রুব বাগচীর ডার্ক লাভ দেখাতে নিয়ে গেছিলেন নন্দনে। কোন কাগজের এডিটর এরকম স্টাফেদের নিয়ে সিনেমা দেখতে যান বলুন ম্যাম?"

ঋপণ হাঁ করে মানালির দিকে তাকিয়ে কিছু বলবে বলবে করে ভেবেও চুপ করে গেল।

ঈপ্সিতা মানালির কথা শুনে কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহ্, আপনারা ডার্ক লাভ দেখেছেন? সিনেমাটা কেমন লেগেছে আপনাদের?"

মানালি বুঝল তার উইকেট লক্ষ্য করে একটা হাফভলি আসছে। ঠিকঠাক খেলতে পারলে বল বাউন্ডারির বাইরেও যেতে পারে, অল্পক্ষণের জন্য মনঃসংযোগ সরে গেলে উইকেট খুইয়ে ফেলার সুযোগও আছে। সে ধ্রুব বাগচীর প্রশংসা করাই মনস্থ করল, "আমার তো খুব ভালো লেগেছে। সব অডিয়েন্সের জন্য না অবশ্য।"

ঈপ্সিতা জানলার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "মাস আর ক্লাস নিয়ে এ দেশটা খুব মোটা দাগে দুভাগে ভাগ হয়ে আছে। সিনেমা চলা না-চলার ওপরে ভিত্তি করে যে দেশে কোন সিনেমা ভালো কোন সিনেমা খারাপ নির্ধারিত হয়, সে দেশে সিনেমার আদতে কোনও ভবিষ্যৎ নেই।"

মানালি চমৎকৃত হল। কথাগুলো যেন ধ্রুবই বললেন!

মানালি আর পারল না। বলে বসল, "আপনাদের ডিভোর্সটা কেন হল?" বলেই বুঝল কপালে আবার ঝাড় নাচছে তার।

ঈপ্সিতা চমকে মানালির দিকে তাকালেন। তারপর ঋপণের দিকে। বললেন, "আমার... আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল যখন আপনি বিশ্বরূপের কথা বললেন..."

মানালি বুঝল আবার কেলো করে ফেলেছে সে। কোনওভাবে সামাল দেবার চেষ্টা করল, "প্লিজ ম্যাম, অনেক দূর থেকে এসেছি, একবারে তাড়িয়ে দেবেন না প্লিজ।"

ঈপ্সিতা কয়েক সেকেন্ড কপালে হাত রেখে বসে বললেন, "কাউকে তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা থাকলে হয়তো অনেক ভালোভাবে জীবনটা কাটাতে পারতাম আমি। তবে অনুগ্রহ করে আমাকে আর কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না। আমারই ভুল। আমি ভেবেছিলাম আমাদের মতো দূরের স্কুলগুলোকে আপনারা স্বীকৃতি দিতে চাইছেন। আমার বোঝা উচিত ছিল, আদতে সেই কেচ্ছা খোঁজাই আপনাদের কাজ।"

মানালি বলল, "ম্যাম, প্লিজ। আমি স্কুলের নিউজটা করব বিশ্বাস করুন। আপনি এভাবে বলবেন না।"

ঈপ্সিতা ঠোঁটের কোণে খানিকটা হাসি এনে বললেন, "সান্ত্বনা দিচ্ছেন?"

মানালি বলল, "না ম্যাম, বিশ্বাস করুন সান্ত্বনা দিচ্ছি না। এই অ্যাসাইনমেন্টটা খানিকটা কৌতূহলবশতই নেওয়া। ধ্রুব বাবু এমন একজন পারসোনালিটি, ওঁর সম্পর্কে আরও কিছু জানতে ইচ্ছা করাটা কি কোনও দোষ বলুন?"

ঈপ্সিতা বললেন, "আপনার তো যা চাওয়ার তা পেয়ে গেছেন। চিন্তা কী? আমাকে যতটা প্রশ্ন করেছেন তার থেকেই কেচ্ছা নেমে যাবে নিশ্চয়ই কিংবা শনিবারের ট্যাবলয়েডের খাদ্য হয়ে যাবে। কী বলেন? সমস্যা আছে?"

মানালি বলল, "ম্যাম, আমি ভেবেই এসেছি আপনাকে সবটা বলেই ইন্টারভিউ শুরু করব। আপনি প্লিজ আমাকে ভুল ভাববেন না। আপনি না চাইলে আপনাকে নিয়ে একটা শব্দও খরচ হবে না আমাদের কাগজে।"

ঈপ্সিতা বললেন, "অনেক দূর থেকে এসেছেন। লাঞ্চ করে বেরিয়ে যান। শীতের দিনে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না।"

মানালি বুঝল বারবার ব্যাখ্যা দেওয়ার থেকে একবারে চুপ করে যাওয়া ভালো। সে আর কিছু বলল না।

ঈপ্সিতা উঠে ডাইনিং টেবিলে প্লেটে ভাত বাড়তে বাড়তে বললেন, "দুজনে বেসিনে হাত ধুয়ে নিন।"

মানালি উঠল। ঋপণকে বলল, "চ।"

দুজনেরই খিদে পেয়েছিল। গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ, মাছভাজা, মাছের ঝোল।

মানালির টেনশনও হচ্ছিল, আবার চুপচাপ খেয়েও নিচ্ছিল। এত কষ্ট করে আবার কলকাতা ফিরে যেতে হবে বিফলমনোরথ হয়ে, ভাবতেই বড়ো কষ্ট হচ্ছিল তার।

ঈপ্সিতা বেশ যত্ন করে খাওয়ালেন তাদের। একটা কথাও বললেন না ধ্রুব সম্পর্কিত।
খেয়ে উঠে মানালি বলল, "বিশ্বরূপদা খুব বকবেন, স্টোরিটা ফেল হয়ে গেল।"
ঈপ্সিতা বললেন, "আপনাদের বসকে বলতে পারেন, নিজে যা যা দেখেছে, শুনেছে, সেগুলো দিয়ে ভালো স্টোরি হয়। অকারণ একটা বাচ্চা মেয়েকে এতদূর না পাঠালেও পারত।"
মানালি কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

১৫

"সব কিছুর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি থাকে বুঝলে?"
পিছনের সিট থেকে বলে উঠলেন ভদ্রলোক। গাড়ি কৈখালি পেরোচ্ছে। দীপ সামনের সিটে বসেছিল। পিছনের সিটে মেয়েটা মায়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে যাচ্ছে। মেয়েটার নাম ঋতি। জিন্স আর লাল টপে কিছু লাগছে মেয়েটাকে! দীপ অনেক কষ্ট করে হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ স্বাভাবিক করল। নিজের ওপর একটু অবাকও হল সে। গার্লফ্রেন্ড তো আছে! তাহলে কাউকে দেখলে হঠাৎ এরকম হওয়া তো মোটেও কাজের কথা নয়! আর অনেক কষ্ট করেও সে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। লুকিং গ্লাসে মেয়েটার দিকে চোখ পড়তেই হার্টফেল হবার চান্স তৈরি হচ্ছিল। সে একটু আশা করেছিল মেয়েটা তার সঙ্গে কথা বলবে, কিন্তু মেয়েটা মায়ের সঙ্গেই ব্যস্ত।
দীপ ভদ্রলোকের কথার উত্তরে বলল, "বুঝলাম না।"
ভদ্রলোক বললেন, "এই যে দ্যাখো না, সিনেমায় দেখায় হিরো সবজিওয়ালার ভ্যান উলটে দিচ্ছে। গাড়ি এসে কোনও দোকানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটার ওপাশটা কেউ আর দেখায় না। হয়তো দেখা গেল সবজিওয়ালার বাড়িতে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে আছে। তারা বাপের কাছে মাংস ভাত খেতে চেয়েছিল। বাপ হয়তো সবজি বেচেই তাদের জন্য মাংস কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু হিরোর লাথি তার ভ্যানে পড়ায় ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল। কিন্তু সেই গল্পটা তো আর আমরা দেখছি না।"
দীপ বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ এই কথা কেন?"
ভদ্রলোক বললেন, "ওই যে, প্রসঙ্গটা হল ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি। আমাদের দেখা হয়ে যাওয়াটাও যেমন। আমরা ভুবনেশ্বর গেছিলাম আমার মেয়ের জন্য পুজো দিতে। ফ্রন্ট স্টোরিটা হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা।"
মেয়ে পাশ থেকে বিরক্ত গলায় বলল, "আহ বাবা। থাক না।"
ভদ্রলোক বললেন, "কেন বলব না? কত ভালো খবর! তুই বিদেশ যাচ্ছিস, এটা আমাদের জন্য কত গর্বের ব্যাপার বল তো?"
মেয়ে আর কিছু বলল না। দীপ বুঝল ভদ্রলোক কন্যাগর্বে গর্বিত। সে বলল, "কনগ্র্যাটস।"
মেয়েটা নিয়মরক্ষার জন্য বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম।"
ভদ্রলোক বললেন, "এই আইটি আসার পরে ভারী ভালো ব্যাপার হয়েছে ভাইটি। আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বিদেশ-টিদেশ ঘুরছে। আগে তো একসময় আম্রিকা মানেই ছিল কঠিন ব্যাপার। এখন ব্যাপারটা জল ভাত হয়েছে। আমরাও সন্তানদের কল্যাণে দেশ বিদেশ ঘুরতে পাব। হ্যাঁ রে মা, ওই দেশে ইলিশ পাওয়া যায় তো?"
ভদ্রমহিলা রাগি গলায় বললেন, "তোমার শুধু খাওয়ার কথা। এখন কত কাজ সামনে আর তুমি সেই ইলিশ ভেটকি নিয়ে পড়ে আছ।"
কথার মাঝখানে দীপের মোবাইলটা বেজে উঠল। দীপ দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। রিংটা সাইলেন্ট করে দিল।
ভদ্রলোক বললেন, "বাড়ি থেকে বুঝি?"
দীপ বলল, "হ্যাঁ। ওই আর কি!"

ভদ্রলোক বললেন, "স্বাভাবিক। কত দূরে দূরে চলে যাচ্ছে সব ছেলেমেয়েরা। বাড়ির লোক চিন্তা করবে না?"

গাড়ি রাজারহাটের রাস্তায় ঢুকে গেছিল। ভদ্রলোক বললেন, "তুমি কলেজ মোড়ে নামবে?"

দীপ লুকিং গ্লাসে ঋতির চোখের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক তাকে বললেন, "তুমি লাঞ্চ করবে তো?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ। লাঞ্চ করেই অফিসে যাব।"

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, "তাহলে তো আমরা লাঞ্চ করেই যেতে পারি।"

ভদ্রমহিলা রেগে গেলেন, "একদম না। ওসব লাঞ্চ-টাঞ্চ একদম না। অনেক খেয়েছ। বাড়ি গিয়ে খাবে।"

ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন, "উফ। তোমার জ্বালায়... আচ্ছা, ছেলেটা লাঞ্চ করবে না?"

ঋতি হঠাৎ বলল, "আমি আজাদ হিন্দে নেমে যাব। উনি চাইলে নামতে পারেন। ওখানে লাঞ্চটা হয়ে যাবে।"

ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "তাই কর। তোরা দুজন নেমে যা। তোর বাবাকে একদম নামতে বলবি না। জানিস না কী লেভেলে খাওয়াদাওয়া করেছে পুরীতে।"

দীপ একটু অবাক হল। মেয়েটা এতক্ষণ অ্যাটি নিচ্ছিল। হঠাৎ ইনডাইরেক্টলি লাঞ্চের প্রপোজাল দিচ্ছে। ব্যাপারটা মন্দ না।

বাকি রাস্তাটা ভদ্রলোক বিভিন্ন খাবারের গল্প করে গেলেন। দীপ কিছু বলছিল না। গাড়িটা তাদের নামিয়ে দেবার পরে ভদ্রলোক বললেন, "অবশ্যই এসো ভাই আমাদের বাড়িতে। আমার মেয়ের কাছ থেকে অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিয়ো। খুব ভালো লাগল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে।"

দীপ প্রত্যুত্তরে বলল, "নিশ্চয়ই। আমারও খুব ভালো লাগল।"

গাড়িটা চলে গেলে ঋতি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

দীপ বলল, "কী?"

ঋতি বলল, "বাবা কাউকে এয়ারপোর্ট থেকে লিফট দেয় না। হঠাৎ কী এমন করলেন যে একবারে লিফট দিয়ে দিল?"

দীপ হাসল, "এমন কিছুই তো করলাম না। জানি না, ওঁর কেন এত ভালো লেগে গেল!"

ঋতি তার দিকে তাকিয়ে রহস্যময়ীর মতো হাসল, "ইম্প্রেসিভ। আপনার মধ্যে একটা ইনোসেন্ট ব্যাপার আছে। আপনি সেটা বুঝতে পারেন?"

দীপ এবার অবাক হল। মেয়েটা এতক্ষণ এত ঘ্যাম নিচ্ছিল। এখন হঠাৎ করে মাঝরাস্তায় এত ভালো ভালো কথা বলছে কেন? সে বলল, "লাঞ্চ করবেন না?"

ঋতি বলল, "নাহ। আমি যাই। আপনার বোধহয় আমাকে ভালো লাগছে না বলুন?"

দীপ বুঝতে পারল না কী বলবে। সে বলল, "না না, কী যে বলেন, আপনার মতো, কী যেন বলে, একজন সুন্দরীকে ভালো না লাগাটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। লাঞ্চ কিন্তু করতেই হবে, আমার খিদে পাচ্ছে।"

ঋতি হাসল "থ্যাংকস ফর ইওর কমপ্লিমেন্ট। চলুন।"

লাঞ্চ ব্রেক অফিসগুলোতে শুরু হয়নি বলে রেস্তোরাঁ ফাঁকাই ছিল। তারা দুজন একটা টেবিলে বসল।

দীপ বলল, "আপনি কবে যাচ্ছেন?"

ঋতি বলল, "এই তো। আর এক মাস।"

দীপ বলল, "পার্মানেন্ট?"

ঋতি বলল, "প্রথমবারে ছ-মাসের জন্য। তারপর ফিরে আবার যাওয়া। সেটা ক-বছর জানি না।"

দীপ বলল, "গ্রেট। বয়ফ্রেন্ড আছে?"

ঋতি মাথা নাড়ল, "না। আপনার?"

দীপ বলল, "না, আমার কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই। আমি স্ট্রেট।"

ঋতি হাসিতে ফেটে পড়ল, "ওরে বাবা, আপনাকে দেখে যতটা ইনোসেন্ট মনে হয় আপনি তো তা নন। যাক গে, গার্লফ্রেন্ড আছে?"

দীপের মোবাইলটা বাজতে শুরু করেছিল। চিত্রলেখা আবার। দীপ সেটার রিংটোনটাকে আবার মিউট করে দিয়ে বলল, "নাহ।"

ঋতি বলল, "বাহ। এনি এক্স?"

দীপ বলল, "নাহ, আপনার?"

ঋতি বলল, "সেরকম কেউ নেই।"

দীপ ঋতির দিকে তাকিয়ে বলল, "সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য!"

ঋতিও তার চোখের দিকে তাকাল, "কেন নয়?"

দীপ বলল, "আপনি এত সুন্দরী!" মনে মনে বলল, আর সেক্সি তো বটেই।

ঋতি বলল, "বারবার না বললেও চলবে। তবে কী জানেন, সবারই ধারণা আমার বয়ফ্রেন্ড আছে। অফিসেরও অনেকে তাই মনে করে। আমি কারও ভুল ভাঙাই না আজকাল। কেরিয়রটাই আসল যখন, তখন অতটা না ভাবলেও চলবে।"

দীপ বলল, "তা ঠিক। আমি কিন্তু পাতি ভাত আর চিকেনের কোনও প্রিপারেশন খাব। কেন জানি না খুব ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।"

ঋতি বলল, "ওকে। একটা করেই নিন। শেয়ার করে নেওয়া যাবে। আমি খুব একটা ফুডি না।"

দীপ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল, "আমিও না।"

ঋতি বলল, "গুড, শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং। বাই দ্য ওয়ে, আমাকে খুব গায়ে পড়া মেয়ে মনে হচ্ছে, না?"

দীপ বলল, "কেন বলুন তো?"

ঋতি বলল, "এই যে নিজে থেকেই লাঞ্চ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আগে থেকেই বলে নি, আমি আমার বাবাকে চিনি। বাড়ি ফিরে আমাকে শুনতে হত ফ্লাইটে একটা দারুণ ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, মিট কর, সেই ফেজটাকে কাটাবার জন্য আগে থেকেই দেখা করে নিলাম।"

দীপ অবাক হয়ে বললাম, "বাবা! আপনি তো আলোর থেকেও দ্রুতবেগে ভাবতে পারেন দেখছি।"

ঋতি বলল, "তা বটে। আচ্ছা, আর ইউ ভার্জিন?"

দীপ হাঁ করে ঋতির দিকে তাকাল। বলল, "কেন বলুন তো?"

ঋতি বলল, "আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আপনি ভার্জিন নন। আপনি অত্যন্ত হ্যান্ডু। এত হ্যান্ডু ছেলে ভার্জিন হয়ে ঘুরে বেড়ালে আমার পৃথিবীর উপর বিশ্বাস উঠে যাবে।"

দীপ হেসে ফেলল, "আনফরচুনেটলি।"

ঋতি হাসতে লাগল। আশেপাশে যে কটা কাপল ছিল, দীপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ছেলেগুলো ঈর্ষান্বিত হয়ে ঋতিকেই দেখছে। দীপ বলল, "আপনি ভার্জিন তো?"

ঋতি হাসতে হাসতেই বলল, "ইয়েস, আনফরচুনেটলি।"

পরের কথাটা দীপ অনেক কষ্টে আটকাল। সে বলতে যাচ্ছিল এতই যখন আনফরচুনেট ব্যাপারটা তখন ফরচুনেট হয়ে গেলেই হয়। বলতে পারল না।

ঋতি বলল, "আমি জানি না আপনার সঙ্গে এত কথা কেন বলছি, তবে একটা ব্যাপার হল আমার বাবার যাকে ভালো লাগে বলে আমার মনে হয়, আমারও কেন জানি না তাকে ভালো লেগে যায়।"

দীপ বলল, "আপনার বাবার আর কাকে ভালো লাগে?"

ঋতি বলল, "আমাদের পেপারওয়ালা।" বলেই আবার জোরে হেসে ফেলল।

দীপও হাসতে যাচ্ছিল, এই সময় আবার তার পকেট বেজে উঠল।

ঋতি বলল, “ফোনটা ধরুন না। কতবার করে ফোন হচ্ছে!”

দীপ আবার রিংটোন মিউট করে বলল, “আর বলবেন না, জোর করে পলিসি গছাবে। আমার এখন কোনও ইচ্ছা নেই!”

১৬

মানালির বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। মা দরজা খুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “শীতের রাতে রাস্তায় কুকুর বেড়াল পর্যন্ত বেরোচ্ছে না, এমন চাকরি করা কেন যেখানে এত রাতে ফিরতে হয়?”

মানালি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওয়াশরুমে ঢুকল। হিমশীতল জলেই হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে বলল, “খেতে দাও তাড়াতাড়ি। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।”

মা বলল, “দাঁড়া, খাবারগুলো গরম করে নি।”

মানালি বলল, “কী আছে?”

মা বলল, “মাছের ঝোল। আলু ফুলকপির তরকারি।”

মানালি বলল, “শুধু মাছ গরম করো। একটু ভাত দিয়ে খাব শুধু।”

মা গজগজ করতে করতে মাছের পাত্র মাইক্রোওয়েভ ওভেনে ঢোকাল। মানালি বলল, “ফিসফিস করে কী বলছ মা? জোরে জোরে বলো!”

মা বলল, “বলছিলাম শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এরকম নবাবি চলবে না। সেটা বুঝিস?”

মানালি বলল, “সেজন্যই তো শ্বশুরবাড়ি যাব না।”

মা রেগে গেল, “কেন? যার সঙ্গে প্রেম করিস, তাকে বিয়ে করবি না?”

মানালি জিভ কাটল। মাকে আরও রাগানোর জন্য বলল, “শ্বশুরবাড়ি থোড়িই থাকব! কে বলেছে শ্বশুরবাড়ি থাকব? লিভ টুগেদার করব তো!”

মা তার দিকে বড়ো বড়ো চোখ করে বলল, “মানে!”

মানালি অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল, “এরকম চমকে ওঠার কিছু নেই মা। দিন পালটাচ্ছে। কনসেপ্ট চেঞ্জ হচ্ছে। তোমাদের সময় ওইসব প্রি-ওয়েডিং ফটোশুট নামের কিছু ছিল? ধাড়ি উড বি-কে কোলে তুলে ফটো তুলছে বর, জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে তবু ফটো তোলা বড়ো বালাই। ছিল? দেখেছ?”

মা অবাক হয়ে বলল, “প্রি-ওয়েডিং... কী সেটা?”

মানালি বলল, “প্রি-ওয়েডিং ফটোশ্যুট। বিয়ের আগে স্বামী স্ত্রী ফটো তোলে। আমার এক বন্ধু প্রি-ওয়েডিং ফটোশ্যুটে কায়দা করে হবু বরের সঙ্গে ফটো-টটো তুলে বিয়ের দিন ড্রাইভারের সাথে পালিয়েছে। নে কত আদিখ্যেতা করবি কর!”

মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “এসব কী অলুক্ষুনে কথা বলছিস বল তো? পালিয়েছে মানে কী।”

মানালি বলল, “ওই আর কি! ওইজন্যই তো বলছি বিয়ের থেকে লিভ টুগেদার ভালো এখন। একসঙ্গে থাকো, পোষালে পোষাল, নইলে যে যার রাস্তায় ফিরে যাও। দেখবে দু-তিন বছর পরে কলকাতায় এটাই চলবে।”

মা মাইক্রোওভেন থেকে খাবার বের করে সার্ভ করতে করতে বলল, “যা ইচ্ছা কর, আমি আর কিছু বলব না। তবে বাচ্চা হবার সময় ছেলেটা যখন তোকে ছেড়ে চলে যাবে তখন বুঝবি এইসব আধুনিকতা আসলে কিছু লোক নিজেদের সুবিধার জন্যই বানিয়ে রাখে। কথাই আছে যস্মিন দেশে যদাচার। সেটার অন্যথা হলে সমস্যা বাড়ে।”

মানালি মাছ দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, “লিভ টুগেদার তারাই করে মা, যাদের নিজেদের সম্পর্কের ওপর সবথেকে বেশি বিশ্বাস থাকে। সম্পর্কটা তো কাউকে জোর করে হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাখার মতো নয়। সম্পর্কে আইনকানুন তখনই আসে, সালিশি সভা তখনই বসে, যখন সম্পর্কটার বাঁধনটা আলগা হয়ে

যায়। আর বাচ্চা হবার সময় কেউ চলে গেলে চলে যাবে। একটা মেয়ে জানে কী করে একটা বাচ্চাকে বড়ো করে তুলতে হয়। তোমার কী মনে হয়, জানে না?”

মা বেশ কিছুক্ষণ মানালির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বলল, “তুই কি সত্যি সত্যি এসব জিনিস করতে যাচ্ছিস? আমায় ছুঁয়ে বল তো!”

মানালি হাসতে হাসতে বলল, “শেষ মিসাইলটা ছুড়েই ফেললে বলো? দেখা যাক কী করি। অত চিন্তা করতে হবে না।”

মা বলল, “চিন্তা করব না? তোরা বাপ মেয়ে মিলে এক-একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকবি, আর মাঝখান দিয়ে আমাকে দৌড়ে মরতে হবে। আমি অতশত জানি না, তুই আমাকে ছুঁয়ে বল এইসব অলুক্ষুনে কাণ্ড তুই কিছুতেই করবি না।”

মা হাতটা তার দিকে এগিয়ে দিল। মানালির রাগ হচ্ছিল। এই সময় তাকে বাঁচাতেই হয়তো ফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। মা বলল, “এই নাও, কৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠেছে।”

মানালি দেখল বিশ্বরূপদা ফোন করছে, সে বলল, “মা প্লিজ, চুপ করো, বসো।”

মা রেগেমেগে অন্য ঘরে চলে গেল।

মানালি ফোন ধরল, “বলো।”

“কী রিপোর্ট? ঈপ্সিতা কী বলল?” ওপাশ থেকে গলাটা নির্লিপ্ত শোনাল।

মানালি বলল, “কী আশা করছ?”

বিশ্বরূপদা বলল, “একটা ভালো স্টোরি।”

মানালি বলল, “হবে না।”

বিশ্বরূপদা বলল, “সেন্টু খেয়ে গেলি, তাই তো?”

মানালি বলল, “এথিক্সে আটকাচ্ছে।”

বিশ্বরূপদা বলল, “তাহলে তো আর কিছু বলা যাবে না, মামণির এথিক্সে আটকাচ্ছে যখন! তা এথিক্স বাবাজি কী বলছে শুনতে পারি?”

মানালি মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, “এক ভদ্রমহিলা নিজেকে সব কিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখে একটা ভালো সোশ্যাল সার্ভিস করছেন, মানুষের জন্য কাজ করছেন, তাঁকে এইসব পেজ থ্রিতে আনতে আমি কোনও ভাবেই পারলাম না।”

বিশ্বরূপদা বলল, “ওকে, ফাইন। পেজ থ্রিতে আনতে হবে না।”

মানালি অবাক হল, “মানে? স্টোরিটা না করলেও চলবে?”

বিশ্বরূপদা বলল, “আমার কথার মানে কি তাই দাঁড়াল?”

মানালি বলল, “তাহলে কী দাঁড়াল?”

বিশ্বরূপদা বলল, “বললাম পেজ থ্রি নিউজ করব না। পেজ ফাইভ বা সিক্সে করলাম। ফ্রন্ট পেজেও করা যায়। হেডলাইন হবে নিভৃত সমাজকর্মী। কলকাতা থেকে দূরে এক অর্থনৈতিক ভাবে কোমর ভেঙে যাওয়া অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার জন্য কাজ করছেন এক মহীয়সী নারী। লেটস মেক হার আ সেলিব্রিটি। সেটা করলে তো ব্যাপারটা আনএথিকাল হবে না? কী বলিস?”

মানালি বলল, “তুমি বলবে না ভদ্রমহিলা ধ্রুব বাগচীর স্ত্রী?”

বিশ্বরূপদা বলল, “না। বলব না। তাহলে হবে? এথিক্সে খোঁচা-টোচা লাগবে না তো?”

মানালি একটু থমকে বলল, “লাগবে না হয়তো। তবু ভদ্রমহিলা সেক্ষেত্রেও রেগে যেতে পারেন। তেমন কোনও সলিড গ্রাউন্ড কি আছে? অনেক হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেসই রাজ্যে আছেন যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে কাজ করেন। তাহলে তো তাঁদের নিয়েও স্টোরি করতে হয়।”

বিশ্বরূপদা বলল, "সলিড গ্রাউন্ড এটসেট্রা রাবিশ ব্যাপার। নিউজপেপার কাকে কখন তুলবে, কাকে ছুড়ে ফেলবে, সেসব তোর বোঝার কথা না। স্পটলাইটটা ফেলার কায়দা জানতে হবে। তুই স্টোরিটা বানা। যতটা পারিস মশলাবর্জিত, আবেগসর্বস্ব স্টোরি বানা। আমি তারপর দেখছি কী করা যায়।"

মানালি বলল, "ওকে। গুড নাইট।"

বিশ্বরূপদা বলল, "গুড নাইট। আর শোন, কাল ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে চাইলে করতে পারিস। আজকের জার্নিটা খুব হেকটিক ছিল শুনলাম।"

মানালি বলল, "না না, কাল যাব। বাড়িতে থাকলে খবর হয়ে যাব আমি।" মানালি আড়চোখে দেখল মা টিভি চালিয়েছে।

বিশ্বরূপদা হাসল, "পালিয়ে পালিয়ে কিন্তু কোনও কিছু হয় না। তার মানে তুই এখনও তোর কাজের গুরুত্বটা মাকে বোঝাতে পারিসনি। দেখ, ওয়ার্কিং লেডিদের একটা এক্সট্রা লোড সব সময়েই নিতে হয়, তাদের হোম ফ্রন্ট সামলাতে হয়, অফিসে আমাদের মতো ঝাঁটু বস সামলাতে হয়, দুদিক ঠিকঠাক ব্যালান্স করে তবেই চলতে হয়। তুই যদি একটা দিক এখন থেকেই ইগনোর করতে শুরু করিস, সেক্ষেত্রে তোকে ফিউচারে আরও প্রবলেমে পড়তে হবে। কেউ অবুঝ না কিন্তু। কনভিন্স ইওর মাদার। আই থিংক তোর বাড়ির লোকের সঙ্গেও সময়টা ইকোয়াল ইম্পর্ট্যান্স দিয়ে কাটানো দরকার। এভরিওয়ান ইজ নট অ্যাজ মাচ লাকি অ্যাজ ইউ আর। আমার বাপ মা কেউ বেঁচে নেই। আমার তো মনে হয় আমারও যদি তোর মায়ের মতন একজন এক্সট্রা কেয়ারিং মা থাকতেন তবে খারাপ হত না।"

মানালি বলল, "বুঝতে আমার জায়গায় থাকলে। ওরম মনে হয়।"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "ওকে। গুড নাইট। যা যা বললাম সেগুলোতে কনসেন্ট্রেট কর।"

মানালি ফোন রেখে প্লেট সিংকে রেখে ঘরে গিয়ে কম্বল গায়ে দিল।

ল্যাপটপটা বিছানাতেই রাখা আছে। খুলতে ইচ্ছা করছিল না।

ফোনটা আবার বাজতে শুরু করেছে।

মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী ফোন করছেন।

১৭

অফিসে রিপোর্ট ইত্যাদি সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দীপের সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাবা বাইরের ঘরে বসে ছিল। তাকে দেখে বলল, "কী খবর?"

দীপ বলল, "খবর ভালো। অফিসের কাজ হল, ঘোরাও হল।"

বাবা বলল, "ব্যস?"

দীপ বলল, "আবার কী?"

বাবা বলল, "ফ্রেশ হয়ে নে। শিঙাড়া আছে। জাস্ট আনলাম নিরুর দোকান থেকে। নতুন খুলেছে দোকানটা। মশলাটা হিং দিয়ে যা বানায় না, জাস্ট ফাটাফাটি!"

দীপ বলল, "আসছি।"

ব্যাগ ঘরে রেখে দীপ বাথরুমে ঢুকল। চেঞ্জ করে বাইরে এসে দেখল চিত্রলেখা ফোন করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। সারাদিনে তিরিশবারের বেশি ফোন করেছে মেয়েটা। সে যে ইগনোর করতে চাইছে, বুঝতে চাইছে না, নাকি বুঝতে পারছে না?

সে টাওয়ালে হাত মুছে ফোন ধরে হ্যালো বলল।

ওপাশে বেশ কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকার পর চিত্রলেখা ধরা গলায় বলল, "আমি কি জানতে পারি, কী হয়েছে ঠিক?"

দীপ বলল, "কিছু হয়নি তো! কেন বলো তো? আমি বিজি ছিলাম সারাদিন।"

চিত্রলেখা বলল, "বিজি ছিলে? একবার ফোন ধরে সেটা বলা যেত না?"

দীপ বলল, "আমি এখনও বিজি। পরে ফোন করছি।"

চিত্রলেখা বলল, "দাঁড়াও। এক মিনিট। আগে বলো আমার দোষটা কী! কী এমন ভুল করেছি আমি যে তুমি এভাবে দূরে দূরে থাকছ?"

দীপ বলল, "তুমি কিছু করোনি। অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হচ্ছে তুমি আর আমি ঠিক কম্প্যাটিবল কাপল না। সে কারণেই ডিসাইডেড টু..."

চিত্রলেখা বলল, "কী ডিসাইডেড টু? বলো বলো!"

দীপ বলল, "ছাড়ো। এত কথার কিছু নেই।"

চিত্রলেখা বলল, "তুমি তো কাল রাতেও আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বললে। এর মধ্যে কী এমন হল বলো! প্লিজ বলো, আমি জানতে চাই।"

দীপ কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল, "তুমি ভার্জিন?"

চিত্রলেখা বলল, "এ কেমন প্রশ্ন?"

দীপ বলল, "তুমি তোমার এক্স-এর সঙ্গে কোনও রকম ফিজিক্যাল রিলেশনশিপে ছিলে কি না?"

চিত্রলেখা কেঁদে ফেলল, "এ কেমন প্রশ্ন করছ তুমি?"

দীপ বলল, "আমি জাস্ট জানতে চাইছি, কিউরিওসিটি।"

বাবা দরজা খুলে বলল, "শিঙাড়াটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

দীপ বলল, "আসছি বাবা, পাঁচ মিনিট।"

বাবা দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল।

চিত্রলেখা বলল, "তোমাকে তো কালকেই বলেছি। ও আমাকে ফোর্স করত। আমি বহু কষ্টে আটকাতাম।"

দীপ বলল, "সে তো অন্য কথা বলছে। ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে নাকি ও তোমাকে নিয়ে যেত?"

চিত্রলেখা ফোনটা কেটে দিল। দীপ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।

ফোনটা খাটের ওপর রেখে ডাইনিং রুমে গেল। ঠোঙার ভেতর থেকে একটা শিঙাড়া নিয়ে আবার ঘরে এল। বাবা দুটো শিঙাড়া নিয়ে টিভি দেখতে বসেছে। মা বাড়ি নেই। থাকলে বাবাকে কিছুতেই শিঙাড়া খেতে দিত না।

দীপ ঘরে এসে দেখল হোয়াটসঅ্যাপে ঋতি মেসেজ করেছে, "হাই। কী করছ?"

দীপ লিখল, "জাস্ট ফিরলাম। তুমি ফিরেছ?"

ঋতি— ক্যাবে।

দীপ— ওকে।

ঋতি— তুমি জানো, একটা কথা মনে হচ্ছে।

দীপ— কী?

ঋতি— এতদিন মনে হচ্ছিল কবে নতুন দেশ দেখব, এতদিন খুব এক্সাইটেড ছিলাম। আজ হঠাৎ করে কেন জানি না খুব মনখারাপ করছে।

দীপ— ??

ঋতি— যদি বলি একজনের সঙ্গে মিট করার পর থেকে?

দীপ— কার সঙ্গে?

ঋতি— আছে একজন। ম্যাজিক জানে। আমার বাবাকে কবজা করে ফেলেছে। বাবা আমাকে ফোন করে তার নামে একগাদা সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে।

দীপ— কী রকম?

ঋতি— অনেক রকম। ১) এই জেনারেশনের ছেলে হলেও অত্যন্ত ভদ্র, সভ্য, ২) এই জেনারেশনের ছেলে হয়েও গুরুজনদের রেসপেক্ট করতে জানে... আরও কী কী সব...

দীপ— বাহ। ছেলেটা দারুণ লাকি তো! এত সুন্দরী একজনের বাবা এত ভালো ভালো কথা বলেছে। হি মাস্ট সেলিব্রেট টুডে।

ঋতি— অ্যাবসোলিউটলি। উইকেন্ডে ছেলেটার দাওয়াতের ফোন আসতে চলেছে আজ রাতের মধ্যেই। ছেলেটা কি উইকেন্ডে ফ্রি থাকবে?

দীপ ফোনের দিকে তাকিয়ে হাসল। লিখল, "থাকবে। তবে মনে হয় ছেলেটা মেয়েটার সঙ্গে একা দেখা করতে বেশি আগ্রহী থাকবে। জাস্ট গেস।"

ঋতি— তাই নাকি?

দীপ— হ্যাঁ।

ঋতি— কিন্তু বাবা যে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার কী হবে?

দীপ— নিশ্চয়ই করবে। অবশ্য ছেলেটা আর মেয়েটা তো কালকেও দেখা করতে পারে। অফিস থেকে বেরিয়ে।

ঋতি— তা পারে। বাই দ্য ওয়ে, আমার আবার একটা কথা মনে হচ্ছে।

দীপ— কী?

ঋতি— এত তপস্যার পর ছেলেটা ভার্জিন হইয়া রহিল, এখন কি তবে তপস্যাভঙ্গের জন্য ছেলেটি ব্যাকুল হইয়া গেল?

দীপ কয়েক সেকেন্ড স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু হেসে সে লিখল— তপস্যাভঙ্গ হইবার তো কোনও রকম লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কন্যা সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া গেলে ছেলেটি আর কী করিবে?

ঋতি বেশ কয়েকটা হাসির স্মাইলি দিয়ে লিখল— দু পক্ষেরই কষ্ট। অতঃপর দীর্ঘশ্বাস এবং বিচ্ছেদ।

দীপ— বাই দ্য ওয়ে, ছেলেটির ভার্জিনিটি নিয়ে মেয়েটি এত চিন্তিত কেন জানতে পারি?

ঋতি— নাহ। থাক। দীর্ঘশ্বাস এবং বিচ্ছেদ অবধিই ঠিক আছে হয়তো।

দীপ— ট্রাজেডি শেক্সপিয়ারের লেখায় আর আশিকি টু-এর গল্পেই হয়। মেয়েটা সম্ভবত সেটা জানে না।

ঋতি— রিয়েলি? সত্যিই জানে না। তা কী রকম কমেডির প্যাকেজ ছেলেটা অফার করে শুনি?

দীপ— এই মাঝেসাঝে দেখা, সুখ দুঃখের গল্প করা, দু-চারটে ভাসমান চুম্বন, দু-চারটে ভালবাসার কথা।

ঋতি— চুম্বন? বাহ, বাহ। ছেলেটি দেখছি সাহসীও বটে!

দীপ— দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বেড়ালও সাহসী হয়ে যায়, ছেলেটা তো তবু মানুষ!

ঋতি— তাই নাকি? তা কেমন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল ছেলেটির? জানতে পারি?

দীপ— এত যুগ পরে একজন মনের মানুষ মেলার পর মেয়েটি যদি বলে দীর্ঘশ্বাস এবং বিচ্ছেদ, তবে কি ছেলেটির দেওয়ালে পিঠ না ঠেকা ছাড়া কোনও উপায় আছে?

ঋতি— হুউউউ... ছেলেটি তবে ভাসমান চুম্বনেই সন্তুষ্ট?

দীপ উত্তর না দিয়ে কয়েকটা হাসির স্মাইলি দিল।

ঋতি— ছেলেটা খুব ভদ্র। মেয়েটির বাবা ঠিকই ধরেছিল তবে।

দীপ— সেটা হওয়া ছাড়া আর তো অপশন নেই কোনও।

ঋতি— ফরচুন ফেভারস দ্য ব্রেভ। ছেলেটা জানে না বোধহয়।

দীপ উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল, চিত্রলেখা। দীপ ধরল, "হ্যালো।"

ওপাশ থেকে চিত্রলেখার থমথমে গলা শোনা গেল, "অন্যের কথা শুনে আমার বিচার করে নিলে?"

দীপ বলল, "আমার টায়ার্ড লাগছে, আমি পরে কথা বলি?"

চিত্রলেখা বলল, "লাগুক টায়ার্ড। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই।"

দীপ বলল, "কী করে বলি বলো তো? আমার তো আর টাইম মেশিন নেই যে তোমার পাস্টে গিয়ে দেখে আসব তুমি সত্যি বলছ না ছেলেটা সত্যি বলছে, তাই না?"

চিত্রলেখা বলল, "দেখতে হবে না। ইটস ওকে। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমি হয়তো একটু ন্যাগিং, একটু ইনসিকিওর, কিন্তু আমি মিথ্যেবাদী নই। পরের মুখে ঝাল খেলে তুমি। বেশ। তবে এখানেই সব কিছু শেষ হোক। ভালো থেকো।"

দীপ কোনও উত্তর না দিয়ে ফোনটা কেটে দিল। স্বস্তি লাগছিল খানিকটা। ঋতির সঙ্গে ফ্লার্ট করার সময় একরকম গিল্টি ফিলিংস হচ্ছিল। সেটা এবারের পর থেকে আর হবে না হয়তো।

ফোনটা রাখতেই তার ফোনটা আবার বেজে উঠল। দীপ চমকে দেখল ঋতি ফোন করছে। সে ধরতেই ওপাশ থেকে ঋতি বলল, "কী ব্যাপার, ছেলেটা বিজি হয়ে গেল হঠাৎ করে?"

দীপ হাসার চেষ্টা করল, "আর বোলো না। অফিস থেকে ফোন এসেছিল।"

—হুঁ... আই নো। আমারও সেম কেস। অফিসের জ্বালায় বাড়ির কাজ করাও মাথায় ওঠে।

—একজ্যাক্টলি, বাড়ি ফিরলে?

—এই তো বাড়ির সামনের রাস্তায়। আর পাঁচ মিনিট। আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময়েও ভাবিনি, এমন কারও সঙ্গে দেখা হবে যার সঙ্গে কথা হলে মনে হবে কেউ যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে ভায়োলিন বাজাচ্ছে, বাতাসে মোহাব্বতে ব্র্যান্ড পাতা ঘুরে বেড়াবে, মিস্টার দীপ সুপুরুষ মহাশয়, আপনি কি ম্যাজিক জানেন?

১৮

"কিছু মানুষ আছে, যারা কেচ্ছা ঘাঁটতে ভালোবাসে। তাদের কী বলে জানেন?"

ধ্রুব বাগচী তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন। মানালি বিশ্বরূপদার দিকে তাকাল।

ধ্রুব বললেন, "উঁহুঁ, বসের দিকে তাকালে হবে না। আপনাকে প্রশ্নটা করেছি। জবাবটা আপনি দেবেন।"

মানালি একটু ইতস্তত করে বলল, "কী বলে?"

ধ্রুব বাগচী তাঁর সামনে রাখা বড়ো কফি মাগে চুমুক দিয়ে বললেন, "তাদের পেজ থ্রি রিপোর্টার বলে। কে হেগে জল দেয় না, কোন নায়কের হাইড্রোসিল হয়েছে, কার যৌন মিলনের সময় দশ সেকেন্ডে কোর্স কমপ্লিট হয়ে যায়, এসব রিপোর্ট করা হল পেজ থ্রি রিপোর্টারের কাজ। দেশের কার কী প্রবলেম, কোথায় লোক খেতে পাচ্ছে না তাতে এঁদের কিচ্ছু এসে যায় না, টাইগার শ্রফের লেজের কালার নিয়ে এঁরা সবথেকে বেশি চিন্তিত। বুঝেছেন তো?"

ধ্রুব বাগচী একটুও উত্তেজিত না হয়ে কথাগুলো বললেন।

মানালির কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

আগের দিন রাত্রে ধ্রুব ফোন করে পরের দিন সকালে দেখা করতে বলেছিলেন। মানালি গলা শুনেই বুঝেছিল, রাত্রে মদ খেলেও ধ্রুব ভীষণ রেগে ছিলেন। একটাও বাড়তি কথা বলেননি। সকালে বিশ্বরূপদাকে ফোন করলে বিশ্বরূপদা ঠিক করে সেও যাবে মানালির সঙ্গে।

"ওকে ঝেড়ে লাভ নেই। অ্যাসাইনমেন্টটা ওকে আমিই দিয়েছিলাম।" বিশ্বরূপদা বলল।

ধ্রুব বললেন, "কেন দিয়েছিলেন?"

বিশ্বরূপদা বলল, "সেটা তো বলা যাবে না কেন দিয়েছিলাম।"

ধ্রুব মন দিয়ে কফিটা শেষ করে মাগটা টেবিলে রেখে বললেন, "ওকে। দিয়েছিলেন। বেশ করেছিলেন। এবার তবে ধ্রুব বাগচীর কেচ্ছা নামিয়ে ফেলুন। ওঁকেই বলছেন কেন, সেই লোকের পেছনের গন্ধ শুঁকে যাওয়া মালটাকেই বলুন না আমার কেচ্ছা নামাতে। নিজেকে বেশ রবীন্দ্রনাথ সুলভ মনে হবে। বইয়ের নাম দেবেন নাহয় ধ্রুব বাগচীর আদরের দাগ! বুলশিট যত রাজ্যের!"

মানালি পরিষ্কার বুঝতে পারছিল ধ্রুব বাগচী একটু একটু করে রাগছেন, কিন্তু উত্তেজনাটা কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বরূপদা বলল, "দেখুন ধ্রুব, একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে।"

ধ্রুব বাধা দিয়ে বললেন, "কী বুঝতে হবে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "আমরা মুখে বাকস্বাধীনতার কথা বলি। অথচ নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই সবথেকে বেশি সেটার বিরোধিতা করি। এই আপনিই তো সেদিন বাকস্বাধীনতার পক্ষে কত কথা বললেন। আপনার মনে হয় না ব্যাপারটা সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে?"

ধ্রুব বললেন, "আপনার কী হিসেবে মনে হয় লোকের ব্যক্তিগত জিনিস নিয়ে কেচ্ছা ঘাঁটাটা বাকস্বাধীনতার আওতায় পড়ে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "নিউজটা কি বেরিয়েছে ধ্রুব? তাহলে এত উত্তেজনা কেন? ইনফ্যাক্ট কালকে রাতেই মানালির সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথা হয়েছে। ঈপ্সিতার কাজটা নিয়ে আমরা একটা স্টোরি করব, ব্যস। আপনাকে কোনও ভাবেই টানা হবে না।"

ধ্রুব কয়েক সেকেন্ড বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি এরকম কোনও কিছু চাইছি না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

মানালি দেখল ধ্রুব বাগচীর চোয়াল শক্ত হয়ে এসেছে।

ঠিক এই সময়েই তার খেয়াল হল দেওয়ালে একটা নতুন পোস্টার লেগেছে। মগনলাল মেঘরাজের। তার হঠাৎ করে খুব হাসি পেয়ে গেল। বিশ্বরূপদা কেমন জটায়ুর মতো পরিস্থিতিতে আছে বলে মনে হচ্ছে এখন। অনেক কষ্টে জিভ কামড়ে হাসি চাপল সে। তার এটা একটা সমস্যা। সিরিয়াস জায়গাগুলোতে হাসি পেয়ে যায় বিচ্ছিরিভাবে।

বিশ্বরূপদা বলল, "সরকারি কিছু বিজ্ঞাপন বন্ধ হবে। এই তো?"

ধ্রুব বাগচী ফুঁ দেবার ভঙ্গি করে বললেন, "সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করার মতো ভাটের কথা বলার লোক ধ্রুব বাগচী নয় সেটা আশা করি আপনি জানেন। আমি আপনাকে এথিক্সের দিকটা বোঝাতে চাইছি। সেটুকু বোঝার মতো বোধ বুদ্ধি আশা করি আপনার আছে।"

মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী বেশ আক্রমণাত্মকভাবে গোটা ব্যাপারটার দখল নিতে এগোচ্ছেন।

বিশ্বরূপদা বলল, "ঈপ্সিতার ইনিশিয়েটিভের একটা নিউজ বেরোবে। যেখানে কোথাও ধ্রুব বাগচীর নাম মেনশন থাকবে না। এখানে আপনার আপত্তিটা কোথায় সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

ধ্রুব বাগচী বললেন, "আপনি এতটাও মাথামোটা নন বিশ্বরূপ।"

বিশ্বরূপদা বলল, "আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না ধ্রুব। আমি অফিসে ফিরি। একটু ভাবনা চিন্তা করে নাহয় আপনাকে জানাই?"

ধ্রুব মানালির দিকে তাকালেন, "আপনি প্রেম করেন? উত্তর দিতে না চাইলে দিতে পারেন, জাস্ট আস্কিং।"

মানালি দুদিকে মাথা নাড়াল।

ধ্রুব বললেন, "কেন করেন না?"

মানালি বলল, "সেসব নিয়ে ভাবার সময় নেই।"

ধ্রুব বললেন, "ঈপ্সিতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? সংক্ষেপে বলুন।"

মানালি বলল, "খুব পারসোনালিটি আছে। চোখগুলো অসম্ভব সৎ। আপনার মতোই সিনেমা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। বারে বারে মনে হয়েছে আপনারা মেড ফর ইচ আদার কাপল।"

ধ্রুব সোফায় পা তুলে বসলেন, "কতক্ষণ ছিলেন?"

মানালি বলল, "দুপুরটা।"

ধ্রুব বললেন, “দু ঘণ্টা খুব বেশি হলে?”

মানালি বলল, “হ্যাঁ।”

ধ্রুব বললেন, “এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনারা দশ পাতা প্রতিবেদন রেডি করে বসে আছেন। তাই তো?”

মানালি মাথা নাড়ল, “না, এখনও লেখা শুরু হয়নি।”

ধ্রুব বললেন, “সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিটা লোকের কাজ কী বলুন তো? ইমেজ বিল্ডিং করা। প্রতিটা সেকেন্ডে, প্রতিটা মুহূর্তে লোকটা চারদিকের লোকজনকে জানান দিয়ে চলেছে যে সে কত ভালো। কত সৎ। সে আসলে একজন সুপারম্যান, ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে বেঁচে আছে। বাস্তব জীবনে গিয়ে বোঝা যায় আসল পার্থক্যটা। ঈপ্সিতা ফেসবুক করে না। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে নেই। কিন্তু শি ইজ অনেস্ট। ইমেজ বিল্ডিং করার দায় ওর নেই। রূপনারায়নপুরে ওর সঙ্গে অনেকেই আছে যারা এই কাজটার সঙ্গে যুক্ত। আপনার মনে হয় না, সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু ওকে নিয়ে লিখলে ব্যাপারটা মারাত্মক বায়াসড হয়ে যাবে? আপনার কি মনে হয় ঈপ্সিতা সেটা দেখলে খুশি হবে?”

মানালি চুপ করে বসে থাকল। ধ্রুব বললেন, “বলুন। আপনার বক্তব্যটাও মূল্যবান আমার কাছে। আপনি নিজে গিয়ে ওর ইন্টারভিউ করে এসেছেন যখন!”

মানালি বলল, “আমি তো ওঁর সঙ্গে স্কুলটা নিয়ে নিউজ করব বলেই ফোন করেছিলাম। আমি যদি সেটা নিয়ে নিউজ করি তাহলে আশা করি ওঁর বা আপনার কারও কোনও আপত্তি থাকবে না।”

ধ্রুব কাঁধ ঝাঁকালেন, “ওকে। কুল। গো অ্যাহেড।”

মানালি অবিশ্বাসী চোখে ধ্রুবর দিকে তাকাল, “তার মানে স্কুলটা নিয়ে স্টোরিটা করলে আপনার কোনও আপত্তি নেই?”

ধ্রুব বললেন, “আপাতত। তবে আশা করি স্টোরির ভিতর খোঁচা-টোচাগুলো থাকবে না। সেক্ষেত্রে আপত্তি থাকবে। এবং নিউজটা বেরোনোর পর আপত্তির জায়গাটা আশা করি আপনাদের পক্ষে সুখকর হবে না।”

মানালি ভাবছিল সব মিটে গেল, এবার উঠে পড়লেই হয়, এই সময় হঠাৎ তাকে অবাক করে বিশ্বরূপদা বলল, “এভাবে আপনি ঈপ্সিতার থেকে দূরে থাকতে পারবেন বলে আপনার মনে হয়?”

ধ্রুব বিশ্বরূপদার দিকে তাকালেন।

ঘরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

বিশ্বরূপদা পরের তিরটা ছুড়ল, “এভাবে সব সময় মেয়েটাকে পিষে রেখে যাবার চেষ্টা করে গেলেন। কী পাবেন এসব করে?”

ধ্রুব স্থির চোখে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনারা আসতে পারেন।”

বিশ্বরূপদা উঠল, “স্টোরিটা হবে মিস্টার বাগচী। আপনার হিসেবে নয়, আমার হিসেবেই হবে। আপনি যা করার করতে পারেন।”

ধ্রুব বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না।

মানালি উঠল। যতক্ষণ না তারা বেরোল, মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী চুপচাপ বসে তাদের দেখে গেলেন।

ব্যাকগ্রাউন্ডে মগনলাল মেঘরাজ।

তবে এই সময় বিশ্বরূপদাকে আর জটায়ুর মতো লাগছিল না।

হাবেভাবে জটায়ুর গল্পের প্রথমজনের মতোই লাগছিল।

১৯

দরজা ধাক্কানোর শব্দে সকালে ঘুম ভাঙল দীপের। উঠে ঘুমচোখে ঘড়ি দেখে চমকে উঠল। সাড়ে আটটা বাজে। উঠে তাড়াহুড়ো করল না। একটু চেঁচিয়ে বলল, “উঠেছি।”

সে আগে বসকে ফোন করল। সমীরবাবু ফোন ধরে বললেন, “বলো।”

“স্যার আজ একটু ডাউন লাগছে, কাল ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে খারাপ লাগছিল বটে, আজ দেখছি একেবারেই উঠতে পারছি না।”

“ওকে ওকে। টেক রেস্ট। একটা দিন রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে আশা করি। আর ভাইরাল হলে তো হয়ে গেল। মেডিসিন নিয়ে নাও। টেক কেয়ার।”

ফোনটা রেখে দীপ বাইরের ঘরে গেল। মা উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, “কি রে, এত দেরি করে উঠলি? অফিস যাবি না?”

দীপ ব্যস্ততা দেখাল, “হ্যাঁ, যাব তো, দেরি হয়ে গেল।”

মা বলল, “যা যা, ভাত হয়ে গেছে, স্নান সেরে বেরোলেই দিচ্ছি।”

দীপ অফিস যাবার সময় যেমন ব্যস্ততা দেখায় তেমন ব্যস্ততা দেখিয়েই তৈরি হয়ে বেরোল। ঋতিও আজ কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে অফিস থেকে ছুটি নেবে। আগের রাতে এই প্ল্যানই হয়েছে।

অফিস টাইমের জ্যাম কাটিয়ে ঋতি যখন দীপের গাড়িতে উঠল তখন সকাল দশটা বাজে। দীপের একটা অদ্ভুত উত্তেজনা হচ্ছিল। ঋতি গাড়িতে ওঠার পর সে বুঝতে পারল তার হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সে বলল, “তৈমুর ড্রাইভ?”

ঋতি অবাক হয়ে বলল, “মানে?”

দীপ হাসল, “লং ড্রাইভ?”

ঋতি বলল, “আমিও সেটাই ভাবছিলাম, কলকাতায় থাকলে অফিসের কেউ দেখলে দুজনেই কেস খাব। তুমি কি শরীর খারাপ বললে?”

দীপ বলল, “ইয়েস।”

ঋতি হাসতে হাসতে বলল, “সেম হিয়ার।”

দীপ গাড়ি স্টার্ট দিল। কেজো অফিসের বাইরে গিয়ে একদিন আচমকা ছুটি নেওয়া, সঙ্গে ঋতির সান্নিধ্য, তার নেশার মতো লাগছিল। সে বলল, “পারফিউমটা দারুণ কিন্তু, ব্র্যান্ডটা?”

ঋতি বলল, “দারুণ মানে তো অনেক রকম দারুণ হয়। তুমি কোনটা মিন করতে চাইছ?”

দীপ বলল, “সিডাকটিভ। তুমি ড্রাইভ করতে জানো তো? সিডাকশন বেশি হয়ে গেলে আমার ঘুম পেয়ে যায়।”

ঋতি হাসল, “তাহলে তো বিপদ। ঘুমিয়ে পড়লে বউ পালাবে যে।”

দীপ ছদ্ম টেনশন আনল গলায়, “সত্যিই। তাহলে তো ভারী বিপদ। আচ্ছা বউয়েরও তো একটা দায়িত্ব থাকা উচিত তাই না? আমাকে জাগিয়ে রাখার?”

ঋতি হাসল, “হুউ, শখ কত! উনি পড়ে পড়ে ঘুমোবেন আর ওনার বউ ওনাকে জাগিয়ে রাখবে!”

দীপ বলল, “হ্যাঁ শুনেছি লিপস্টিকের গন্ধ নাকি খুব ভালো জাগিয়ে রাখতে পারে।”

ঋতি বলল, “ওহ!!! এটা তো জানতাম না! তা অফিসে ঘুমিয়ে পড়লে বুঝি কোনও মেয়ে এরকম লিপস্টিকের গন্ধেই ঘুম ভাঙায়?”

দীপ কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “নাহ, অত সৌভাগ্য এখনও হয়নি। আপাতত খোঁজ চলছে।”

ঋতি বলল, “খোঁজ চলছে বুঝি? এখনও পাওয়া হয়নি? আমিও খুঁজতে শুরু করি তবে?”

দীপ বলল, “শিওর, সবাই মিলে খুঁজলে তবেই তো অরূপরতন পাওয়া যাবে।”

ঋতি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময়ে বুকপকেট থেকে দীপের ফোনটা বেজে উঠল।

ঋতি বলল, “অফিস থেকে নাকি?”

দীপ বলল, “যেখান থেকেই হোক। ড্রাইভ করার সময় আমি ফোন রিসিভ করি না।”

ঋতি বলল, “ইউ আর এ বিজি পার্সন। যখনই দেখা হয়, তোমার ফোন রিং হয়ে যায়।”

দীপের সিক্সথ সেন্স বলছিল ফোনটা চিত্রলেখাই করছে। সে মিথ্যা করে বলল, "অফিসের প্রোজেক্টটা নিয়ে একটু বিজি আছি এখন। ওই ব্যাপারেই হয়তো।"

ঋতি জিভ কাটল, "ইশ, তাহলে কি আমি দেখা করার আবদারটা করে ভুল করলাম?"

দীপ বলল, "ধুস, আমার নিজেরই কি রোজ রোজ অফিস করতে ভালো লাগে নাকি? এসব নিয়ে ভেবো না। আমি ফোনটা সাইলেন্ট করে দিচ্ছি।"

তারা দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজায় চলে এসেছিল। টোল ট্যাক্স দিয়ে দীপ বলল, "বলুন মেমসাহেব, একদিকে যাইতেছে দিল্লি রোড, অপরদিকে মুম্বই। আপনি কোন দিকে যাইতে আগ্রহী?"

ঋতি বলল, "মুম্বই কদিনে পৌঁছোব, আর দিল্লি? বেশ একটা পথ যদি না শেষ হয় টাইপ ফিলিং আসছে কিন্তু।"

দীপ বলল, "ডিসিশন প্লিজ।"

ঋতি তার ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা দীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "একটা আঙুল ধর।"

দীপ ঋতির তর্জনীটা ছুঁয়ে দিল। সামান্য স্পর্শেই একটা ম্যাজিক হল তার ভেতরে।

ঋতি বলল, "দিল্লি জিতল। দিল্লি চলো।"

দীপ বলল, "ওকে। তাই হোক।"

ঋতি বলল, "একটা কোথাও ফাঁকা দেখে একটু দাঁড় করানো গেলে দাঁড়িয়ো। একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা বলব।"

দীপ বলল, "ওকে।"

সাঁতরাগাছি পেরিয়ে, আরও কয়েকটা লোকালয় ছাড়িয়ে দীপ রাস্তার বাঁদিকে গাড়িটা দাঁড় করাল।

বলল, "ইয়েস। প্রসিড প্লিজ।"

ঋতি তাকে চমকে দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে তার ঠোঁটে একটা চুমু খেল।

দীপ প্রথমে বুঝে উঠতে পারেনি। সেও ঋতিকে জড়িয়ে ধরল।

কয়েক মিনিট ধরে পরস্পরকে তারা পাগলের মতো চুমু খেল।

হাইওয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো প্রচণ্ড গতিতে চলে যাচ্ছে।

ঋতি একটু সময় নিয়ে নিজেকে সামলে বলল, "আই অ্যাম সরি। অনেক কষ্টেও নিজেকে আটকাতে পারলাম না, বিলিভ মি।"

দীপ কয়েক সেকেন্ড পর বলল, "সরির কিছু নেই। আমারও খুব ভালো লাগছে।"

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। দুজনে নিজেদের সামলে নিচ্ছিল।

ঋতি বলল, "তো?"

দীপ বলল, "লং ড্রাইভ?"

ঋতি বলল, "অ্যাজ ইউ উইশ। রাস্তাঘাটে তো..."

দীপ ঋতিকে কথাটা শেষ করতে দিল না। আবার ঋতির ঠোঁটে চুমু খেল।

ঋতি আটকাল, "এখানে আর দাঁড়িয়ো না। লোকে দেখলে বাজে ব্যাপার হয়ে যাবে। চলো।"

দীপ বলল, "আমি তোমাকে পুরোটা পেতে চাই ঋতি। এভাবে রাস্তাঘাটে না।"

ঋতি দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায়?"

দীপ বলল, "যেখানে সম্ভব।"

ঋতি বলল, "নিয়ে চলো। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, আমি চোখ বন্ধ করে সেখানেই যাব।"

কয়েক মিনিট চুপ করে বসে দীপ গাড়ি ঘোরাল।

ঋতি বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

দীপ বলল, "তোমার কোনও আই কার্ড আছে তোমার সঙ্গে? আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড?"

ঋতি বলল, "দুটোই আছে।"
দীপ বলল, "দেন বুক আ রুম। আনম্যারেড কাপলদের জন্য অ্যাপস আছে। ডাউনলোড করো।"
ঋতি বলল, "হোটেল?"
দীপ বলল, "হুঁ। সেফ। আমার অনেক কলিগই যায়।"
ঋতি বলল, "আর কোনও অপশন নেই?"
দীপ বলল, "মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করবে পুরোনো বাংলা সিনেমার মতো?"
ঋতি হেসে ফেলল।
ঘণ্টাখানেক বাদে তারা পার্ক স্ট্রিটের একটা হোটেলে চেক ইন করল।

২০

সকালে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় টিফিন নিয়ে আসা হয়নি।
মানালি ভেবেছিল বাইরে গিয়ে লাঞ্চ করবে। বিতস্তাই বারণ করল।
বিতস্তা লাঞ্চে চাউ এনেছিল। পরিমাণে অনেকটাই ছিল। আশেপাশের ডেস্কগুলো ফাঁকা। বেশিরভাগই অফিসের নিচের খাবারের স্টল থেকে খেতে গেছে।
বিতস্তা খেতে খেতে বলল, "তোর মনে হচ্ছে না এই ধ্রুব বাগচীর ব্যাপারটা নিয়ে বিশ্বরূপদা একটু বেশিই তেতেপুড়ে রয়েছে?"
মানালি বলল, "সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমার ওপর দিয়ে জাস্ট ঝড় চলছে। আমি আর পারছি না বিশ্বাস কর।"
বিতস্তা কাঁধ ঝাঁকাল, "তো সেটা নিয়ে খোলাখুলি ডিসকাস তো কর। বলে দে বিশ্বরূপদাকে।"
মানালি মাথা নাড়ল, "নাহ। বলব না। আমিও শেষ দেখতে চাই। দেখ আমি একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি। বিশ্বরূপদা চাকরি ছাড়বে বা যাই করবে, যাওয়ার আগে ধ্রুব বাগচীর সঙ্গে একটা বড়োসড়ো পাঙ্গা নিয়ে যেতে চাইছে।"
বিতস্তা বলল, "সেটাই তো বলছি। কানাঘুষো শুনছিলাম বাইরের কোন ইউনিভার্সিটিতে নাকি আরও কী সব পড়ার জন্য যেতে পারে। যদি সেটাই হয় তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যাওয়ার আগে কোনও স্কোর সেটল করতে চায়।"
মানালি বলল, "যা পারে করুক। বাদ দে তো। এখন লাঞ্চ টাইমে এসব বালের কথা বাদ দে। তোর কথা বল। তোর স্কোর কেমন চলছে?"
মানালি চোখ মারল।
বিতস্তা বলল, "অ্যাপটা সুপার ভাই। কখনও ট্রাই করে দেখিস।"
মানালি অবাক হল, "কোন অ্যাপটা?"
বিতস্তা বলল, "রুম ফর আনম্যারেড কাপল। জাস্ট সার্চ কর, হোটেলে আই কার্ড দিয়ে চেক ইন করে যা।"
মানালি চোখ বড়ো বড়ো করল, "হোটেলে?"
বিতস্তা বলল, "ইয়েস। হোটেলে। আমি আর সৌরভ তো একদিন হোটেলেই মিট করলাম। রেটটা যদিও একটু হায়ার সাইডে থাকে, কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই ভেরি স্মুদ।"
মানালি বলল, "সৌরভের ফ্ল্যাটে যেতিস যে, সেসব?"
বিতস্তা মুখ ব্যাঁকাল, "আরে সে আর বলিস না, অতিথি তুম কব যাওগে কেস। ওর এক মামার ছেলে এসেছে। সে ব্যাটা তিন দিন থাকব বলে সাত দিন থেকে গেল। কী করব বল? আমাদেরও তো কিছু একটা জুগাড় করতেই হবে, তাই না?"

মানালি বলল, “দেখিস বাবা, পুলিশের ঝামেলায় পড়িস না।”

বিতস্তা বলল, “দেশের তো কোনও আইনে বলে না হোটেলে আনম্যারেড কাপল থাকতে পারে না। তবে কীসের ঝামেলা?”

মানালি বলল, “তাহলে হোটেলগুলোতে রেইড হয় কেন?”

বিতস্তা বলল, “আই কার্ড ছাড়া থাকলে রেইড তো হতেই পার। সিকিউরিটি ইস্যুসও তো আছে। তবে সমস্যা হল, যে কারণে হেলমেট থাকলেও তোকে রাস্তাঘাটে পুলিশ ধরতে পারে, হোটেলগুলো ঠিক সে কারণেই রেইড হতে পারে। একটু স্ট্যান্ডার্ড হোটেলে অবশ্য এই ঝামেলা হয় না। আর-একটা ব্যাপার কী জানিস, শহরে গুচ্ছ গুচ্ছ হোটেল আছে, পুলিশ কি আর সব রুমে গিয়ে নক করে করে দেখবে যে ভিতরে কী চলছে?”

মানালি বলল, “দেখিস, আর যাই হোক হেডলাইন হোস না, তবেই হবে।”

বিতস্তা আক্রমণাত্মক হল, “আসুক না, বুঝে নেব। আমার রিলেশন, কীভাবে হ্যান্ডেল করব আমি বুঝে নেব। পাড়ার জেঠিমা কাকিমার মতো বিহেভ করবে আর আমরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলব?”

মানালি হেসে ফেলল, “এত ডেসপারেট হয়ে গেছিস কেন? সেরকম হলে বিয়ে বা লিভ টুগেদার কিছু একটা করে নিলেই তো পারিস! সপ্তাহে একদিন দুদিন খেপ খেলতে হয় না।”

বিতস্তা বলল, “করব। সৌরভ আর আমি আর-একটু সেটল হলেই করব। দ্যাখো বস, ভিতরে খিদে থাকবে, আর থার্টিজের নির্বাক সিনেমার নায়ক নায়িকার মতো চোখ দিয়ে চু কিত কিত খেলতে পারলাম না জাস্ট।”

মানালি বলল, “বাড়িতে বলেছিস সৌরভের ব্যাপারে?”

বিতস্তা বলল, “বলেছি। বাবা গাঁইগুঁই করছে।”

মানালি অবাক হল, “কেন?”

বিতস্তা বলল, “সৌরভ ব্রাহ্মণ না। বাবার জাত্যাভিমানে লাগছে।”

মানলি চোখ কপালে তুলল, “সে কী রে! তাহলে কী করবি?”

বিতস্তার চাউ শেষ হয়ে গেছিল। সে আঙুল চাটতে চাটতে বলল, “বাবাকে বলে দিয়েছি, মানুষ মঙ্গলগ্রহে ক্রিকেট খেলবে দুদিন পরে। তুমি এখন ব্রাহ্মণ মুচি মেথর দেখে বেরিয়ো না। বাবা শুনে হালকা খচেছে, তবে ক্যাজ করে নেব। চাপ নেই।”

মানালি বলল, “আর আন্টি?”

বিতস্তা বলল, “মা? মা হল জাতির, থুড়ি, আমার বিবেক। শুধু বলে বিয়ে কর বিয়ে কর।”

মানালি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “ঘর ঘর কি কাহানি ভাই। কী আর করবি।”

ইন্টারকমের ফোনটা বাজছে, বিতস্তা বলল, “নে, তোরই হবে। বিশ্বরূপদা নিশ্চয়ই।”

মানালি ধরল, “হ্যালো।”

“চলে আয়।”

ফোনটা কেটে গেল।

বিতস্তা বলল, “ঠিক গেস করেছিলাম তো?”

মানালি বলল, “আর কী! কপাল!”

বিতস্তা বলল, “মুখটা ধুয়ে যা। বাচ্চাদের মতো খাস এখনও। ঠোঁটের কোনায় চাউ লেগে আছে। তোর একটা বয়ফ্রেন্ড দরকার ছিল। এই সময় ঠোঁট দিয়ে চাউটা টুক করে খেয়ে নিত।”

মানালি বাঁ হাত দিয়ে বিতস্তাকে ঘুসি মারল, “সব সময় এক জিনিস ভেবে যাচ্ছিস। ভাক।”

বিতস্তা চোখ মারল, “জওয়ানি কা জোশ বেটা, তুম নেহি সমঝোগে রমেশ বাবু।”

মানালি রেগে গেল, “কেন বে? আমার কি জওয়ানি নেই? সব শিলা কি জওয়ানি তোরই আছে?”

বিতস্তা হাসতে হাসতে হাত নাড়ল, "ব্যাপারটা তো তাই দাঁড়াচ্ছে, তোকে দেখে তো মনে হয় এসব নিয়ে তোর কোনও ইন্টারেস্টই নেই। হাউ ক্যান ইউ বি সো কাম মা? হাউ?"

মানালি বলল, "থাম। তোর সঙ্গে এত ভাট বকতে থাকলে বিশ্বরূপদা খচে যাবে। আমি যাই।"

বিতস্তা বলল, "যা যা। দেরি না, যা।"

মানালি ওয়াশরুমে মুখ ধুয়ে মুখ-টুখ মুছে বিশ্বরূপদার চেম্বারে ঢুকল।

বিশ্বরূপদা ল্যাপটপে কাজ করছিল। তাকে দেখে বলল, "পেজ ফোর না, ওটা পেজ থ্রি-ই বানা।"

মানালি বুঝল না, "মানে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "পেজ থ্রি নিউজ বানা অ্যাবাউট ধ্রুব বাগচী অ্যান্ড ঈপ্সিতা বাগচী। স্টোরিটা এভাবে বানা যে ফেমাস ডাইরেক্টর ধ্রুবর ঘর ভাঙল কেন? শ্রীপর্ণা ঘোষাল, নাকি অন্য কেউ? ঈপ্সিতা বাগচী কেন এত দূরে গিয়ে জনসেবা করে যাচ্ছেন? এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?"

মানালি হাঁ করে বিশ্বরূপদার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "না। সব ঠিক আছে।"

মানালি বলল, "তাহলে এরকম একটা ডিসিশন নিলে কেন হঠাৎ করে?"

বিশ্বরূপদা কাঁধ ঝাঁকাল, "আমার ইচ্ছে। একটা লোক ফালতু অ্যাটিটিউড নিয়ে যাবে, আর আমরা তাকে খোলা বাজারে ফ্রি স্পেস দিয়ে দেব, তা আর হবে না। অনেক হয়েছে লুকোচুরি। ধ্রুব বাগচীকে এক্সপোজ করার টাইম এসে গেছে। নিউজ হিসেবেও পাবলিক খাবে। আমাদের এক্সক্লুসিভ নিউজ থাকবে। একটা গোটা পাতা জুড়ে।"

মানালির নার্ভাস লাগছিল। বলল, "সব আমার নামে যাবে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "হোয়াই নট? তোর আবার কী প্রবলেম হল?"

মানালি বলল, "তুমি বুঝতে পারছ এই নিউজের ফলে ঠিক কী কী ঘটতে পারে? তা ছাড়া... আমি ঈপ্সিতা ম্যামকে কথা দিয়েছিলাম, ওঁর রিলেশন সম্পর্কিত কোনও কিছু এক্সপোজ করব না।"

বিশ্বরূপদা মানালির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "ওকে, নিউজটা এমনভাবে বানা তুই ঈপ্সিতাকে মিট করিসনি। তাহলে হবে তো?"

মানালি উশখুশ করে বলল, "তোমার আবার কী হল? ধ্রুব বাগচীর সঙ্গে কি তোমার কোনও ইগো ক্ল্যাশ হল?"

বিশ্বরূপদা পেপারওয়েটটা হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল, "হতেই পারে। একটা লোক ঘরে বসে বিশ্বসুদ্ধ লোককে তুচ্ছ প্রমাণ করে যাবে, আর তার সিরিয়াস প্রবলেমগুলো দেখাতে গেলে সে ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে ফেলবে, আমি তো তা হতে দিতে পারি না। লিখে ফেল।"

মানালি মাথা নিচু করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "আমার এথিক্সে আটকাবে। তুমি লেখো বরং। আমাকে তো এই হাউসে চাকরি করতে হবে বিশ্বরূপদা। তুমি বাইরে চলে যাবে বা অন্য চাকরি পেয়ে যাবে তোমার যা এক্সপেরিয়েন্স আছে। আমার কী হবে?"

বিশ্বরূপদা বিরক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে হাতে ধরে কাজ শেখাচ্ছি আমি। বাকিদের মধ্যে তুই-ই একটু কমজোরি, সেটা তুইও জানিস। সব কিছুর মধ্যে ইনভলভড হয়ে যাস, রিঅ্যাক্ট করে ফেলিস বলে এখনও তোকে যতটা পারি আমিই গার্ড দি। এবারও দেব। আর কিছু?"

মানালি উঠল, "ওকে। লিখছি। দেখে দিয়ো। তবে নিজের ইচ্ছায় আমি কাজটা করব না। তোমার কথাতেই করব। এটা মনে রেখো।"

আর একটা কথাও না বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিশ্বরূপদা কী বলে শোনার জন্য দাঁড়াল না।

২১

"তোমার অপরাধবোধ হচ্ছে না তো?" প্রশ্ন করল দীপ।

দীপ সোফায় বসে ছিল। ঋতি খাটে শুয়ে। অনাবৃত। গায়ে কেবল একটা চাদর।

ঋতি দীপের দিকে তাকিয়ে হাসল, "একটু ব্যথা আর ছাড়া কোনও বোধ হচ্ছে না।"

দীপ বলল, "ব্যথা? কোথায়? মনে?"

ঋতি বলল, "তোমার কী মনে হয়?"

দীপ বলল, "হুঁ। ইট হার্টস।"

"তুমি ওই গানটা জানো? তুমি নরম ঠোঁটে স্বেচ্ছা ব্যথার নীল?"

দীপ ঋতির দিকে তাকাল, "চন্দ্রবিন্দু?"

ঋতি হাসল, "ইয়েস।"

দীপ বলল, "ইয়েস।"

ঋতি বলল, "করো তাহলে।"

দীপ বলল, "আমি গান জানি না।"

ঋতি বলল, "আমি জানি না। করতেই হবে।"

দীপ বলল, "বেসুরো? শুনলে পালাবে না তো?"

ঋতি বলল, "না করলে পালাব। প্লিজ।"

দীপ একটু গুনগুন করে বলল, "ধুস। হচ্ছে না।"

ঋতি হেসে বলল, "জীবন কত অদ্ভুত না? দিন দু-এক আগেও আমরা দুজন দুজনকে চিনতাম না। সেক্টর ফাইভেই হয়তো পাশাপাশি গেছি, কিন্তু কোনও দিন মুখোমুখি হইনি।"

দীপ সোফা থেকে উঠল। ঋতির পাশে বসে ঋতির চুলে আদর করতে করতে বলল, "আর একমাস পরে সবটাই লং ডিসট্যান্স রিলেশনশিপ হয়ে যাবে।"

ঋতি বলল, "প্লিজ মনে করিয়ে দিয়ো না। তবে তুমি যদি চাও..."

দীপ বলল, "তুমি যদি চাও সূর্যকে নিয়ে যাব তোমাদের বাড়ি?"

ঋতি বলল, "জানি। এটা নচিকেতার গান। আমি সিরিয়াস দীপ। তুমি যদি চাও আমি যাওয়াটা ক্যান্সেল করে দেব।"

দীপ বলল, "চাকরি চলে যায় যদি?"

ঋতি বলল, "যাক না। ক্ষতি কী?"

দীপ বলল, "তোমার অনুশোচনা হবে না কোনও দিন?"

ঋতি অধৈর্য হল, "আজ থেকে এক বছর পরে কোনও এক অচেনা শহরে একা একা থাকার চেয়ে আমি আমার প্রিয়জনের কাছে থাকাটা বেশি প্রেফার করব দীপ।"

দীপ বলল, "জীবনটা সত্যিই অদ্ভুত ঋতি, দিন কয়েক আগে আমিও স্টক মার্কেট ছাড়া আর কিছু বুঝতাম না। আজ আমি একবারও দেখিনি সেনসেক্সের কী হাল। আমার ফান্ডগুলো কোন পজিশনে আছে। ইউ চেঞ্জড মি। ইউ চেঞ্জড মি আ লট।"

ঋতি দীপের হাতটা নিয়ে চুমু খেল, "আমাকে একজন বলেছিল প্রেম এমন একটা জিনিস যেখানে কারও সঙ্গে দেখা হবার পরে অদ্ভুত ভাবে সব কিছু তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমি জানি না দীপ, তোমার মধ্যে কী আছে। কিন্তু কাল থেকে কী যে হয়েছে, তুমি যাবার পর থেকে আমি অন্য কিছু নিয়ে ভাবতেই পারছি না। আমি জানি, আর পাঁচটা লোক আমাকে খারাপ মেয়ে ভাববে... কিন্তু..."

দীপ ঋতির কথা শেষ করতে না দিয়ে ঋতিকে কাছে টেনে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল।

বলল, “আর পাঁচটা লোক আমরা কী করব সেটা ঠিক করবে না ঋতি। আমরা কী করব সেটা আমি আর তুমি ঠিক করব।”

ঋতি বলল, “সো দীপবাবু? অফিশিয়ালি আজ থেকে তুমি আর আমি আজ ভার্জিনিটি হারালাম, বলো?”

দীপ হাসল “ইয়েস। অফিশিয়ালি। অ্যান্ড ইট ফিলস লাইক হেভেন।”

ঋতি বলল, “আমরা এবার বেরোতে পারি না? আমার কেমন ভয় ভয় লাগছে। যদি পুলিশ রেইড হয়?”

দীপ বলল, “আমার মনে হয় না এত ভালো হোটেলে পুলিশ আসবে। ওসব সস্তার হোটেলে হয়। তা ছাড়া অ্যাপটা যথেষ্ট রিলায়েবল।”

ঋতি বলল, “আইডিগুলো নিয়ে রেখে দিয়েছে। ওগুলো দিয়ে কী করবে?”

দীপ বলল, “সেটা তো সিকিউরিটি পারপাস। রিসেপশনে বলল, শুনলে না? বেরোনোর সময় ফেরত দিয়ে দেবে।”

ঋতি বলল, “হোটেল যতই সেফ হোক, আমরা এর পর অন্য কিছু খুঁজি বরং।”

দীপ বলল, “তাই হোক। চলো লেটস ম্যারি।”

ঋতি ব্যাজার মুখে বলল, “ধুস! তুমি একেবারেই রোম্যান্টিক নও! এটা কোন ধরনের প্রোপোজ হল?”

দীপ বলল, “তুমি কোন ধরনের প্রোপোজ চাও?”

ঋতি বলল, “অ্যাটলিস্ট জ্যোৎস্না রাত হবে, ক্যান্ডেল লাইট ডিনার হবে। এই দুটো ক্রাইটেরিয়া তো থাকতেই হবে। আর হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ডে ভায়োলিন না, বাজবে ‘তুমি যে আমার’।”

দীপ বলল, “তথাস্তু। লেকিন, পূর্ণিমা কব হ্যায়? আরে ও সাম্বা, পূর্ণিমা কব হ্যায়?”

ঋতি হেসে ফেলল, “এক কাজ করো, রুম সার্ভিসে ফোন করে একটা ক্যালেন্ডার আনাও।”

দীপ বলল, “ভালো মনে করালে, রুম সার্ভিসের কথায় মনে পড়ল। লাঞ্চ অর্ডার করে দি?”

ঋতি বলল, “এখানে খাবে?”

দীপ বলল, “তাহলে কোথায় খাবে?”

ঋতি বলল, “হাইওয়ের কোনও ধাবায়?”

দীপ খাটে শুয়ে পড়ল, “পারলাম না। জাস্ট আর ড্রাইভ করতে পারলাম না বস। আমি ল্যাদ খেয়ে গেছি। আজ থেকে আমি সংসারী মানুষ। ভুঁড়ি বাগিয়ে সংসার করব, ব্যস।”

ঋতি বলল, “তাহলে আমিও ছেড়ে চলে যাব। ভুঁড়ি আমার দু চোখের বিষ। ইয়াক। আমি কল্পনাও করতে পারছি না তোমার ভুঁড়ি!”

দীপ বলল, “আর-একটু দূর কি শোচো। আমার একটা বড়ো টাক হয়েছে। বারান্দার মতো। ইয়াব্বড়ো একটা ভুঁড়ি। তুমি অফিস যাওয়ার আগে আমাকে একটা ইয়াব্বড়ো টিফিনকৌটো ধরিয়ে দিলে। আমি অফিস গিয়ে সে টিফিন খুললাম। টিপিক্যাল বাঙালি টিফিন। ভাত। ট্যালট্যালে ডাল। মাছের ঝোল।”

ঋতি বলল, “ঈশ!!! ছিঃ! আমি দূর কেন, কোনও ভাবেই এত কিছু ভাবতে পারছি না। আমাকে দিয়ে দয়া করে এসব ভাবিয়ো না। তোমার পায়ে পড়ি।”

দীপ বলল, “জিম পাঠানোর ট্রাই নেবে নাকি?”

ঋতি বলল, “সে যা ইচ্ছা করো, কিন্তু ভুঁড়ি যেন না হয়। ওর থেকে বড়ো টার্ন অফ আর কিছু হয় না আমার কাছে।”

দীপ বলল, “ওকে ম্যাম। তাই হোক।”

কলিং বেল বাজল।

ঋতি বলল, “দ্যাখো কে এল। পুলিশ না তো?”

দীপ বলল, “ধুস! পুলিশ কেন হবে? এত ভয় পাও কেন? দাঁড়াও দেখি।”

দীপ উঠল। জামাটা পরে কি-হোলে চোখ রেখে বলল, “হোটেলের বয়।”

ঋতি শ্বাস ছাড়ল, "উফ! ভয় পেয়ে গেছিলাম সত্যি।"
দীপ দরজা খুলল, "কী চাই?"
ছেলেটা বলল, "স্যার রিসেপশনে লাঞ্চের জন্য বলেছিলেন। কিছু লাগবে?"
দীপ বলল, "আমি ফোন করছি। নক করার দরকার নেই, ওকে?"
ছেলেটা বলল, "ওকে স্যার।"
ছেলেটা যেতে ঋতি বলল, "এই চলো তো। আমার একদম টেনশন পোষায় না। কলকাতা এখনও যথেষ্ট সেফ না আনম্যারেড কাপলদের জন্য।"
দীপ কাঁধ ঝাঁকাল, "আমার আচ্ছা খাসা ল্যাদটা নষ্ট হল। ঠিক আছে। তাই হোক, আমি ওয়াশরুম যাই। তুমি যাবে আগে?"
ঋতি উঠল, "না, যাও রেডি হয়ে নাও। আমিও যাই। ফালতু দেরি করে লাভ নেই।"
দীপ ওয়াশরুমে ঢুকল। ঋতি তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় দীপের ফোনটা ভাইব্রেট হতে শুরু করল। ফোনটা ঋতির চোখের সামনেই ছিল। ঋতি দেখল "চিত্রলেখা" নামটা ভেসে উঠছে। সে ফোনটা ধরল না।
দীপ বেরোলে বলল, "চিত্রলেখা কে?"
দীপ ঋতির দিকে তাকিয়ে একটু থতোমতো খেয়ে বলল, "কলিগ। কেন বলো তো?"
ঋতি বলল, "টোটাল কাব্যিক নাম তো! ফোন করেছিল।"
দীপ মুখে ছদ্ম বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, "উফ, এঁরা একদিন ছুটি নিতেও দেবে না। অফিস জুনিয়র, বুঝলে তো? একেবারে কিছুই কাজ জানে না। ক্ষণে ক্ষণে শুধু বিরক্ত করতে জানে।"
ঋতি হাসল, "বিরক্ত না, ওরম বলে না। এমন হ্যান্ডু সিনিয়র থাকলে একটু জ্বালানো তো হক বনতা হ্যায় বস। জানো তো, আমারও এরকম একজন সিনিয়র ছিল অফিসে। আমি খুব বোকা সেজে তাকে ফোন করতাম। একদিন সানডেতে তাকে ফোন করেছিলাম। তার বউ ধরে সে কী ঝাড়! কেন অফিস আওয়ারসের বাইরে ফোন করেছি এটসেট্রা এটসেট্রা। বোঝো! আমি তখন জাস্ট কয়েকদিন হল জয়েন করেছি। ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হয়েছে আর নতুন প্রোজেক্ট দিয়েছে। আমি কী করে বুঝব ব্যাটার বউ অমন সন্দেহ করে। ইনফ্যাক্ট উনি যে ম্যারেড সেটাই জানতাম না। খুব কেঁদেছিলাম।"
দীপ বলল, "হুঁ। ক্রাশ ছিল তাহলে।"
ঋতি চোখ নাচাল, "জ্বলল?"
দীপ ঠোঁট ওলটাল, "সুন্দরী বউ হবে। আরও কত জ্বলা বাকি!"
ঋতি বলল, "সুন্দরী না ছাই। তুমিও তো কম হ্যান্ডু না বাপু। তোমাকেও আমি চোখে চোখে রাখব দেখে নিয়ো। একদম অন্য মেয়েদের দিকে তাকাবে না, চোখ গেলে দেব।"
বলেই ঋতি হাসতে শুরু করল।
দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আবার ফোনটা বেজে উঠল।
ঋতি বলল, "এই, ফোনটা রিসিভ করো। নইলে বারবার ফোন করবে।"
দীপ বিরক্ত গলায় বলল, "ছাড়ো তো। রিসিভ করলেও হ্যাজ দিতে শুরু করবে। অত হ্যাজ এখন নিতে পারব না। চেক আউট করি চলো।"
ঋতি বলল, "এক কাজ করি? আমি রিসিভ করি? ঝাড়ব না, বিলিভ মি। ভালো করে কথা বলি।"
দীপ আঁতকে উঠেও সামলে নিল, "না না, কোনও দরকার নেই। চলো চলো বেরোই।"
ঋতি অবাক হয়ে বলল, "তুমি এত রিঅ্যাক্ট করে ফেলছ কেন?"
দীপ নিজেকে সামলে নিল, "আরে সেটা না, অফিসে শরীর খারাপ বলেছি না, এখন যদি তুমি ধরো তখন অন্য ঝামেলা হতে পারে। ভেবে নেবে অ্যাপো মারছি। বুঝলে তো?"
ঋতি মাথা নাড়ল, "পয়েন্ট। ওকে। চলো বেরোই।"

দীপ বলল, “তোমার ইচ্ছাই থাকল। তবে হাইওয়েতে ধাবায় পৌঁছোতে পৌঁছোতে খিদে পাবে না তো?”

ঋতি হাসল, “পাবে না। এত চুমু খেয়েছ পেট ভরে গেছে।”

২২

মানালি ঘুমাচ্ছিল।

ঘুম ভাঙল ফোনের শব্দে।

মানালি কোনও মতে হাত বাড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করল, “হ্যালো।”

“কি রে, এটা কী নিউজ করেছিস?!” বিতস্তার উত্তেজিত গলা ভেসে এল ওপাশ থেকে।

মানালি ঘুমচোখে বলল, “রাখ এখন। পরে করছি।”

বিতস্তা বলল, “শোন শোন শোন। রাখিস না প্লিজ।”

মানালি বিরক্ত গলায় বলল, “বল। কাল সাড়ে এগারোটায় বাড়ি ফিরেছি সব কাজ সেরে। আজকে যাওয়ার কথা ছিল না তো নিউজটা। চলে গেছে?”

বিতস্তা বলল, “সেটাই তো বলছি। পেজ থ্রি নিউজ এত প্রম্পট বেরোয় এই প্রথম দেখলাম। আর তার ওপর এ তো পাতাজোড়া কেচ্ছা রে! কেচ্ছা নামানো তাও যুদ্ধকালীন তৎপরতায়! ইম্প্রেসিভ!”

মানালি বলল, “দেখিনি নিউজপেপার এখনও। রাখ দেখছি।”

বিতস্তা বলল, “ওকে, দেখা মাত্র কলব্যাক করিস। অফিস আসছিস কখন?”

মানালি বলল, “দেখি।”

ফোনটা কেটে দিল সে।

সকাল সাড়ে আটটা বাজে। মানালি উঠে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। মা তাকে দেখে বলল, “বাবা ফিরছে আজ। ছুটি পাবি?”

মানালি বলল, “দেখছি তাড়াতাড়ি চলে আসা যায় নাকি। কাগজ এসেছে?”

মা বলল, “হ্যাঁ, টিভির টেবিলে দেখ। কী এমন রাজকাজ আছে আজ যে ছুটি পাবি না?”

মানালি উত্তর না দিয়ে ড্রয়িং রুমে গেল। মা গজগজ করতে লাগল।

বহুদিন পরে তার এমন পাতাজোড়া একটা স্টোরি বেরিয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ নিজের নামটা দেখল মানালি। তারপর নিউজটা পড়তে শুরু করল। গত রাতে বিশ্বরূপদার সঙ্গে বসে যতটা লেখা হয়েছিল তেমনটাই বেরিয়েছে। ঈপ্সিতা বাগচীর একটা ছবিও বেরিয়েছে কাগজে।

শ্রীপর্ণা ঘোষালের সঙ্গে ধ্রুবর একটা ছবি বেরিয়েছে।

“কী কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ধ্রুবর? শ্রীপর্ণা, নাকি অন্য কেউ? পর্দার আড়ালে কে? খুঁজলেন মানালি।”

হেডলাইনটা এই। কাগজটা নিয়ে নিজের ঘরে গেল সে।

উত্তেজিত লাগছিল খানিকটা।

একটু ভেবে বিশ্বরূপদাকে ফোন করল সে। একটা রিং হতেই ধরল বিশ্বরূপদা, “এই তো, তোর ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, বল। ধ্রুব ফোন করেছে নাকি?”

মানালি কথার উত্তর না দিয়ে বলল, “নিউজটা শনিবার যাবার কথা ছিল না?”

বিশ্বরূপদা বলল, “দেরি হয়ে যেত তো। অন্য কোনও মিডিয়া নিউজটা করে দিলে ফুল কেলো হয়ে যেত। রিস্কটা নেওয়া গেল না আর কি! এত বড়ো স্কুপ অন্য কোনও মিডিয়া পেলে ছাড়ত? তোর কী মনে হয়? তুই তো এখন টক অফ দ্য টাউন হয়ে যাবি। এত বড়ো এক্সক্লুসিভ নিউজ করলি। দেখ দেখ, কত ফোন আসবে আজ।”

মানালি বলল, “হুঁ। রাখছি। শোনো আজ যাচ্ছি না। কাজ আছে।”

বিশ্বরূপদা বলল, “রাগ হল নাকি?”

মানালি বলল, “নাহ। বাবা আসবে। বাড়িতে অনেক কাজ আছে। বাই।”

বিশ্বরূপদাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দিল সে। ফোনে একটা এস এম এস এসেছে। ঈপ্সিতা বাগচীর। সকালেই এসেছে। লেখা, "ফ্রি থাকলে ফোন করবেন একটু।"

মানালি বেশ খানিকক্ষণ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটু ভেবে ফোনটা করল।

ঈপ্সিতা ধরলেন একবারেই, "গুড মর্নিং।"

মানালি খানিকটা কুণ্ঠিত ভাবে বলল, "গুড মর্নিং ম্যাম। নিউজটার ব্যাপারে ফোন করেছেন?"

ঈপ্সিতা বললেন, "হ্যাঁ। আমার একটাই কথা বলার। আমি ভেবেছিলাম এখনও হয়তো কেউ কেউ আছে যাকে ভরসা করা যায়। আপনাকে দেখে আমার তেমনটাই মনে হয়েছিল। ভুলটা আজ ভাঙল।"

মানালি বলল, "দেখুন ম্যাডাম, আমি এই ব্যাপারে একেবারেই কিছু বলতে পারব না। নিউজটায় শুধু নামটা আমার গেছে। গোটাটাই আমার বস বিশ্বরূপদার পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা।"

"রিপোর্টটা তো আপনার নামেই হয়েছে। আর দিনের শেষে সেটাই ম্যাটার করবে, তাই না?" ঈপ্সিতার গলাটা শান্ত।

মানালি একটু থেমে বলল, "দেখুন ম্যাম, আমার কেরিয়রটা জাস্ট শুরু হয়েছে। অনেক সিদ্ধান্তই আমি নিতে পারি না যেটা হয়তো নিতে চেয়েছিলাম। এই স্টোরিটার ব্যাপারও একেবারেই তাই। ধ্রুব বাবুর সঙ্গে বিশ্বরূপদার সামান্য কথা কাটাকাটি থেকে যে এই নিউজটা তৈরি হবে, বিশ্বাস করুন ম্যাম, আমি কালকে এই সময়ে দাঁড়িয়েও ভাবতে পারিনি।"

ঈপ্সিতা বললেন, "বিশ্বাস করা না-করার ওপরে তো আর কিছু দাঁড়িয়ে নেই এখন। যা হবার তা তো হয়েই গেল। যাই হোক, ভালো থাকুন। আর হ্যাঁ, ওকে তো চেনেনই। একটু সামলে থাকবেন। নিজের মত অনুযায়ী কিছু না ঘটলে লোকটাকে আর চিনতে পারা যায় না।"

ফোনটা কেটে গেল।

মানালি ফোনটা অফ করে সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল। মা ঘরে এসে বলল, "টিফিন রেডি আছে। স্নান করে নিয়ে যাস।"

মানালি বলল, "আজ ছুটি নিলাম।"

মা খানিকক্ষণ অবিশ্বাসী চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সূর্যটা কোনদিকে উঠেছে আজ কে জানে।"

মা বেরোলে মানালি ফোনটা নিয়ে অন করল।

বাবাকে ফোন করল। বাবা বলল, "কি রে, এই ফ্লাইট থেকে নেমে ফোন অন করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ফোন? বল কী বলবি।"

মানালি বলল, "আর কতক্ষণ বাবা?"

বাবা বলল, "আর বড়োজোর দেড় ঘণ্টা। কী আনব বল।"

মানালি বলল, "কিছু আনতে হবে না। শিগগির এসো তো।"

বাবা অবাক গলায় বলল, "শিগগির মানে? কী হল আবার? মা ঠিক আছে তো?"

মানালি বলল, "উফ, তুমিও না! ওসব কিছু না। তুমি এসো, তারপর কথা হবে।"

বাবা ফোন রাখতে মানালি ফোনটা আবার অফ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখল ধ্রুব বাগচী টেক্সট করেছেন, "কনগ্র্যাচুলেশনস।" শুধু এই শব্দটা লেখা। আর কিচ্ছু না।

মানালি প্রথমে ভাবল রিপ্লাই দেবে। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত বদলাল। তার ফোন বাজতে শুরু করল আবার। মানালি দেখল এবার শ্রীপর্ণা ফোন করছেন, ধরল সে, "হ্যালো।"

"এসব কী হল আজ?"

শ্রীপর্ণা ওপাশ থেকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

মানালি বলল, "আই ক্যান এক্সপ্লেইন ম্যাম।"

শ্রীপর্ণা বললেন, "কী এক্সপ্লেইন করবে? আর কী বাকি আছে এক্সপ্লেইন করার? সেই ধ্রুবকে জড়িয়েই নিউজটা করতে হল?"

মানালি বলল, "গোটাটাই এডিটরের নির্দেশে ম্যাম।"

শ্রীপর্ণা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "আজ আমার জন্মদিন। তোমরা কী অসাধারণ গিফটটাই না দিলে আজ! স্পিচলেস!"

মানালি বলল, "প্লিজ ম্যাম। রাগ করবেন না। আমার ওপর যেমন যেমন ইন্সট্রাকশন ছিল তেমনটাই লিখেছি।"

শ্রীপর্ণা বললেন, "একজন মেয়ে হয়ে এই লাইনটা লিখতে লজ্জা হল না তোমার? এটা... এটা কী লাইন? শ্রীপর্ণার ফাঁকা ফ্ল্যাটে বারবার কীসের আকর্ষণে যেতেন ধ্রুব? ছিঃ! একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে তোমরা এভাবে খোলাবাজারে খেলো করে দিলে! আমি ভাবতেই পারছি না।"

মানালির দম আটকে আসছিল। সে কোনওমতে "ম্যাম এই নিউজ রিলেটেড সব রকম কথা বিশ্বরূপদার সঙ্গে করলে ভালো হয়" বলে ফোনটা কেটে দিল।

সে কয়েক সেকেন্ড বসে ধ্রুব বাগচীকেই ফোন করল। টেনশন এতটাই হচ্ছিল তার যে আর নিজেকে সে সামলে রাখতে পারল না।

ফোনটা ধরে ধ্রুব শান্ত গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই আপনি কিছুই জানেন না নিউজটার ব্যাপারে?"

মানালি থমথমে গলায় বলল, "আমার ওপর যা ইন্সট্রাকশন ছিল তাই লেখা হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু বলার নেই আমার।"

ধ্রুব বললেন, "দারুণ কাজ করেছেন। আমি খুশি হয়েছি। এস এম এসটা পড়েননি? আমি তো আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করলাম আবার।"

মানালি বুঝতে পারল না ধ্রুব এত ঠান্ডা মাথায় কেন কথা বলে যাচ্ছেন। ঝড়ের খানিকটা আভাস সে পাচ্ছিল।

ধ্রুব বললেন, "ইয়েলো জার্নালিজম অনেক দেখেছি। তবে আপনাদের মতো নির্লজ্জ এবং নির্বোধ জার্নালিস্ট এই প্রথম দেখলাম। চাকরি চলে গেলে কী করবেন ভেবেছেন? ওহ, আপনারা তো মেয়ে। মেয়েদের তো সাত খুন মাফ। কিছু বলা যাবে না। বললেই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কেস করে দেবে।"

মানালি বুঝল ধ্রুবর রাগ ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিয়েছে। সে ফোনটা কেটে অফ করে রেখে দিল।

২৩

ঋতিকে নামিয়ে দীপের ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা হয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বারবার ফোন আসছিল রাস্তাতেই। দীপ ধরেনি। দরজা খুলে তাকে দেখে মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "ফোন ধরছিলি না কেন?"

দীপ বলল, "বারবার বলেছি যখন ফোন ধরব না তখন বুঝে নেবে ড্রাইভ করছি, রাস্তায় যা জ্যাম ছিল।"

বাবা বসার ঘরে বসে টিভি দেখছিল। বলল, "একবার ফোন করে দিলেই পারতিস। তোর মা তো সন্ধে সাতটার পর থেকেই রোজ ঘর বার করা শুরু করে দেয়। ইতিহাসে কাঁচা ছিল তো।"

দীপ অবাক হয়ে বলল, "মানে? এর সঙ্গে ইতিহাসে কাঁচা হবার সম্পর্ক কোথায়?"

বাবা বলল, "ওই যে, তোর যে রোজ ফিরতে দেরি হয় সেটা ভুলে যায়।"

মা বাবাকে ধমক দিল, "তুমি থামো তো! আমার কেমন চিন্তা হয় তা যদি বুঝতে।"

বাবা বলল, "আমার ভাগের চিন্তাটাও তুমি নিয়ে রেখেছ আগেকার দিনের সুলতানদের মতো। আমি আর কী করব।"

মা বলল, "তুই হাত পা ধুয়ে আয়, আমি খেতে দিচ্ছি।"

দীপ বলল, "না না, আমি খেয়ে এসেছি, অফিসেই। আজ আর খাব না।"

বাবা অবাক গলায় বলল, “বাবা, অফিসগুলো দেখছি আজকাল খাবারও দিচ্ছে। কালে কালে কত দেখব। আমাদের অফিসে তো ক্যান্টিনের খাবার একদিন খেলে দশদিন পেট খারাপে শুয়ে থাকতে হত। সবই আইটির দয়া।”

মা গজগজ করছিল। দীপ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে হাত পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

ঋতি মেসেজ করেছে বাড়ি ফিরে গেছে। দীপ দেখল হোয়াটসঅ্যাপে চিত্রলেখার একগাদা মেসেজ এসেছে।

শেষে একটা ভয়েস মেসেজ এসেছে। রাত আটটা নাগাদ। দীপ প্লে বাটন টিপল, ওপাশ থেকে চিত্রলেখার গলা ভেসে এল, “দীপ, তোমাকে সারাদিন ধরে বারবার চেষ্টা করে গেলাম। পেলাম না। আমি বুঝতে পারছি তুমি একটা সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে একটা ডিসিশন নিয়েছ। আমি জানি, বুঝতে পারি তুমি যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছ সেটা তোমার দিক থেকে খুবই ভ্যালিড, কিন্তু বিশ্বাস করো, ছেলেটা ইচ্ছা করে তোমাকে কথাগুলো বলেছে। আমাদের মধ্যে এমন কোনও কিছুই হয়নি। ছেলেটা একটা সাইকো দীপ। ও চায় আমার জীবনটা দুমড়ে মুচড়ে যাক। আজ ও সফল। আমি হেরে গেলাম দীপ। ভালো থেকো। এইটুকুই বলব। আর কখনও তোমাকে বিরক্ত করব না। সবশেষে একটা রিকোয়েস্ট করব। আমরা একবার শেষ বারের জন্য মিট করতে পারি? অনেক হ্যাংলার মতো কথাগুলো বললাম। তবু জানিয়ো।”

থেমে থেমে কথাগুলো একটু একটু করে বলেছে চিত্রলেখা। দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থাকল। হঠাৎ করে একটা অপরাধবোধ তার মাথায় একটু একটু করে চেপে বসছিল।

সে ফোনটা রেখে ড্রেস চেঞ্জ করে খাটে এসে বসল। ঋতি ফোন করছে। ধরল দীপ, “সব ঠিকঠাক তো?”

ঋতি বলল, “ইয়েস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।”

দীপ বলল, “ফর হোয়াট?”

ঋতি বলল, “আর কীসের জন্য হতে পারে? সব কিছুর জন্য। বিশেষ করে আজকের দিনটার জন্য।”

দীপ বলল, “তাহলে তো সেম টু ইউ বলতে হয় ঋতি রানি।”

ঋতি বলল, “বাড়িতে সব ঠিকঠাক তো? এত রাতে ফিরলে, বাবা মা কিছু বললেন না?”

দীপ বলল, “আমার তো হয়েই থাকে রাত। প্রায়ই। অতটা চাপ হয় না। তোমার বাবা কিছু বললেন বুঝি?”

ঋতি হাসল “আমারও হয়, তবে আজ একটু বেশিই হল। তবে সবথেকে খারাপ পার্ট হল আমাকে ভাত খেতে হল।”

দীপ আঁতকে উঠল, “সে কী! বলোনি তুমি যে খেয়ে এসেছ?”

ঋতি বলল, “না। বললেই মা একগাদা প্রশ্ন শুরু করে দিত। ওই গ্র্যান্ড ভাইভা অ্যাটেন্ড করার থেকে ভালো খেয়ে নেওয়া। বমি করলাম অবশ্য।”

দীপ বলল, “বোঝো। বমি করলে যখন মা কিছু বুঝল না?”

ঋতি বলল, “আমার দোতলায় ঘর তো। ওরা নিচে থাকে। বুঝবে না। এসেই মিউজিক সিস্টেমে হাই ভলিউমে গান চালিয়ে দিয়েছিলাম।”

দীপ হাসতে হাসতে বলল, “যাহ্, তাহলে তো কোনও চিন্তাই নেই।”

ঋতি বলল, “নেই আবার। হুহ। আমার মার প্রশ্নের সামনে তো কোনও দিন পড়নি, তাই বলছ এই কথা। যেদিন পাবে, দেখবে একে ফরটি সেভেনের মতো থেকে একের পর এক প্রশ্ন বেরিয়ে আসছে।”

দীপ বলল, “ওরে বাবা। সেটা আবার কবে হবে? ফ্লাইটে তো সেরকম কিছু মনে হল না।”

ঋতি বলল, “কী করে মনে হবে? তুমি তখন অপরিচিত একজন মানুষ ছিলে। এর পরে তো আর থাকবে না দীপবাবু। তখন বুঝবে।”

দীপ বলল, “আচ্ছা? বেশ তাই হোক।”

ঋতি বলল, “তো? কাল থেকে আবার সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়?”

দীপ বলল, “আর একমাস পরে তো তোমার সেটা থাকছে না। তখন?”

ঋতি বলল, “তোমাকে বলেছি না এটা মনে করাবে না?”

দীপ বলল, “তবে কী মনে করাব বলো? মনে করতে না চাইলেও তো সেটাই মনে পড়ে যাচ্ছে। কী করব?”

ঋতি বলল, “মনে করবে না ব্যস। তুমি আমাকে এমন করে ভালোবেসো যেন কোথাও যেতে না হয়। পারবে?”

দীপ বলল, “পারব। অবশ্যই পারব।”

ঋতি বলল, “ফেসবুকে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দেব ট্যাগ করে?”

দীপ বলল, “ইয়েস। গো অ্যাহেড।”

ঋতি বলল, “রাখছি। স্ট্যাটাসটা দিয়েই ঘুমোতে যাব। সকালে রিঅ্যাকশনগুলো দেখব।”

দীপ হাসল, “বেশ। গুড নাইট।”

ফোনটা রেখে দীপ সবার আগে ফেসবুক খুলে ব্লক করার জন্য চিত্রলেখার ফেসবুক প্রোফাইল খুঁজল। পেল না। বুঝল চিত্রলেখা প্রোফাইল আবার ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছে।

কয়েক মিনিট পরেই দেখল ঋতি তাকে ট্যাগ করেছে। ট্যাগটা অ্যাক্সেপ্ট করল সে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফেসবুকে কনগ্র্যাচুলেশন আসতে শুরু করল। নোটিফিকেশনের ঠেলায় দীপ নেট অফ করে দিল।

খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পরে তার ঘুম এসে গেল।

ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিল সে, ফোন রিং হবার শব্দে ঘুম ভাঙল তার। ভেবেছিল চিত্রলেখা ফোন করছে, ফোনে চোখ পড়তে ভুলটা ভাঙল। ঋতি। সে ধরল, “বলো।”

“তুমি এটা কী করলে দীপ?”

ওপাশ থেকে ঋতির গলা গম্ভীর।

দীপ অবাক হল, “কী করলাম?”

ঋতি বলল, “তুমি এত বড়ো মিথ্যাবাদী আমি আগে বুঝলাম না কেন?”

দীপের একটা হার্টবিট মিস হল, “কেন?”

ঋতি বলল, “এইমাত্র চিত্রলেখার সঙ্গে আমার কথা হল। তুমি ওর সঙ্গে রিলেশনে ছিলে? আর আমাকে সারাদিন ধরে এতগুলো মিথ্যে কথা বলে গেলে?”

দীপের মুখ থেকে নিজে থেকেই বেরিয়ে এল, “হোয়াট দ্য ফাক।”

ঋতি কেঁদে ফেলল, “আমি ভাবতেই পারছি না তুমি আমার সঙ্গে এত বড়ো একটা... জাস্ট...”

দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে আক্রমণাত্মক হল, “দ্যাখো ঋতি, আমি তোমাকে সব বলতেই যাচ্ছিলাম। চিত্রলেখা যা বলছে তার সবটা মিথ্যা। বিলিভ মি।”

ঋতি বলল, “পরে কথা বলছি। কিংবা আদৌ আর কোনও দিন তোমার সঙ্গে কথা বলব নাকি ভাবব। আমাকে আর ফোন কোরো না। বাই।”

ফোনটা কেটে গেল। দীপ সঙ্গে সঙ্গে কল ব্যাক করতে গিয়ে দেখল ঋতি ফোনটা অফ করে দিয়েছে। সে বেশ খানিকক্ষণ উঠে চুপচাপ বসে থাকল। মাথায় আগুন জ্বলছিল তার। চিত্রলেখাকে ফোন করল সে। ফোন বাজছিল। চিত্রলেখা ফোন ধরছিল না।

সাত-আটবার টানা রিং করে যাবার পরে অবশেষে চিত্রলেখা ফোন ধরল, বলল, “বলো।”

দীপ বলল, “তুমি যখন বুঝলে আমি তোমায় ফোন করছি না, আশা করি তখনই বুঝে গেছিলে তোমায় আমি চাইছি না।”

চিত্রলেখা হাসল অনেকক্ষণ ধরে। হাসতে হাসতে কেঁদে দিল শেষমেশ।

দীপ চাপা গলায় গর্জন করল, “ন্যাকামি করবে না চিত্রলেখা। একদম ন্যাকামি করবে না।”

চিত্রলেখা বলল, “তা তো করবই না। সম্পর্কে থাকতে থাকতে আর-একজনকে পেয়েই আমাকে ভুলে গেলে একটু ন্যাকামি করব না তা কি হয়? কী ভাগ্যে ফেসবুকটা ডিঅ্যাক্টিভেট করা ছিল। আর কী ভাগ্যেই না অসাবধানতাবশত লগ ইন করলাম। নইলে এত বড়ো যাত্রাপালাটা দেখার সৌভাগ্যই হত না।”

দীপের মাথায় আগুন জ্বলছিল। সে ফোনটা কেটে দিল।

ফেসবুক খুলে দেখল ঋতি তাকে ব্লক করে দিয়েছে।

২৪

“কি রে তোদের খবর কী?”

ঘরে ঢুকে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল বাবা।

মানালি বলল, “সব ঠিকঠাক। নাগপুর কেমন ছিল?”

বাবা বলল, “ভালো। খাওয়াদাওয়া কদিন বাইরে হল এই যা।”

মা বলল, “হ্যাঁ, তোমার তো ভালোই। ঘরের খাবার তো তোমার আবার মুখে রোচে না।”

বাবা বলল, “সে বললে হবে? বাইরে থাকলে বোঝা যায় ঘরের খাবারের আসল দাম। যাক গে, মানির বিয়ে ফাইনাল করে ফেলেছ নিশ্চয়ই? আমি বেরোনোর আগে তো অনেক আশার কথা শোনালে।”

মা কড়া চোখে বাবার দিকে তাকাল, “সবই তো জানো। জেনেশুনে কেন অ্যাক্টিং করছ?”

মানালি অবাক হয়ে মার দিকে তাকাল, “মানে? তোমার সবটাই প্রি-প্ল্যানড ছিল?”

মা ব্যাজার মুখে বলল, “সে যাই থাক, তুই তো আর সেসব দিনের আলো দেখতে দিলি না। কোন না কোন একটা ছেলে ধরে নিয়ে আসবি কে জানে!”

বাবা মানালির দিকে তাকাল, “কই রে, দেখালি না তো! আমাকে তো অ্যাটলিস্ট দেখাতে পারতিস ছেলেটাকে।”

মানালি বিরক্ত হয়ে বলল, “তোমরা একটু থামবে প্লিজ? আমার একদম এসব কথা ভালো লাগছে না। অফিস নিয়ে এমনিতেই ভীষণ টেনশনে আছি।”

বাবা অবাক হল, “কেন? কী হল আবার অফিসে?”

মা গজগজ করতে করতে বলল, “ও অফিস করার কী মানে বুঝি না বাপু! ফেরার ঠিক নেই, যাওয়ার ঠিক নেই, আজ এখানে যাচ্ছে, কাল ওখানে যাচ্ছে। কী দরকার আছে তোর চাকরিটা করার?”

মানালি বাবার দিকে তাকাল, “আমি বেরোই বাবা। পরে কথা বলব।”

মা রেগে গেল, “দেখলে? যেই আসল কথাটা বললাম মেয়ের ঝাল লেগে গেল। তুই তো বলেছিলি আজ ছুটি নিবি।”

মানালি উঠে পড়ল, “ঘরে আর কুড়ি মিনিট থাকলে দেখতে পাব বিকেলের মধ্যে তুমি আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছ। আমার এমনিতেই অনেক প্রেশার আছে। বেরোলাম। রাতে কথা হবে।”

ঘরে গিয়ে স্নান করে চেঞ্জ করে চার্জার আর ফোন নিয়ে মানালি বেরোল।

মা রান্না বসিয়েছিল। বাবা তাকে দেখে ফিসফিস করে বলল, “তাড়াতাড়ি ফিরিস। সন্ধেয় আমরা চাইনিজ খেতে যাব।”

মানালি রেগে ছিল, বলল, “তুমি মাকে বলো সর্বক্ষণ একই ক্যাসেট রিওয়াইন্ড না করে যেতে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি জাস্ট।”

বাবা বলল, “বলব বলব। সাবধানে যা। তাড়াতাড়ি ফিরিস।”

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মানালি ঠোঁট কামড়াল।

যখনই মনে পড়ছিল অফিস গেলেই আবার গোটা কন্ট্রোভার্সিটা সামলাতে হবে তাকে, তখনই গায়ে জ্বর চলে আসছিল। রাস্তায় খানিকটা পথ উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে একটা বাসে চড়ে বসল। ঠিক করল কোনও একটা শপিং মলে গিয়ে সারাদিন সিনেমা দেখবে, নিজের সাথে সময় কাটাবে একা একা। চাকরি করার আগে এভাবে সময় কাটাত সে। সব সময় সঙ্গী দরকার পড়ে না। একা ঘোরারও একটা আলাদা মজা আছে।

বাসটায় খুব বেশি ভিড় ছিল না। মানালি বসার জায়গা পেল। শুনতে পেল তার সামনের সিটেই কমবয়সি দুজন ছেলে বেশ উত্তেজিত ভাবে চাপা গলায় ধ্রুব বাগচীর ব্যাপারে আলোচনা করছে।

একজন বলছে, "ভাই, আমি ভাবতাম আর যাই হোক, এই লোকটা অন্তত সাদা কাপড়ের লোক। এ তো দেখছি আরও এক কাঠি সরেস। কেচ্ছাটা জানতামই না ভাই?"

পাশের জন বলছে, "যাই বল, শ্রীপর্ণা ঘোষালের মধ্যে একটা অ্যাপিল আছে। এই বয়সেও ভদ্রমহিলা নিজেকে যা তা লেভেল মেন্টেন করেছে। ধ্রুব বাগচীর আর দোষ কী! ফাঁকা ফ্ল্যাট পেত। চলে যেত।"

দুজনেই উদ্দেশ্যপূর্ণ হাসল। প্রথমজন বলল, "আমাদের কপাল দেখ, পরকীয়া করব কী, নিজেরটা করার মতো পাবলিক জোটাতেই প্যান্ট হলুদ হয়ে যাচ্ছে।"

পাশের জন বলল, "থাম, ওই লেভেলটায় গেলে সবার হয়। কোথায় ঝাঁসির রানি আর কোথায় বিছনায় মুতুনি।"

প্রথমজন রেগে গেল, "কেন বে? দাঁড়া না, চাকরিটা পেতে দে, দেখবি সামনে পিছনে দুটো করে মামণি নিয়ে ঘুরব। তুই দেখবি আর জ্বলবি, সি এফ এলের মতো ফুলবি।"

মানালির হাসি পাচ্ছিল। সে দেখতে পেল তার পাশে বসা গম্ভীর ভদ্রলোকও ছেলেদুটোর কথায় মুচকি মুচকি হাসছেন। পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ওঠার আলাদা মজা আছে। মাঝে মাঝে এমন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায়, যা মনের ভারকে অনেকটাই লাঘব করে দেয়।

ফোনটা একবার অন করল মানালি। একগাদা এস এম এস এসেছে। বেশি কিছু ভাবতে পারল না সে। ফোনটা অফ করে দিল।

হাইল্যান্ড পার্কে বাস থেকে নেমে গেল সে। সবে মলের দোকানগুলো খুলছে। খুব বেশি লোক আসেনি। বিগ বাজারে একা একা ঘুরল। এসকেলেটরে করে উপর নিচ করল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করে হঠাৎই তার চোখ পড়ল দীপের ওপরে। একা একা দাঁড়িয়ে কাচের ফাঁক দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মানালি এগিয়ে গেল, "কী ব্যাপার? অ্যাপো আছে নাকি?"

দীপ খানিকটা চমকে তাকে দেখে বলল, "ওহ আপনি! না না, ওসব কিছু নেই। অফিসের জন্যই বেরিয়েছিলাম। মাঝরাস্তায় এসে এখানে চলে এলাম কিছু না ভেবেই।"

মানালি অবাক চোখে দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেম হিয়ার। আমিও অফিস বাঙ্ক করেছি। মনে হচ্ছে না আর কোনও দিন অফিসে যেতে পারব বলে। আচ্ছা, আপনার চোখ মুখ এরকম বসা বসা লাগছে কেন?"

দীপ খানিকটা সচেতন হয়ে বলল, "ওহ, একটু স্ট্রেস যাচ্ছে আর কি!"

মানালি বলল, "আমারও তো। আজ সময়ের কণ্ঠস্বর পড়েছেন? দ্যাট বিগ ব্রেকিং নিউজ?"

দীপ অপ্রস্তুত হল, "না, মানে আজ আর কাগজ পড়ার মতো অবস্থায় ছিলাম না। কী ব্রেকিং নিউজ বলুন তো!"

মানালি বলল, "ধ্রুব বাগচীকে চেনেন?"

দীপ বলল, "না! কে সে? নামটা একটু শোনা শোনা লাগছে।"

মানালি বলল, "আপনি বাংলা সিনেমা দেখেন না?"

দীপ বলল, "সেরকম দেখা হয় না। সময় কোথায়? শেষ মনে হয় হলে গিয়ে দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে। এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে। ইন্টারভ্যালের বেশি টিকতে পারিনি। গান শুনি অবশ্য।"

মানালি হাসল, "ওহ, তাহলে আপনি ধ্রুব বাগচীকে চিনতে পারবেন না। উনি এই সময়ের একজন বিখ্যাত পরিচালক। ওঁর একটা কেচ্ছা ফাঁস করেছি আমি আজকে।"

দীপ বলল, "তাহলে তো আপনার ভালো খবর! এর জন্য এত স্ট্রেস নিচ্ছেন কেন?"

মানালি মাথা নাড়ল, "মোটেও ভালো খবর নয়। খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। আমার কপালে দুঃখ আছে। আর এই নিউজটা আমার এডিটর খানিকটা জোর করেই করালেন। তবে সেসব না, কোথাও গিয়ে একটা এথিক্সে লাগছে আমার।"

দীপ অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। মানালির কথা শুনছিল না। ওভাবেই বলল, "ও।"

মানালি বলল, "ধ্রুব বাগচীর ওয়াইফ ঈপ্সিতা খুব ভালো মানুষ। আমি হয়তো ওঁর জীবনটাকে আর-একটু কঠিন করে দিলাম।"

দীপ বলল, "আচ্ছা।"

মানালি বলল, "বাদ দিন। ভাবতে চাইছি না এসব নিয়ে। আপনি বলুন, আপনার লাভ লাইফ কেমন চলছে?"

দীপ বলল, "ভয়াবহ।"

মানালি অবাক হল, "মানে?"

দীপ বলল, "আমার কোনও লাভ লাইফ নেই। যেটুকু ছিল কাল রাতেই সব ভেসে গেছে।"

মানালি জিভ কেটে বলল, "এ বাবা, তাই জন্য আপনিও আমার মতো এভাবে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ। জীবনের ট্রাজেডি কী জানেন?"

মানালি বলল, "কী?"

দীপ বলল, "যখন জীবনে মেয়ে আসে না, তখন কেউ আসে না, যখন আসে, তখন ঠিক আর-একজনকে সাথে নিয়ে আসে। অন্তত আমার জীবনে এসেছিল।"

মানালি বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দীপ বলল, "না বোঝারই কথা, বিশেষ করে আমার সম্পর্কে যখন আপনি কিছুই জানেন না।"

মানালি বলল, "বলতে পারেন। আমারও বিশেষ কাজ নেই আজকে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া।"

দীপ বলল, "কী বলব বলুন! নিজেকে ভিলেন দেখিয়ে পৃথিবীতে কটা লোক গল্প বলেছে আজ অবধি?"

মানালি বলল, "আপনি বলুন। সে হিসেবে দেখতে গেলে আমিও তো ভিলেনই আজ। এথিক্স ভেঙেছি, বস যা বলেছে তাই করেছি, নিজের মেরুদণ্ড সোজা পর্যন্ত রাখতে পারিনি। আপনি বলতে পারেন। আমার তেমন পিএনপিসি করার মতো কেউ নেই। আপনার তথ্য সুরক্ষিত থাকবে।"

দীপ শূন্য দৃষ্টিতে কাচের জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, "সম্প্রতি এক বিয়েবাড়িতে এক মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমারও তাকে পছন্দ ছিল। তারও আমাকে। ফোন করা হল। যেভাবে সব কিছু চমৎকার ভাবে শুরু হয়, আমারও তেমনভাবেই শুরু হয়েছিল। সম্পর্কটা একটু এগোতেই আমি ব্যাপারটাতে নিজেকে তেমনভাবে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ঠিক এই সময় আর-একজনের সঙ্গে আলাপ। একদিনের আলাপেই..."

দীপ চুপ করে গেল।

মানালি বলল, "একদিনের আলাপে প্রোপোজ করে ফেললেন?"

দীপ মাথা নাড়ল, "একদিনের আলাপে আমাদের ফিজিক্যাল রিলেশন হয়ে গেল। কাল। রাত্তিরে ব্রেক আপ।"

মানালি চোখ বড়ো বড়ো করে দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, "মানে? একদিনে শুরু একদিনে শেষ? আপনি তো বুলেট ট্রেনকেও হার মানিয়ে দেবেন দেখছি।"

দীপ অপ্রস্তুত মুখে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু সাম আপ করার পরে আমারও সেটাই মনে হচ্ছিল।"

মানালি বলল, "শেষ মানে ঠিক কীভাবে শেষ জানতে পারি?"

দীপ গত রাত্রের ঘটনাটা বলল।

মানালি সবটা শুনে মাথায় হাত দিল। বলল, "এবার কী করবেন?"

দীপ ম্লান হাসল, "অনেকদিন স্টক মার্কেটের খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম না। আপাতত সেগুলোই শুরু করি। এই কদিনে যা বুঝলাম, এসব আমার জন্য না। যেমন ছিলাম তেমনই ভালো ছিলাম।"

মানালি বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। সকাল থেকে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব কেস আমি একা খেয়ে বসে আছি। আপাতত মনে হচ্ছে আমার থেকেও খারাপ অবস্থার কেউ আছে।"

দীপ বলল, "সে আর বলতে। আচ্ছা আমি এখন কি ঋতির কাছে ক্ষমা চাইব? আপনার কী অ্যাডভাইস?"

মানালি মাথা নাড়ল, "লাভগুরু হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা শূন্য। তবে সিক্সথ সেন্স বলছে এখনই ক্ষমা চাইতে গেলে জুতো খেতে পারেন। অপেক্ষা করলেই ভালো।"

দীপ বলল, "কদিন অপেক্ষা?"

মানালি বলল, "অন্তত এক মাস।"

দীপ মাথা নাড়ল, "অত দিন নেই। ও বাইরে চলে যাবে।"

মানালি বলল, "তাহলে শেয়ার মার্কেটই ঠিক আছে। খারাপ হবে না।"

দীপ অস্ফুটে বলল, "আমারও তাই মনে হচ্ছে। ধুস, আমি অফিসই যাই বরং। জিজ্ঞেস করলে বলা যাবে ডাক্তার দেখাতে গেছিলাম।"

কোনও দিকে না তাকিয়ে দীপ হনহন করে চলে গেল।

মানালি বলল, "বোঝো!"

সে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফোন অন করল।

ধ্রুব বাগচী এস এম এস করেছেন, "গেট রেডি ফর লিগাল প্রসিডিংস।"

২৫

"তোর হল কী ভাই?"

রাম কখন তার ডেস্কে চলে এসেছে দেখতে পায়নি দীপ। বলল, "ওই শরীর খারাপ বললাম তো।"

রাম তার পিঠ চাপড়ে বলল, "না ভাই, শরীর খারাপ বসকে বলেছিস ঠিক আছে। তোকে তো আমি চিনি। এ শরীর খারাপ না। অন্য কিছু হয়েছে।"

দীপ বিরক্ত হয়ে বলল, "বললাম তো শরীর খারাপ।"

রাম বলল, "ঠিক আছে। শরীর খারাপ। আচ্ছা আজকের সেনসেক্স কত বল তো?"

দীপ বলল, "জানি না।"

রাম অবাক হয়ে তার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "জানিস না? তেরা তো হো গয়া ভাই!"

দীপ বলল, "হো গয়া তো! অব খুশ? ফুটে যা এবার।"

রাম বলল, "ঠিক আছে ভাই, টেক ইওর টাইম। পরে কথা বলছি।"

রাম চলে গেলে দীপের একটু খারাপ লাগছিল। সে বুঝতে পারছিল দুর্ব্যবহারটা একটু বেশিই হয়ে গেল।

অফিসে ঢুকতে ঢুকতে দেড়টা বেজে গেছে। সমীর স্যারকে বলে দিয়েছে ডাক্তার দেখিয়ে ঢুকেছে। বেশি প্রশ্ন করেননি ভদ্রলোক। পরের সপ্তাহে আর-একবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে সেটা অবশ্য শুনিয়ে দিয়েছেন।

দীপ কিছু বলেনি আর। কয়েক দিন কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে থাকতে পারলে আরও ভালো হত। মোবাইলে কোনও ফোন আসেনি সকাল থেকে। হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক দুটোই আনইনস্টল করে দিয়েছে সে।

অফিসে সন্ধে সাড়ে ছটা অবধি কাটিয়ে বেরিয়ে দেখল রাম বেরোচ্ছে। সে নিজেই এগিয়ে গেল, "চল ভাই মদ খাওয়াব।"

রাম বলল, "তুই খাওয়াবি?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ, আমি খাওয়াব। চল।"

রাম তার দিকে তাকিয়ে হাসল, "খুব বড়ো কিছু পাকিয়েছিস, তাই তো?"

দীপও হাসল, "হ্যাঁ ভাই।"

রাম বলল, "চল। গিয়ে শুনি। তবে মদ না আজ, কফি হোক।"

দীপ বলল, "তাই হোক।"

দুজনে মিলে একটা কফি শপে ঢুকল। ওপিয়ামের মতো ভিড় নেই। ফাঁকাই ছিল।

দীপ বলল সবটাই। রাম শুনে-টুনে বলল, "এটাই হয় ভাই। বহুদিন ভুখা থাকার পর মানুষ যখন খেতে পায়, তখন সে তোর মতোই পাগলাচোদা হয়ে যায়। তোর আর দোষ কোথায়। কিন্তু যতক্ষণ না তুই, ওই কী যেন নাম বললি চিতরলেখা না কী নাম, ওই মেয়েটাকে ব্লক করলি, ততক্ষণ রিলেশনশিপ অ্যাক্সেপ্ট করা উচিত হয়নি।"

দীপ বলল, "আমি কী করে জানব সে মেয়ে রাতে লগ ইন করে ফেলবে!"

রাম বলল, "খুব ফ্রাস্ট্রু মাল। বোঝাই যাচ্ছে।"

দীপ বলল, "আমি কী করব সেটা বল। ক্যারেক্টার অ্যানালিসিস করতে দিইনি তোকে।"

রাম বলল, "তুই আর কী করবি ভাই। কোনও একটা গুরু পাকড়ে ফেল। গায়ে নামাবলি জড়িয়ে একটা খোল কর্তাল জোগাড় করে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়। তোর দ্বারা তো এর বেশি কিছু হবে না।"

দীপ বলল, "এইজন্য তোকে বলতে চাই না। সব কিছুর খিল্লি উড়িয়ে দিস।"

রাম বলল, "খিল্লি উড়াব না? এটা নিয়ে খিল্লি উড়াব না তো কী নিয়ে খিল্লি উড়াব বল তো? তোকে সিরিয়াসলি বলছি এসব থেকে দূরে থাক। কোনও মেয়ের সঙ্গেই কোনও কিছু করিস না এখন।"

দীপ বলল, "সে চাইলেও করতে পারব না, কিন্তু তুই দূরে থাকতে বলছিস কেন?"

রাম বলল, "যে হোটেলে উঠেছিলি সেখানে আই কার্ড জমা রেখেছিলি?"

দীপ বলল, "হ্যাঁ।"

রাম বলল, "ওই মেয়েটার কত সেকেন্ড লাগবে এটা প্রমাণ করতে যে তুই ওকে নিয়ে ওই হোটেলে গেছিলি?"

দীপ অবাক হল, "ও কেন এসব প্রমাণ করতে যাবে?"

রাম বলল, "আজকালকার দিনের মেয়েদের চেনো মামা? বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস টার্মটা শুনেছ কখনও?"

দীপ জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না না, ঋতি একেবারেই সে মেয়ে নয়।"

রাম দীপকে ভেঙিয়ে একইভাবে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাল মদু বেত্যা নয়। সবাই এরকমই ভাবে। তুই তো কোন ছাড়।"

দীপ বিরক্ত হয়ে বলল, "ভাট বকছিস তুই এবার। দয়া করে থাম। পোষাচ্ছে না এসব। ঋতি ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। তা ছাড়া হোটেলের ঘরে সব সময় সহবাস করার জন্যই যাওয়া হয় এরকম তো কোনও রুল নেই।"

রাম বলল, “তাহলে হোটেলের ঘরে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কী করতে যায় ভাই? সাপলুডো খেলে?”

দীপ বলল, “আড্ডা মারতেও যায়। আমি বলে দেব আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম। কী হয়েছে তাতে?”

রাম বলল, “তোকে যা বলছি তাই কর। পারলে মোবাইল নাম্বার চেঞ্জ করে ফেল। এই দুটো মেয়ের কারও সঙ্গেই কোনও রকম কন্ট্যাক্টস রাখিস না এখন।”

দীপ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল। চিত্রলেখা ফোন করছে।

রাম বলল, “ধরিস না।”

দীপ বলল, “দাঁড়া না, কী বলে দেখি।”

রাম বলল, “যা পারিস কর।”

দীপ ধরল, “হ্যালো।”

ওপাশ থেকে চিত্রলেখা বলল, “কী করছ?”

দীপ রামের দিকে তাকাল। বিরক্ত মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, “কিছু না।”

চিত্রলেখা বলল, “তোমাকে একটা খবর দেওয়ার আছে।”

দীপ বলল, “বলো।”

চিত্রলেখা বলল, “ঋতি আর আমি এখন খুব ভালো বন্ধু।”

দীপ বলল, “তোমার এক্সটাকেও জুটিয়ে নাও। একটা সাইকো জুটে গেলে ভালো থ্রিসাম হবে।”

চিত্রলেখা ফোনটা কেটে দিল।

রাম চারদিকে তাকিয়ে বলল, “আস্তে ভাই। কী সব বলছিস!”

দীপ বলল, “মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না ভাই। হট করে মাথায় রক্ত উঠে গেল।”

রাম বলল, “শোন। তোকে যা বলছি কর। সিমটা ইমিডিয়েটলি চেঞ্জ কর।”

দীপ রেগে গেল, “কী হবে চেঞ্জ করে? আমার ব্যাংক ট্রানজাকশন থেকে শুরু করে সব অ্যালার্ট এই নাম্বারে আসে। চেঞ্জ করে কোথায় যাব?”

রাম বলল, “ওসব অল্টারনেটিভ নাম্বারে শিফট করতে ম্যাক্স এক দিন লাগবে। তুই ইনবক্স চেক কর, কোন কোন কোম্পানি তোকে মেসেজ পাঠায়, কোন কোন নোটিফিকেশন পাস, সবাইকে একসঙ্গে মোবাইল নাম্বার চেঞ্জের অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দে। বেশিক্ষণ লাগবে না। ট্রাস্ট মি। শোন ভাই, তুই মেয়েদের চিনিস না, আমি চিনি, দুটো মেয়ে যদি মনে করে তোর গাঁড় মেরে তোকে সাদ্দাম হুসেন বানিয়ে দেবে, ওদের বেশি সময় লাগবে না। সো বিওয়্যার।”

দীপ বলল, “আমার দোষটা কোথায় আমাকে একটু বোঝাতে পারবি? আমার যদি মনে হয় চিত্রলেখা ন্যাগিং, চিত্রলেখা ডিজঅনেস্ট, তার জন্য যদি আমি রিলেশনটা কাটিয়ে দিতে চাই, ওকে ইগনোর করি, ঋতির সঙ্গে নতুন করে স্টার্ট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি দোষটা কী করলাম? চিত্রলেখা নিশ্চয়ই গোটা ব্যাপারটা এমন করে ঋতিকে বুঝিয়েছে, যেন আমি কতবার চিত্রলেখার সঙ্গে একইভাবে হোটেলে শুয়ে এসেছি, কিন্তু ব্যাপারটা কি তাই? তা তো নয়! ঋতি কেন আমার ফোন ধরবে না, আমার জন্য ফোন অফ করে রেখে দেবে?”

রাম চোখ ছোটো ছোটো করে বলল, “তুই হঠাৎ করে ঋতিকে নিয়ে হোটেলে গেলি কেন?”

দীপ বলল, “না যাওয়ারই বা কী আছে? শোন ভাই, এসব ব্যাপারে আমি যথেষ্ট আধুনিক। প্রেমিকাকে নিয়ে হলে কিংবা ভিক্টোরিয়ার ঝোপে বসে দোতলার কাজ সেরে প্যান্ট ভিজিয়ে বাড়ি ফেরার পাবলিক আমি নই। আমার মনে হয়েছিল রিলেশনশিপে থাকলে ফিজিক্যাল হলে প্রবলেমের কিছু নেই। সো আই ডিড ইট।”

রাম বলল, “ওয়েল, তোর কথায় যুক্তি আছে, তবে এখানে অনেক কিন্তুও আছে। ঋতি সম্পূর্ণ স্ট্রেঞ্জার একটা মেয়ে। তুই ওর সম্পর্কে কিছু না জেনেই শুয়ে পড়লি? যদি কোনও রোগ হত? বা বড়ো কোনও ট্র্যাপ হত? কী করতিস?”

দীপ বলল, “আমি ওর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলেছি। যথেষ্ট ডিগনিফায়েড ফ্যামিলি ওরা।”

রাম বলল, “বাড়ি গেছিস? ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানালিসিস করেছিস? যদি ফ্রড হত? যদি জাল কারবারি হত? কী করতি তখন? ওকে লিভ ইট, সব ছেড়ে দিলাম, ওয়ান ফাইন মর্নিং তোকে যদি ফোন করে বলে তোমার বাচ্চার মা হতে চলেছি, তখন কী করবি তুই?”

দীপ কিছু বলতে পারল না। চুপ করে থাকল।

রাম বলল, “শোন ভালো কথা বলছি। একটা ভালো ভদ্র মামণি দেখে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ কর। সব শনি থেকে দূরে থাকবি।”

দীপের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল, “আবার ম্যারেজ!”

রাম বলল, “এখনই না, দশ বছর পরে। আপাতত বনবাসে চলে যা ভাই।”

২৬

দরজা খুলে তাকে দেখে ধ্রুব অবাক হলেন না।

মৃদু হেসে বললেন, “একটা ওয়াইল্ড গেস করেছিলাম বটে। আসুন।”

মানালির নিজেরই অবাক লাগছিল। এস এম এসটা পাবার পর থেকে এমন উত্তেজনা হচ্ছিল যে সে আর কিছু চিন্তা করেনি। হাইল্যান্ড পার্ক থেকে ট্যাক্সি ধরে সোজা ধ্রুবর বাড়ি চলে এসেছে।

সে ঢুকল না। সসংকোচে বলল, “আমি আপনাকে এটুকুই বলতে এসেছিলাম...”

ধ্রুব তার কথা শেষ হবার আগেই বললেন, “আপনি একা নিউজটা করেননি, তাই তো?”

মানালি থতোমতো খেয়ে বলল, “হ্যাঁ।”

ধ্রুব বললেন, “সে তো জানা কথা। কেসটা পেপারের এগেনস্টেই করব। আপনার ভয় পাবার কিছু নেই।”

মানালি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বলল, “আমি আসি তাহলে।”

ধ্রুব বললেন, “ভিতরে আসুন। আপনি টেন্সড হয়ে আছেন। কফি খেয়ে যান।”

মানালি ইতস্তত করে ড্রয়িংরুমে ঢুকল।

ধ্রুব দরজা বন্ধ করে কিচেনে ঢুকলেন।

মানালি খানিকটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সে চুপ করে বসে থাকল খানিকক্ষণ।

ধ্রুব কফি মাগ মানালির দিকে এগিয়ে সোফায় বসে বললেন, “আপনাদের জেনারেশনের সমস্যাটা কী জানেন? আপনারা কোনও কিছু করার আগে সামনে পিছনে চিন্তা করেন না। তারপরে হঠাৎ করে হুড়কো খেয়ে গেলে খোলা বাজারে দৌড়ে বেড়ান। সত্যিটার মুখোমুখি হতেই বা এত ভয় কীসের? ফোনটা অফ করে রেখেছেন কেন?”

মানালি কিছু বলতে পারল না। ফ্যাকাশে হাসল।

ধ্রুব কফি মাগে চুমুক দিয়ে বললেন, “আমরা মানুষের প্রাইভেসিকে সম্মান করতে জানি না। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে একজন লেখক, একজন শিল্পীর থেকে অনেক বেশি দাম পায় একজন তৃতীয় শ্রেণির সিরিয়াল অভিনেতা, যে কতগুলো শেখানো বুলি কপচে অভিনয় করে চলে আসে। কেন জানেন? আমরা মেধার সম্মান দিতে জানি না। শুধু তাই নয়, এ দেশে একজন স্টার মানে আমরা যতক্ষণ না তাদের ঘরের ভিতর উঁকি না মেরে দেখতে পারছি, ততক্ষণ আমাদের কোনও শান্তি হয় না।”

মানালি বলল, “আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।”

ধ্রুব একটা সিগারেট ধরালেন, বললেন, “শুধু আপনি কেন, যে-কোনো সেন্সিবল মানুষই বুঝতে পারবে, কিন্তু তাতে কি কোনও লাভ হবে? আপনি আমাকে জাস্ট একটা কথার উত্তর দিন, আজকের নিউজটা

বেরোনোর পরে কার কী এমন লাভ হবে? ক্ষতিটা তো একটা মেয়ের হবে, যে দাঁতে দাঁত চেপে একটা পিছিয়ে পড়া জায়গার কতগুলো অনাত্মীয় ছেলেমেয়ের জন্য লড়ে যাচ্ছিল। সম্পর্ক বলতে কি একসঙ্গে থাকাটাকেই বোঝেন আপনারা?”

মানালি মাথা নিচু করে বলল, “সম্পূর্ণ সিদ্ধান্তটাই বিশ্বরূপদার... আমি আর-একবার বলছি। তা ছাড়া নিউজটা এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার কথাও ছিল না। আমি যদি জানতাম স্টোরিটা কবে বেরোবে, তার আগে নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়ে দিতাম।”

ধ্রুব মাথা নাড়লেন, “একটা যুদ্ধ হবে। একটা বড়ো যুদ্ধ শুরু হবে। আপনাকে না চাইলেও হয়তো একটা পক্ষে থাকতে হবে। আপনি জানেন আজ সকাল থেকে কটা পেপার আমাকে ফোন করেছে?”

মানালি উত্তর দেবার আগেই কলিং বেল বেজে উঠল। ধ্রুব দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “এই যে, এসে গেছে কোনও চ্যানেল। কেচ্ছার খোঁজে খোঁজে। কেচ্ছায় কেচ্ছা বাড়ে। দেখবেন কাল অন্য কোনও পেপারে আমার সম্পর্কে আরও নতুন নতুন কেচ্ছা জানতে পারবেন। এঁরা মাইনেই পান লোকের গায়ে কালি ছিটিয়ে দেওয়ার জন্য। যে কথা কেউ কোনও দিন বলেনি, সে কথাও কারও মুখে বসিয়ে দিতে এঁরা দুবারও ভাবেন না।”

ধ্রুব উঠলেন, দরজা খুললেন।

মানালি দেখল দুজন ধ্রুবর পিছন পিছন ড্রয়িং রুমে ঢুকল। দুজনের কাউকেই সে চিনতে পারল না।

ধ্রুব বললেন, “বসুন, আপনারাও বসুন। আমরা কি আরও কয়েকটা চ্যানেল আসার জন্য অপেক্ষা করব?”

দুজনের মধ্যে একটা ছেলে মাথা নাড়ল, “না স্যার, প্লিজ, আমরা আগে এলাম, আমাদের একটু অ্যাটেন্ড করুন।”

ধ্রুব বললেন, “এক্সক্লুসিভ নিউজ? সে তো আজকে বেরিয়েই গেছে সময়ের কণ্ঠস্বরে।”

সেই প্রথমজনই বলল, “স্যার, একটা জিনিসই জাস্ট জানার, ওই নিউজে যা যা লেখা হয়েছে সবই কি সত্যি?”

ধ্রুব বললেন, “আংশিক। পৃথিবীতে কোনও কিছু একশো শতাংশ খাঁটি হতে পারে না।”

দ্বিতীয়জন বলল, “স্যার শ্রীপর্ণা ম্যাডামকে আমরা ফোন করেছিলাম, উনি সব অ্যাবসার্ড বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।”

ধ্রুব বললেন, “সেটা তো বলাই স্বাভাবিক। বন্ধুত্বর সম্পর্ক আপনারা বোঝেন না।” ধ্রুব একবার মানালির দিকে তাকিয়ে আবার ছেলেদুটোর দিকে মনোযোগী হলেন, “আপনারা এবার আসুন। এই ব্যাপারে আমার একটাই বক্তব্য। নো কমেন্টস।”

ছেলেদুটো পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

ধ্রুব বললেন, “খাজনার থেকে বাজনা বেশি হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে। কে কেমন সিনেমা বানাচ্ছে তা নিয়ে কিন্তু বিন্দুমাত্র কারও উৎসাহ নেই। শুধু কে কার সঙ্গে শোবে, কে কবে কী গোপন কথা কাকে বলেছিল, সেসব নিয়ে কন্টিনিউয়াস হ্যাজ হয়ে যাচ্ছে। ওরা যা ইচ্ছা লিখুক।”

প্রথম ছেলেটা বলল, “স্যার আপনার মনে হয় না এই কন্ট্রোভার্সিটা সামনে আসার ফলে আসলে আপনার লাভই হল? আপনার বাজারটা পড়ে যাচ্ছিল, অনেকটা বুস্ট আপ হল সম্প্রতি।”

ধ্রুব আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, “যে বাজার লোকের ঘরকে পৃথিবীর সবার সামনে তুলে ধরতে বিন্দুমাত্র ভাবে না, যে বাজার মানুষের প্রাইভেসিকে বিন্দুমাত্র সম্মান দেয় না, সে বাজারের মুখে আমি মুতি। বুঝলেন?”

ছেলেদুটো এবার একরাশ অস্বস্তি নিয়ে মানালিকে দেখে বলল, “তবে আমরা আসি স্যার।”

মানালিও উঠল। বলল, “আসছি স্যার।”

ধ্রুব হাত নাড়লেন। মানালির খানিকটা অপমানিত লাগছিল। সঙ্গে নিজের প্রতি রাগও হচ্ছিল। কোনও দরকার ছিল না এরকম ঝোঁকের মাথায় ধ্রুব বাগচীর বাড়ি চলে আসার। ব্যাপারটা সবাই জানলে আরও বেশি খিল্লি হতে পারে। বিশ্বরূপদা রেগেও যাবে ভীষণ।

ধ্রুবর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতেই দুজন ছেলের একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনিও প্রেস?"

মানালি অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "সময়ের কণ্ঠস্বর।"

দুটো ছেলেই মানালির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে প্রায় একসঙ্গে বলল, "আপনিই রিপোর্টটা করেছেন?"

মানালি বলল, "হ্যাঁ।"

দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল আবার।

মানালি দাঁড়াল না। ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল একটা। উঠে অফিসের অ্যাড্রেস বলে দিল।

বিশ্বরূপদা চেম্বারেই ছিল। ল্যাপটপে কাজ করছিল। মানালিকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "কী হল? ছুটি নিবি ভেবেই নিলি না?"

মানালি বলল, "ধ্রুব বাগচীর বাড়ি থেকে আসছি। উনি লিগাল প্রসিডিংসে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। আর ভীষণ ঠান্ডা মাথায় কথা বলছিলেন। আগের মতো রেগে রেগে না।"

বিশ্বরূপদা ল্যাপটপে মন দিল, "গেলে যাবেন। আমাদের ল সেল আছে, ওরা বুঝবে। তারপর তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ হয়ে কেসটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। মাঝখান থেকে তুই নার্ভ ফেল করলি, এটাই যা কষ্ট থেকে যাবে আমার।"

মানালি চুপ করে গেল। বিশ্বরূপদা বলল, "ফোনটা অন কর দয়া করে।"

মানালি বলল, "স্টোরিটার কোথাও তোমার নাম নেই। সর্বত্র আমার নাম। তুমি কেস খাবে কেন? কেস খেলে আমিই খাব।"

বিশ্বরূপদা বলল, "ওই আনন্দেই থাক। এডিটরের এগেনস্টে কেসটা হবে। হলে হবে। কী আর করার আছে!"

বিশ্বরূপদা কাঁধ ঝাঁকাল।

মানালি বলল, "খাল কেটে কুমির আনলে।"

বিশ্বরূপদা তার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

২৭

দীপ দুঃস্বপ্ন দেখছিল। একটা ওভারব্রিজে উঠেছে সে। নিচ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় ওভারব্রিজটা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। কপালটা ঘামে ভিজে গেছে। মোবাইলটা বের করে সময় দেখল। আড়াইটা বাজে। বিছানার পাশেই বোতল থাকে। অনেকটা জল খেল সে।

অস্বস্তি হচ্ছিল তার। শীতের রাত। কম্বলটা সরিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল খানিকক্ষণ। শীত লাগছিল। তবু কম্বল গায়ে জড়াল না সে।

ফেসবুক গত রাত থেকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা ছিল। সে লগ ইন করল নিজের অ্যাকাউন্টে। ঋতি কিংবা চিত্রলেখা কারও অ্যাকাউন্টই দেখা যাচ্ছে না।

সে বুঝল তাকে ব্লক করা হয়েছে।

দীপ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে একটা নতুন আইডি খুলল। সেটা থেকে দুজনের প্রোফাইলে উঁকি মারল।

চিত্রলেখা বেশ লম্বা একখানা স্ট্যাটাস দিয়েছে। পুরুষ মাত্রেই ভয়ংকর, এটাই তার বক্তব্য। দীপ দেখল ঋতি সেখানে কমেন্ট করেছে। পুরুষ শুধু একটা জিনিসই চায়, সব পুরুষ সমান ইত্যাদি।

দীপ বেশ কিছুক্ষণ কমেন্টগুলো দেখল। ঋতির প্রোফাইল খুলল। প্রবল অস্বস্তির সঙ্গে সে লক্ষ করল হোটেলের রুমের কথাগুলো বারবার মাথায় চলে আসছে তার। ঋতিই কি তাহলে ঠিক? আদতে ঋতির

শরীরটাই চেয়েছিল সে? ঠিকই তো, ঋতিকে সেভাবে মিসও করছে না সে। একটা গোটা দিন চলে গেল, চিত্রলেখা কিংবা ঋতি, কাউকেই সে মিস করেনি। বরং অনেকটা বিতৃষ্ণা এসেছে সম্পর্কের প্রতি। টানটা যেটা আসছে ঋতির প্রতি, তা সম্পূর্ণই জৈবিক কারণে।

দরজা খুলে বাথরুমে গিয়ে হিমশীতল জল দিয়ে মুখ ধুল দীপ। ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে এসে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টল করল। বেশ খানিকক্ষণ ভেবে ঋতিকে মেসেজ করল, "মিসড ইউ। টেরিবলি। এক্সপ্লেইন করার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে?" মেসেজটা না চাইতেই যেন করে ফেলল সে। শরীর যে কতরকম ভাবে মানুষকে মিথ্যা বলাতে বাধ্য করে!

ঋতি ফোন করছে। দীপ ধরল।

ওপাশ থেকে ঋতির গলা ভেসে এল, "কী চাই? এত রাতে ডিস্টার্ব করছ কেন?"

দীপ বলল, "আমি তোমায় জাস্ট একটা কথাই বলতে চাই। চিত্রলেখাকে আমি ইগনোর করা শুরু করেছিলাম। আমি কখনোই ওর সঙ্গে সেভাবে সম্পর্কে ছিলাম না।"

ঋতি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "ব্যস?"

দীপ মরিয়া হল, "দ্যাখো ঋতি, আমি তোমাকে মিথ্যা বলতে চাইনি। কিন্তু তুমিই ভেবে দ্যাখো, আমি যদি তোমাকে বলে দিতাম আমি কারও সঙ্গে সম্পর্কে আছি, তুমি কি এগোতে? আমি চাইছিলাম আমাদের কেমিস্ট্রিটা ওয়ার্ক আউট করুক। জাস্ট একটাই কারণে, বিশ্বাস করো আমি চিত্রলেখার থেকে বেরোতে চাইছিলাম। ও ভীষণ ন্যাগিং, কনফিউজড, আমি জানি, ও আজকে আমায় বলেছে ও তোমার সঙ্গে নাকি দারুণ বন্ধুত্ব করেছে, তুমি দুটো দিন ওর সঙ্গে কাটাও, নিজেই বুঝে যাবে আদতে ও কেমন মেয়ে।"

ঋতি বলল, "তুমি সত্যি আমাকে মিস করছিলে?"

দীপ বলল, "তোমার ঠোঁটের পাশের তিলটার দিব্যি, তোমার পারফিউমের দিব্যি, তোমার শ্যাম্পুর দিব্যি, বিলিভ মি।"

ঋতি ফোনটা কেটে দিল।

দীপ চুপচাপ বসে রইল।

নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। খানিকটা ভয়ও হচ্ছিল। ঋতি যদি কল রেকর্ডিং করে? কেন এমন হচ্ছে বারবার? কেন নিজের ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না সে? যতবার ভাবছে সব কিছুর থেকে দূরে চলে যাওয়া দরকার, ততবারই হোটেলের ঘরটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রাত বাড়তে মনে পড়ে যাচ্ছে দরজা বন্ধ করেই কীভাবে পরস্পরের শরীরটা দখল করতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্য কোথায় কী হচ্ছে, কিছুই মাথায় আসছিল না সেই সময়টা।

ফোনটা বাজছিল দীপের।

দীপ দেখল ঋতি ফোন করছে। ধরতেই ওপাশ থেকে ঋতির গলা ভেসে এল, "তুমি সত্যি আমাকে মিস করছিলে?"

দীপ গলায় খানিকটা নাটকীয়তা আনল, "তোমার কী মনে হয়? আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি?"

ঋতি বলল, "না, আমার মনে হয় না। কালকে মিট করা যায়?"

দীপ কয়েক সেকেন্ড ফোনটা ধরে বলল, "থ্যাংক ইউ।"

***

সকালে তৈরি হয়ে দীপ নটার মধ্যেই বেরোল।

ঋতিকে যখন তুলল তখন পৌনে দশটা বাজে।

হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল তার।

এক অদ্ভুত নেশা মাথায় ভর করতে শুরু করেছিল।

দরজা খুললেন রত্না ব্যানার্জি নিজেই। মানালি খানিকটা চাপে পড়ে গেল। সে ভেবেছিল অন্য কেউ দরজা খুলবে। অফিসে ধ্রুব বাগচীর ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশি টেন্সড হয়ে ছিল সে, বিশ্বরূপদা জোর করে রত্না ব্যানার্জির ইন্টারভিউ নিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে ঋপণ এসেছে।

তাকে দেখে রত্না বললেন, “সময়ের কণ্ঠস্বর?”

মানালি বলল, “হ্যাঁ ম্যাডাম।”

রত্না বললেন, “ভিতরে এসো।”

মানালি ঘরের ভেতর ঢুকল। ঘরময় বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগের ছবি।

সে সোফায় বসে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি একা থাকেন?”

রত্না মাথা নাড়লেন “না, আমার ভাইয়ের মেয়ে থাকে আমার সঙ্গে। এখন কলেজে গেছে। ও লেকচারার।”

মানালি রত্নার দিকে ভালো করে তাকাল। এককালে যে প্রবল সুন্দরী ছিলেন তার রেশ এখনও আছে। তবে বয়স অনেকটাই থাবা বসিয়েছে সত্তরোর্ধ্ব অভিনেত্রীর চেহারায়। চুল সব সাদা। মানালি অনেককেই দেখেছে বয়স হলেও চেহারায় তার ছাপ ফেলতে দেন না। রত্না ব্যানার্জির মধ্যে সেই চেষ্টাটা নেই।

সে বলল, “শুরু করব ম্যাডাম ইন্টারভিউটা?”

রত্না বললেন, “তোমরা কিছু খাবে না?”

মানালি মাথা নাড়ল, “না না ম্যাডাম, ওইসব একদম না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।”

রত্না বললেন, “আচ্ছা। তবে শুরু করো। অনেক দিন কেউ ইন্টারভিউ নেয় না। ভুলেই গেছে সবাই।”

মানালি বুঝল রত্নার গলায় অভিমানের ছাপ স্পষ্ট। সে বলল, “শুরু থেকেই বলি? আপনার অভিনয় শুরু কার হাত দিয়ে?”

রত্না বললেন, “তুমি সিনেমার কথা বলছ না মঞ্চের? মঞ্চে আমি বারো বছর বয়েস থেকেই অভিনয় করি। ওখান থেকেই আমায় সিনেমায় নেওয়া হয়েছিল। সে এক সময় ছিল। আমার বাবার তো কিছুতেই মত ছিল না। আমার জ্যাঠামশাই বাবাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি হয়েছিলেন। প্রথম সিনেমা করি ষোলো বছর বয়েসে। “রামের বনবাস”। তারপরেই তো পরপর ডাক পেতে শুরু করলাম।”

ঋপণ উশখুশ করছিল। মানালি বলল, “আপনার ছবি নেবে ম্যাডাম?”

রত্না বললেন, “নাও। আর বারবার ম্যাডাম বোলো না। কেমন কেমন লাগে শুনতে। তুমি আমায় দিদি বলতে পারো। যদিও তুমি আমার নাতনির বয়সি।”

মানালি হাসল, “দিদিটা ঠিক আছে।”

ঋপণ কয়েকটা ছবি তুলল। রত্না বললেন, “কী আর হবে ছবি তুলে। শেষ দিনটার জন্য অপেক্ষা করছি এখন শুধু।”

মানালি বলল, “দিদি, অভিনয়ের প্রশ্ন থেকেই শুরু করি। আপনার স্বামী ফিল্মের বাইরের জগতের একজন মানুষ ছিলেন। ওঁর কোনও দিন আপনার সিনেমা করা নিয়ে আপত্তি ছিল না?”

রত্না বললেন, “সেভাবে ছিল না। বরং উলটোটা বলাই সমীচীন। ও আমাকে বরাবর উৎসাহ দিত। চার বছর আগে এক সকালে হঠাৎ সেরিব্রাল হল। সময় দিল না লোকটা।”

রত্নার চোখে শূন্যতা এল।

মানালি অপ্রস্তুত হল, “দুঃখিত দিদি। আপনাকে আঘাত দিতে চাইনি।”

রত্না হাসলেন, “নাহ, ঠিক আছে। কী আর করবে। সবাইকেই একদিন না একদিন যেতে হবেই। আজকাল আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? আমরা সবাই এক অদ্ভুত সাজানো পৃথিবীতে বেঁচে আছি। কয়েক সেকেন্ড পরে আমার কী হবে আমরা কেউ বলতে পারি না। এইসব ভেবেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখি। একসময় যেভাবে মানুষের চোখে নিজের প্রতি সম্মান দেখেছি, ধীরে ধীরে যখন দেখেছি সময়ের সঙ্গে

সঙ্গে সবটাই অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়, তখন প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত। পরে এসব ভেবেই সামলে উঠেছি।"

মানালি বলল, "অনেকেই তো টিভি সিরিয়ালে কাজ করছেন আপনার সমসাময়িকরা, আপনি করছেন না কেন?"

রত্না বললেন, "পারব না গো। বড়ো পরিশ্রম। অত পরিশ্রম এখন আর হয়ে উঠবে না। আমাকে এক প্রোডাকশন হাউস থেকে বলেছিল। আমি না করে দিয়েছি। তবে ধ্রুব, চেনো তো নিশ্চয়ই, ধ্রুব বাগচী, ওর একটা সিনেমায় আমাকে অফার করেছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। আমাকে ও বলেছে কোনও সমস্যা নেই নাকি, বাড়ি নিয়ে যাওয়া, বাড়ি দিয়ে আসা, সব কিছু নাকি ও নিজে দেখবে। আমি না করা সত্ত্বেও জোর করে এই সিনেমাটা আমাকে দিয়ে করাতে চায়। আমি ওকে এও বলেছি, সিনেমার মাঝপথে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তখন কী হবে? শুনে ছেলে তো একবারে রে রে করে উঠল। এখন এই নিয়েই ভাবছি। করব কি না। করলে প্রায় পনেরো বছর পরে স্ক্রিনে ফেরা। সঙ্গে কত ঝক্কি!"

মানালি মনে মনে কপালে হাত দিল। এখানেও ধ্রুব বাগচী! তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে বিশ্বরূপদা সব জেনে বুঝেই এই খবরটা করতে তাকে পাঠিয়েছে।

মানালি বলল, "আপনি সাম্প্রতিক কালের সিনেমা দেখেন?"

রত্না বললেন, "কয়েকটা দেখেছি। সাউথের রিমেকগুলো ইচ্ছা করেই আর দেখতে যাই না। ওরকম সিনেমা আমাদের ভালো লাগবারও কথা নয়। বড়ো পীড়াদায়ক জানো তো! এককালে এই বাংলা থেকে কত বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের লেখা নিয়ে সিনেমা হত। তারাশঙ্কর, আশুতোষ কিংবা রবীন্দ্রনাথের দেশে যে দক্ষিণ থেকে গল্প টুকে নিয়ে এসে সিনেমা বানাতে হচ্ছে এই ভাবনাটাই বড়ো কষ্ট দেয় আমায়। এর বাইরে যে সিনেমাগুলো হচ্ছে তার বেশ কয়েকটা দেখেছি। কয়েকটা মনে হয়েছে বড়ো তাড়াহুড়ো করে বানানো। কয়েকটা দেখে মনে হয়েছে একটু বেশি স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে গল্পটা আর সামলে উঠতে পারেনি। তবে এখন তো সবটাই বাজারনির্ভর। বাজার যেভাবে ঠিক করে দেয়, মানুষের স্বাদ সেভাবেই তৈরি হয়। আমাদের পছন্দ অপছন্দে কার কী যায় আসে বলো?"

মানালি বলল, "রাস্তাঘাটে বেরোলে মানুষজনের সাড়া কেমন পান?"

রত্না ম্লান হাসলেন, "বেশিরভাগই চেনে না। যারা চিনতে পারে সেলফি নিতে চলে আসে। এই এক নতুন কায়দা হয়েছে তোমাদের প্রজন্মের। মানুষ যেখানে যাচ্ছে সেলফি তুলছে। অথচ জানো, আমার মনে পড়ে, আমরা যখন প্রথম ক্যামেরা কিনেছিলাম তখন কী অবস্থা ছিল? আমার উনি, দিল্লি থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আগফা। এই কবছরে কত কিছু পরিবর্তন হয়ে গেল।"

মানালি বলল, "আপনাদের সময়ে সেই সময়ের সবথেকে বড়ো ত্রিকোণ প্রেমের ঘটনা ঘটেছিল। সে ঘটনা আপনাকে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল?"

রত্না বললেন, "মহানায়ক?"

মানালি হাসল।

রত্না বললেন, "সত্যি কথা বলতে কী, ওঁর ত্রিকোণ প্রেম ছিল না। আমরা সবাই ওঁর প্রেমিকা ছিলাম।"

বলেই হেসে ফেললেন রত্না। মানালিও হাসল। বলল, "তা বটে।"

রত্না বললেন, "এই প্রসঙ্গ থাক ভাই। ওঁদের তিনজনই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অনেক তো হল। আর কত?"

মানালি বলল, "আচ্ছা দিদি। আমি প্রসঙ্গ বদল করছি। অন্য কথা বলি, ধ্রুব বাগচীর সিনেমা যদি আপনি করেনও, সেক্ষেত্রে আপনার অসুবিধে হবে না এতদিন পরে আবার নতুন করে শুরু করতে?"

রত্না বললেন, "হবে না মানে? হবে তো বটেই। কিন্তু কী বলো তো, সাঁতার আর অভিনয় ভোলা যায় না। আমার স্বপ্নে এখনও সে দিনগুলো আসে। কীসব দিন ছিল! একদিকে রাজনৈতিক উথালপাতাল সময়,

অন্যদিকে এমন সিনেমা বলো, গান বলো, একের পর এক কিংবদন্তি! এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়!"

মানালি একটু ইতস্তত করে বলল, "ধ্রুব বাগচীকে নিয়ে আজ একটা খবর বেরিয়েছে সময়ের কণ্ঠস্বরে, সেটা পড়েছেন?"

রত্না বললেন, "হ্যাঁ, আমি কাগজ খুঁটিয়েই পড়ি। পড়েছি। আমার কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তেমন আগ্রহ কোনও কালেই ছিল না। এখন তো আরও চলে গেছে। তবে ধ্রুবর মধ্যে একটা ব্যাপার আছে জানো তো। কারও কারও মধ্যে এই ব্যাপারটা থাকে।"

মানালি অবাক হল, "কী ব্যাপার দিদি?"

রত্না হাসলেন, "কিছু কিছু মানুষকে দেখলে মনে হয় সে লোকটা কিছুতেই ভুল কিছু করতে পারে না। ধ্রুব এক্কেবারে সেই ধরনের মানুষ। আমার কেন জানি না ওকে ভীষণ সৎ মানুষ বলে মনে হয়।"

মানালি বলল, "আপনি ধ্রুবর স্ত্রী ঈপ্সিতার ব্যাপারটা জানতেন?"

রত্না বললেন, "না। জানার চেষ্টা করিনি কোনও দিন। হয়তো ওকে জিজ্ঞেস করলে বলত।"

মানলি বলল, "জানতে চাইবেন এর পরে?"

রত্না মাথা নাড়লেন, "নাহ। কাউকে বিব্রত করতে কোনও কালেই খুব একটা ভালো লাগে না। ধ্রুবর মতো একজন গুণী মানুষকে তো নয়ই। সংবাদপত্র তো লিখবেই। আমরা এই ছায়াছবির জগতের মানুষেরা যদি তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়ি তা দুর্ভাগ্যজনক হবে।"

মানালি মুগ্ধ হচ্ছিল। ভদ্রমহিলা বেশি জোরে জোরে কথা বলেন না, বয়সের ভারে অনেকটাই ক্লান্ত, কিন্তু ওঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত দৃঢ়তা আছে, অনেকদিন পরে তার মনে হল কাউকে দেখে মাথা নত করাই যায়।

সে বলল, "আপনার কি মনে হয় না রুপোলি জগৎটা খুব দুর্ভাগ্যজনক একটা জগৎ। সম্পর্কের ভাঙা গড়ার জন্য এই জগতের গ্ল্যামার অনেকাংশে দায়ী?"

রত্না হাসলেন, "না। মনে হয় না। সবাই রক্তমাংসের মানুষ। আর পাঁচটা মানুষ যা করে, আমরাও তাই করি। সম্পর্কের ভাঙাগড়া আর পাঁচটা সম্পর্কেও থাকে। আজকাল তো তোমাদের কী সব ফেসবুক না কী এসেছে, আমার ভাইঝি মাঝে মাঝে আমাকে দেখায়, ওখানেই তারা সম্পর্কে জুড়ছে, ওখানেই তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে তো বলতে হয় আধুনিক পৃথিবীটাই দুর্ভাগ্যের জগৎ।"

মানালি পরের প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। রত্না উঠলেন, "দাঁড়াও, ভাইঝি এল বোধহয়।"

রত্না দরজা খুলতে দরজা থেকে যিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে মানালি আর-একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল।

ধ্রুব বাগচী!

২৯

"একটা রাত, একটা দিন, আমার দুঃস্বপ্নের মতো কাটল।"

গাড়ি চলছিল। ঋতি কথাগুলো বলে থামল।

পেছন থেকে একটা গাড়ি অনেকক্ষণ থেকে অনাবশ্যক হর্ন বাজিয়ে চলছিল, দীপ সেটাকে সাইড দিল।

শহর থেকে শীত ছেড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। চিরপরিচিত উষ্ণতা গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিটা কোনা।

দীপের হৃৎস্পন্দন বাড়ছিল। পাশে বসে থাকা ঋতির প্রতিটা ছোঁয়া তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল।

সে বলল, "আমারও। তোমার কাছে অনেকটা ক্ষমা চাওয়া বাকি আমার।"

ঋতি বলল, "একটা মেয়ে কখনও কাছের মানুষকে কারও সঙ্গে শেয়ার করতে চায় না দীপ। আমি যখনই চিত্রলেখার কাছ থেকে তোমার কথা শুনেছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল..." ঋতি কথা শেষ করতে পারল না।

দীপ বলল, "এসব কথা থাক। হোটেল সার্চ করো প্লিজ। অ্যাপটা ওপেন করো।"

ঋতি মোবাইল বের করে হোটেল সার্চ শুরু করল। মিনিট পাঁচেক পর হোটেলের লোকেশন বলে দিল।

জ্যাম বাড়ছে শহরে। দীপের অস্থির লাগছিল। কাজের সময়েই যত বড়ো বড়ো জ্যামগুলো শুরু হয়।

আধ ঘণ্টা লাগল হোটেলে পৌঁছোতে। গাড়ি পার্ক করে তারা রিসেপশনে গেল। দুজনের আই কার্ড নিয়ে বয় রুম দেখিয়ে দিল।

দীপ দেরি সহ্য করতে পারছিল না। রুমের দরজা বন্ধ হতেই ঋতিকে জড়িয়ে ধরল।

ঋতি তাকে ছাড়িয়ে নিল, "একটু ওয়াশরুম হয়ে আসি।"

দীপ বলল, "ওকে ওকে।"

ঋতি ওয়াশরুমে ঢুকল।

দীপের হোটেলের রুমের দিকে চোখ গেল। আট ঘণ্টার স্লটে হোটেল ভাড়া নিচ্ছে সাড়ে তিন হাজার টাকা। সে তুলনায় ঘরগুলো বিরাট কিছু না। একটা বড়ো এলইডি টিভি আছে। দীপ অন্যমনস্কভাবে রিমোট নিয়ে টিভিটা চালাল।

ঋতি বেরোল মিনিট পাঁচেক পরে। দীপ টিভিটা বন্ধ করল।

ঋতি বলল, "টিভিটা বন্ধ করলে কেন? চলুক না!"

দীপ ঋতিকে জড়িয়ে ধরল। পাগলের মতো ঋতির ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল।

ঋতি দীপকে দূরে ঠেলে দিল, "প্লিজ, এখন ভালো লাগছে না।"

দীপ অবাক হল, "মানে?"

ঋতি বলল, "একটু বসি প্লিজ। একটু গল্প করি। আজ ঠিক ভালো লাগছে না।"

দীপের রাগ হচ্ছিল। সে বলল, "তাহলে হোটেলে এলাম কেন?"

ঋতি বলল, "কথাটাও তো বলা দরকার আমাদের, তাই না?"

দীপ অবাক হচ্ছিল।

এই ঋতিকে সে চিনতে পারছিল না।

ঋতি খাটের সামনের সোফায় বসল। বলল, "আমাদের কিছু কথা বলা দরকার দীপ। শুরু করি?"

দীপ বলল, "করো।"

ঋতি বলল, "চিত্রলেখাকে তোমার ঠিক কোন কারণে অপছন্দ? তুমি সন্দেহ করো ও ভার্জিন নয়? ও মিথ্যাবাদী?"

দীপ খানিকটা হকচকিয়ে গেল। বলল, "এসব কথা কখন হল তোমার সঙ্গে?"

ঋতি বলল, "উত্তরটা দাও প্লিজ।"

দীপ বলল, "হ্যাঁ। অবশ্যই তাই। যখন থেকে বুঝতে পেরেছি ও মিথ্যে কথা বলছে, আমি সরে এসেছি।"

ঋতি বলল, "আমিও তোমায় মিথ্যে কথা বলেছি দীপ। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে আমার দুটো অ্যাফেয়ার ছিল। দুবারেই আমার ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছিল।"

দীপ অবাক হয়ে ঋতির দিকে তাকাল। কয়েক সেকেন্ড পর খানিকটা নিজেকে সামলে বলল, "তবে আমাকে দেখে এতটা মুগ্ধতা? প্রথমবার হোটেলের রুমে... বললে... যেগুলো..."

ঋতি দীপের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সব ফেক ছিল। আমার মনে হয়েছিল তুমি একটা ন্যালাভোলা ছেলে যাকে বাবা-মারও পছন্দ হয়। মেয়ে হিসেবে আমি যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার লাভার দীপ। তুমি আর আমি তো অনেক ভদ্রভাবে হোটেলে এসে সব কিছু করছি, আমার লাস্ট যে এক্স ছিল তার সঙ্গে আমি যেখানে সেখানে যা ইচ্ছে করে বেড়াতাম। প্রায় সব উইকেন্ডেই, কখনও শান্তিনিকেতন, কখনও দিঘা, মন্দারমণি, বাবাকে বলতাম অফিস ট্যুরে বেরোচ্ছি, আদতে সব এসব করতে যেতাম। সমুদ্রের বালিতে রাত দেড়টার সময় সেক্স করার থ্রিল ইজ হেভেনলি..."

দীপের কথা বন্ধ হয়ে গেল। সে হাঁ করে ঋতির দিকে তাকিয়ে বলল, "এত সব কথা এখন আমায় বলছ কেন? না বললেও তো পারতে?"

ঋতি বলল, "তোমার সব কথা আমি জেনে গেছি। আমার কেন জানি না মনে হয় আমার সব কথাও তোমাকে বলে দি। আমি ভেবেছিলাম তুমি একেবারেই ভোলাভালা টাইপ ইনসান। ভেবেছিলাম সেটল হয়েই যাব সব কিছু ছেড়ে। চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তুমি একেবারেই সেরকম নও। তুমি ট্রুথ হাইড করতে পারো, তুমি সব কিছু লুকিয়ে ফেলতে পারো। আমার মনে হল আমি বরং তোমার সামনে কিছু অপ্রিয় সত্যি নিয়ে আসি। দেখি তুমি সহ্য করতে পারো কি না।"

দীপ ঋতির দিকে তাকাল। খানিকক্ষণ আগে তার নিজের ভেতরে যে উত্তেজনাটা তৈরি হচ্ছিল, ঋতির কথাগুলো সে সব কিছুর মুখে নুন ছুড়ে মেরেছে।

দীপ খানিকটা আক্রমণাত্মক হতে চেষ্টা করল, "আমি তো তোমাকে কাল রাতেই খুলে বলেছি সবটা। বলিনি?"

ঋতি বলল, "চিত্রলেখা যদি আমাকে না বলত তাহলে কি আদৌ কোনও দিন বলতে?"

দীপ বলল, "ভাগ্যিস বলেছিল। নইলে তো জানতেই পারতাম না তুমিও সব কোর্স কমপ্লিট করেই আমার কাছে সতী সাবিত্রী সেজে এসেছিলে। আমার অবশ্য প্রথমেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, যখন তুমি আমাকে চুমু খেতে চলে এসেছিলে।"

ঋতি হাসতে লাগল। বেশ খানিকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো হেসে বলল, "আমি এরকমই খানিকটা এক্সপেক্ট করেছিলাম তোমার কাছে দীপ। একটু অন্য সুরে কথা বলতেই তোমার ভিতরের অন্য মানুষটা কীভাবে বেরিয়ে এল। বিশ্বাসও করে নিলে দ্যাখো কী সুন্দর, যা বললাম সবটাই। তোমরা কখনোই মেনে নিতে পারবে না মেয়েটা প্রথম চুমু খেতে আসবে। এলে সে-ই খারাপ, তাই না?"

দীপ বলল, "মানে? যা বললে এগুলো সত্যি না?"

ঋতি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "হতেও পারে, নাও হতে পারে।"

দীপের রাগ হচ্ছিল। প্রত্যাশাভঙ্গের রাগ। সে বলল, "এই নাটকটা তুমি না করলেই পারতে ঋতি। ফোনে বলে দিতে, ব্রেকআপ হত, সেটাই ভালো হত। এখানে ডেকে আনার কোনও দরকার ছিল না।"

ঋতি বলল, "শোনো দীপ, ওইসব শরীর নিয়ে ন্যাকামো আমারও কোনও কালেই ভালো লাগে না। ভালোবাসায় শরীর আসবেই। যারা বলে আসবে না, তাদেরও পেটে খিদে থাকবে। ফোনে তো বললে হতই, আমি তোমার মুখোমুখি হতে চেয়েছিলাম।"

দীপ বলল, "তো? তুমি কী চাও?"

ঋতি উঠে তার পাশে এসে বসল। ঠোঁটটা দীপের কানের কাছে নিয়ে এসে বলল, "প্রেমটা মিথ্যে। প্রেম ছাড়া শরীরটাও। চলো বেরিয়ে যাই।"

ঋতি কাছে এলেও দীপের মধ্যে কোনও রকম যৌনাকাঙ্ক্ষা তৈরি হচ্ছিল না। বরং গোটা ব্যাপারটাই তিতকুটে লাগছিল তার কাছে। সে উঠল, "চলো।"

ঋতি উঠল না, বলল, "নিজেকে ডিফেন্ড করবে না দীপ?"

দীপ নিস্পৃহ গলায় বলল, "চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। আগে বললে অফিসটা ডুব মারতাম না।"

ঋতি বলল, "আমার আর চিত্রলেখার একসঙ্গে মুখোমুখি হবার সৎসাহস আছে তোমার?"

দীপ চোখ বড়ো করে বলল, "মানে? রিয়ালিটি শো পেয়েছ নাকি?"

ঋতি বলল, "যদি বলি তাই?"

দীপ বিরক্ত হল, "আমি বেরোলাম। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি থেকে যাও। এখানে থেকে ফালতু সময় নষ্ট করতে পারছি না জাস্ট।"

ঋতি হাসল, "এখন সবই ফালতু লাগবে। এটাই স্বাভাবিক।"

দীপ বলল, "দ্যাখো ঋতি, মরাল অফ দ্য স্টোরি ইজ, আমি তোমাদের কারও সঙ্গেই কোনও রিলেশনে যাব না। সুতরাং এসব অর্থহীন জিনিস করে কোনও লাভ নেই।"

ঋতি বলল, "আমাকে একটা কথা বলো তো। তুমি তো চিত্রলেখাকে অ্যাভয়েড করছিলে জাস্ট। মেয়েটাকে সরাসরি বলে দিলে না কেন যে তোমার ওকে পছন্দ নয়?"

দীপ বলল, "তুমি কি এভাবে ইমোশনাল অত্যাচার করার জন্য হোটেলে রুম নিতে বললে?"

ঋতি ঠান্ডা গলায় বলল, "মানুষজন যদি জানে একটা মেয়েকে ভুলভাল বুঝিয়ে হোটেলের রুমে এনে এক্সপ্লয়েট করার চেষ্টা করেছ, তোমার কী হবে ভেবে দেখেছ?"

দীপের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা শীতল স্রোত চলে গেল। সে ফ্যালফ্যাল করে ঋতির দিকে তাকিয়ে থাকল। ঋতিকে কোনও ভাবেই আর চিনতে পারছিল না সে।

৩০

ধ্রুব ড্রয়িং রুমে ঢুকে মানালিকে দেখে বললেন, "বাহ, আপনি এখানেও?"

মানালি একেবারেই শকড অবস্থায় ছিল। কিছু বলতে পারল না।

রত্না অবাক হয়ে বললেন, "ওঁর এখানে না থাকারই বা কী হল?"

ধ্রুব সোফায় বসতে বসতে বললেন, "সে আর আপনার শুনে কাজ নেই দিদি।"

রত্না বললেন, "বেশ। তুমি যখন বলছ তখন নেই।"

ধ্রুব মানালির দিকে তাকালেন, "আপনার কতক্ষণ লাগবে?"

মানালি ঋপণকে উঠতে ইশারা করে নিজে উঠে দাঁড়াল, "আপনারা কথা বলবেন। আমি আসি বরং।"

রত্না হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "একদম না। সবে তো এলে। বসো। সর্বক্ষণ তো একা একাই কাটাচ্ছি। একটু থাকো। ভালো লাগবে।"

রত্নার কণ্ঠস্বরে কিছু একটা ছিল যেটা মানালি অবজ্ঞা করতে পারল না। চুপচাপ বসে পড়ল।

ধ্রুবর প্রশ্নটায় সে হঠাৎই খানিকটা অপমানিত বোধ করছিল, রত্নার কথায় খানিকটা প্রলেপ লাগল তাতে।

রত্না বললেন, "ওঁর সামনেই বলো ধ্রুব। অসুবিধা নেই।"

ধ্রুব চোখ ছোটো করে তাকে আর ঋপণকে খানিকটা দেখে বললেন, "বলব? ওরা কারা জানেন তো?"

রত্না বললেন, "জানব না কেন। প্রেস তো। যদি তোমার সিনেমার প্রচার হয় তাহলে সমস্যা কোথায়?"

ধ্রুব বললেন, "সিনেমা শুরু হল কোথায়? আপনিই বা রাজি হলেন কখন? আমি তো সেই ব্যাপারে জানতেই এলাম।"

রত্না বললেন, "ভাবছি ধ্রুব। ভেবে যাচ্ছি।"

ধ্রুব বললেন, "বেশ। ভাবুন। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ভাবুন। আপনার ওপরই নির্ভর করে আছে এই সিনেমার ভবিষ্যৎ।"

রত্না অবাক হলেন, "এরকম ব্যাপার?"

ধ্রুব বললেন, "অবশ্যই। আমি যে চরিত্রে আপনাকে ভেবেছি, সেটা আপনি না করলে সিনেমাটাই আমি বানাব না।"

রত্না একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, "এই কিছুদিন আগেও একা একা এই ঘরে বসে থেকে যখন টিভি দেখতাম ধ্রুব, আমার প্রতিদিন মনে হয়েছে আমাকে বোধহয় আর কেউ মনে রাখেনি। সবাই সব কিছু ভুলে গেছে। মানুষ স্বর্ণযুগ স্বর্ণযুগ বলে এত মাতামাতি করে অথচ নায়করা যে সম্মানটা পেয়ে বাঁচেন তার সিকিভাগও নায়িকারা পান না। কেমন নিঃশব্দে সবাই চলে যান। অথবা হয়তো যেতে না চাইলেও যেতে বাধ্য হন। তোমার এই কথাগুলো আমাকে অনেকটা বল দিল ধ্রুব। আমি তোমার সিনেমা করব। তবে আমি বয়স্কা একজন মানুষ। আশা করব..."

ধ্রুব হাত তুললেন, "আর কিছু বলতে হবে না। ওসব চিন্তা আমার।"

পরক্ষণেই ধ্রুব মানালির দিকে তাকালেন, "নিউজটা করছেন তো?"

মানালি অপ্রস্তুত হল, "আমি শুধু এটুকু জানলাম আপনি একটা সিনেমা বানাচ্ছেন, তাতে দিদি অভিনয় করবেন। এর বেশি আমি এমন কিছুই জানি না যা নিয়ে কোনও স্টোরি করা যায়।"

ধ্রুব বললেন, "টার্মটা একদম পারফেক্ট বলেছেন। স্টোরিই বটে। আপনারা নিউজ করেন না। স্টোরি করেন।"

রত্না বললেন, "এসব কথা এখানে না বললে খুশি হতাম ধ্রুব। ও কিন্তু আমার বাড়িতে এসেছে আজকে।"

রত্না যে রুষ্ট হচ্ছেন, বুঝল সবাই। মানালি ভেতরে ভেতরে একটু স্বস্তি বোধ করল।

ধ্রুব বললেন, "সরি সরি দিদি। আর হবে না। তবে কী জানেন তো, বাড়ি বয়ে এসে কেউ যদি কেচ্ছা খুঁড়ে বের করে নিউজ করে তখন খানিকটা রাগ হওয়া জায়েজ। সব সুস্থ মানুষই হয়তো রাগ করত, যেমন আমি করেছিলাম। সকাল থেকে ফোন আর টিভির ব্রেকিং নিউজের জ্বালায়... যাই হোক।"

রত্না বললেন, "বেশ তো। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাহয় ঝগড়াটা কোরো। আপাতত বন্ধ রাখো।"

ধ্রুব কাঁধ ঝাঁকালেন, "আচ্ছা। আপাতত তাই হোক। অবশ্য আমার খুশি হবার কথা এখন। আমার এতদিনের পরিশ্রম আজ সফল হল। এবার প্রি-প্রোডাকশনের কাজ আমরা শুরু করে দিতে পারব।"

রত্না বললেন, "আর কে কে থাকবে?"

ধ্রুব একবার মানালির দিকে তাকালেন, তারপর রত্নার দিকে তাকিয়ে বললেন, "শিগগিরি জানাচ্ছি দিদি।"

মানালি বুঝল তার সামনে বলতে চাইছেন না ধ্রুব।

রত্না বললেন, "যে-ই থাকুক আমার কোনও অসুবিধা নেই অবশ্য। আমার শুধু আমার শরীরটা নিয়েই যা ভয় লাগে। কখনও খুব খারাপ হয়ে পড়লে তোমাদের বড়ো সমস্যা হয়ে যাবে।"

ধ্রুব মাথা নাড়লেন, "সেসব ব্যাপার আমি বুঝব দিদি।"

রত্না খুশি হলেন, "বেশ। তাই হোক। দেখি কতটা কী করতে পারি।"

মানালি উঠল, "আমি আসি দিদি। আমাকে আবার বাড়িতে ফিরতে হবে।"

রত্না বললেন, "অনেকটা দূরে বাড়ি তোমার?"

মানালি বলল, "হ্যাঁ দিদি। আমি আসি।"

রত্না বললেন, "বেশ। সাবধানে যেয়ো। খবরটা বেরোলে আমায় জানিয়ো একটু ফোন করে।"

মানালি হাসল, "নিশ্চয়ই দিদি। গুড নাইট।"

রত্না বললেন, "সাবধানে যেয়ো।"

মানালি আর ধ্রুবর দিকে তাকাল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

রত্না ব্যানার্জি দরজা অবধি এলেন তাদের পৌঁছে দিতে।

রাস্তায় নেমে মানালি একটা শ্বাস ছাড়ল, "উফ, দেখলি? যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।"

ঋপণ বলল, "হয়েছিল তোর আজকে। মালটা তক্কে তক্কে আছে।"

মানালি ম্লান হল খানিকটা, "আমার বোধহয় আর বেশিদিন চাকরি করা হয়ে উঠবে না।"

ঋপণ ক্যামেরার ব্যাগ ঠিক করতে করতে বলল, "ধুস, ছাড় তো! অফিসে এসব চলতেই থাকে। তবে তোকে অনেক বেশি স্টেডি হতে হবে। তোর মধ্যে এখনও কলেজ স্টুডেন্ট ভাবটা রয়ে গেছে। এইজন্যই হয়তো বিশ্বরূপদাও বেশি বেশি করে তোকে এসব সিচুয়েশনে ফেলে টেস্ট করে যাচ্ছে।"

মানালি বলল, "হুঁ, আমি তো গিনিপিগ। এক আমাকেই পেয়েছে এইসব সিচুয়েশনে ফেলার জন্য। কই বাকিদের তো ফ্যালে না!"

ঋপণ বলল, "জানিস না তবে তুই। প্রান্তিকের ঘটনাটা জানিস তো?"

মানালি মাথা নাড়ল, "কী ঘটনা?"

ঋপণ বলল, “সেই যে সেই মন্ত্রীটার কোরাপশনের নিউজটা জোর করে করাল প্রান্তিককে দিয়ে। প্রান্তিক প্রায়ই থ্রেট খায়। বিশ্বরূপদার কাছে গেছিল। বিশ্বরূপদা ভাগিয়ে দিয়েছে এই বলে যে জার্নোদের ক্ষেত্রে এসব কমন ব্যাপার। অত ভয় খেলে বাড়িতে বসে সাপলুডো খেলো গে যাও।”

মানালি বলল, “প্রবলেমটা তো অন্য জায়গায়। অতই যখন তোমার সাহস তখন নিজের নামে নিউজটা করো না বাপু। আমাদের ফাঁসাচ্ছ কী করতে!”

ঋপণ বলল, “ওখানেই তো কবি কেঁদে দিয়েছে। দেখবি কদিন পরে কোনও প্রাইজ গিভিং সেরিমনিতে ধ্রুব বাগচী আর বিশ্বরূপদা পাশাপাশি বসে চিয়ার্স করছে আর তুই দৌড়ে বেড়াচ্ছিস কেসের ভয়ে। এসবই তো হয় এই লাইনে। কেউ নিজের ঘাড়ে কোনও কিছু নিতে চায় না।”

মানালি বলল, “যে যা পারে করুক, আমার না পোষালে আমি সিম্পলি চাকরি ছেড়ে দেব।”

ঋপণ বলল, “সেই ভালো। সংসার করবি মন দিয়ে।”

মানালি কড়া চোখে ঋপণের দিকে তাকাল। তার ফোনটা বেজে উঠল। মানালি দেখল আননোন নাম্বার। সে ধরল, “হ্যালো।”

“হ্যালো, আমি ট্রিভিয়া মিডিয়া হাউজ থেকে বলছি। মানালি বলছেন?”

মানালি অবাক হল। বলল, “হ্যাঁ, বলছি।”

“একটু হোল্ডে থাকুন ম্যাম, আমাদের স্যার একটু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।”

ফোনের ওপাশ থেকে ইন্টারকমের মিউজিক শুরু হল।

মানালি বলল, “যাহ্‌বাবা।”

ঋপণ বলল, “কী কেস?”

মানালি ঠোঁট ওলটাল, “কে জানে। কিছুই বুঝছি না।”

ফোনের ওপাশ থেকে এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “মানালি বলছেন?”

মানালি বলল, “হ্যাঁ, কে বলছেন?”

“আমি বিপ্রতীপ রায় বলছি।”

মানালি অবাক হল। বিপ্রতীপ রায়? যার একার নামেই ট্রিভিয়ার নিউজ চ্যানেলটা এত বিখ্যাত? সে বলল, “হ্যাঁ বলুন স্যার।”

“কনগ্র্যাচুলেশনস আজকের নিউজটার জন্য। আজ এই শহরে এই একটাই খবর। আপনি এক্কেবারে বুলস আই হিট করেছেন মানালি।”

মানালি বুঝল না তার এত তারিফ করছেন কেন ভদ্রলোক। শুধু বলল, “থ্যাংক ইউ স্যার।”

“মানালি আপনার স্যালারির তিন গুণ আমরা আপনাকে অফার করছি। আপনি ট্রিভিয়া মিডিয়ায় জয়েন করতে আগ্রহী?”

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ এই প্রস্তাবে মানালির হাত থেকে ফোনটা পড়ে যাচ্ছিল। সকাল থেকে এত টেনশন, তার ওপর হঠাৎ করে এমন প্রস্তাব, সে কোনও মতে নিজেকে সামলাল।

৩১

ন্যাশনাল হাইওয়েতে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল দীপ। ঘণ্টাখানেক আগে হোটেল থেকে বেরিয়েছে দুজনে।

ঋতি আর গাড়িতে ওঠেনি তার। গাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসেছিল সে।

স্টার্ট যখন দিল তখন আর মাথা কাজ করছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ শহরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে যখন দেখল বারবার গাড়ি দাঁড় করাতে হচ্ছে জ্যামের জন্য, গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ধরে দিল্লি রোড ধরে ফেলল। ডানকুনির টোল প্লাজা পেরিয়ে আধ ঘণ্টাটাক চালিয়ে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করাল।

গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে দাঁড়াল। নিজের ওপর একটা অদ্ভুত রাগ হচ্ছিল তার। বারে বারে মনে হচ্ছিল আদতে সে হেরে গেছে। নিজের কাছে, নিজের ইন্দ্রিয়র কাছে।

ঝড়ের গতিতে এক-একটা গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দীপ গাড়িতে গিয়ে বসল।

দেখল রাম মিসড কল মেরেছে। কলব্যাক করল সে।

রাম ধরতে বলল, "আজ ডুব মারলি। আবার কোনও চক্করে পড়লি, তাই তো?"

দীপ বলল, "ছিল। আর থাকবে না।"

রাম রেগে গেল, "সে তো সবাই তাই বলে। কাজের সময় দেখা যায় আবার গন্ধ পেলেই পেছন পেছন দৌড়োতে শুরু করবি। কী হয়েছে, খুলে বল।"

দীপ কাটাল, "কাল বলব। ফোনে বলা যাবে না।"

রাম বলল, "কাল কেন? আজ কিঁউ নেহি? কোথায় তুই এখন?"

দীপ বলল, "দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে।"

রাম আঁতকে উঠল, "লড়কি সাথ মে? ক্যা কর রহা হ্যায় বে?"

দীপ বলল, "না না, লড়কি নেই। একাই আছি।"

রাম বলল, "একা একা কী করছিস?"

দীপ বিরক্ত হল, "বললাম তো পরে বলব। রাখ এখন।"

ফোনটা কেটে দিল সে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে গাড়ি ঘোরাল। বিকেলের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে গেল।

তাকে ঢুকতে দেখে মা বলল, "সে কী রে, আজ সূর্য কোনদিকে উঠেছিল! এত তাড়াতাড়ি চলে এলি!"

দীপ বলল, "ছুটি হয়ে গেল। আমি এখন ঘুমাব। পরে কথা বলছি।"

মা বলল, "এই বিকেলে ঘুমোবি? পাগল নাকি?"

দীপ উত্তর না দিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। জামাকাপড় পরেই খাটের ওপর শুয়ে পড়ল। অদ্ভুত একটা অস্থিরতা গ্রাস করছিল তাকে। বেশ খানিকক্ষণ পর শুয়ে থেকে যখন বাইরের ঘরে এল, দেখল বাবা মা বসে টিভি সিরিয়াল দেখছে।

বাবা তাকে দেখে বিরক্ত গলায় বলল, "দেখ, বাংলা সিরিয়াল। ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান কিছুই মানে না। এদের ধরে ধরে ম্যাপ পয়েন্টিং করানো উচিত।"

দীপ গম্ভীর গলায় বলল, "টিভিটা বন্ধ করো একটু। কথা আছে।"

মা বিরক্ত গলায় বলল, "বল না। বলতে কী অসুবিধা।"

দীপ বলল, "ঠিক আছে, এটা দেখে নাও, তারপরে বলছি।"

মা বলল, "পরে কী করে বলবি? এর পরে সন্ন্যাসী রাজা আছে, কুসুমদোলা আছে, গোপাল ভাঁড় আছে, রাত এগারোটার আগে আমি উঠতেই পারব না টিভির সামনে থেকে আজকে। যা বলার টিভি চলতে চলতেই বল।"

দীপ বলল, "আমার জন্য মেয়ে দ্যাখো। আমি বিয়ে করব।"

দীপের মুখ থেকে কথাটা বেরোতে বাবা মা তার দিকে হাঁ করে তাকাল। মার হাত থেকে রিমোটটা খসে গিয়ে মেঝেতে পড়ে সেটার ব্যাটারি বেরিয়ে গেল। বাবা বলল, "তোর নাকি নিজে নিজেই মেয়ে দেখা ছিল?"

দীপ বলল, "সব ক্যানসেল। তোমরা মেয়ে দ্যাখো। আমি বিয়ে করব।"

মা রিমোটটা তুলে ব্যাটারি লাগিয়ে টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে বাবাকে বলল, "ওর কথায় কান দিয়ো না। তুমি মেয়ে দেখে আনবে তারপর ও ঠিক ভেগে যাবে।"

বাবা বলল, "বুঝেছি। চতুর্থ পানিপথ।"

মা বলল, "মানে?"

বাবা বলল, "চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ হয়েছে আর কি! ঝগড়া করেছে।"

দীপ বলল, "দ্যাখো মা, আমি সেদিন ইচ্ছা করেই বলেছিলাম, আমার গার্লফ্রেন্ড আছে, তোমাদের কাটানোর জন্য। কোনও কালেই ছিল না। তোমরা মেয়ে দ্যাখো।"

মা বাবার দিকে তাকাল। বাবা মায়ের দিকে।

কয়েক সেকেন্ড পরে মা বলল, "কালকে তোকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাব। কথা বলিস সামনাসামনি। উনি যা চাইবেন তাই করা যাবে।"

দীপ রেগে গেল, "গুরুদেব কী করবে? তা ছাড়া এসব ভণ্ড পাবলিক আমি কাকে বিয়ে করব সেটা ঠিক করে দেবে নাকি? বাবা, তুমি মাকে বোঝাও! এসব ধর্মগুরু সবকটা জালি হয়। যে জিনিসটার অস্তিত্বই নেই, তার দালালি করে মানুষকে টুপি পরিয়ে যাবে, তারা আবার ঠিক করে দেবে কে কাকে বিয়ে করবে, এসব অ্যাবসার্ড না?"

মা রেগে গেল, "এসব কথা বলবি না আমার সামনে। আমি কিন্তু সব কিছু মানি।"

বাবা বলল, "পিকে আমিও দেখেছি দীপ, ব্যাপারটা সেটা না। ব্যাপারটা হল কী এমন হল যে হঠাৎ করে তুই বিয়ে করার জন্য এরকম খেপে উঠলি?"

দীপ বলল, "ইচ্ছা হল।"

বাবা বলল, "ইচ্ছা হওয়া ভালো। কিন্তু কোনও প্রবলেমে আছিস, সেটা থেকে বাঁচার জন্য যদি বিয়ে করতে চাস তাহলে তুই বড়ো ভুল করবি। মানে তপ্ত কড়াই থেকে ফুটন্ত তাওয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে খুব একটা লাভ হয় কি?" বাবা গলা খাঁকড়াল, "বিয়ে করে লাইফটা নরক করার কোনও অর্থ নেই।"

মা বলল, "তুমি থামো। আমি কাল সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিচ্ছি গুরুদেবের চেম্বারে। তুই আমার সঙ্গে একবারে রেডি হয়ে বেরোবি। ওখান থেকে অফিসে চলে যাবি।"

দীপ গোঁজ হয়ে রইল।

***

গুরুদেব শ্রী শ্রী একশো আট চাঁদবদন মহারাজ আলাউদ্দিন খলজির মতো একটা পদ্মফুল নাকে গুঁজে বসেছিলেন। সামনের ফরাসে খান তিরিশেক লুচি সাজানো। দীপ আর মা গুরুদেবের চেম্বারে ঢুকতে গুরুদেব ইশারায় দীপের মাকে বেরিয়ে যেতে বললেন।

মা বেরিয়ে গেল। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু দীপ আর গুরুদেব।

নাক থেকে পদ্মফুলটা নামিয়ে গুরুদেব একটা লুচি মুখে পুরে বললেন, "তোমার মা বলছেন তুমি নাকি বিয়ে করতে চাও? কেন?"

দীপ বলল, "ইচ্ছা।"

গুরুদেব বললেন, "কেন? এমন ইচ্ছা হবার কারণ?"

দীপ গুরুদেবের দিকে তাকাল। মাথার বেশিরভাগ চুল পেকে গেছে। খুব করে চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করেছেন সম্ভবত। ঘরময় চন্দনের গন্ধ। ঘরের ধুপকাঠিতেও চন্দনের গন্ধ।

দীপ একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আপনার কী দাবি? সারাজীবন একা একা কাটিয়ে দেব?"

গুরুদেব কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমার কম বয়েস। এই বয়স ঠাকুর দেবতা মানার বয়স নয়। তুমি সেটা মানোও না সেটা তোমাকে দেখলে বোঝা যায়। নিতান্ত সমস্যায় পড়েই তুমি এখানে এসেছ। আমরা বন্ধুর মতো কথা বলতে পারি। তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে তোমার সমস্যা বলতে পারো। ভয় নেই। আমি তোমার কোনও কথাই পাঁচকান করব না।"

দীপ গুরুদেবের কথায় একটু অবাক হল। এতটা যুক্তি দিয়ে কথা বলবেন উনি, সেটা সে ভাবতে পারেনি। চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আমি সেক্স করেছি দু-তিন দিন হল। তারপর থেকে আমি অন্য কিছুতে মন বসাতে পারছি না।"

গুরুদেব বললেন, “তার মানে তোমার কথা অনুযায়ী শারীরিক চাহিদার জন্যই তুমি বিয়ে করতে চাইছ, তাই তো?”

দীপ বলল, “অনেকটা তাই।”

গুরুদেব গম্ভীর হলেন। বললেন, “বলতে পারবে কেন ‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’ গানটা এত জনপ্রিয়?”

দীপ বলল, “এর মধ্যে এই গানটা এল কোথা থেকে?”

গুরুদেব দীপের কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, “এই কারণেই জনপ্রিয় যে মানুষ সবথেকে বেশি নিজেকেই ভালোবাসে। গানটা শুনতে শুনতে যখন মানুষ ভাবতে শুরু করে সত্যিই তো, যেদিন আমি থাকব না, তখনও তো সব থাকবে। শুধু আমি থাকব না। যাই হোক, বেশি বলে ফেলছি তবু বলি, তুমি যে কথাটা বললে সেটা আসলে নিজেকে ভালোবাসা। তুমি এই মুহূর্তে কাউকে ভালোবাসার অবস্থায় নেই। তোমার ভালোবাসায় ভালোবাসা কম, শরীর বেশি। এভাবে সম্পর্ক টেকে না যদিও।”

দীপ বলল, “সেইজন্যই তো ঠিক করেছি বিয়ে করব। এক কাজ করুন, আপনিও আমার জন্য একটা মেয়ে দেখুন। ঘটকালিও হবে, গুরুদেবগিরিও হবে। কী বলেন?”

গুরুদেব কটমট করে দীপের দিকে তাকালেন।

৩২

মানালির বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে রাত নটা বাজল। বাবা টিভি দেখছিল। তাকে দেখে বলল, “চাইনিজ খাওয়াটা আর হল না আজ। যাক গে, আসন্ন ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে ব্যবসায়ী সমিতির উন্নতিকল্পে কত টাকা দান করছিস?”

মানালি হাসল। বাবার কথাবার্তা এমনই। তার ক্লান্ত লাগছিল। ব্যাগটা সামনের টেবিলের রেখে সোফায় বসে বলল, “মা কোথায়?”

বাবা বলল, “ঘুমোচ্ছে। সান্ধ্যকালীন নিদ্রা।”

মানালি বলল, “যাক বাঁচা গেল, তবে দশটার মধ্যেই উঠে পড়ে সাধারণত।”

বাবা বলল, “অদ্ভুত অভ্যাস যাই বলিস, এর পর রাত বারোটা অবধি বাসন মাজবে। সেই কবে থেকে দেখছি।”

মানালি বলল, “তার আগে খেয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। নইলে আবার শুরু করবে।”

বাবা বলল, “শুরু যাতে না করে সেই ব্যবস্থা করলেই তো পারিস।”

মানালি বলল, “প্লিজ বাবা। তুমিও শুরু কোরো না।”

বাবা বলল, “শুরু করছি না। জাস্ট আস্কিং। ছেলেটা কে? কী করে?”

মানালি অবাক হয়ে বলল, “ছেলে পেলে কোত্থেকে?”

বাবা বলল, “তুই যে বলেছিস তোর বয়ফ্রেন্ড আছে, ভুলে গেলি?”

মানালির মনে পড়ল। সে বলল, “ও আছে একজন।”

বাবা বলল, “অফিসের?”

মানালি মাথা নাড়ল, “না, অফিসের না।”

বাবা বলল, “তবে?”

মানালি বলল, “এম এন সিতে কাজ করে।”

বাবা খুশি হল, “বাহ, খুব ভালো তো। বিয়ে করে ফেল। তোর মা বাঁচে, তুই আর আমি দুজনেই বাঁচি।”

মানালি মাথায় হাত দিল। বলল, “বাবা, আমি অফিসে একটা ব্যাপার নিয়ে ভীষণভাবে ফেঁসে আছি, প্লাস একটা হাউস থেকে এই কিছুক্ষণ আগে বেশি মাইনের চাকরির অফার এসেছে। সব কিছু নিয়ে আমি খুব

কনফিউজড। এর মধ্যে মিক্সার মেশিনে আবার আমার বিয়েটা ঢুকিয়ো না প্লিজ। আমি জাস্ট পাগল হয়ে যাব বিশ্বাস করো।”

বাবা বলল, “কী ব্যাপারে ফেঁসেছিস? আজকের নিউজটা যেটা করেছিস সেটা নিয়ে?”

মানালি বলল, “ওই হল। ওই ব্যাপারগুলো নিয়েই আর কি।”

বাবা বলল, “এগুলো তো সব অকুপেশনাল হ্যাজার্ডস। সবার থাকে। তোরও আছে। থাকবে। তার জন্য কি নাওয়া খাওয়া ভুলে সব সময় চিন্তা করে যাবি? এক কাজ কর, একদিন ছেলেটাকে বাড়িতে ডাক, আমি কথা বলি। চিন্তা করিস না, আমার ছোঁড়াকে পছন্দ না হলেও সেই ছোঁড়ার সঙ্গেই তোর বিয়ে দেব। এসব ব্যাপারে আমি একেবারেই পিউরিটান নই।”

মানালি বাবার দিকে রাগি চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “তোমাকে কি মা ব্রেইন ওয়াশ করেছে সারাদিন ধরে?”

বাবা হাসল, “কেন বল তো?”

মানালি বলল, “এই যে একই কথা অন্য ভার্সনে বলে যাচ্ছ! আচ্ছা বাবা, বিয়ে দিয়ে কী এমন লাভ হয় বাবা-মায়ের? তোমরা কেন এখনও এই সময়ে এসেও একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে একই ভাবতে পারো না? মেয়ে পার করতে পারলেই স্বস্তি তাই না?”

বাবা বলল, “আচ্ছা, আচ্ছা, তুই রেগে যাস না। তুই যদি রেগে যাস তাহলে আর তো কোনও কথাই বলা যাবে না। তোকে আমি আলাদা কোনও দিনও ভাবিনি, কিন্তু মা, আমাদেরও তো ইচ্ছা করে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করতে। এগুলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার তাই না? আজ না হয় কাল তোরা বিয়ে করবি, এতদিন তোকে বড়ো করলাম, আমাদেরও তো খানিকটা অধিকারবোধ জন্মায় তোর ওপরে?”

বাবার গলা খানিকটা অভিমানী শোনাল।

মানালি টিভির দিকে তাকাল। ধ্রুব বাগচীর খবরটা দেখাচ্ছে। রূপনারায়ণপুরে চলে গিয়েছিল সাংবাদিকরা। ঈপ্সিতা কাউকেই ঢুকতে দেননি। ফোনে শ্রীপর্ণা ঘোষাল জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর এবং ধ্রুব বাগচী সম্পর্কে যা যা রটছে তা সম্পূর্ণ গুজব। তাঁরা খুব ভালো বন্ধু। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে এভাবে মিসইন্টারপ্রেট করায় যে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত তাও দেখাচ্ছে।

বাবা বলল, “কিছু বল।”

মানালি বলল, “দেখবে দেখবে। চিন্তা করছ কেন?”

বাবা বলল, “ফটো আছে?”

মানালি নিঃশ্বাস ছাড়ল, “না বাবা।”

বাবা বলল, “এইসব সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর যুগে ফটো পাওয়া এমন কোনও চিন্তার ব্যাপার না। সেসব নিয়ে আমি ভাবছি না। যাক গে, বয়সের ডিফারেন্স স্বাভাবিক তো! আজকাল যা হচ্ছে! হয় মেয়েটা ছেলেটার থেকে দশ বছর বড়ো, নইলে কোনও বুড়োর সঙ্গে অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তোর আবার কুড়ি তিরিশ বছর বড়ো কোনও কাকু জেঠু পছন্দ হয়ে যায়নি তো? হয়তো দেখা গেল তার স্ত্রীও আছে। দেখিস, কারও সংসার ভাঙিস না যেন।”

মানালি হাত জোড় করল, “প্রণাম বাবা। তোমার কল্পনাশক্তি পৃথিবীর সেরা লেখকের থেকেও এক কাঠি ওপরে। তুমি বরং লেখালেখি করো।”

বাবা বলল, “কী করব বল! তোদের জেনারেশনটাকে একেবারেই বুঝতে পারি না। আবার ভালোও লাগে। তোর যে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছেটা হয়েছে সেটাকেও অ্যাপ্রিশিয়েট না করে পারি না।”

মানালি বলল, “থ্যাংকস বাবা। এতক্ষণ পরে একটা ভালো কথা বললে।”

বাবা বলল, “কথা আমি সব ভালোই বলি। তুই শুধু বুঝতে পারিস না এটাই প্রবলেম। যাই হোক, মাকে ডাক, খেয়ে নে। বা মা আসার আগেই খেয়ে নে। তাহলে আর একগাদা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না

তোকে।"

মানালি বলল, "আর খেয়েই বা কী হবে? যা গেল সারাটা দিন, আমার আর কিছু পেটে ঢুকবে না।"

বাবা বলল, "কী গেল? সমস্যাটা কী?"

মানালি বলল, "সে অনেক সমস্যা। সব বলে লাভ নেই। বুঝবেও না।"

সে উঠল, "আমি ঘরে যাই। ঘুমিয়ে পড়ি।"

বাবা বলল, "কিছু তো খা।"

মানালি বলল, "দেখছি।"

সে ফ্রিজ খুলল। একটা চকোলেট ছিল। সেটা হাতে নিয়ে বলল, "এই তো, ডিনার পেয়ে গেলাম। আর চিন্তা নেই।"

বাবা বলল, "তোর মা ঝাড়লে আমি জানি না কিন্তু।"

মানালি বলল, "আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। তুমি সামলে নিয়ো।"

বাবা ব্যাজার মুখ করল, "দেখি, কী করে সামলাই।"

মানালি ঘরে ঢুকল। সকালে সব কিছু নিয়ে সে যতটা টেন্সড ছিল, অতটা আর হচ্ছিল না এখন। দরজা বন্ধ করে চেঞ্জ করে খাটে শুয়ে ল্যাপটপ খুলল। ফেসবুকে অনেকগুলো মেসেজ এসেছে। সে বেশিরভাগই ইগনোর করে গেল। কিছু পাবলিক আছে, মেয়ের প্রোফাইল পেলেই ওভারস্মার্ট সেজে ফ্যালে। বেশ কিছু এরকম মেসেজ জমেছে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার ধরনগুলো দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল সে। নিজের ওয়ালে এল। কয়েকটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসেছে। একটাও অ্যাক্সেপ্ট করল না। বিতস্তা পিং করল, "কি রে, কী হল শেষমেশ?"

মানালি লিখল, "কী আবার হবে?"

"আর কেউ ঝাঁট জ্বালিয়েছে আজ? ধ্রুব বাগচী ফোন করেছিল?"

"আমি তো জ্বলার ওপরেই থাকি। ও আর কী!"

"আচ্ছা, লিভ ইট, গেস কর তো আমি কোথায় আছি?"

"আর কোথায় থাকবি? সৌরভের ফ্ল্যাটে?"

"না বে। হোটেলে। জাস্ট চেক ইন করলাম। সেই অ্যাপ রে।"

"গান্ডু। হোটেলে চেক ইন করে এখন ফেসবুক করছিস?"

"ডেবিউ হয়ে গেছে। সৌরভের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আনতে বেরিয়েছে।"

"হি হি। ওকে, এনজয়।"

"হ্যাঁ রে বাই।"

বিতস্তার সাথে কথা বলে ল্যাপটপটা শাট ডাউন করল মানালি।

সারাদিন বড়ো টেনশন গেছে। মাথাটা হঠাৎ খুব শান্ত লাগছে। ঘুম পাচ্ছিল তার। চোখ বুজল সে।

ঘুম ভাঙল মোবাইলের শব্দে। মানালি দেখল রাত বারোটা বেজে গেছে। কোনও মতে ফোনটা ধরল সে, "কে?"

"আমি বলছি রে মানালি।" ওপাশ থেকে বিতস্তার গলা। কেমন টেন্সড।

মানালি বলল, "কী হল?"

"আর বলিস না, সেই যে সৌরভ বেরিয়েছিল এখনও ফেরেনি। আমি অনেকক্ষণ দেখলাম। তারপর সৌরভকে বারবার ফোন করছি। ফোন নট রিচেবল বলছে।" বিতস্তার গলার ভয়টা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল মানালি।

সে বলল, "শোন, শোন, নিশ্চয়ই কোনও প্রবলেম হয়েছে, তুই টেনশন করিস না, রাতটা হোটেলেই কাটিয়ে দে। সকালে নাহয় চেক আউট করে যাস। টাকা আছে তো?"

বিতস্তা বলল, “টাকা আছে, কিন্তু আমার তো ভয় লাগছে রে! যদি অন্য কেউ চলে আসে? বুঝতেই তো পারছিস!”

মানালি বলল, “বিশ্বরূপদাকে বলব তোকে নিয়ে আসতে? বা ঋপণকে?”

বিতস্তা বলল, “তুই খেপেছিস? গোটা পৃথিবীর লোক জেনে যাবে তাহলে। আমার তো মাথাই কাজ করছে না রে। ভয় লাগছে ওর কিছু হল নাকি!”

মানালি বলল, “তুই চিন্তা করিস না, ফোনটা অন রাখ, কোনও রকম প্রবলেম হলে ফোন কর আমাকে।”

বিতস্তা বলল, “প্রবলেম হবে ভাবতে গেলেই তো কেমন কেমন লাগছে রে। আনম্যারিড কাপল হোটেলে থাকছে এসব কেউ মেনে নেবে না! কিছু হলে সবাই তো আমাকেই দেখাবে।”

মানালি একটা ধমক দিল, “কিচ্ছু হবে না। অত ভয় পাওয়ার কিছু হয়নি। মাথা ঠান্ডা রাখ জাস্ট। ঘুমিয়ে পড় বরং। সকালে উঠে সৌরভকে খোঁজা যাবে।”

বিতস্তা বলল, “শোন না, আমরা তো এখন পার্ক স্ট্রিট এরিয়ায় আছি। পুলিশ স্টেশনে ফোন করে একটু খোঁজ নিতে পারবি, সৌরভ দাস বলে কারও কোনও খবর আছে নাকি?”

মানালি বলল, “আচ্ছা দেখছি। তুই টেন্সড হোস না। ফোনটা রাখ, আমি দেখছি।”

ফোনটা কাটল সে। মাথাটা এক্কেবারে ফাঁকা লাগছে তার। কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না।

৩৩

“ভাই সুস্থ আছিস তো?”

লাঞ্চ করতে একাই বেরিয়েছিল দীপ। রাম পেছন থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এল।

দীপ বলল, “হ্যাঁ। অসুস্থ কেন হব?”

রাম বলল, “তোর হালচাল তো ভালো ঠেকছে না। পাবলিক ইউরিনালওয়ালা কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়িসনি তো ভাই?”

দীপ অবাক হল, “মানে?”

রাম বলল, “কিছু কিছু আছে তো। টেগোরের একটা কবিতা শুনছিলাম, হেথায় আর্য হেথা অনার্য এক দেহে হল লীন। মানে ইউনিভারসাল গিভার। এরকম কারও পাল্লায় পড়িসনি তো ভাই? লাইফ হেল হয়ে যাবে কিন্তু আগে থেকে বলে দিলাম।”

দীপ বলল, “তুই টেগোর পড়লি কীভাবে? বাংলায় পড়েছিস?”

রাম চোখ নাচাল, “পড়েছি, কে পড়িয়েছে সেটা তোর না জানলেও হবে। আসল কথায় আয় ভাই। এরকম কারও পাল্লায় পড়লি না তো? যা ডেস্ক্রিপশন দিচ্ছিস, একদিনেই কোর্স কমপ্লিট করে ফেললি, তাতে তো সেরকমই লাগছে।”

দীপ উত্তর না দিয়ে একটা খাবারের স্টলে রুটি মাংস নিয়ে খেতে শুরু করল।

রাম বলল, “কী বে? চুপ হয়ে গেলি কেন?”

দীপ বলল, “পোষাচ্ছে না। ব্রেক লাগবে।”

রাম বলল, “হ্যাঁ তুই এই কর। একদিন পর পর ছুটি নে। তারপর বস তোকে একেবারেই লং ব্রেকে পাঠিয়ে দেবে।”

দীপ বলল, “বসের সঙ্গেই কথা বলব। মাইন্ডটা পুরো ছেতরে আছে। বিয়ে করলেও হয়।”

রাম অবাক হয়ে দীপের দিকে বড়ো বড়ো চোখে করে তাকিয়ে বলল, “এই হল তোদের বাঙালি ছেলেদের সমস্যা। বাঁড়া সারাজীবন কোনও মেয়ে দেখবি না, টেনে পড়াশুনা করবি, তারপর যখনই ফুটার পাল্লায় পড়বি, ঝাঁপিয়ে পড়ে যাচ্ছেতাই করে ফেলবি। তুই জাস্ট ভাব এ কদিনে তুই কী কী করলি! এর মধ্যে আবার তোর মাথায় বিয়েও নিয়ে এলি ভাই?”

দীপ মুরগির ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বলল, "আমি সিরিয়াস। আমার মনে হয় বিয়ে করলেই আমি এক্কেবারে ঠিক হয়ে যাব।"

রাম বলল, "ঠিক হয়ে যাবি? ওকে! এক্সপ্লেইন।"

দীপ বলল, "আমি যেটা বুঝতে পারছি, সেটা হল আমার একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড চলছে। সব কিছু নিয়ে বিচ্ছিরিভাবে ছড়িয়ে গেছি। এমন কোনও পার্টনার চাই, যার সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করা যাবে। আমাকে বুঝবে। মানে..."

রাম বাধা দিয়ে বলল, "মেয়েরা ছেলেদের বুঝবে। এই আশাতেই কত কবি কেঁদে দিল। উনি এলেন বুঝবে। আসল কথাটা বলো না মামা, তুমি এখন কামের ফাঁদে পড়েছ!"

দীপ চুপচাপ খেয়ে গেল। বলল, "তুই যদি উইকেন্ডে কোথাও যাবি তো বল। আমি তোর এই ভ্যাক ভ্যাক আর শুনতে পারছি না।"

রাম বলল, "চল। আমার তো কোনও কাজ নেই। ভুবনেশ্বর কবে যাবি?"

দীপ বলল, "পরের সোমবার। তার আগে শান্তিতে কোথাও বসে মদ খেয়ে আসি।"

রাম ফিসফিস করে বলল, "কাল কী করলি?"

দীপ বলল, "ছিঁড়লাম। ঝাঁট জ্বালাস না।"

রাম ব্যাজার মুখে বলল, "আমার কী! তোর এস টি ডি না হলেই হল। আমার এক বন্ধু তো সেই এসবের পাল্লায় পড়েছিল, শেষে দ্যাখে যন্ত্রটা ফুলে তাকিয়া হয়ে গেল। ডেঞ্জার চিজ ভাই ওই ব্ল্যাকহোল। প্রোটেকশন ইউজ না করে কত লোক কেস খেয়ে গেল।"

দীপ বিরক্ত হল, "ফোট তো! যত ভুলভাল কথা বলে যাচ্ছিস!"

দীপের ফোন বাজছিল। দীপ দেখল মা ফোন করছে, ধরল, "হ্যাঁ বলো।"

"শোন না, অফিস থেকে বেরোবি কখন আজ?"

দীপ বলল, "ছটা সাড়ে ছটা হবে। কেন?"

মা বলল, "বেরিয়ে আমাকে ফোন করিস। আমি আর তোর বাবা তখন বাড়ি থেকে বেরোব।"

দীপ অবাক হল, "কোথায় যাবে?"

মা বলল, "আহ। তুই-ই তো সকালে বললি আমরা যেখানে দেখব সেখানে যাবি। এত কথা কীসের?"

দীপ বলল, "তা বলে আজই?"

মা বলল, "হ্যাঁ। আজই। এর পরে কিন্তু তুই না এলে আমি আর কাউকে দেখতে পারব না আগে থেকে বলে দিলাম।"

দীপ বলল, "আচ্ছা। যাব। রাখো এখন।"

ফোনটা কাটল সে। রাম বলল, "কী বে, কী হল আবার?"

দীপ কথা ঘোরাল, "কিছু না। এমনি মা ফোন করে খেলাম-টেলাম নাকি জিজ্ঞেস করল।"

***

কাছের বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াবে বলে জানিয়েছিল বাবা মা। দীপ যখন পৌঁছোল দেখল দুজনেই পৌঁছে গেছে। মা গাড়িতে উঠে বলল, "তাও দেরি করে দিলি।"

দীপ বলল, "বাড়ি চেনো তো?"

মা বলল, "ডান দিক নে।"

দীপ বলল, "মেয়ে কী করে?"

মা বলল, "গিয়ে দেখবি। এখন কিছু বলব না।"

বাবা পিছনে বসেছিল, বলল, "তোর মা যে এতটা করিতকর্মা আগে বুঝিনি রে। আমার মনে হয় তোর মা প্রধানমন্ত্রী হবার ক্ষমতা রাখে। কত তাড়াতাড়ি নেটওয়ার্ক খাটিয়ে ফেলল ভাবছি শুধু।"

মা রেগে গিয়ে বাবাকে ধমক দিল, “তুমি থামো তো, শুধু বাজে কথা। দেখছ একটা শুভ কাজে যাচ্ছি। ছেলের এত দিনে একটু মতি ফিরল আর তুমি বাজে বকে যাচ্ছ।”

বাবা চুপ করে গেল। কয়েক মিনিট পরেই তারা বাড়িটার সামনে চলে এল। গাড়ি পার্ক করে তারা ভেতরে ঢুকল।

দীপের চেনা চেনা লাগছিল বাড়ির সবাইকে। বসার ঘরে বাড়ির গ্রুপ ফটো দেখেই বুঝতে পারল তারা চিত্রলেখার বাড়িতে এসেছে। তার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল।

এক বয়স্ক মতো ভদ্রলোক বললেন, “আপনারা দুপুরে যখন ফোন করলেন, তখন তো ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখতে চাইবেন।”

মা বলল, “সে কী কথা, মেয়ে তো এই কয়েকদিন আগেই বিয়েবাড়িতে দেখলাম। পছন্দ তো তখনই হয়েছিল। আমার মাথার মধ্যে ছিল ব্যাপারটা, কিন্তু আমার ছেলের ভয়ে কিছুই বলতে পারছিলাম না। তাড়াতাড়ি করলাম কারণ আমার ছেলে আবার অফিস ট্যুরে যখন তখন বেরিয়ে যেতে পারে...” মা যে শেষটা বানিয়ে বলল, সেটা বুঝল দীপ। কোন মা আর বলবে আমার ছেলে বিয়েপাগলা হয়ে গেছে, মেয়ে দেখতে বলল বলে আমি আজকেই দেখতে চেয়েছি!

বাবা বলল, “মেয়েকে দেখান। সামাজিকতা পরে হবে নাহয়।”

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রলেখাকে নিয়ে এল সবাই। দীপ চিত্রলেখার দিকে তাকাল না। গম্ভীর হয়ে রইল। মা মুগ্ধ গলায় বলল, “বাহ, আপনাদের মেয়ে এক্কেবারে যথার্থ সুন্দরী। কি রে দীপ, কিছু বল।”

দীপ দেখল চিত্রলেখা হাসি হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে হাসার চেষ্টা করল।

বেশ কয়েক মিনিট চিত্রলেখার সঙ্গে মা-বাবার প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। খানিকক্ষণ পরে মা বলল, “যা বাবা, ওর ঘরটা দেখে আয়। আমরা একটু গল্প করি।”

দীপ উঠল। তার বিরক্ত লাগছিল। চিত্রলেখার ঘরে পৌঁছে সে বলল, “শোনো, প্রথমেই ক্লিয়ার করে নি। আমি কিছুই জানতাম না। এখানে আসবে জানলে আমি কখনোই আসতাম না।”

চিত্রলেখা একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, “জানি। তুমি বসো।”

দীপ বসল। তার মাথা কাজ করছিল না।

চিত্রলেখা বলল, “তুমি এখানে কিছুক্ষণ বসো। তারপর চলে যাও।”

দীপ শুকনো গলায় বলল, “থ্যাংকস।”

দীপ মোবাইল বের করল। চিত্রলেখা বলল, “কালকের হোটেল কেমন গেল?”

দীপ উত্তর দিল না।

সে বুঝতে পারছিল চিত্রলেখার সঙ্গে ঋতির সব কথাই হয়েছে।

চিত্রলেখা বলল, “আমার সমস্যা হল আমার রাগ হয় না।”

দীপ বলল, “আমার সমস্যা হল আমার সহ্য করার ক্ষমতা বেশ ভালো।”

চিত্রলেখা বলল, “আমাকে তোমার সহ্য হয় না, তাই না?”

দীপ উত্তর দিল না।

চিত্রলেখা বলল, “আমার সবথেকে খারাপ লাগল কী জানো তো? আমার ইনসিকিউরিটিটাকে তুমি আমার ন্যাগিং নেচার ভেবে নিলে।”

দীপ বলল, “তুমিই তো বললে বসতে পারি। তুমি যদি এখন এত কথা বলো তাহলে আমি বরং চলে যাই। এত কৈফিয়ত দিতে পারব না।”

চিত্রলেখা বলল, “থাক। আমি আর কিছু বলব না। তুমি বসে থাকো। সেটাই ভালো। অন্তত কিছুক্ষণ তো থাকবে। সেটাই অনেক।”

দীপ কিছু বলল না। গম্ভীর মুখে বসে রইল।

৩৪

সকাল সাড়ে দশটায় ঘুম ভাঙল মানালির। রাতটা দুঃস্বপ্নের মতো গেছে।

সৌরভ সারারাত ফেরেনি। বিতস্তার সঙ্গে ফোনে কথোপকথন চালিয়ে যেতে হয়েছে তাকে। সামান্য শব্দেই বিতস্তা ভেঙে পড়ছিল। ভোর নাগাদ চেক আউট করেছে বিতস্তা। হোটেলে সাংবাদিক পরিচয় দিয়েছে। আই কার্ড দেখিয়েছে। সৌরভের আই কার্ড হোটেলেই আছে। সৌরভকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মানালি সকাল সাড়ে ছটার পরে আর জাগতে পারেনি। যখন জানতে পেরেছিল বিতস্তা ট্যাক্সিতে উঠে গেছে, তারপরেই ফোন অফ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙলেও গা হাত পা ব্যথা করছিল। রাত জাগলে এই সমস্যাগুলো হয়। উঠে ফোন অন করে বসার ঘরে গিয়ে বসল। বাবা টিভি দেখছিল। তাকে দেখে বলল, "কোনও প্রবলেম?"

মানালি দেখল মা একটু দূরত্বে আছে, গলা নামিয়ে বলল, "মাইনর। বড়ো কিছু না।"

বাবা বলল, "তোর?"

মানালি মাথা নাড়ল ঘুম গলায়, "না না, আমার না। এক কলিগের। মিটেছে পার্শিয়ালি। দেখছি কী করা যায়।"

বাবা বলল, "এখন বেরোবি?"

মানালি বলল, "ফোন করতে হবে। ইচ্ছা করছে না বেরোতে।"

বাবা বলল, "তাহলে ডুব মেরে দে।"

মানালি মাথা নাড়ল, "খেপেছ? অফিস যেতেই হবে।"

ফোনটা সবে অন হয়েছিল। বাজতে শুরু করে দিল। মানালি দেখল বিতস্তা ফোন করছে, ধরল তাড়াতাড়ি, "বল। সৌরভের খোঁজ পেলি?"

বিতস্তা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "না রে, থানা পুলিশে যেতেও কেমন কেমন লাগছে।"

মানালি বলল, "অফিসে আয়। কথা বলে দেখি কী করা যায়।"

বিতস্তা বলল, "বিশ্বরূপদাকে বলবি না তো?"

মানালি আড়চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে উঠে নিজের ঘরে এল, "দ্যাখ, ব্যাপারটা যথেষ্ট সিরিয়াস মনে হচ্ছে। বিশ্বরূপদাকে না বললে মনে হয় না কিছু হবে। শোন না, একটা কথা বলবি?"

বিতস্তা বলল, "বল।"

মানালি বলল, "কাল রাতে কি তোদের মধ্যে কোনও ব্যাপারে ঝগড়া হয়েছিল? সিরিয়াসলি বলবি।"

বিতস্তা একটু চুপ করে থেকে বলল, "একটা ব্যাপার নিয়ে চলছিল। তবে এর আগেও এসব হয়েছে। একেবারে হাওয়া হয়ে যাবার ছেলে তো নয়!"

মানালি বলল, "কোনওভাবে ওর বাড়ির লোকেদের খবর দেওয়া যায় না?"

বিতস্তা আঁতকে উঠল, "তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওর বাড়ির লোকেরা জানলে কী হবে ভাবতেও গায়ে জ্বর চলে আসছে আমার। বললে তো সবই বলতে হয়। তা ছাড়া আজ দুপুর বারোটার পরে যদি সৌরভ ওর আই কার্ড না নেয় হোটেল থেকে, তাহলে তো পুলিশ কেস হতে পারে। নির্ঘাত আমি ফাঁসব। তখন থেকে আমার মাথায় এইসবই ঘুরছে শুধু।"

মানালির গলা থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে এল, "শিট!" বলল, "বিশ্বরূপদা ছাড়া গতি নেই।"

বিতস্তা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "হুঁ। বল।"

মানালি বলল, "তুই বলবি না আমি বলব?"

বিতস্তা বলল, "তুই-ই বল। আমি ছড়িয়ে ফেলব। এমনিতেই বিশ্বরূপদা আমায় বেশি দেখতে পারে না।"

মানালি বলল, "জানতাম তুই এটাই বলবি। ঠিক আছে। রাখ এখন। আমি বিশ্বরূপদাকে ফোন করি।"

ফোনটা কেটে মানালি বিশ্বরূপদাকে ফোন করল। বিশ্বরূপদা ধরল, “অফিসে এসে গেছি কোন সকালে। তুই কি আজও ডুব মারার প্ল্যান করছিস?”

মানালি বলল, “একটা ব্লান্ডার হয়ে গেছে। তোমার একটু হেল্প চাই।”

বিশ্বরূপদা বলল, “সে তো তুই মানেই ব্লান্ডার। মানালি আর ব্লান্ডার ওয়ার্ড দুটো সিনোনিম। বল শিগগিরি কী হয়েছে।”

মানালি সবটা বলল। বিশ্বরূপদা পুরোটা শুনে বলল, “বিতস্তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মিনিমাম বোধ বুদ্ধি কিছুই নেই? কী রে!”

মানালি বলল, “কী করে ঝামেলাটা থেকে বেরোবে সেটা আগে বলো তো!”

বিশ্বরূপদা বলল, “সেই! মরণকালে হরির নাম। ওকে, আমাকে ছেলের নাম, চেহারার ডেস্ক্রিপশন আর হোটেলের নামটা হোয়াটসঅ্যাপ কর। দেখছি কী করা যায়।”

ফোনটা কেটে গেল। বিতস্তা বিশ্বরূপদাকে সব কিছু পাঠিয়ে স্নানে ঢুকল। বেশ খানিকক্ষণ ঠান্ডা জলে স্নান করে অফিসের জন্য তৈরি হতে শুরু করল। মাথায় একটা কথাই ঘুরছিল শুধু। সৌরভকে না পাওয়া গেলে কী কী হতে পারে। ফোনটা বেজে উঠল আবার। মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী ফোন করছেন। ধরবে না ধরবে না করেও ধরল, “বলুন স্যার।”

“মানালি, আপনাকে একটা কথা বলার জন্য ফোন করলাম।”

ওপাশের গলাটা শান্ত।

মানালি বলল, “হ্যাঁ, বলুন স্যার।”

ধ্রুব বললেন, “আমি এটা বলার জন্যই ফোন করেছিলাম, আজকের কোনও কাগজেই ধ্রুব বাগচী নেই। এর মানেটা বুঝলেন?”

মানালি কিছুই বুঝল না, “না স্যার, আমি তো ঠিক...!”

ধ্রুব বললেন, “বুঝবেন না। অত বুদ্ধি থাকলে সাংবাদিক হতেন না। এর মানে হল আপনার কালকের নিউজটা আজকে বাসি হয়ে গেছে। টয়লেট পেপার হয়ে গেছে। নতুন কাগজ এসে গেছে। পড়ে নিন।”

ফোনটা কেটে গেল। মানালি উঠে বাবার সামনে গিয়ে বসল। তিন চার রকম কাগজ রাখে তারা। অবাক হয়ে দেখল কোনও কাগজেই ধ্রুব সংক্রান্ত কোনও খবর নেই।

মানালি অবাক হল। ধ্রুব কি তার মানে তাঁর ক্ষমতা দেখালেন? খবরের কাগজগুলোকে ক্ষমতা বা অর্থবলে কিনে নিলেন? কয়েক সেকেন্ড ভেবেই তার বিতস্তার কথা মনে পড়ল।

মানালি বিশ্বরূপদাকে ফোন করল। বিশ্বরূপদা বলল, “কী হল আবার?”

মানালি বলল, “সৌরভের কোনও খবর পেলে?”

বিশ্বরূপদা কথা ঘোরাতে চাইল, “থাক জেনে কাজ নেই।”

মানালি অবাক হয়ে বলল, “মানে? মেয়েটা ওই অবস্থায় আছে, জানাতে হবে তো!”

বিশ্বরূপদা একটু থেমে বলল, “মন শক্ত কর।”

মানালি বলল, “আমার মন শক্তই আছে। তুমি যা বলতে চাও বলো তাড়াতাড়ি।”

বিশ্বরূপদা বলল, “একটা ছেলে কাল রাতেই স্পট হয়েছে। একটা গাড়ি মেরেছিল। বুঝতেও পারেনি। যা ডেস্ক্রিপশন পাঠালি, মনে হচ্ছে এ-ই সম্ভবত সৌরভ।”

মানালির হঠাৎ করে বিতস্তার মুখটা মনে পড়ে গেল। সে বলল, “এখনও কেউ জানেনি তো! এটা কী করে হল?”

বিশ্বরূপদা বলল, “হসপিটালে নিয়ে যেতে পারেনি। তার আগেই যা হবার হয়েছে। পকেটে মানিব্যাগ ইত্যাদি কিছুই ছিল না তো। সব চুরি হয়ে গেছে। পথের এক কোণে পড়ে ছিল। কেউ দেখেওনি। শেষমেশ এক সার্জেন্ট দেখতে পেয়ে সব ব্যবস্থা করে। চোরটা এমন চোর, চুরি করবি কর, বাড়ির লোককে খবরটা

তো দিবি রে বাবা! তা না সরাসরি মানিব্যাগটাই নিয়ে হাওয়া। পুলিশ আমি বলার পরেই জানতে পারল ছেলেটা সম্পর্কে। যাক গে, বডি ডিটেক্ট করতে হবে, বিতস্তাকে জানা। এ ছাড়া এখন আর উপায় নেই।"

মানালি মাথায় হাত দিল। বলল, "দেখছি বলে।"

৩৫

গাড়িতে উঠেই মা জিজ্ঞেস করল "কি রে, কেমন দেখলি?"

দীপ বলল, "বাড়ি গিয়ে বলছি। গাড়ি চালাবার সময় বেশি কথা বোলো না। সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের অ্যাড দেখছ না?"

বাবা বলল, "ঠিক ঠিক। তুমি বরং সিটবেল্ট বেঁধে বসো।"

মা গজগজ করতে লাগল, "কলকাতার বুকে বড়ো বাড়ি, মেয়ে উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী, পড়াশুনা করছে। তোদের জীবনে আর কী চাহিদা আছে কে জানে।"

দীপ চোয়াল শক্ত করে গাড়ি চালাচ্ছিল। রাস্তায় যথেষ্ট জ্যাম আছে। গাড়ি দেখে চালাতে হচ্ছিল। বাবা বলল, "ইস, একটা ভুল হয়ে গেল। মিষ্টিগুলো কোন দোকান থেকে কিনেছিল জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম।"

মা বলল, "তুমি থামো। ওভাবে গেলে কেউ? লজ্জা লাগে তো সাধারণ মানুষের। তোমার তো দেখলাম সেসব বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই।"

বাবা গম্ভীর মুখে বলল, "কী করব, খেতে ভালো দেখে একটা খেলাম। তারপর দেখলাম আর-একটা খেলেও তুমি কিছু বলছ না। একটু সিগন্যাল দিলে তো খেতাম না।"

মা রেগে গেল, "এখানেও আমার দোষ? নিজের তো কিছু বিবেচনা থাকবে না কি?"

দীপের বিরক্ত লাগছিল। এমনিতেই চিত্রলেখার ঘরে আধঘণ্টা চুপ করে বসে থাকতে হয়েছে। তার ওপর গাড়িতে এত কথা ভালো লাগছিল না তার।

সে বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল, "অন্য কাউকে দ্যাখো মা। এখানে বিয়ে হওয়া সম্ভব না।"

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। চুপ করে গেল।

মা বলল, "কী? আর-একবার বল?"

দীপ বলল, "বললাম তো। অন্য কোথাও দ্যাখো। না হলে ছাড়ো, আর দেখতে হবে না।"

মা বলল, "সমস্যা কোথায় সেটা তো বল! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই মেয়েকে পছন্দ না হলে তোর কেমন মেয়ে পছন্দ? কুমারটুলিতে অর্ডার দেব নাকি?"

দীপ কিছুটা গিয়ে গাড়িটা রাস্তার বাঁদিকে দাঁড় করাল। বলল, "সমস্যা আছে মা। অত বলা যাবে না।"

মা বলল, "মেয়ে বেশি সুন্দর? তোর কি কম সুন্দর পছন্দ? নাকি কম শিক্ষিত? নাকি আরও শিক্ষিত? চোখ ঠিক নেই, না নাক? নাকি হাইটে সমস্যা?"

দীপ বলল, "মা, পৃথিবীতে মেয়ে দেখা ছাড়াও অনেক সমস্যা আছে। আমরা বরং সেগুলোতে কনসেনট্রেট করি। বাদ দাও এসব।"

মা বলল, "বাদ দেব? মেয়ে কি এবার আমার ইচ্ছায় দেখতে গেছিলাম? তুই প্রথমে বললি যেতে, মেয়ে দেখার পর বলছিস দেখো না। তোর সমস্যাটা কোথায়? মানছি আমি একটা সময় তোকে খুব বলেছি, কিন্তু আমিও তো শেষমেশ হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই কিছুদিন আগে বললি তুই নিজে থেকেই মেয়ে দেখেছিস, এখন বললি মেয়ে দ্যাখো, আবার বলছিস দেখো না, তোর হঠাৎ করে হলটা কী?"

দীপ একটু চুপ করে থেকে বলল, "এই সেই মেয়ে মা, যাকে বিয়েবাড়িতে পছন্দ হয়েছিল। কথাও হয়েছিল।"

মা অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল। বাবা বলল, "ওহ, তার মানে হিস্ট্রিতে গলদ রয়েছে?"

দীপ বলল, “হ্যাঁ, হিস্ট্রি জিওগ্রাফি সবেতে গলদ রয়েছে। এ বিয়ে হলে মহা বিপদ। এই মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করা সম্ভব না।”

মা মাথায় হাত দিল, “ভগবান! কী সমস্যা সেটা তো বল?”

দীপ গাড়ি স্টার্ট করল, “অত শুনে লাভ নেই। অন্য কাউকে দ্যাখো।”

মা বলল, “আমি আর দেখব না। যেটাই দেখব কিছু না কিছু সমস্যা বের করবি। আমারও তো একটা মান সম্মান আছে।”

বাবা বলল, “এক কাজ করলেই হয়। পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে দি। আজকাল তো ছবিও দেয়। দীপের একটা ভালো ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দি। অনেক সম্বন্ধ আসবে। সেখান থেকে বেছেবুছে নেবে নাহয়।”

দীপ বলল, “না না, ছবি-টবি একদম না। ওসব হাস্যকর। থাক তোমাদের আর মেয়ে দেখতে হবে না।”

মা বলল, “সে তুই যা বল, আমি আর দেখছি না। এসব ভীষণ অসম্মানজনক।”

দীপ চুপ করে গেল। সারা রাস্তা বাবা মা বকবক করে গেল। বাড়ি ফিরে দীপ নিজের ঘরে গিয়ে দরজা দিল।

হোয়াটসঅ্যাপ চেক করল। চিত্রলেখা লিখেছে, “বাড়ি পৌঁছেছ?”

দীপের বিরক্তি আসছিল। সে ফোনটা ছুড়তে যাবে, এমন সময় দেখল একটা আননোন নাম্বার থেকে ফোন আসছে। ধরল সে, “হ্যালো। কে বলছেন?”

“কি রে ভাই, তোকে তো সব ডিটেলসে বললাম। তা সত্ত্বেও তুই মেয়েটাকে দেখতে চলে গেলি?”

গলাটা চিনতে পারল দীপ। চিত্রলেখার এক্স।

সে বলল, “হ্যাঁ। গেলাম। তো?”

ওপাশটা খানিক চুপচাপ থেকে বলল, “ভালো ভালো। খাওয়া মাল বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে তোর। কর গিয়ে বিয়ে। পরে বলতে পারবি না আমি তোকে অ্যালার্ট করিনি।”

দীপ বলল, “তুই কে ভাই? আমার বাপ না মা? আর কে খেয়েছে, না খেয়েছে, তাতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।”

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ ভেসে এল, “এই তো ছেলে বার খেয়ে গেছে। যা ভাই। বেস্ট অফ লাক।”

দীপ ফোনটা কেটে দিল। মাথায় হাত দিয়ে বসল। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত জগাখিচুড়ি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সে নিজেই বুঝতে পারছিল। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। সে খানিকক্ষণ ভেবে দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরোল। বাবা মা ড্রয়িং রুমে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

দীপ বলল, “মা, ওই বাড়িতে ফোন করে বলে দাও, আমরা বিয়ের জন্য রাজি।”

মা বাবা দুজনেই তার দিকে তাকাল।

বাবা বলল, “তুই তো দেখছি মহম্মদ বিন তুঘলককেও লজ্জায় ফেলে দিবি।”

মা বাবার দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, “গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে গো। আমার মনে হয় দীপের ভিতরে কোনও দুষ্টু প্রেতাত্মা ঢুকেছে। ভূত তাড়াতে হবে।”

বাবা বলল, “ধুস। ভূত-টুত কিছু নেই। এ যুগে আবার ভূত বলে কিছু আছে নাকি? ওর বায়ু চড়েছে। কদিন ধরে শুধু পেপে আর কাঁচকলা রান্না করো। অফিসেও টিফিন দিয়ে দাও। বাইরের খাবার যেন না খায়।”

দীপ বাবা-মার সামনে গিয়ে বসল, “দ্যাখো, আমার প্রথমে মনে হয়েছিল চিত্রলেখা ঠিক মেয়ে না। এখন মনে হচ্ছে ও-ই ঠিক মেয়ে। তোমরা ফোন করো।”

মা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, “ধর আমি ফোন করলাম। তার ঠিক ঘণ্টাখানেক পরে তোর যদি মনে হয় বিয়েটা করা ঠিক হবে না, তখন কী হবে?”

দীপ কয়েক সেকেন্ড বাবা-মার দিকে তাকিয়ে ফোন নিয়ে চিত্রলেখার নাম্বার ডায়াল করল।

রিং হতেই ধরল চিত্রলেখা। বলল, "মেসেজ করেছিলাম। পৌঁছেছে?"

দীপ বলল, "আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

চিত্রলেখা বলল, "বলো।"

দীপ বলল, "আমি জানি আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ করেছি। তবু এত সব কিছুর পরে আমি যদি তোমায় বিয়ে করতে চাই তুমি কি রাজি হবে?"

চিত্রলেখা চুপ করে গেল। বাবা মা হাঁ করে দীপের দিকে তাকিয়ে আছে।

দীপ অধৈর্য হল, "তোমার আবার কী হল?"

চিত্রলেখা বলল, "আমি খুব বোকা মেয়ে দীপ। মাঝে মাঝে অনেক কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বুঝতে পারি আসলে একটা মিথ্যার মধ্যেই আছি। তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ?"

দীপ ফোন নিয়ে বাবা-মার সামনে থেকে উঠে নিজের ঘরে গেল, "দ্যাখো চিত্রলেখা। আমি এই মিনিট তিনেক আগেও ঠিক করেছিলাম তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখব না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোনও একটা জায়গায় তুমি বা আমি কোথাও একটা মিলে যাচ্ছি। তুমি সময় নাও। প্রয়োজনে ঋতির সঙ্গেও কনসাল্ট করতে পারো। আমার কোনও আপত্তি নেই। এটুকু কথা তোমাকে আমি দিতে পারি, ভবিষ্যতে আর কোনও রকম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগব না।"

চিত্রলেখা বলল, "তুমি ঝোঁকের মাথায় আবার এসব করছ দীপ, আমি বুঝতে পারছি। তুমি বরং একটা রাত সময় নাও। ভাবো। আমি অনেক কষ্টে এত সব কিছু থেকে নিজেকে সামলেছি দীপ। আবার সেই একই লুপে পড়তে চাই না। আমিও সময় নি। ভেবে নাহয় একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে? ঠিক আছে?"

দীপ বলল, "ঠিক আছে। সকালে জানিয়ো তুমি।"

ফোনটা কেটে দিল সে।

বিশ্রীভাবে মাথা ধরছে। দীপ ফোনটা রেখে একটু ভেবে ঋতিকে ফোন করল।

ঋতি ধরল না প্রথমটা। দীপ আবার ফোন করল।

এবার ধরল, ঠান্ডা গলায় বলল, "বলো।"

দীপ বলল, "আমি ঠিক করেছি চিত্রলেখাকে বিয়ে করব।"

ঋতি শুনে তেতো হাসল, "ফাইন। আমাকে বলছ কেন?"

দীপ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "জানি না।"

ঋতি বলল, "শোনো দীপ। তোমাকে বন্ধুর মতো একটা অ্যাডভাইস দি। কলকাতা শহরে এসকর্ট সার্ভিস হয় জানো তো? তুমি বরং সেসব কনসাল্ট করো। এখনই রিলেশনশিপের মধ্যে যেয়ো না। আই স্ট্রংলি বিলিভ, ইউ হ্যাভ সিরিয়াস ইস্যুস। চিত্রলেখা তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু তুমি ওকে ভালোবাস না। জাস্ট কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে তোমার মধ্যে, আর সব কিছুর মধ্যে ঘেঁটে থেকে তুমি এই ডিসিশনটা নিয়েছ।"

দীপ বলল, "আমি তো তোমাকে ভালোবেসেছিলাম। তুমি আমাকে ডিচ করে দিলে।"

ঋতি বলল, "শোনো দীপ গাঙ্গুলি, আমার মাথা খেয়ো না। তোমার কী মনে হয়, হঠাৎ করে এই সব কিছুর থেকে বেরোনোটা আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল? কিন্তু এটাও জেনে রেখো, আমি যথেষ্ট স্ট্রং। মোহ কাটতে আমার বেশিক্ষণ লাগেনি, যখনই জেনেছি তোমাকে একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। আমি চিত্রলেখাকে কিছুই বোঝাতে যাব না। ও নিজেই বুঝুক। তুমি এসকর্ট সার্ভিস কনসাল্ট করো। কাজ দেবে।"

দীপ ফোন কেটে দিল।

৩৬

বিতস্তা ঘুমোচ্ছিল। তিন-চারবার ফোন করার পরে ধরল।

মানালি কী বলবে বুঝতে পারছিল না প্রথমে। বেশ খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল, "অফিস চলে আয়। সৌরভের একটা খোঁজ পাওয়া গেছে।"

বিতস্তা ঘুমঘোরেই বলল, "বল না প্লিজ আমাকে একটা ফোন করতে।"

মানালি বলল, "অফিস আয়। ওখানেই দেখছি।"

কথা বাড়াল না মানালি। ফোনটা কেটে দিল।

খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। রাস্তায় বেরিয়ে ক্যাব নিল একটা। মাথা কাজ করছিল না তার। বিতস্তার কাছে সৌরভই সব ছিল। এত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটার পরে মেয়েটাকে কীভাবে সামলাবে তা নিয়ে ক্রমাগত ভেবে চলেছিল সে।

আর-একটা ব্যাপারও কাঁটার মতো বিঁধছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ বিতস্তাকে বলেছিল বারোটার মধ্যে সৌরভ তার আই কার্ড নিতে না এলে লোকাল পুলিশে তারা জানিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে যাবে।

এই ব্যাপারটা বিশ্বরূপদাকে বলা হয়নি। একটু ভেবে সে ঠিক করল সবটা জানাবে।

একবার রিং হতেই ফোন তুলল বিশ্বরূপদা, "কী হল আবার?"

মানালি বলল ব্যাপারটা।

বিশ্বরূপদা একটু থমকে বলল, "এটা কোনও ইস্যু না। তুই একটা কাজ কর, আগে হোটেলটায় যা। ম্যানেজারকে মিট কর। জানা। বাকিটা আমি দেখছি।"

মানালি আকাশ থেকে পড়ল, "আমি বলব?"

বিশ্বরূপদা বলল, "কেন? তুই বললে সমস্যাটা কী? ভাবছিস তুই একটা মেয়ে, তোর কথা শুনলে ওরা কী রিঅ্যাক্ট করবে? শোন, তুই যে জিনিসটা বারবার ভুলে যাস, তোর কাছে একটা মহা শক্তিশালী অস্ত্র আছে। সেটা হল তোর প্রেস কার্ড। দ্বিতীয়ত, একটা হোটেলে নিজেদের মতো করে একটা আনম্যারেড কাপল থাকতেই পারে। এ দেশের কোনও আইনে এটা বলা হয়নি যে এটা বেআইনি। নীতিপুলিশগিরি অনেকেই মাড়ায়। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনও আইন নেই। স্বেচ্ছায় কে কী করবে তা বলার জন্য সমাজ কেউ না। কোথাও কোথাও পুলিশের পকেট ভরার জন্য হোটেলে রেইড ইত্যাদি হয়। তুই নিশ্চিন্ত থাক। বিতস্তার এই ক্ষেত্রে কোনও ভয়ই নেই। তুই যেটা করবি, হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে নিজের পরিচয় দিয়ে ঘটনাটা এক্সপ্লেইন করবি। ওরা ঠিক বুঝে যাবে। পুলিশ ইত্যাদি আমি সামলাচ্ছি, ব্যাক আপ তো আমি থাকলাম। অফিসটাও তো সামলাতে হবে মা, আফটার অল সব কিছুর পরেও দ্য শো মাস্ট গো অন। আশা করি যেটা বোঝাতে চাইছি তুই বুঝলি।"

মানালি বলল, "ওকে। দেখছি।"

ফোনটা কেটে ক্যাব চালককে হোটেলের লোকেশন জানাল মানালি। জানলার বাইরে চোখ গেল তার। সব কিছু কেমন স্বাভাবিক গতিতে চলছে।

শহর ব্যাপারটাই এমন। সব কিছুই চলবে, আর প্রতিটা সময়ে কারও না কারও কত বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে, শহরের গায়ে কোনও আঁচই লাগবে না।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ হোটেলে পৌঁছোল মানালি।

বেশ ঝাঁ চকচকে হোটেল। মানালি ট্যাক্সিতে বসেই যতটা সম্ভব মানসিক শক্তি অর্জন করছিল।

রিসেপশনিস্টকে বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই জানাল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। রিসেপশনিস্ট তাকে লবিতে বসতে বলল। বসতে গিয়েই মানালির চোখ পড়ল দীপের দিকে। গম্ভীর মুখে বসে খবরের কাগজ পড়ছে।

মানালি প্রথমে ভাবল কিছু বলবে না, কিন্তু তার ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একগাদা কথা বললে হয়তো খানিকটা টেনশন কমবে। দীপকে দেখে কেন জানে না সে বেশ আশ্বস্ত হল।

বলল, “এখানে কী ব্যাপার?”

দীপ চমকে তার দিকে তাকাল। বলল, “ওহ আপনি? এখানে কী ব্যাপার?”

মানালি বলল, “সেটা তো আপনি বলবেন। আমি আগে প্রশ্নটা করলাম।”

দীপ কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে নিজের সিট থেকে উঠে তার পাশে এসে বসল, “অ্যাকচুয়ালি আমি একটা বিরাট সমস্যায় পড়েছি। আপনার নামটা কী যেন?”

– “মানালি।”

দীপ বলল, “ওহ, সরি। আমার ভোলাটা উচিত হয়নি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভীষণ কনফিউজড।”

মানালি বলল, “কী ব্যাপারে?”

দীপ কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, “কলকাতার এসকর্ট সার্ভিস সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?”

মানালি হাঁ করে দীপের দিকে তাকিয়ে থাকল। বিতস্তা আর সৌরভের ব্যাপারটা কিছুক্ষণের জন্য পুরোপুরিই ভুলে গেল সে। বলল, “মানে?”

দীপ বলল, “আপনি কী জানেন? এগুলো কি সেফ? মানে পুলিশ ধরে? বা এইচ আই ভি-র চান্স আছে?”

মানালি বলল, “আপনি কী বলে চলেছেন? এসকর্ট সার্ভিস নিয়ে আমি কী করে জানব?”

দীপ বলল, “অ্যাকচুয়ালি আমি আজকেও অফিস ছুটি নিয়েছি। একটা নাম্বারে সকালে ফোন করেছিলাম। ওরা এখানে বসতে বলল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা আমাকে কন্ট্যাক্ট করছে জানাল।”

মানালি বলল, “কিন্তু অফিস-টফিস না গিয়ে হঠাৎ করে এসকর্ট সার্ভিস নিয়ে পড়লেন কেন আপনি?”

দীপ বলল, “ঋতি সাজেস্টেড। আপনি ঋতিকে চেনেন?”

মানালি দুদিকে মাথা নাড়ল।

দীপ বলল, “ঋতির ধারণা হয়েছে আমি সেক্সুয়ালি ফ্রাস্ট্রেটেড একটা লোক, আমার নাকি এসকর্ট সার্ভিস দরকার। আমি সেটা দেখতেই এসেছি। ব্যাপারটা কি সত্যি!”

মানালি বলল, “আমি কিছুই বুঝছি না।”

দীপ বলল, “আমি বোঝাচ্ছি। আপনাকে তো আমার স্টোরিটা বলেছিলাম।”

মানালি বলল, “হ্যাঁ। বলেছিলেন।”

দীপ বলল, “তারপরে অনেক জল গড়িয়েছে। আমি কাল বিয়ের ডিসিশনও নিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সব গোলমাল ঘটল ঋতিকে ফোন করার পরে।”

মানালি বলল, “আপনি সত্যিই কনফিউজড। আপনি বরং বাড়ি যান। কলকাতার এসকর্ট সার্ভিস কেমন সে ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারি ওসব আপনার জন্য না। আপনি এখান থেকে বেরোন।”

দীপ বিহ্বল চোখে মানালির দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করল।

মানালির দীপকে দেখে হঠাৎ করেই খুব খারাপ লাগছিল।

প্রথম যেদিন আলাপ হয়েছিল সেদিনের সঙ্গে আজকের দীপকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না।

ম্যানেজার এসে গেছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “গুড মর্নিং ম্যাম। হাউ মে আই হেল্প ইউ?”

মানালি উঠে নিজের আই কার্ড বের করল, “আমি সময়ের কণ্ঠস্বর থেকে আসছি। একটু আলাদা কথা বলা যাবে?”

ম্যানেজার বললেন, “আমার চেম্বারে চলুন তাহলে।”

মানালি দীপের দিকে তাকাল, “আপনি কি বসবেন?”

দীপ বলল, “হ্যাঁ আমি বসছি। আপনি কাজ সেরে আসুন। আমরা বরং একসঙ্গে বেরোই।”

মানালি বলল, “ঠিক আছে।”

ম্যানেজারের চেম্বারে গেল সে। ম্যানেজার সবটা শুনে বললেন, “ব্যাপারটা যদিও একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে আছে তবু আশা করা যাচ্ছে পুলিশও খুব একটা সমস্যা করবে না। তবু এটা আমাদের ডিউটি ওঁদের জানানো। আশা করছি আপনাকে বোঝাতে পারছি।”

মানালির মাথা কাজ করছিল না। সে বলল, “আই কার্ডটা যদি আমি নিয়ে যাই?”

ম্যানেজার মাথা নাড়লেন, “না ম্যাম, ওটা থানাতেই জমা দিতে হবে আমাদের।”

মানালি ফোনটা বের করে বিশ্বরূপদাকে ফোন করল। সবটা শুনে বিশ্বরূপদা বলল, “ম্যানেজারকে দে।”

মানালি বলল, “আমাদের এডিটর স্যার একটু আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।”

ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিলেন।

মিনিট তিনেক কথা বলার পর ফোনটা রেখে বললেন, “ওকে। আপনি আই কার্ডটা আপাতত নিয়ে যান। তবে হোটেলের রেজিস্টারে আপনাকে সই করে নিয়ে যেতে হবে।”

মানালি বলল, “তাই হোক।”

মিনিট পনেরো লাগল সব মিটতে। সৌরভের আই কার্ড নিয়ে মানালি যখন লবিতে ফিরল, দেখল দীপ তখনও ওখানেই বসে আছে।

৩৭

“আপনার অফিসটা কোন এরিয়ায় বলুন, আমি ড্রপ করে দিচ্ছি।”

গাড়ি স্টার্ট করে বলল দীপ। মানালি অন্যমনস্ক ছিল খানিকটা। বারবার বিতস্তার মুখটা মনে পড়ছিল। এতক্ষণে বোধহয় বিতস্তা অফিসে এসেও গেছে। মানালি গুটিয়ে গেল খানিকটা। বলল, “অফিস যেতে ইচ্ছা করছে না ঠিক। আপনি কোথাও একটা নামিয়ে দিন আমায়।”

দীপ বলল, “সে তো আমারও ইচ্ছা করছে না। আচ্ছা, এজেন্টটা আবার আমায় ফলো করবে না তো?”

মানালি ভুলে গেছিল দীপের কথা। সে বলল, “কোন এজেন্ট?”

দীপ বলল, “আপনাকে বললাম না, এসকর্ট সার্ভিসের এজেন্ট!”

মানালির মনে পড়ল, “ওহ। হ্যাঁ। ঠিক। কেন, আপনাকে ফলো করবে কেন?”

দীপ বলল, “লোকটা আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল।”

মানালি বলল, “আপনি কোনও রকম টাকা দিয়েছেন কি?”

দীপ বলল, “না, এখনও অবধি দিইনি।”

মানালি বলল, “তাহলে ফোন করতে পারে। আপনি অ্যাভয়েড করুন।”

দীপ বলল, “আচ্ছা কোথাও একটা বসে কফি খেলে আপনার সমস্যা আছে? আমার মনে হয় আপনি খুব নিরপেক্ষ একটা জায়গায় আছেন। আমার এমন কাউকে দরকার যার সঙ্গে আমি আমার এই বিতিকিচ্ছিরি অবস্থাটা আলোচনা করতে পারি। যাকে আমাকে একগাদা এক্সপ্ল্যানেশন দিতে হবে না।”

মানালি একটু ভেবে বলল, “ওকে। আমারও তাই মনে হয়। মাথাটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে। আপনি বলতে পারেন। আমি জাজমেন্টাল হব না। যদিও আগে একবার আপনি অনেক কিছুই বলেছিলেন, কিন্তু আমার সব ঘেঁটে গেছে। একেবারে শুরু থেকে বললেই ভালো হয়।”

দীপ বেশ খানিকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে একটা কফিশপের সামনে গাড়ি পার্ক করল।

মানালি গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, “আপনি কি আজকাল রেগুলার অফিস বাঙ্ক করেন?”

দীপ অসহায় ভঙ্গিতে হাসল, “তাই হয়ে যাচ্ছে। একদিন যাচ্ছি, পরের দিন যাচ্ছি না। চাকরিটা থাকবে না সম্ভবত।”

মানালি অবাক হল, “এরকম হল কেন হঠাৎ করে?”

দীপ শপের দরজা খুলতে খুলতে বলল, “আমি তো সেই ব্যাপারটা নিয়েই ভেবে যাচ্ছি। বসুন আপনি, আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসি।”

মানালি বসল একটা টেবিলে। কফিশপটা ছোটো হলেও বেশ সুন্দর। মানালির মনে পড়ল তার একসময় ইচ্ছা ছিল একটা কফিশপ খুলবে। অবশ্য এরকম অনেক ছোটো ছোটো ইচ্ছেই তার হত এককালে। একবার ঠিক করেছিল বইয়ের দোকান দেবে। মানালির মনে হল যত দিন যাচ্ছে, এইসব ইচ্ছাগুলো কেমন কমে যাচ্ছে। অলস লাগে বেশিরভাগ সময়েই। কাজের ভয়, কাজে ছোটোখাটো ভুল ভ্রান্তি হলে কাজ চলে যাবার ভয়, কাজ করতে গিয়ে বারবার বাড়ি থেকে জোর করে বিয়ে করার চাপ, সব মিলিয়ে পৃথিবীটা আজকাল কেমন দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠছে যত দিন যাচ্ছে।

ফোনটা বাজছিল। মানালি দেখল বিশ্বরূপদা ফোন করছে। সে ধরল, “বলো।”

“কি রে হোটেল প্রবলেম মিটে গেছে?”

মানালি বলল, “হ্যাঁ। মিটেছে।”

“তো চলে আয়। দেরি করছিস কেন?”

মানালি কাতর কণ্ঠে বলল, “বিতস্তার সামনে আমি যেতে পারব না বিশ্বরূপদা। প্লিজ ওকে সামলাও।”

বিশ্বরূপদা খুব রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বলল না। একটু থেমে বলল, “ওকে। টেক কেয়ার।”

ফোনটা কেটে গেল।

দীপ চলে এসেছিল। কফির অর্ডার দেওয়া হল।

মানালি ফোনটা ব্যাগের ভেতর রেখে দীপের দিকে তাকাল, “বলুন।”

দীপ খানিকটা বিহ্বলভাবে মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি তো জার্নালিস্ট?”

মানালি অবাক হয়ে বলল, “হ্যাঁ। কেন বলুন তো?”

দীপ বলল, “আপনার কাছে একটা কাগজ আর একটা পেন হবে? আমার একটা ডায়াগ্রাম এঁকে বোঝালে সুবিধা হত।”

মানালি ব্যাগ থেকে তার নোটবুক আর পেনটা বের করে দীপকে দিল।

দীপ টেবিলের ওপর নোটবুকটা রেখে বেশ খানিকক্ষণ পেন নিয়ে বসে থাকল। তারপর কাগজের ওপর বড়ো বড়ো করে লিখল, “চিত্রলেখা, ঋতি।”

মানালি বলল, “বাহ। দুটো নামই সুন্দর।”

দীপ মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, “নামের সঙ্গে মানুষের কোনও মিল থাকে না বিশ্বাস করুন, নাম দেখে যারা মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের মাথায় তিন চার কিলো গোবর আছে।”

মানালি হাসল, “ওকে। বলে যান।”

দীপ বলল, “দেখুন আমি এককালে ভীষণ ভালো ছেলে ছিলাম। বয়েজ স্কুলে পড়েছি, পড়াশুনায় ভালো ছিলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং কো-এড ছিল যদিও, কিন্তু কোনও দিন এইসব প্রেম-ট্রেম নিয়ে খুব একটা ঘাঁটাঘাঁটি করিনি। চাকরি পাবার পর শেয়ার মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ড ইত্যাদি নিয়ে ভালোই ছিলাম। গোল বাধল একটা বিয়েবাড়িতে গিয়ে।”

মানালি বলল, “বিয়েবাড়ি একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা বটে। বেশিরভাগ বাঙালির প্রেম শুরু হয় কোনও না কোনও বিয়েবাড়ি থেকে।”

দীপ বলল, “আপনার হয়েছিল?”

মানালি বলল, “ছোটোখাটো। কিন্তু সে ছেলে এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। আপনি বলে যান।”

দীপ বলল, “ওকে। যা বলছিলাম। এই বিয়েবাড়িতে গিয়েই চিত্রলেখার সঙ্গে আমার আলাপ। বেশ পছন্দ হয়েছিল ওকে। সুন্দরী। কিন্তু ওই যে, আমার ঠাকুরদা বলত, কারও সঙ্গে এক ছাদের তলায় না থাকলে বোঝা যায় না সে মানুষটা আসলে কেমন। কারও সঙ্গে দু ঘণ্টা দেখা হওয়া, আর চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে

থাকার মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। যদিও চিত্রলেখার সঙ্গে আমি একসঙ্গে থাকিনি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, খানিকক্ষণ কথাবার্তা চলার পরে আমি বুঝতে পারলাম যতই ওকে আমি আলাদা আলাদা ভাবি না কেন, ভেতরে ভেতরে মেয়েটা অদ্ভুত ন্যাগিং নেচারের একটা মেয়ে। একটু অল্পতেই আমি হাঁফিয়ে উঠলাম।"

মানালি বলল, "সো ইউ ডিসাইডেড টু ব্রেক আপ?"

দীপ বলল, "না। একেবারেই না। মাথায় যে একেবারে আসেনি তা নয়, কিন্তু তখনও অতটা দূরে ভাবতে পারিনি।"

মানালি বলল, "তবে? সমস্যাটা কখন শুরু হল?"

দীপ একটু ইতস্তত করে বলল, "সমস্যাটা আসলে চিত্রলেখা শুরু করেনি। সমস্যাটা শুরু করেছিল আমার সন্দিগ্ধ মন। কথায় কথায় ওর এক্সের নম্বর আমি পেয়ে গেছিলাম। ওই নাম্বারে ফোন করে আমি জানতে পারলাম ওই ছেলেটার সঙ্গে চিত্রলেখার ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে। এদিকে চিত্রলেখা আমাকে বলেছিল ওর তেমন কিছুই হয়নি। ছেলেটার গলায় একটা অদ্ভুত কনফিডেন্স লক্ষ করেছিলাম। চিত্রলেখা ভার্জিন কি না সেটা আমার মাথায় ঘুরছিল না, আমার শুধু মনে হচ্ছিল যে সম্পর্কের ভিত্তিই মিথ্যে দিয়ে তৈরি, সে সম্পর্কের আদৌ কোনও ভবিষ্যৎ থাকে কি? আমি কনফিউজড হয়ে পড়লাম। আর এমন আয়রনিক ব্যাপারটা, আমি চিত্রলেখার সত্যি মিথ্যা নিয়ে ভাবছিলাম, আর এর পরেই সবথেকে বড়ো মিথ্যাবাদীর মতো কাজগুলো আমি করতে শুরু করলাম। ঋতির সঙ্গে আলাপ হল, আর... বাকিটা ইতিহাস।"

দীপ পেন দিয়ে দুটো নামই অনেকক্ষণ ধরে কাটল।

মানালি সেদিকে তাকিয়ে বলল, "এই মুহূর্তে ঠিক কী অবস্থা?"

দীপ বলল, "এমন কপাল, ঠিক করলাম এসবের থেকে আমি বেরিয়ে আসব। বাড়িতে বললাম মেয়ে দেখতে। এত কিছুর পরে মা সেই চিত্রলেখার বাড়িতেই নিয়ে গেল আমাকে। প্রথমে খুব রাগ হল। পরে কেন জানি না চিত্রলেখার কথা ভেবে একটা অপরাধবোধ এল। ঠিক করলাম চিত্রলেখাকে বিয়ে করব।"

মানালি বড়ো বড়ো চোখ করে দীপের দিকে তাকাল, "কিন্তু আপনি ওর নামটা কেটে দিলেন যে?"

দীপ বলল, "সে তো আমি ঋতির নামও কাটলাম। কিন্তু আসলে তো আমি ওকেই ভালোবাসি।"

মানালি কয়েক সেকেন্ড দীপের দিকে তাকিয়ে বলল, "অসাধারণ তো!"

দীপ দাঁত দিয়ে ডান হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, "চিত্রলেখা আর ঋতি খুব ভালো বন্ধুও বটে।"

মানালি বলল, "বাহ। তাহলে তো সোনায় সোহাগা।"

দীপ বলল, "তবে সুখের খবর হল ঋতি পরের মাসে বাইরে চলে যাচ্ছে।"

কফি এসে গেছিল। মানালি কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল, "আপনার সঙ্গে কথা বলার একটা ভালো ব্যাপার হল, এই সময়টাতে আমি ভুলে গেছিলাম পৃথিবীর বাকি মানুষেরা, কিংবা আমি, ঠিক কতটা সমস্যায় আছি। আমার এক বন্ধুর বয়ফ্রেন্ড মারা গেছে, এক সেলিব্রিটি আমার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পেপারের ওপর ডিফেমেশন চার্জ এনেছেন, একটা নতুন চাকরির অফার এসেছে, সেটায় যাব না যাব না কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না, বিশ্বাস করুন আমি সব ভুলে যাচ্ছিলাম।"

দীপ অধৈর্য হয়ে বলল, "আমাকে একটা সলিউশন বলুন প্লিজ।"

মানালি বলল, "কেমন সলিউশন?"

দীপ বলল, "আমি এসবের থেকে বেরোতে চাই। এরকম আর কটা দিন চললে আমি জাস্ট পাগল হয়ে যাব।"

মানালি বলল, "আপনি টস করতে পারেন। যার নাম আসবে..."

দীপ বলল, "মজা করছেন?"

মানালি বলল, "একেবারেই না।"

দীপ বলল, "কিন্তু যদি চিত্রলেখা জেতে? ও ভীষণ অ্যানোয়িং।"

মানালি বলল, "তাহলে ঋতি।"
দীপ বলল, "ঋতি আমাকে দেখলেই কেমন রেগে যায়। আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না। নিশ্চয়ই চিত্রলেখাকেও আমার নামে অনেক কিছু বলেছে। দেখুন আমি চাই ঋতি আর চিত্রলেখার বন্ধুত্বটা কেটে যাক। ওইজন্যই তো আমি চিত্রলেখাকে বিয়ে করার কথা বলেছি।"
মানালি একটু হেসে নিয়ে বলল, "আমার এক বন্ধু ক্লাস টুয়েলভ ফেল করেছিল, বাবার মারের ভয়ে পাড়ার একটা বখাটে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল। এখনও আপশোশ করে। ঝোঁকের মাথায় কোনও রকম সিদ্ধান্তই বোধহয় নেওয়া উচিত না।"
দীপ মাথা চুলকে বলল, "তাহলে আমার গেম প্ল্যান কী হওয়া উচিত?"
মানালি বলল, "অফিস করুন। আর কোনও দিকে তাকাবেন না। সময়মতো বিয়ে থা করে তারপরে সংসার করুন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি এটাই বলব।"
মানালির ফোন বাজছিল। ফোন বের করে মানালি দেখল ধ্রুব বাগচী ফোন করছেন।
ধরল, "বলুন স্যার।"
ধ্রুব বাগচী বললেন, "খানিকক্ষণ আগে ঈপ্সিতা এসেছে। আপনি ইচ্ছা করলে আসতে পারেন। ও আপনার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চায়।"
ফোনটা কেটে গেল।
মানালি মাথায় হাত দিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বলল, "চলুন।"
দীপ অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"
মানালি বলল, "আপনার জীবনে এক্সাইটমেন্ট কমে যাচ্ছে। চলুন, আমার তুমুল ঝাড় খাওয়া দেখবেন। আপনি এত কিছু বললেন, আমারও মনে হল আপনি একটা ভার্চুয়াল দুনিয়ায় আছেন যেখানে মানুষের প্রেমটাই সব। আর কোনও সমস্যাই নেই। দেখবেন নাহয় সেটাই।"
দীপ হতভম্ব হয়ে মানালির দিকে তাকিয়ে রইল।

৩৮

কলিং বেলের সুইচ টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিতা দরজা খুললেন। মানালি সারা রাস্তা ধরে শুধু এটাই ভেবে এসেছে ঈপ্সিতার মুখোমুখি হলে সে কী করবে। খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই চলে এসেছে সে। বিশ্বরূপদাকেও জানায়নি সে ধ্রুবর এখানে আসবে।
দীপ একবারই জিজ্ঞেস করেছিল এখানে সে এলে কোনও সমস্যা হবে নাকি। মানালি বলেছে, চলুন চুপচাপ থাকবেন, কী আর হবে।
ঈপ্সিতাকে দেখে মানালি কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, "ভালো আছেন?"
ঈপ্সিতা দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন, "আসুন।"
তারা ভিতরে ঢুকল।
অন্যান্য দিন ফ্ল্যাটের সব জানলা বন্ধ থাকে, এখন জানলাগুলো সব খোলা। রোদ এসে পড়ছে জানলা দিয়ে। ধ্রুব বসেই ছিলেন ড্রয়িং রুমে। তাদের দেখে বললেন, "বসুন। আজকের ফটোগ্রাফারটি নতুন মনে হচ্ছে?"
মানালি বলল, "উনি ফটোগ্রাফার নন, বন্ধু বলতে পারেন।"
ধ্রুব ভ্রু কুঁচকে বললেন, "বিশেষ বন্ধু?"
মানালি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না না। বরং একটু কম বন্ধু বলতে পারেন। এখনও বন্ধু হয়ে উঠতে পারেননি।"

ধ্রুব বললেন, "ওহ্। নো প্রবলেম। সরি ফর আস্কিং পিসি মাসি টাইপস অফ কোশ্চেন। একটা ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে দেখলেই তারা একগাদা অ্যাসাম্পশনস করে ফ্যালে। আপনার নাম কী?" ধ্রুব দীপের দিকে তাকাল।

দীপ অন্যমনস্কভাবে ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র দেখতে দেখতে বলল, "দীপ গাঙ্গুলি।"

ধ্রুব বললেন, "আপনি বুঝতে পারছেন আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

দীপ কয়েক সেকেন্ড ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওর ধারণা আপনারা ওকে খুব ঝাড়বেন, তাই আমাকে নিয়ে এসেছেন যাতে ঝাড়টা কম খেতে হয়।"

ধ্রুব আর ঈপ্সিতা দুজনেই হেসে ফেললেন। মানালিও হাসল।

দীপ বলল, "আমি কি ভুল কিছু বললাম?"

ধ্রুব বললেন, "একেবারেই না। তবে মানালি কিংবা আপনি যা ভাবছেন তা ভুল। ঈপ্সিতা আর আমি আসলে মানালিকে একটা গল্প শোনাতে ডেকেছি। কেন জানি না মনে হল, গল্পটা মানালির জানা দরকার। তার আগে একটু স্যান্ডউইচ খাওয়া যাক?"

মানালি মাথা নাড়ল, "না না, আমার খিদে নেই। আপনি বলুন।"

দীপ বলল, "চিকেন না ভেজ? ভেজ হলে খাব না।"

ধ্রুব বললেন, "চিকেন। চিন্তা নেই।"

ধ্রুব উঠতে যাচ্ছিলেন। ঈপ্সিতা বললেন, "আমি এনে দিচ্ছি। তুমি বোসো।"

দীপ মানালির দিকে তাকাল, "কিছু মনে করবেন না, আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না কদিন ধরে। ব্যাপারটা কি হ্যাংলামি হয়ে গেল?"

মানালি বলল, "না না, তা কেন মনে হবে?"

ধ্রুব বললেন, "হ্যাংলা হওয়া ভালো। পেটে খিদে মুখে লাজ হওয়াটা কোনও কাজের কথা না। অথচ দেখবেন আমাদের এটাই শেখানো হয়। ভদ্রতা করো। এই এক ভদ্রতা শব্দটাই আমাদের সব কিছু নষ্ট করে রেখে দিয়েছে।"

দীপ বলল, "ঠিক বলেছেন। এই যে কথাটা আপনি বললেন, পেটে খিদে মুখে লাজ। এর থেকে বাজে জিনিস আর কিছু হয় না। আমি একটা উদাহরণ দি..." দীপ উদভ্রান্তের মতো মানালির দিকে তাকাল, "আমি কি বেশি কথা বলছি?"

ধ্রুব সিগারেট ধরালেন, "একেবারেই না। বেশি কথা বলছেন না। পেটে খিদে রাখবেন না, যা বলার বলে ফেলুন।"

দীপ উৎসাহ পেল, "আমি মনে করি বেশিরভাগ প্রেমিক প্রেমিকাই চায় পরস্পরের কাছে আসতে। কিন্তু চারদিকের পিউরিটান সমাজ তাদের পেছন থেকে টেনে রাখে। জাস্ট ভাবুন, এরা প্রেম করে অথচ শারীরিক সম্পর্কটাকে নিয়ে কত রকম কিছু ভেবে ফ্যালে। এগুলো হিপোক্রেসি নয়?"

ঈপ্সিতা স্যান্ডউইচের প্লেটটা দীপের দিকে এগিয়ে দিলেন। ধ্রুব বললেন, "অবশ্যই। আমরা যখন প্রেম করেছি, সেই সময়টাতেও এসব নিয়ে আমাদের কোনও রকম শুচিবাই ছিল না।"

দীপ স্যান্ডউইচে কামড় দিল।

মানালি ধ্রুবর দিকে তাকাল, "অ্যাকচুয়ালি দীপ ওর সব কিছু নিয়ে ভীষণভাবে ডিস্টার্বড। আপনি বরং আপনাদের গল্পটা..."

ধ্রুব বলল, "হুঁ। দ্যাট ড্যাম স্টোরি। কিংবা গল্প হলেও সত্যি। একটা ধূসর নস্টালজিক সময় কল্পনা করুন মানালি। অত্যন্ত মেধাবী এক ছাত্রী। এক ভবঘুরে ইন্টেলেকচুয়াল সাজতে চাওয়া চালচুলোহীন যুবক। প্রেমে পড়ে গেল। প্রেম মানে যে সে প্রেম নয়। প্রেম মানে সে ভয়াবহ প্রেম। একে অপরকে আঁচড়ে কামড়ে দেওয়া প্রেম। আমরা শুরুতে কখনোই ঘর বাঁধার কথা ভাবতেও পারিনি। কিন্তু হঠাৎই একটা অ্যাড

এজেন্সিতে আমার চাকরি পেয়ে যাওয়া, কিছু হঠাৎ জেগে ওঠা আবেগ আমাদের বিয়ে করিয়ে দিল। এ বাড়ি ও বাড়ি কোনও বাড়িই মানেনি সে বিয়ে যদিও।"

মানালি ঈপ্সিতার দিকে তাকাল। ঈপ্সিতা জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন।

দীপ বিড়বিড় করে বলল, "তাও ভালো আপনার কোনও চিত্রলেখা ছিল না।"

ধ্রুব অবাক চোখে দীপের দিকে তাকালেন, "মানে?"

মানালি বলল, "উনি বলতে চাইছেন সেই সময়ে কোনও তৃতীয় কেউ ছিল না আপনাদের দুজনের মধ্যে।"

ধ্রুবর সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "আমার ছিল। আমার দু-তিন জন ছিল। আঁতলামি প্রেম যাকে বলে। বরাবরই আমি দুশ্চরিত্র। ঈপ্সিতা থাকলে আরও বেশি। ওর অনুপস্থিতিতেই বরং আমি সচ্চরিত্র হয়ে যাই।"

দীপ অবাক গলায় ঈপ্সিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার হিংসা হত না?"

ধ্রুব বললেন, "হত না আবার? কিন্তু মেয়েরা কখনও সরাসরি মুখে বলবে না হিংসার কথা। আকারে ইঙ্গিতে কথায় পরোক্ষে বোঝাবে। ঈপ্সিতাও তাই। আমি ইচ্ছা করে ওকে রাগানোর জন্য আরও বেশি করে ওদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতাম। যাই হোক, সেগুলো তো সব রিলেশনেই হয়, নাথিং স্পেশাল, স্পেশাল যেটা হল, আমার তখন ফার্স্ট সিনেমার শ্যুট শুরু হচ্ছে। ঠিক তখন ঈপ্সিতা কলেজ সার্ভিস কমিশন পাশ করল এবং ওর প্লেসমেন্ট হল উত্তরবঙ্গে। ঈপ্সিতা আমার সঙ্গে কোনও রকম কনসাল্ট না করে চাকরিটা ছেড়ে দিল। ওর কলেজেই বিশ্বরূপ পড়তেন, বিশ্বরূপ সহ ওর অনেক বন্ধুরই ধারণা হল আমিই ওকে চাকরিটা করতে দিইনি। অথচ বিষয়টা একেবারেই তা নয়।"

বিশ্বরূপদার নাম শুনে মানালি খানিকটা চমকাল।

ধ্রুব বলে চললেন, "অভাবের সংসার, খুব বেশি টাকা আসছে না। এদিকে সহধর্মিণী চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন জানতেও পারিনি। তখন এই ফ্ল্যাটটা ছিল না। থাকতাম ছোটো একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে। এর মধ্যেই একদিন তুমুল ঝামেলা। সাবান বা শ্যাম্পু কিছু একটা নিয়ে মে বি। আমি ভয়াবহ কিছু কথা বলে ফেলেছিলাম ওকে, বরাবরই আমি দুর্মুখ, কারও সঙ্গে ঝগড়ায় সেসব আরও বেশি করে বোঝা যায়, ঈপ্সিতা কোনও দিকে তাকাল না, বাড়ি চলে গেল।"

"এবং এই গল্পে কোথাও শ্রীপর্ণা ঘোষাল নেই।" ঈপ্সিতা কথাটা বলে চুপ করে গেলেন।

মানালির অপরাধবোধ জন্মাচ্ছিল। সে বলল, "বুঝতে পারছি। উনি অনেক পরে এসেছেন।"

ধ্রুব বললেন, "কোনও কালেই আসেননি। বন্ধুরা বন্ধুই থাকেন।"

দীপ আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল "আপনি কখনও ওঁর রাগ ভাঙাতে যাননি?"

ধ্রুব সিগারেট ধরালেন, "আশ্চর্যজনক হলেও কথাটা সত্যি, ঝগড়াটা হয়েছিল তুচ্ছ কারণে, ঈপ্সিতা রূপনারায়ণপুরে চলে গেছিল, এদিকে 'রেনেসাঁ'-র শুটিং তখন তুঙ্গে, কিছুতেই ও ফোন ধরছে না, একদিন শুটিং ছিল না, ঠিক করেছিলাম পরের দিন যাব, রাস্তায় টালিগঞ্জ মেট্রোর কাছে ওর এক বন্ধু আমাকে যা নয় তাই বলে গেল। আমার জন্য মেয়েটা নাকি কেরিয়র শেষ করেছে, কলেজে চাকরি পেয়েও গেল না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার ধারণা হল ও-ই বন্ধুদের কাছে কাঁদুনি গেয়েছে, তুমুলভাবে রেগে গেলাম, সব কিছু শেষ করে দিলাম। আর গেলামই না। প্রবল জেদ ধরে ছিলাম। এর মধ্যেই সরকারি কোটায় এই ফ্ল্যাটটা কিনতে পারলাম।"

দীপ বলল, "আপনি গেলেন না, কোনও দিন যোগাযোগও হয়নি দুজনের? তবে? আজ হঠাৎ উনি এখানে?"

ধ্রুব মানালির দিকে আঙুল তুলে দেখালেন, "সৌজন্যে এই ভদ্রমহিলা।"

দীপ একবার ধ্রুব, একবার ঈপ্সিতা, আর-একবার মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, "শুধু স্যান্ডউইচেই কর্তব্য সেরে ফেললেন? উনি তো মিরাকল করেছেন!"

ঈপ্সিতা দীপের দিকে তাকালেন, "তা ঠিক। তবে কী জানেন তো, এতদিন পরে এসে আমরা দুজনেই বুঝতে পারি, সম্পর্কে দূরত্বেরও একটা দরকার আছে। আমরা দুজনে যথেষ্ট লাকি যে সাবান শ্যাম্পুর মতো ছোটোখাটো ব্যাপারেই সব কিছু শেষ হয়ে গেছিল। সে কারণেই হয়তো এত দিন পরেও আমরা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারি।"

মানালি বলল, "আপনাদের ডিভোর্স হয়নি কোনও দিন, তাই না?"

ধ্রুব হাসলেন, "বিয়েই হয়নি কোনও দিন। আমরা লিভ টুগেদার করতাম। সবাই জানত বিয়ে। আপনাদের স্টোরি কোনও দিক থেকেই দাঁড়ায় না।"

মানালি হাঁ করে ধ্রুবর দিকে তাকাল।

ধ্রুব বললেন, "কেসটা রাগের মাথায় করব ঠিক করেছিলাম। সেসব আর করব না।"

মানালির মনে হল মাথা থেকে একটা বড়ো পাথর নেমে গেল। অকারণেই তার চোখের কোণ ভিজে উঠল।

দীপ বলল, "আপনারা তার মানে আজ থেকে একসঙ্গে থাকছেন?"

ধ্রুব ঈপ্সিতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "দেখা যাক, পাগল তো দুজনেই। এখন থেকে দু ঘণ্টা পরে কোথায় যাব তাও জানি না। তবে অনেক দিন পরে ওর হাতে আলু পোস্ত খাব। আমার মতো মাতাল লোক, যার খাওয়ার ঠিক নেই, তার জন্য এটা তো একটা সুখবরই বটে।"

মানালির ফোন বাজছিল। দেখল বিশ্বরূপদা।

মানালি ধরল, "বলো।"

"শোন, চিন্তা করিস না, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই কন্ট্রোলে। বিতস্তা ভীষণ কাঁদছে, তবে সামলে নেব। তোর আজকে অফিসে না এলেও হবে। কিন্তু কাল থেকে বিতস্তা যেন অফিসে আসে, স্বাভাবিক থাকে, এই দায়িত্বটা তোকে নিতে হবে। পারবি তো?"

মানালি বলল, "পারব।"

"কোথায় আছিস এখন?"

মানালি ধ্রুব আর ঈপ্সিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "বন্ধুর বাড়ি।"

"ওকে। চোখ কান খোলা রাখ। নতুন যা নিউজ পাবি, নোট করতে থাক। একজন ভালো সাংবাদিকের কখনও বিশ্রাম নেই, মনে রাখিস।"

ফোনটা রেখে দিল বিশ্বরূপদা।

মানালি ধ্রুবর দিকে তাকাল, "বিশ্বরূপদাকে বলবেন না কোনও দিন?"

ধ্রুব হাসলেন, "আপনি বলে দেবেন। কিংবা আমিই কোনও দিন বলব। রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছি বটে, কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের ভালোই চেয়েছিলেন উনি।"

মানালি বলল, "পরের সিনেমাটা কি তবে প্রেমের হবে?"

ধ্রুব হো হো করে হেসে উঠলেন।

৩৯

গাড়ি স্টার্ট করে দীপ বলল, "আমার লাইফে সত্যি সমস্যা আছে বুঝলেন?"

মানালি বলল, "কী রকম?"

দীপ বলল, "এত কিছু শুনেও আমি এখনও বুঝতে পারছি না এই জাগ্রত প্রেমের আবেগ নিয়ে আমি কার কাছে যাব, ঋতি, না চিত্রলেখা?"

মানালি হেসে ফেলল, “আপনি বরং গুরুদেবের কাছেই যান।”

দীপ বলল, “আচ্ছা আমরা কি বন্ধু? আপনি তো আবার কী যেন বললেন, কম বন্ধু না কী!”

মানালি বলল, “হ্যাঁ ওই হল আর কি!”

দীপ বলল, “তাহলে আমরা আপনি আপনি করছি কেন? তুইটা ঠিক আছে না?”

মানালি বলল, “ওকে, নো প্রবলেম। তবে একটাই শর্ত আছে বন্ধুত্বের।”

দীপ সিরিয়াস হয়ে রাস্তার বাঁদিকে গাড়ি দাঁড় করাল, “কী?”

মানালি বলল, “হঠাৎ করে ওয়ান ফাইন মর্নিং প্রোপোজ করে দেবেন না। আমার প্রায় সব ছেলে বন্ধুদের এটার জন্য কাটিয়েছি।”

দীপ বলল, “এই মরেছে।”

মানালি বলল, “কী হল?”

দীপ বলল, “আমি তো জাস্ট ভাবছিলাম তুই, মানে আপনিই আমার জন্য এক্কেবারে পারফেক্ট ম্যাচ। ন্যাগিং নন, হুটহাট রিঅ্যাক্ট করে ফেলেন না, জাজমেন্টাল বা মেন্টাল কোনোটাই নন, সব দিক থেকেই, মানে সেই ছক থেকেই আপনাকে আমি বন্ধু বানাবার ট্রাই নিচ্ছিলাম আর কি! ওল্ড স্কুল মেথড বা ওই সবই আর কি!”

মানালি চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, “প্লিজ না, আপনি ভীষণ বিপজ্জনক মানুষ।”

দীপ বলল, “তবে তোকে ফোন করতে পারি তো? মানে অ্যাটলিস্ট বায়ু চড়েছে তো, ফোন করলে হয়তো ত্রিকোণ প্রেম থেকে এবারের মতো সসম্মানে পালিয়ে বাঁচতে পারব।”

মানালি বলল, “ওকে, তাই হোক।”

দীপ বেশ কয়েক সেকেন্ড মানালির দিকে তাকিয়ে বলল, “তবে ঋতি মেয়েটা খারাপ ছিল না যাই বলুন।”

মানালি মাথায় হাত দিয়ে বলল, “আপনি গাড়ি চালান প্লিজ।”

দীপ বলল, “তবে ঋতি তো আর ঈপ্সিতা নয় যে চাকরি ছেড়ে আমার জন্য থেকে যাবে! চিত্রলেখাও খারাপ না অবশ্য।”

মানালি গাড়ির এফ এমটা চালিয়ে দিল...

৪০

“তাহলে তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ না? পড়তে যাচ্ছ? তাও এই বুড়ো বয়সে?”

বিশ্বরূপদাকে প্রশ্নটা করেই হেসে ফেলল মানালি। খানিকক্ষণ আগে বিশ্বরূপদার ফেয়ারওয়েল পার্টি হয়ে গেল। এখন বিশ্বরূপদাই তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে তার গাড়িতে করে।

তার প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বরূপদাও হাসল। বলল, “চাকরি করার থেকে ওটাই সেফ। দেখিস না কখন কার সেন্টিমেন্টে লেগে যায় আর পারলে তখনই ফাঁসিতে চড়িয়ে দেয়। বাদ দে, তোর খবর বল। বিপ্রতীপ রায়ের অফারটা নিয়ে কী ভাবলি?”

মানালি বলল, “জানি না। ভদ্রলোক আজকেও ফোন করেছিলেন। আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে আমার কথা ওঁকে তুমিই রেকমেন্ড করেছিলে, তাই না?”

বিশ্বরূপদা একটা খয়েরি রঙের আই-টুয়েন্টিকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, “উঁহুঁ, এই বাজারে কেউ কাউকে রেকমেন্ড করে না। তুই একদিনে যা খেল দেখিয়ে দিয়েছিলি, এটা তারই সাইড এফেক্ট ছিল।”

মানালি বলল, “তোমার কী মনে হয়? আমার কী করা উচিত?”

বিশ্বরূপদা বলল, “কী আবার? সিম্পল। ট্রিভিয়া নিউজে জয়েন করবি। ওখানে তোকে কত বেশি স্যালারি দিচ্ছে সেটা দেখ!”

মানালি একটু ইতস্তত করে বলল, “বিতস্তাকে এভাবে একা ছেড়ে...”

বিশ্বরূপদা বলল, "শোন মানালি, এটা প্রফেশনাল ফিল্ড। এখানে এইসব সেন্টিমেন্ট নিয়ে ভাবলে জীবনে কিচ্ছু করতে পারবি না। তুই তো ঠিকই করে নিয়েছিস মোটামুটি সিঙ্গল থেকে জাতির উদ্দেশে নিজের সাংবাদিক কেরিয়রটাকে উৎসর্গ করবি। সেক্ষেত্রে এর থেকে বেটার অপশন আপাতত তোকে কে দেবে? আর বিতস্তা তো হারিয়ে যাচ্ছে না। দেখা করবি, মিট করবি মাঝে মাঝেই, সেরকম জায়গা করে নিতে পারলে ট্রিভিয়া নিউজে বিতস্তাকেও রেকমেন্ড করে নিতে পারবি।"

মানালি রাগল একটু, "তোমাকে কে বলেছে আমি সিঙ্গল থেকে জাতির উদ্দেশে এইসব বুলশিট?"

বিশ্বরূপদা হাসল, "সেরকমই তো ট্রেন্ড দেখছি। পাগলের মতো অফিস আসিস আর বাড়ি যাস। আর কোনও কিছু নিয়ে তো ভাবতেও দেখি না তোকে।"

মানালি বলল, "প্লিজ তুমি আর বাবা-মার মতো শুরু কোরো না।"

বিশ্বরূপদা বলল, "কোথায় ধ্রুব ঈপ্সিতার মতো জ্বলন্ত প্রেম করবি, গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিবি, তা না..."

মানালি বলল, "ছোটো মুখে একটা বড়ো কথা বলব বিশ্বরূপদা?"

বিশ্বরূপদা বলল, "বাওয়া। বাংলা সিরিয়াল টাইপ ডায়লগ ঝাড়ছিস কবে থেকে? বল বল কী বলতে চাস।"

মানালি একটা ঢোক গিলে বলল, "ঈপ্সিতা বাগচীর ওপর কোনও এককালে তোমার চাপ ছিল, না?"

বিশ্বরূপদা গাড়ি চালাতে চালাতে হাসতে লাগল। মানালি বলল, "কী হল, বলো না, ছিল?"

বিশ্বরূপদা বলল, "এই এত্তবড়ো ওয়াইল্ড গেসটা করলি কী হিসেবে?"

মানালি বলল, "সব মেয়েই তো মা দুর্গার অংশ, জানো তো, ত্রিনয়ন দিয়ে সব দেখতে পায়। আমিও তেমন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ধ্রুব বাগচী আর ঈপ্সিতা প্রেম করছেন, তুমি ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলে, একটা সময় ধ্রুব আর ঈপ্সিতার তুমুল ঝামেলা, তুমি বুঝলে আর যাই হোক, ঈপ্সিতা ধ্রুবকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না, শেষমেশ চারটে কথা শুনিয়ে দিলে ধ্রুবকে। পরে বুঝলে সেটা আরও বাজে কেলো করে ফেলেছ, এত বছর পরে এসে ব্যাপারটা খুঁচিয়ে দেখতে চাইলে সত্যি কোনও লাভ হয় নাকি, এবং শেষ পর্যন্ত সফল হলে। দূর থেকে কাল হো না হো-র শাহরুখ খানের মতো গোটা ব্যাপারটা দেখে শহরটাই ছেড়ে চলে গেলে।"

বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "তাও ভালো, বলিসনি পৃথিবীটা ছেড়েই চলে গেলে।"

মানালি বলল, "বলো না, ঠিক বললাম কি না?"

বিশ্বরূপদা মাথা নাড়ল, "তুই ভাবলি কী করে ট্রিভিয়া নিউজের স্কুপ খুঁজে বেড়ানো সাংবাদিককে আমি এত বড়ো কনফেশনটা করে ফেলব?"

মানালি হেসে ফেলল, "তার মানে আমার গেস সত্যি?"

বিশ্বরূপদা চোখ পাকাল, "একদম না। এইসব নিয়ে আমি আর একটা কথাও বলব না।"

মানালি হাসছিল। বলল, "আচ্ছা। বলতে হবে না।"

মানালির ফোন বাজছিল। মানালি দেখল দীপ ফোন করছে। কেটে দিল।

বিশ্বরূপদা বলল, "কী ব্যাপার? কে ফোন করছে?"

মানালি বলল, "আরে এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। টোটাল কনফিউজড মেটিরিয়াল।"

বিশ্বরূপদা বলল, "বেশ তো পড়েছিস, পড়েছিস, তাতে ব্লাশ করছিস কেন?"

মানালি রেগে গেল, "কোথায় ব্লাশ করলাম?"

বিশ্বরূপদা বলল, "এই তো করছিস।"

মানালি বলল, "তুমি সামনের দিকে দেখে গাড়ি চালাও তো। কী সব ভুলভাল বকে যাচ্ছ।"

বিশ্বরূপদা বলল, "কেসটা কী?"

মানালি বলল, "সেরকম কিছু না। একটা কমপ্লিটলি এইমলেস ছেলে। এককালে বেশ গোছানো ছিল। এখন দুটো মেয়ের পাল্লায় পড়ে মাথা-টাথা বিগড়ে পেগলে গেছে।"

বিশ্বরূপদা বলল, "বেশ তো, তুই দিশা দেখা তবে।"

মানালি বলল, "খেপেছ? দুদিন পরে আরও কোনও একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে আমাকেও কনফিউজ করে দেবে। এইসব পাবলিকদের থেকে যত দূরে থাকা যায় তত ভালো।"

বিশ্বরূপদা বলল, "তাহলে ছেলেটা তোকে ফোন করছে কেন? তুই-ই বা ব্লাশ করছিস কেন?"

মানালি থতোমতো খেয়ে বলল, "কোথায় ব্লাশ করতে দেখছ তুমি?"

বিশ্বরূপদা বলল, "হয়, হয়, যানতি পারো না। ফোনটা করল ছেলেটা, সেটাও কেটে দিল, এটা বোঝাচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে তুই ওভারপ্রোটেক্টিভও বটে। গুড গুড, মেয়েরা একটু কনফিউজড ন্যালাক্যাবলা পছন্দ করে, তুইও সেরকমই তাহলে।"

মানালি রেগে গেল, "কী সব ফালতু বকে যাচ্ছ বলো তো? তুমি ছেলেটাকে দেখেছ? দেখলে এ কথা বলতে না।"

বিশ্বরূপদা বলল, "কথাগুলো আমাকে বলছিস না নিজেকে?"

মানালি গুম হয়ে বসে রইল।

বিশ্বরূপদা বলল, "প্রাচীন বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, জন্ম মৃত্যু বিয়ে..."

মানালি বলল, "ইশ, সেই ক্লিশে, মানে বলতে চাইছ ছেলেটা এত কনফিউজড কারণ শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেই জুটবে বলে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "একজ্যাক্টলি। এই তো, ভালো মেয়ে। বুঝে গেছিস। এবার ফোন করে ফেল।"

মানালি বলল, "চুপ করো তো। যত ভুলভাল।"

তাদের বাড়ির গলি এসে গিয়েছিল। বিশ্বরূপদা হাসতে হাসতে বলল, "ঠিক আছে। করিস না। কিন্তু কিছু হলে ফেসবুকে আপডেট দিস। দূর থেকে আশীর্বাদ করে দেব।"

মানালি বলল, "কাল ফ্লাইট তো?"

বিশ্বরূপদা বলল, "ইয়েস।"

মানালি বলল, "কে এবার আমার পাগলামিগুলো প্রশ্রয় দেবে?"

বিশ্বরূপদা বলল, "দেখ মানালি, সাইকেল যারা শেখে, কখনও দেখেছিস?"

মানালি বলল, "না, আমি সাইকেল জানি না।"

বিশ্বরূপদা বলল, "যারা সাইকেল শেখায়, তারা প্রথমে ধরে থাকে, যে শিখছে সে নিশ্চিন্ত যে কেউ ধরে আছে, একটা সময় কিন্তু সাপোর্টটা ছেড়ে দেওয়া হয়। যে শিখছিল সে জানতেও পারে না সাপোর্টটা নেই। যখন জানতে পারে প্রথম প্রথম পড়ে যায়। একটা সময় ঠিকই শিখে যায়। তুই নিশ্চিন্ত থাক, এখন কদিন একটু আধটু পড়বি ঠিকই, কিন্তু তুই সাইকেল চালানোটা ঠিকই শিখে যাবি।"

মানালি কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থেকে বলল, "ভালো থেকো বিশ্বরূপদা।"

বিশ্বরূপদা বলল, "তুইও। যাহ্। অনেক রাত হল।"

মানালি গাড়ি থেকে নামল। বিশ্বরূপদা বেরিয়ে গেলে কয়েক সেকেন্ড রাস্তাতেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পথে রওনা দিল। মনখারাপ লাগছিল। বিশ্বরূপদা একটা ছাতার মতো ছিল। মনে হচ্ছিল ছাতাটা সরে গেল আজ থেকে।

ফোনটা আবার বাজছিল।

মানালি ধরল, "বলুন।"

"আমি ঠিক করেছি সন্ন্যাস নিয়ে নেব। গেরুয়া পরে অফিস করব। ব্যাপারটা কেমন হবে?"

মানালি গম্ভীর হয়ে বলল, "ভালো হবে।"

"হাতের কাছে তো একজন গুরুদেব আছেই। চাঁদবদন মহারাজ। বাবার পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে জনসেবা করা যাবে।"
মানালি বলল, "আচ্ছা, আর কী কী প্ল্যান আছে?"
দীপ বলল, "একটা জিনিস জানার আছে। সন্ন্যাসীদের মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট থাকলে পাপ লাগে না তো?"
মানালি বলল, "সেটা জানি না, চাঁদবদন মহারাজকে জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।"
দীপ বলল, "আমায় কাল আবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে।"
মানালির বলল, "বেশ তো, যাবেন।"
দীপ বলল, "কবে ফিরব ঠিক নেই। ফোনও করতে পারব না।"
মানালি বলল, "ভালো তো।"
দীপ বলল, "আপনি রাগ করলেন?"
মানালি বলল, "রাগ করতে যাব কেন বলুন তো?"
দীপ বলল, "তাও তো ঠিক। রাগ করতে যাবেন কেন খামোখা। তা ছাড়া আমি তো সন্ন্যাসী হয়ে যাব।"
মানালি বলল, "হুঁ। এবার রাখি?"
দীপ বলল, "আচ্ছা রাখুন।"
মানালি গলি দিয়ে হাঁটছিল। বাড়ির সামনে এসে দেখল দীপ দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁ করে বলল, "আপনি এখানে?"
দীপ বলল, "এই একটু চমকে দিলাম আপনাকে।"
মানালি বাড়ির চারপাশে দেখল। আশেপাশের কাকিমা পিসিমাদের অ্যান্টেনাগুলো বেশিই সক্রিয়। সে বিরক্ত হয়ে বলল, "বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসতে পারতেন তো।"
দীপ বলল, "ও বাবা, আপনার বাবা মা আছেন না? তাঁরা কী ভেবে নেবেন।"
মানালি বলল, "কী ভাববে?"
দীপ বলল, "অনেক কিছু ভাবতে পারে।"
মানালি বলল, "আচ্ছা। চলুন ভিতরে চলুন।"
দীপ বলল, "না আমি যাব না। আমি বাড়ি যাই।"
মানালি বলল, "আচ্ছা। যান তাহলে।"
দীপ বলল, "অ্যাকচুয়ালি লং ড্রাইভে যেতে চাইছিলাম। কাউকে পাচ্ছি না।"
মানালি বলল, "ওহ। ঠিক আছে।"
দীপ কয়েক সেকেন্ড পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি যাবেন?"
মানালি আঁতকে উঠল, "এত রাতে?"
দীপ নিভে গেল একটু, "তাও ঠিক। অনেক রাত হয়েছে। আসলে আমি এখনও এত কনফিউজড, বুঝতে পারছি না কী করব। জাস্ট কয়েকটা দিনে কী থেকে কী হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারছি আমার এখানে আসা একেবারেই উচিত হয়নি। কদিন ধরে আপনাকেও বড্ড জ্বালাতন করছি বলুন? আমি বরং.. আমি বরং যাই, হ্যাঁ?"
মানালিকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে দীপ হনহন করে হাঁটা লাগাল।
মানালি সেদিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বাড়ির দরজায় বেল বাজাল। মা দরজা খুলল। মানালি বলল, "মা ব্যাগটা রাখো তো, একটা জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট এসেছে, একটু বেরোতে হবে।"
মা তার দিকে হাঁ করে তাকাল, "এত রাতে?"
মানালি বলল, "হ্যাঁ, এই তো জাস্ট এল। পরে ফোন করে নিচ্ছি। যাই এখন।"

মানালি ব্যাগটা মার হাতে দিয়েই পিছন ফিরে দৌড় লাগাল।
ছেলেটা কদ্দূর চলে গেল কে জানে...